বাঙ্গলা ভাষা-প্রসঙ্গে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা ৯ : কলিকাতা ২৯

বাক্‌তত্ত্বে যাঁহার সার্থক সাধনা ও সহজ অধিকাব,

বাঙ্‌মযে যাঁহার অসীম আগ্রহ ও অপাব প্রীতি ,

যিনি আমাব সকল বচনার ভাণ্ডাবী,

আমাব সকল মুদ্রণাব কাণ্ডাবী ,

একনিষ্ঠ সাহিত্য সংস্কৃতি সেবক,

আত্ম নিবেদিত অনুশীলন-সহাযক

অনুজকল্প শ্রীমান্ আনলকুমাব কাঞ্জিলাল

কল্যাণীযেষু ॥

শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে—গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ॥ (বঙ্গালস্য)

'ঘনরসময়ী (নদী অর্থে—প্রচুর জলময় ; ভাষা অর্থে—বিভিন্ন রসের অধিষ্ঠানভূমি), গভীর (গভীর-খাত-বিশিষ্ট ; গভীর-অর্থ-সমন্বিত) ; বক্রিম (বঙ্কিম, আঁকাবাঁকা যাহার গতি ; সুন্দর বা মনোহর) ও সুভগা (সুন্দর, ঐশ্বর্য্যশালিনী), এবং বহু কবি যাহাকে আশ্রয় করিয়াছেন—এইরূপ গঙ্গানদী ও বাঙ্গালা ভাষা—এই দুই প্রবাহে অবগাহন করিলে, মানুষ পবিত্র হয়॥'

[খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে শ্রীধরদাস-কর্তৃক সংকলিত প্রকীর্ণ-সংস্কৃত-কবিতা-সংগ্রহ 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' গ্রন্থে উদ্ধৃত অজ্ঞাত-পরিচয় কোনও পূর্ববঙ্গীয ('বঙ্গাল' অর্থাৎ বাঙাল) কবির বঙ্গভাষা-প্রশস্তি॥]

গ্রন্থকথা

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের একখানি প্রবন্ধ-সংকলন-গ্রন্থ—'মনীষী স্মরণে' (১৯৭২) যখন 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন-সংস্থা থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন উক্ত পুস্তকের মুদ্রণ-সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। ঐ সময়ে 'জিজ্ঞাসা'-র স্বত্বাধিকারী, আমার অগ্রজতুল্য শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়ের বাসনা হয় যে ভাষাচার্য্যের যেসব বাঙ্গলায় লেখা বাঙ্গলা ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকীর্ণ আছে, সেগুলিকে সংকলিত করে একখানি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করবেন এবং এ ব্যাপারে আমায় উদ্যোগী হতে বলেন। বাস্তবিক পক্ষে ভাষাচার্য দীর্ঘকাল ধরে মাতৃভাষা-সম্পর্কিত যেসব মূল্যবান্ আলোচনা করেছেন, তা সংকলিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বাঙ্গলা ভাষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু পাঠকবর্গ যথেষ্ট উপকৃত হবেন, একথা মনে করে এবং একজন দায়িত্বশীল প্রকাশকের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে, এতে আনন্দিত হয়ে আমি আমার পরম আত্মীয়তুল্য, ভাষাচার্যের গবেষণা-সহায়ক শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হই। তাঁর পরামর্শক্রমে এবং সহৃদয় সহযোগিতায় প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য ১৩২৩ থেকে ১৩৭৯ সালের মধ্যে রচিত ভাষাচার্যের বিভিন্ন প্রবন্ধের একটি তালিকা প্রস্তুত করে তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে যাই। তিনি আমাদের বক্তব্য শোনেন এবং এই সংকলন গ্রন্থ (বাঙ্গলা ভাষা-প্রসঙ্গে) প্রকাশে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর আমরা প্রেসকপি প্রস্তুত করি—পুনর্মুদ্রণের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বহু প্রবন্ধই সম্পাদনা করেন।

বর্তমান গ্রন্থে পরিশিষ্টের চারটি রচনা নিয়ে ভাষাচার্যের মোট আটাশটি রচনা স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থের ' "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব' (১৩২৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৯৭-২১৭) প্রবন্ধটি লেখকের প্রথম প্রকাশিত বাঙ্গলা প্রবন্ধ। 'অর্ধমাগধী' প্রবন্ধটি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, এইজন্য যে, পরোক্ষ ভাবে 'অর্ধমাগধী'র সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার যোগ আছে।

গ্রন্থান্তর্গত প্রবন্ধগুলি কালানুক্রমে নয়, বহুলাংশে বিষয়ানুক্রমে সাজানো হয়েছে। গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকারের অনুমতিক্রমে 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৫০) থেকে, 'স্বরসংগতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি' ও 'মহাপ্রাণ বর্ণ' প্রবন্ধ দুটি এবং 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক

প্রকাশিত, ৩য় সংস্করণ ১৯৪৫) থেকে "পরিশিষ্ট [৫.৫] 'সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী (হিন্দী বা উর্দূ), ফার্সী, ও আরবী ব্যাকরণের সহিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের তুলনা'— যার বর্তমান নাম 'অন্য কতকগুলি ভাষার ব্যাকরণের সহিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের তুলনাত্মক বিচার'—প্রবন্ধটি বর্তমান গ্রন্থে পরিশিষ্ট হিসাবে সন্নিবেশিত হল। গ্রন্থকার ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যায় 'সবুজ-পত্রে'-"বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা'তের গোড়ার কথা" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, উক্ত প্রবন্ধে তিনি বাঙ্গলা ভাষার রূপ-বিবর্তনের একটি আদর্শ 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে। / দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে॥'—অবলম্বনে প্রস্তুত করেন, এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট-অংশে সেটির পরিমার্জিত রূপ —যা ODBL Pt III pp 104-106-তে প্রকাশিত হয়েছে, সংকলিত হ'ল।

আমাদের সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও এই গ্রন্থে মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে, মারাত্মক প্রমাদ ঘটেছে গ্রন্থের ৭, ১৫১, ১৬১ এবং ১৭৮ পৃষ্ঠাগুলিতে, প্রমাদগুলি নিম্নরূপ :

পৃঃ ৭ পংক্তি ১৬ : Emeneav হবে Emencau

পৃঃ ১৫১ পংক্তি ২ : Congregacao হবে Congregação

পংক্তি ৪ : Missaõ হবে Missiõ

পৃঃ ১৬১ পংক্তি ৬ : [ɐri] হবে [ãri], [Siidz] হবে [Siid 3]

dz হবে d3

পংক্তি ৭ : [zi = gɔ] (জী-য্য— হবে [ʑi : gɔ] (জী-য্য)

পৃঃ ১৭৮ পংক্তি ৮ চবুট্টান হবে চবুত্তান

পৃঃ ২৬৫-র পাদটীকা পৃঃ ২৬৭-তে মুদ্রিত হয়েছে।

গ্রন্থস্থ মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে লজ্জিত।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

বাংলা বিভাগ
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
কলিকাতা ৯

সূ চি প ত্র

বাঙলা ভাষার কুলজী	১
খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গলা	১৫
ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গলা কাগজ-পত্র	২৩
ভারতচন্দ্রের একখানি পুঁথি	৭১
বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা	৪৬
বাঙলা ভাষার শব্দ	৫৭
বাঙলা ভাষায় বিদেশী শব্দ	৬৪
বাঙলা উচ্চারণ	৭২
বাঙলা উচ্চারণ শিক্ষা	৭৬
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ও 'চলন্তিকা'	৮১
একখানি উর্দূ-বাঙ্গালা অভিধান	৯৭
শব্দ-প্রসঙ্গ	১০৭
বাঙ্গালা বানান-সমস্যা	১১৬
বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজি নাম ও শব্দ	১২৬
'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'	১৪৬
'কৃপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও বাঙ্গালা উচ্চাবণ-তত্ত্ব	১৫৮
'আহুট', 'আউট' ও সার্ধ-সংখ্যাবাচক শব্দাবলী	১৮৫
বাঙ্গালা ভাষায় কর্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া	১৯২
"বাঙ্গলা ভাষায় অনুজ্ঞা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	২১৭
'বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্তমান কালের উত্তম পুরুষ' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	২৩০
বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা	২৩৫
একজন বিদেশীর লেখা প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ	২৪৬
অর্ধমাগধী	২৭২
'সূক্ষ্মক বাঙ্গলা'	২৮৫
প রি শি ষ্ট	২৯৯

[ক] স্বরসংগতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি [খ] মহাপ্রাণ বর্ণ [গ] অন্য কতকগুলি ভাষার ব্যাকরণের সহিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের তুলনাত্মক আলোচনা [ঘ] বাঙ্গলা ভাষার রূপ-বিবর্তন

বাঙলা ভাষার কুলজী

ভাষাতত্ত্বের কোন্ অঙ্গ নিয়ে আপনাদের সুমুখে কিছু নিবেদন ক'র্‌বো তা আমি ঠিক ক'র্‌তে পারি নি। ভাষাতত্ত্ব আর তার শাখা উচ্চারণতত্ত্ব—এই দুটো নোতুন বিদ্যার মোহে প'ড়ে গিয়েছি[১]—সবে মাত্র এই বিদ্যার আস্বাদ পেয়েছি, আগ্রহের সঙ্গে কিছু কিছু প'ড়্‌ছি, শিখ্‌ছি, আপনাদের কিছু নোতুন কথা শোনাবো এমন যোগ্যতা এখন আমার হয় নি। এই বিদ্যাটাকে নোতুন ব'লেছি, কিন্তু এটা বিশেষ ক'রে আমাদের দেশেরই বিদ্যা—তাহ'লেও অনেক দিন ধ'রে আমাদের দেশে, বাঙলায়, এর চর্চা নেই—ইউরোপ থেকে ফের একে নোতুন ক'রে আমদানি ক'র্‌তে হ'য়েছে। পাণিনি, প্রাচীন শিক্ষাকার আর সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণকারেরা আমাদের নমস্য; সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার চর্চায় এই গুরুদের ছাড়্‌লে চ'ল্‌বে না—কিন্তু আমরা এখন যে ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যা শিখ্‌বো, যে উচ্চারণতত্ত্ব বা শিক্ষাশাস্ত্র প'ড়্‌বো সেটি হ'চ্ছে একটা মস্ত ব্যাপক জিনিস; কেবল ভাষাশিক্ষা আর শুদ্ধভাবে শব্দ বা মন্ত্র উচ্চারণ করানো তার উদ্দেশ্য নয়—সেটি একাধারে মানব-ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ধ্বনিতত্ত্ব। এই বিদ্যা পশ্চিমের কাছ থেকে নোতুন যুগের এক দান হিসাবে আমাদের কাছে উপস্থিত; সমস্ত জীবন ধ'রে এর সাধনা ক'র্‌তে পারা যায়; এর সাধনায় মানবমাত্রই অধিকারী, এর সাহায্যে অনেক বিষয়ের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারা যায়, এই বিদ্যা ভাষার ভিতর দিয়ে প্রাচীনের যথার্থ স্বরূপটি দেখিয়ে দেয়। ভাষা মানবের বিশেষ গৌরব; আধুনিক জগতে জাতি ও সভ্যতা অর্থে ধর্ম নয়, কৌলিক উৎপত্তি নয়, গণ-মণ্ডলী নয়, জাতি ও সভ্যতা অর্থে মুখ্যতঃ ভাষা। আমরা বাঙালী—আমাদের মধ্যে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, আর্য্য আছে, দ্রাবিড় আছে, কোল মোঙ্গোল আছে, ফিরিঙ্গি আছে—কিন্তু আমাদের জাতীয়তার সূত্র হ'চ্ছে আমাদের বাঙলা-ভাষা। এই ভাষার জাত ঠিক হ'লে, এর পিতৃকুল মাতৃকুলের সমস্ত খবর জানা গেলে, বাঙালী জাতির বাঙালীর ধর্মের সভ্যতার সমাজের সমস্ত লুকানো কথা বেরিয়ে প'ড়্‌বে; আমার ঘরের কথা, অথচ এত

১. এই বানান দেখে কেউ চ'ট্‌বেন না—কথাটা পুরানো বাঙলায় আর হিন্দীতে 'নৌতুন', সংস্কৃতের 'নবতন'। আমরা 'নোতুন' বলি, কিন্তু লেখ্‌বার বেলায় 'নূতন' লিখে একটা পণ্ডিতী ধৃষ্টতা করি।

লুকানো, এত রহস্যময় হ'য়ে র'য়েছে! ভাষাতত্ত্বের প্রদীপ এই রহস্যের অন্ধকার দূর করবার জন্যে তৈরী র'য়েছে। লোকে এই বিদ্যাকে বিশেষ নীরস ব'লে মনে করে—সাধারণ লোককে সেজন্য দোষ দেওয়া যায় না—কারণ এটি প্রথমত শুষ্ক বিশ্লেষণের কাজ—প্রতি পদে একে মাটি ছুঁয়ে যেতে হয়। এতে কল্পনার হাওয়ায় উড়ে বেড়াবার পথ নেই—নানান্ সূত্র একসঙ্গে ধ'রে থাকতে হয়। এই বিদ্যায় মনের উপর যে ধকল পড়ে, তা সকলে বরদাস্ত ক'রতে পারে না। কিন্তু এর থেকে বার করবার জিনিস এত র'য়েছে—যথানিয়ম কাজ ক'রে গেলে এত নোতুন ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে যে, যাঁরা এর আস্বাদ পে'য়েছেন, তাঁরা পরিশ্রমকে পরিশ্রমই মনে করেন না, এর চর্চায় এক অপূর্ব আনন্দ পান। ইউরোপের লোকেরা তাঁদের ভাষায় কিছুই গুপ্ত অজ্ঞাত থাকতে দেন নি,—ইংরিজি, ফরাসি, জর্মান প্রভৃতিতে যা কাজ হ'য়েছে, তার শতাংশের এক অংশও আমাদের দেশ-ভাষাগুলিতে হয় নি। অথচ আমাদের দেশেব ভাষাগত সমস্যাগুলি আরও জটিল। জমি বিস্তর প'ড়ে র'য়েছে, আবাদ করবার লোক চাই। যাঁরা এদেশের ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কাজ ক'রছেন, তাঁদের মধ্যে দেশী লোক খুবই কম। বাঙলা-ভাষার কথা যাঁরা আধুনিক রীতিতে আলোচনা ক'রছেন, এক আঙ্গুলে গুণে তাঁদের সংখ্যা শেষ ক'রতে হয়। কিন্তু এ সব কাজে ডাকাডাকি ক'রে লোক সংগ্রহ ক'রতে পারা যায় না—যে মনে মনে এর টান অনুভব করে সে-ই লেগে যায় আর সে-ই বেশি কাজ করে। কিন্তু তবুও কার মনে কোথায় এ বিদ্যার দিকে একটু প্রবণতা প্রচ্ছন্ন র'য়েছে, সেটা চাপা পড়্বার পূর্বেই জীইয়ে রাখ্বার চেষ্টা করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে ফল হ'তে পারে। সেটি করবার একমাত্র উপায়,—গোড়া থেকেই এই বিদ্যার সঙ্গে একটু পরিচয়—যাতে জান্বার শোন্বার শেখ্বার আগ্রহ জেগে ওঠে। অর্থাৎ বাঙালীর ছেলে যখন ইস্কুলের উঁচু শ্রেণীতে পড়ে, তখন বাঙলা-ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি মোটা জ্ঞান তার পাওয়া উচিত। এটা ক'রতে পারলে এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে কাজ করবার জন্য রিক্রুট পাওয়া সহজ হয়—আর দেশের মধ্যে নিজের ঘরের সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধিরও সহায়তা হয়। আপনাকে না জানলে অপরকে জান্বার ক্ষমতা জন্মে না।

ভাষাতত্ত্ব, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের আর্য্যভাষাগুলির ভাষাতত্ত্ব আলোচনা ক'রতে ক'রতে দেখি যে আমাদের অনেক পূর্ব-সংস্কার আর বিশ্বাস ঘা খায়। সকল পুরানো জাতির বংশধর বা সভ্যতার উত্তরাধিকারী নিজের আভিজাত্য সম্বন্ধে একটা স্পর্ধা রাখে। ইতালির লোকেরা মনে করে, তারা বিশ্ববিজয়ী

রোমানদের সন্তান ; গ্রীসের লোকেদের বিশ্বাস যে তারা লেওনিদাস, সোক্রাতেস আর আলেক্সান্দর-এর জাতির মানুষ—তারা যে বেশির ভাগই স্লাভ আর আলবানীয় জাতির লোক, গ্রীসে এসে গ্রীক জাতির ভাষা আর সভ্যতা নিয়েছে সে কথাটা ব'ল্‌লেই তারা চ'টে যায়। সব জায়গায় দেখা যায় যে, নিজের জাতি সম্বন্ধে একটা না একটা সংস্কার জাগ্রত র'য়েছে। সত্যের অনুসন্ধান ক'র্‌তে হ'লে এসকল সংস্কারের উপর উঠ্‌তে হবে। কুক্ষণে এদেশে বিলেত থেকে নোতুন ক'রে 'আর্য্য' শব্দের আমদানি হয়েছিল, মাক্স মূলারের লেখা প'ড়ে, আর নব্য হিন্দুয়ানির দলের বিজ্ঞানের আর ইতিহাসেব বদ্‌হজমের ফলে, একটা নোতুন গোঁড়ামি এসে আমাদের ঘাড়ে চেপেছে, সেটার নাম হচ্ছে 'আর্য্যামি'। এই গোঁড়ামি আমাদের দেশে নানা স্থানে নানা মূর্তি ধ'রেছে—স্বাধীন চিন্তার শত্রু এই বহুরূপী রাক্ষসকে নিপাত না ক'র্‌লে ইতিহাস চর্চা বা ভাষাতত্ত্বেব আলোচনা —কোনটারই পথ নিরাপদ হয় না। এই গোঁড়ামির মূল সূত্র হ'চ্ছে এই— ১। যা-কিছু ভালো তা প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে ছিল (অথচ এই আর্য্য যে কারা, সে সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান কারুর নেই—একটা আবছা আবছা রকমের ধারণা আছে যে মুসলমানদের আস্‌বার পূর্বের কালের হিন্দুরাই আর্য্য)। ২। অতএব যা-কিছু খারাপ, সমস্তই আর্য্যেতর—'অনার্য্য'। সংস্কৃত ভাষায় আর্য্য শব্দের যে মানে, ইংরিজি **Aryan**-এর মানে ঠিক তা নয় ; **non-Aryan**-এর অর্থ সংস্কৃতের 'অনার্য্য' দাঁড়-করানোতে যত কিছু বিভ্রাট ঘ'টেছে। ৩। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য্য, আমরা হিন্দু, এঁদের বংশধর ; সুতরাং আমাদের মধ্যে অনার্য্য কিছুই নেই। যদি বা কিছু থাকে—সে-সব কথা তোলা উচিত নয়। আমাদের মধ্যে অনধিকারী ঐতিহাসিকের অন্ত নেই। এঁদের সকলেই এই তিন বিশ্বাসের খোঁটায় আপনাদের বেঁধে মনের আনন্দে চোখ বুজে ঘুরপাক খাচ্ছেন—মনে ক'র্‌ছেন, ঐতিহাসিক গবেষণা ক'র্‌ছি। ভাষাতত্ত্বেও উৎকট আর্য্যামি বিদ্যমান। তবে সৌভাগ্যের বিষয় সেটা আস্তে আস্তে চ'লে যাচ্ছে। প্রাকৃতকে এখন অনেকে মান্‌ছেন। বাঙলা-ভাষাটা যে অনার্য্য ভাষার ছাঁচে ঢালা আর্য্য ভাষা, সেটাও ক্রমে ক্রমে লোকে মান্‌বে ; আর্য্যামি যতদিন বাধা দিতে থাক্‌বে, ততদিন বাঙলার ঠিক স্বরূপটি আমাদের বের করা কঠিন হবে।

কথাটা একটু খুলে বলা যাক্‌। বাঙালী জাতিটা যে একটা মিশ্র অনার্য্য জাতি—মোঙ্গোল কোল মোন্‌-খ্মের দ্রাবিড় এই সব মিলে সৃষ্ট খিচুড়ি, যাতে আর্য্যত্বের গরম-মশলাটুকু উপরে প'ড়েছে মাত্র, একথাটা স্বীকার ক'র্‌তে যেন

কেমন লাগে। বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নাকি শত-করা ১৩ জন মাত্র; যাঁরা ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির, তাঁদের মধ্যে দুচার জন বড়ো গলায় 'বাঙালী অনার্য্য' এ কথাটা বলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় তাঁরা মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে, তাঁরা ব্রাহ্মণ, অতএব আর্য্যত্বের গরম মশলার একটা কণা, অনার্য্য চাল-ডাল নন। আমি নিজে ব্রাহ্মণবংশীয়; কিন্তু আমার বিশ্বাস, গরম মশলাটুকুতেও ভেজাল আছে। প্রচ্ছন্ন আর্য্যামিটুকুর হাত থেকে অনেকেই একেবারে মুক্ত হ'তে পারেন না। Scientific disinterestedness যাকে বলে, সেটা বড়ো দুর্লভ। জাতের পাঁতি নিয়ে আলোচনা ক'রে আপাতত ঝগড়া তোল্‌বার ইচ্ছে নেই, তবে ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে এইটুকু বলা যায় যে, বেদের সময় থেকেই আর্য্যভাষা অনার্য্যের ঘরে জাত দিয়েছে, তাকে আর কিছুতেই ঠেলে শুদ্ধ ক'রে জাতে তোলা যায় না। আদি কালের আর্য্যজাতি উত্তর মেরুতেই থাকুন আর মধ্য-এশিয়ায় থাকুন, দক্ষিণ রুষেই থাকুন আর স্কাণ্ডি-নেভিয়াতেই থাকুন, বা এদেশের লোকই হন, তাঁদের নিদর্শন আর কোথাও মেলে না; কিন্তু তাঁদের ভাষা আর চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে, আর তাই অবলম্বন ক'রে তাঁদের সভ্যতা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্যা অনেক খবর দিয়েছে। দেখা যায় যে, বেদে যে ভাষার নিদর্শন আমরা পাই, কেবল সেটাতেই অনেকটা মূল আর্য্যত্বের ছাঁচ বর্তমান; তার পরের অর্বাচীন যুগের সংস্কৃতে, প্রাকৃতে আর আধুনিক ভাষাগুলিতে সে ধাঁচা নাই—পুরানো ধাতু আর শব্দ অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু কোথা থেকে অনেক নোতুন শব্দ এসে জুটেছে, বাক্য-রচনা-রীতি আর পুরানো বা বিশুদ্ধ আর্য্যচিন্তার অনুরূপ নয়, অন্য ধরনের। একদিকে বেদের আর প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থের ভাষা—আর একদিকে বাঙলা প্রভৃতি; এদের যদি দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যায়, দেখা যায় যে, তামিল তেলুগুর যে ছাঁচ, বাঙলারও সেই ছাঁচ; যদিও বাঙলার ধাতুগুলি আর শব্দগুলি মুখ্যত তদ্ভব, অর্থাৎ বৈদিক থেকে উৎপন্ন। বৈদিক ক্রমে প্রাকৃত হ'ল,—প্রাকৃত বাঙলা প্রভৃতিতে দাঁড়াল। এই পরিবর্তন কিন্তু একটানা ভাবে হয় নি। বাঙলা প্রভৃতির উৎপত্তি আর প্রকৃতি বিচার ক'র্‌লে এইটুকু বোঝা যায় যে, বৈদিক কালের 'জাত্‌' আর্য্যভাষীর বংশধরের মুখে মুখে ব'দ্‌লে এলে যে রকমটি এর রূপ দাঁড়াত, এর এখনকার রূপটি সেরকম নয়। আর্য্যভাষা অনার্য্য-ভাষীর দ্বারা গৃহীত হওয়াতেই এর পরিবর্তন স্বাভাবিক হয় নি। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্‌। খ্রীষ্টীয় পাঁচের শতে ইংরিজিভাষী টিউটনেরা ব্রিটেনে বাস

ক'রতে আরম্ভ করে—ব্রিটেন-দ্বীপে ইংলাণ্ডে আর দক্ষিণ-স্কট্‌লাণ্ডে ছড়িয়ে গিয়ে এরা নিজেদের জাতির আর ভাষার প্রসার করে। ইংলাণ্ডে আর দক্ষিণ-স্কট্‌লাণ্ডে লোকেদের পূর্বপুরুষ মূলত ইংরিজি-ভাষী, এদের মুখে ইংরিজির পরিবর্তন একরকম নিয়মে হ'য়েছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু ক'রে ইংলাণ্ড আর স্কট্‌লাণ্ড থেকে ইংরিজি-ভাষী লোকেরা আয়র্লাণ্ডে অল্প অল্প ক'রে উপনিবেশ ক'রতে থাকে; রাজশক্তির প্রভাবে আয়র্লাণ্ডের অধিবাসী লোকেরা ক্রমে ক্রমে ইংরিজি গ্রহণ ক'রতে থাকে। আইরীশ লোকেরা আগে কেল্‌টিক্ ভাষা ব'ল্‌ত; এখন এরা প্রায় সকলেই ইংরিজি বলে। এখানে দেখ্‌ছি যে একটা বিদেশী ভাষা অন্য জাতের উপর চ'ড়ে ব'স্‌ল; সে জাতের পুরানো ভাষার অনেক ধাঁজ আর ঢঙ, অনেক রীতি নীতি, শব্দ, বিশেষত্ব, তাদের নোতুন-ক'রে নেওয়া ভাষায়ও এসে গেল। আয়র্লাণ্ডে ইংরিজি ভাষার যে রূপ, সেটা হ'চ্ছে বিদেশীর মুখের ইংরিজির রূপ, 'জাত্' ইংরিজি-ভাষীর মুখের রূপ সেটি নয়। ভারতে আর্য্য ভাষার সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাও খাটে। 'আর্য্যীকৃত' দ্রাবিড়, কোল ও মিশ্র জাতিদের মুখে আর্য্যভাষা আপনার স্বরূপ বজায় রাখ্‌তে পারল না। আর্য্যভাষার মালমশলা, পুরানো দেহটা—রইল বটে, কিন্তু তার চেহারা ব'দ্‌লে গেল।

ভাষায় যা দেখা যায়, ভারতবর্ষের ধর্মের আর সভ্যতার ইতিহাসেও তা দেখা যায়। আকাশের দেবতার উপাসক বৈদিক বা বৈদিক-পূর্ব যুগের আর্য্য একদিকে, আর একদিকে পৃথিবীর দেবতার উপাসক দ্রাবিড়; মুখ্যতঃ আর্য্য আর দ্রাবিড় সভ্যতা আর চিন্তা মিলিয়েই হিন্দু সভ্যতা আর চিন্তা। আর্য্যভাষা দ্রাবিড়ের ও অন্য অন্-আর্য্যের মুখে ব'দ্‌লেই প্রাকৃত; আর অর্বাচীন সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে ধ্বনিগত পার্থক্য থাক্‌লেও উভয় ভাষা একই জাতির চিন্তার ফল। একথা তাদের বাক্যরীতির সাম্যে দেখা যায়। আমরা আর্য্যভাষা বলি, কিন্তু ঠিক প্রাচীন আর্য্য ধরনে আমরা ভাবি না, আমরা ভাবি দ্রাবিড় ভাবে। **Syntax**-এ বৈদিক একদিকে, প্রাকৃতগুলি, আধুনিক ভাষাগুলি আর দ্রাবিড় ভাষাগুলি আর একদিকে। অন্-আর্য্য-ভাষীর মুখে না প'ড়্‌লে আর্য্যধ্বনিগুলির ভারতে যে গতি দাঁড়িয়েছে সে গতি হ'ত না।

ভাষা ব'ল্‌লে বুঝি, মানুষের কণ্ঠের স্বরের ধ্বনি মিলিয়ে শব্দ সৃষ্টি ক'রে তার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ। দুটো জিনিস এতে আছে—একটার স্থিতি শারীরিক যন্ত্রের উপর—সেটা হ'চ্ছে ধ্বনি, আর একটির উৎপত্তি চিন্তা থেকে—ভাব। বাক্য—অর্থ, পরস্পর জড়িত। আদিম কালে যখন মানুষ প্রথম ভাষা প্রয়োগ

করে, তখন শারীরিক অবস্থার বাহ্য প্রকাশ হ'ত ব্যক্ত ধ্বনি দিয়ে; যেমন ইতর জীবেদের মধ্যে এখনও দেখা যায়। তারপব যখন মানুষ চিন্তা ক'র্তে শিখ্‌লে, তখন এই সকল ধ্বনি মিলিয়ে ধাতু বা মূল শব্দ হ'ল, সেই শব্দগুলি এক একটি ভাবের মূর্তি হ'য়ে দাঁড়াল। পবে মনের চিন্তার অনুবর্তী হ'য়ে সেই শব্দগুলি sentence-এ সংযুক্ত হ'ল। দেখা যায় যে, ধ্বনিগুলো বদ্‌লাতে পাবে, তাদের সমষ্টি ধাতু শব্দগুলো আর প্রত্যয়গুলোও বদ্‌লায়; কিন্তু কোনও জাতের মধ্যে তার চিন্তাপ্রণালীটি সহজে বদ্‌লায় না—কারণ সেটা হ'চ্ছে মস্তিষ্কের জিনিস, ধ্বনি বা শব্দের মতো সহজে অনুকরণীয় নয়। অন্য জাতির প্রভাবে প'ড়ে এক জাতি নোতুন ধ্বনি, শব্দ, ধাতু, প্রত্যয় শিখেছে, আত্মসাৎ ক'রেছে, কিন্তু যেরূপ চিন্তায় তারা অভ্যস্ত, সেরূপ ভাবে চিন্তা-করা-টা শীঘ্র ছাড়্‌তে পারে না—সাধারণত তাদের নোতুন-করে-শেখা অন্য জাতির ভাষার শব্দ, ধাতু, প্রত্যয় তারা নিজ ভাষার বাক্য রচনার অনুরূপ ক'রে নেয়। অর্থাৎ Syntax-টি বিশেষ প্রবল থাকে, এটাই জাতি-বিশেষের মানসিক প্রবণতার বিশেষ চিহ্ন। ভারতে আর্য্যভাষার গতি ধরা যাক্। বৈদিক-পূর্ব ভাষার উচ্চারণের, ধ্বনি-সমষ্টির যা বিশেষত্ব, ভারতে দ্রাবিড়ের সংঘাতে এসে অনেকটা ব'দ্‌লে গিয়েছে। প্রথম—বৈদিক-পূর্ব ভাষায় কতকগুলি উষ্ম ধ্বনি ছিল, সেগুলি বৈদিকে মেলে না; আবার এটাও দেখি যে, দ্রাবিড়ে উষ্ম ধ্বনির একান্ত অভাব। তাবপর আদি আর্য্য ভাষার মূর্ধন্য ধ্বনি ছিল না; এখন মূর্ধন্য ধ্বনি হ'চ্ছে বিশেষ ক'রে দ্রাবিড় ভাষার ধ্বনি, সেগুলি অন্য প্রাচীন ভাষায় মেলে না। যত এদিকে আসি, ততই দেখি ভারতের আর্য্য-ভাষায় মূর্ধন্যের বৃদ্ধি হ'তে চ'ল্‌ছে। এটি একটা লক্ষ্য কর্‌বার জিনিস।

দ্রাবিড আব কোল উচ্চারণের বিশেষত্ব—কথায় দুই ব্যঞ্জন একত্র থাক্‌তে পারে না; হয় তাদের ভেঙে নেওয়া হয়, নয় একটিকে লোপ করা হয়। প্রাকৃতেও তাই, আমাদের ভাষাতেও তাই। অথচ ও-দিকে ইউরোপে দেখি, কথার গোড়ার সংযুক্ত ব্যঞ্জনের কোনও হানি হয় নি। ঈরানের ভাষায়, আফ্‌গান্‌দের ভাষায় দেখি, এখনও সংযুক্ত বর্ণ কথার আদিতে জোরের সঙ্গে চ'ল্‌ছে। বৈদিকে কত রকমারি 'ল-কার' (tense বা ক্রিয়ার কালবাচক রূপ)। সংস্কৃতে সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বজায় আছে বটে, কিন্তু প্রাকৃতে, প্রাচীন ভারতের জনসাধারণের ভাষায়, সাধারণত তিনটিতে ঠেকেছে। প্রাচীন দ্রাবিড়ে মোট দুটি কালবাচক রূপ ছিল, পরে আর কতকগুলির উদ্ভব হয়। ও-দিকে গ্রীসে

রোমে কিন্তু প্রাচীন কালবাচক রূপের বিশেষ হানি হয় নি। দ্রাবিড়ে, কোলে আর ভোট-ব্রহ্ম ভাষায় **prefix**-এর হাঙ্গামা নেই, সবই **suffix**, আমাদের ভাষাগুলিতে তাই, কিন্তু বৈদিকে তা নয়। বৈদিকে **preposition** ছিল, সেগুলি সংস্কৃতে ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত উপসর্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ত-তবৎ প্রত্যয় দিয়ে তিঙন্ত ক্রিয়ার কাজ সারা তো সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে সাধারণ। যেমন— সঃ গতঃ, অশ্বম্ আরূঢ়বান্। দ্রাবিড়েও ঠিক সেইটি দেখি। বৈদিকে তা নয়— স জগাম, অশ্বম্ আরুক্ষৎ। বাঙলার যে অতীত আর ভবিষ্যতের প্রত্যয়, তা এই 'ত' আর 'তব্য' থেকে হ'য়েছে, কোনও বৈদিক তিঙ্ থেকে নয়। এ ছাড়া অনেক বাঙলা **idiom**-এ দ্রাবিড়ের ছাপ পাওয়া যায়। বাঙলায় অসমাপিকা-ক্রিয়ার ঘটা, সহায়ক-ক্রিয়ার ব্যবহার প্রভৃতি আর নানা চল্‌তি বাক্য-রীতি দ্রাবিড় ভাষার অনুযায়ী।

দ্রাবিড় শব্দ আধুনিক বাঙলায় অনেক আছে, আর সেগুলি একেবারে ঘরোয়া শব্দ, যা লোকে বই প'ড়ে শেখে না, যা পরিবারে ধারাবাহিকরূপে চ'লে আসে। সংস্কৃতেও বিস্তর দ্রাবিড় শব্দ আছে। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হ'য়ে গিয়েছে। **Kittel**-এর কন্নাডী ভাষার অভিধানের ভূমিকায় প্রায় ৪৫০ সাধারণ সংস্কৃত শব্দ দেওয়া আছে, যেগুলি দ্রাবিড় থেকে নেওয়া। এ ছাড়া **M. B. Emeneav, T. Burrow** প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতেরা, আর কতকগুলি ভারতীয় পণ্ডিত ভারতের আর্য্য ভাষায় অনেক দ্রাবিড় কথা বা'র ক'রেছেন।

এই সকল বিষয় বেশি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে গেলে, পুঁথি বেড়ে যায়।

আমার ধারণা এই—খালি সংস্কৃত আর প্রাকৃতের দিকে নজর রাখ্‌লে চ'ল্‌বে না, বাঙলা ভাষার ইতিহাস ঠিক ক'রে জান্‌তে গেলে অন্‌-আর্য্য ভাষাগুলির দিকেও নজর রাখ্‌তে হবে। আর এ বিষয়ে অনুসন্ধান ক'র্‌তে গেলে শিক্ষার দরকার, সাধনার দরকার—ঘরে ব'সে খোশখেয়ালি গবেষণায় চ'ল্‌বে না। আমাদের মাল-মশলা সমস্ত হাতের কাছে নেই। মাটি খুঁড়ে পাথর কাঠ কেটে আন্‌বার সময় এখন। সব ঠিক হ'লে তবে ইমারত উঠ্‌বে। একজনকে সব দিককার উপাদান জোগাড় ক'র্‌তে গেলে চ'ল্‌বে না—এক একটা বিষয় এক একজনকে নিতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ—এটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উৎসাহী লোকেদের যোগাড় ক'রে দিতে হবে। এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজ এগিয়েছে—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়—কিন্তু

ঢের বাকী। ছাত্রদের দ্বারায় এরূপ অনেক কাজ হ'তে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ—technical terms—সেগুলির আলোচনায় অনেক নোতুন খবর বেরুতে পারে, এটার সম্বন্ধে অনেকেই নিজের নিজের প্রদেশের ভার নিতে পারেন। যাঁদের বাঙলার প্রান্ত জেলায় বাস—যেখানে অন্-আর্য্যভাষী জাতি এখনও বিদ্যমান, তাঁদের উচিত সেই প্রান্তের অন্-আর্য্য ভাষা শিখে নেওয়া। সাঁওতালী আর কাছাড়ীর প্রভাব যে পশ্চিম বাঙলার আর উত্তর বাঙলার ভাষায় আছে, তা সহজেই অনুমান ক'রতে পারা যায়; কারণ রাঢ়ের জন-সাধারণ--masses-এর মধ্যে কোল-জাতির উপাদান আছে, উত্তর-বঙ্গ আর কামরূপের লোকেরা তো সেদিন পর্য্যন্ত কাছাড়ী বা বড (বোড়ো) ভাষা ব'ল্‌ত, এখন বাঙলা-ভাষী হ'চ্ছে, মুসলমান আর হিন্দু হ'য়েছে, এমন কি অনেকে নিজেদের ক্ষত্রিয় ব'লে পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু এ কাজ ততটা সহজ নয়। বাঙলা-ভাষা যখন জন্মগ্রহণ করে, তখনকার দিনের অনার্য্য-ভাষার প্রভাবটাই বেশি প'ড়েছিল। কিন্তু অনেক অনার্য্য-ভাষা লোপ পেয়েছে, আর অনেকের পূর্ব স্বরূপটি জান্‌বার উপায় নেই। তবুও, এদিক্ দিয়ে কিছুই জান্‌বার চেষ্টা হয় নি। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় বাঙলার পশ্চিম প্রান্তের অন্-আর্য্য জাতদের ভাষা, ইতিহাস, রীতি নীতি আলোচনা ক'রছেন; তাঁর মতো আরও কর্মী দরকার, যাঁরা এই সকল অন্-আর্য্যদের সঙ্গে তাদের আশপাশের হিন্দু বাঙালীদের সম্বন্ধ কী, নৃ-তত্ত্ব-বিদ্যার দিক থেকে সেটা চর্চা ক'রবেন। বাঙলা দেশের প্রত্যেক জেলার মহকুমা থানা নির্বিশেষে গ্রাম ও ভূসংস্থানের নামের তালিকা সংগ্রহ হওয়া উচিত, এমন সকল নামের তালিকা, যেগুলির মানে বোঝা যায় না, আর সংস্কৃত বা বাঙলার সাহায্যে, ব্যাখ্যা ক'রতে পারা যায় না। নাম থাক্‌লেই তার একটা মানে আছে, বা ছিল; অথচ সমস্ত বাঙলা দেশে (কেবল বোধ হয় দক্ষিণ সমতট-টুকু বাদ, কারণ এ অঞ্চলটায় নোতুন ক'রে লোকের বাস হ'য়েছে) এমন সব স্থানের নাম আছে, যার মানে খুঁজে পাওয়া যায় না—কথাগুলি বাঙলার কথা মনেই হয় না, যদি আমরা এগুলোকে একটু বিচার ক'রে দেখি। নিশ্চয় যখন এই সকল নাম দেওয়া হ'য়েছিল, তখন লোকে তার মানে বুঝ্‌ত; কিন্তু নামগুলি ত বাঙলা নয়। তা হ'লে পূর্বে এদেশে অ-বাঙালী লোক ছিল, যারা অন্য ভাষা ব'ল্‌ত; তারা গেল কোথা? কপ্পূরের মতো উবে গেল—যাতে আর্য্য-বংশধরেরা এসে দয়া ক'রে বাস ক'রে, পাণ্ডব-বর্জ্জিত বাঙলা দেশকে পবিত্র ক'রতে পারেন—না, তারাই আর্য্যভাষী বৌদ্ধ প্রচারকদের কাছ থেকে, পশ্চিম

থেকে আগত মৌর্য্য আর গুপ্ত রাজাদের প্রেরিত রাজপুরুষদের কাছ থেকে, উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণ বেনিয়া সৈনেকের কাছ থেকে আর্য্যভাষা শিখে তাকে নিজেদের ভাবের উপযুক্ত ক'রে নিয়ে, রাঢ় বরেন্দ্র আর বঙ্গের বাঙলায় ব'দ্‌লে ফেল্‌লে, বাঙলা-ভাষী জাতিতে পরিণত হ'ল? এ বিষয়ে বাঙলায় মোটেই আলোচনা হয় নি; এক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দেখিয়েছেন যে উড়িষ্যা অঞ্চলের কতকগুলি গ্রামাদির নাম দ্রাবিড় ভাষার; তা থেকে প্রমাণ হয় সেখানে দ্রাবিড় ভাষা আগে চ'ল্‌ত। F. Hahn সাহেবও ছোটো-নাগপুরে কোল ও দ্রাবিড় নাম দেখিয়েছেন; উত্তর-বঙ্গের ও আসামের অনেক নাম তেমনি ভুটিয়া ও ভোট-ব্রহ্ম শ্রেণীর ভাষা থেকে হ'য়েছে। অনেক সময়ে আবার এই সকল নামকে সংস্কৃত ক'রে আর্য্য ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু, মিহিজাম, জামতাড়া, হাব্‌ড়া, চুঁচুড়া, সোমড়া, রিষড়া, মগরা, বগুড়া, পাবনা, কুমিল্লা দোয়ারপা, জান্‌পা, গুরপা, পরশা, পাণ্ডুয়া, সুড়ি, নাড়াজোল, জাগুলিয়া, শালিখা, জালিখা, নড়াইল, নন্দাইল, টাঙ্গাইল, কাঁথি, দেবড়া, ইগড়া, কোলা, সাঁইথিয়া, উলা, হাটবয়্‌রা, ভাদুড়িয়া, কান্দি, ভীলাকান্দি, সরিয়াকান্দি, হাইলাকান্দি, ঝিকড়াগাছী, ঝাকৈর, জামুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ি, দীমরা, আটা, জয়রা, ঝিট্‌কা, জামুকী, বাসাইল, ছাপ্‌ড়া—ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—-এই সকল গ্রামের নামের মানে কী? অথচ এদেরই ইতিহাস ত আমাদের জাতের ইতিহাস। গ্রামের নামে প্রায় বাঙলা দেশময় একটা প্রত্যয় মেলে—সেটা '-ড়া' বা '-রা' বা '-লা'—এই প্রত্যয়ের মানে কী, আর এ কোন্ ভাষার কথা? বাঙালী জাতি, অর্থাৎ বাঙলা-ভাষী জাতি সৃষ্টি ক'র্‌তে যে যে জাতির উপাদান লেগেছিল, তাদের ভাষা চর্চা না ক'র্‌লে এ-সবের সমাধান হ'তে পারে না। আমাদের হাতে এখন মাল মশলা নেই। এইরূপ নামের লিস্‌ট্, বিশেষভাবে, যাঁরা এদিকে কাজ ক'র্‌বেন, তাঁদের না হ'লে চ'ল্‌বে না। কিন্তু গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কোথায় অজানা-মানে কোন্ পাড়া বা নদীর বা জঙ্গলের নাম আছে, তাঁরা তা সংগ্রহ ক'র্‌তে গেলে কাজ এগোবে না। বাঙলার প্রত্যেক মহকুমা বা থানা থেকে ইস্কুলে কলেজে কত ছেলে পড়ে, তাদের কাজ হ'চ্ছে এইরকম সমস্ত নাম সংগ্রহ করা, আর তার যদি কোনও স্থানীয় ব্যাখ্যা থাকে, তাও যোগাড় করা। ক'রে, সাহিত্য-পরিষদের মতো স্থানে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া—সেগুলি প্রকাশ হ'লে পর তার বিচার চ'ল্‌তে পারে।

এ তো গেল বাঙলা-ভাষার পুরানো ইতিহাসের কথা। চল্‌তি বাঙলার স্বরূপটি নানা দিক দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌বার বিষয়। সেদিন ঢাকা থেকে বিরাট এক ব্যাকরণ বেরিয়েছে দেখ্‌লুম—প্রায় ৮০০ পাতার বই। বাঙলার ব্যাকরণ দেখে আগ্রহের সঙ্গে পাতা উল্টে দেখি, লেখক বাঙলা কাকে বলে জানেন না। আগাগোড়া একখানি সংস্কৃতের ব্যাকরণ তিনি লিখে গিয়েছেন। বাঙলার প্রত্যয়াদি তিনি দু'ভাগে ভাগ ক'রেছেন—সাধু অর্থাৎ সংস্কৃত, আর অসাধু। তিনি যা অসাধু মনে ক'রেছেন, সংকুচিতভাবে আলগোছে, বা কোনরকমে বর্ণনা ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন, তাই যে খাঁটি বাঙলা, সেদিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। বাঙলার বিশুদ্ধ রূপটি হ'চ্ছে এর তদ্ভব উপাদানটি। এটি বৈদিক থেকে উদ্ভূত, কিন্তু অন্‌-আর্য্য বা দ্রাবিড়ীয় ঢঙে এর বাক্য-রচনায় প্রয়োগ। বাঙলার এই নিজ রূপটি সংস্কৃতের অলংকারের চাপে ঢাকা প'ড়েছে—একে বা'র ক'রে, এর নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন কার সঙ্গে কতটা মেলে, এর যথার্থ গোত্র-পরিচয় এর গুণাগুণ থেকে কতটা পাওয়া যেতে পারে—এই সব নির্ধারণ করাই হ'চ্ছে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক বাঙলা ব্যাকরণের কাজ। কিন্তু পণ্ডিতেরা এর অলংকারের যাচাই নিয়েই ব্যস্ত,—সংস্কৃতের সোনা কতটা আর কতটা খাদ। সংস্কৃতের চাপে প'ড়ে বাঙলা কতটা যে অকর্মণ্য ও অসহায় হ'য়েছে, কতটা একে সংস্কৃতের মুখাপেক্ষী হ'তে হ'চ্ছে, তা হিন্দীর সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায়। বাঙলার কৃৎ আর তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি পঙ্গু; নোতুন শব্দ বাঙলায় সৃষ্টি করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি সাধারণ ইংরিজি কথা দিচ্ছি; **singer, childhood, goer, current, redness, silence, manufacture, earning, goodness, 84th**; এগুলির খাঁটি বাঙলা অনুবাদ কী? **singer** 'গায়ক' নয়, 'গায়ক' তো সংস্কৃত শব্দ; 'গাইয়ে' ব'ল্‌লে যে ভালো গায় তাকে বুঝায়, হিন্দীতে 'গবৈয়া'; **childhood**—শৈশব—হিন্দী 'বচ্‌পন্‌'; **goer**—গমনকারী—'চল্‌নেহারা', **current**—প্রচলিত—'চালু' ('চল্‌তি' শব্দ হিন্দী থেকে নেওয়া); **redness**—বাঙলায় কী? হিন্দী 'লালী'; **silence**—স্তব্ধতা—'সন্নাটা' ('নিঝুম' ব'ল্‌লে ঘুমের ভাব আসে); **manufacture**—নির্মাণ, 'বনাবট'; **earning**—উপার্জন, রোজগার—হিন্দী 'কমাঈ'; **goodness**—'ভলাঈ'; **84th**—'চৌরাসীবাঁ'—বাঙলায়—চতুরশীতিতম। অনেক স্থলে সংস্কৃতের অলংকার বাঙলাব বোঝা হ'য়েছে, বাঙলাকে জীবন্মৃত ক'রে ফেলেছে। যতই আমরা আমাদের সাহিত্যের বড়াই করি না কেন, হিন্দীর কাছে

সংস্কৃতের প্রেত-ঘাড়ে-করা বাঙলা দাঁড়াতে পারে না—হিন্দী যতটা জোরের ভাষা, বাঙলা ততটা নয়। বাঙলার 'নক্ষত্রপর্য্যবেক্ষণাগার', 'কৌতুকাগার', 'তাপমান যন্ত্র' প্রভৃতি দাঁত-ভাঙ্গা শব্দ অচল, হিন্দীর 'তারাঘর', 'জাদুঘর', 'গর্‌মী-নাপ', রাস্তার লোকেও বোঝে। আজকালকার 'সাধু' হিন্দীর মন্দিরে বাঙলার অনুকরণে সংস্কৃতের অশথ গাছের বীজ চূড়োয় বসানো হ'য়েছে, কিন্তু তার জড় এখনও বেশি দুব যায় নি, 'ঠেট-হিন্দী' ব'লে এক রকম রচনা-রীতি হিন্দীতে এখনও চ'ল্‌ছে যাতে চেষ্টা ক'রে সংস্কৃত শব্দ পরিহার করা হয়, কেবল তদ্ভব আর প্রাকৃত ধাতু আর প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদই ব্যবহার করা হয়। হিন্দীতে হালে তিনখানা বই লেখা হ'য়েছে, সে তিনখানাতে একটিও পণ্ডিতী বা সংস্কৃত শব্দ বা ফারসি শব্দ নেই—সমস্তটাই খাঁটি দেশী আর তদ্ভব শব্দে পূর্ণ। তিনখানি বই-ই উপন্যাস—একখানি এক মুসলমানের লেখা, আর দুখানি এক হিন্দুর। তিনখানারই স্টাইল সকলেই প্রশংসা করেন; এর একখানা বইকে আবার কাশীর নাগরী-প্রচারিণী-সভা, হিন্দীর ২২ খানি শ্রেষ্ঠ গদ্য বইয়ের মধ্যে একখানি ব'লে স্বীকার ক'রেছেন। আজকালকার বাঙলায় এ রকম একটা ব্যাপার অসম্ভব। যাঁরা বাঙলা ব্যাকরণ আলোচনা করেন, তাঁরা যেমন বাঙলার নিজ স্বরূপটিরই ইতিহাসের পুনর্গঠন ক'র্‌বেন, সেইরকম যাঁরা বাঙলা ভাষা সৎসাহিত্যে প্রয়োগ ক'র্‌ছেন, তাঁদের চেষ্টা করা উচিত যাতে বাঙলার এই পঙ্গু-ভাব দূর হয়—খাঁটি বাঙলা-ধাতু-প্রত্যয়-সিদ্ধ পদের প্রচলন যেন বেশি হয়। যেখানে খাঁটি বাঙলা পদ মেলে না, বা না মিল্‌লে সৃষ্টি করা চলে না, সেখানেই যেন সংস্কৃতের কাছে কথা ধার করা হয়। চল্‌তি ভাষায় প্রাদেশিক ভাষায় বাঙলার ঠিক মূর্তির ফল্গু বইছে, এর অন্তঃসলিলা মূর্তিকে প্রকট ক'র্‌তে হবে। অসমিয়া ভাষা বাঙলার বোন, বাঙলার কাছে অসমিয়া এখন দাঁড়াতেই পারে না, কিন্তু অসমিয়া সম্পূর্ণ-রূপে আত্মনির্ভরশীল।

বাঙলার প্রাকৃত বা তদ্ভব রূপটিই যে এর আসল রূপ, একথা রামমোহন রায় মেনে গিয়েছেন। কিন্তু ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের আর শ্রীরামপুরের পণ্ডিতদের হাতে প'ড়ে বাঙলা ভাষা ভোল ফিরিয়ে ব'স্‌ল, বাঙলা ব্যাকরণ ব'লে লোকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি আর কৃৎ তদ্ধিত শব্দসিদ্ধি প'ড়্‌তে লাগ্‌ল। বিদেশী পণ্ডিত বীম্‌স্ আর হর্নলে বাঙলার আসল রূপটি বের কর্‌বার প্রথম চেষ্টা ক'র্‌লেন। ১২৮৮ সালে (ইংরিজি ১৮৮১) চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'ইংরাজী বাঙ্গলা ও নর্‌ম্যাল বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ' একখানি বাঙলা ব্যাকরণ

লেখেন। আমার বোধ হয়, বাঙালীর হাতে তার মাতৃভাষার যথার্থ ব্যাকরণ লেখ্‌বার এই প্রথম প্রয়াস। গ্রন্থকারের নাম এখন অজ্ঞাত, প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে তিনি লিখেছেন, অথচ তিনি তাঁব মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা এখনও দুর্লভ। তিনি পূর্বভাষে ব'লেছেন: "সংস্কৃত এবং দেশজ বাঙ্গলা এই উভয়বিধ শব্দই বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষার উপাদান; এতদ্বিধ ভাষার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকবণ লিখিতে হইলে যেরূপ ভাষাগত সংস্কৃতশব্দসম্বন্ধে বৈয়াকরণ নিয়মবিধান করা কর্ত্তব্য, দেশজ বাঙ্গলা শব্দ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ কর্ত্তব্য, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এতাদৃশ বাঙ্গলাব্যাকরণ বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে কি না তাহা আমি জানি না; প্রত্যুত আমার বিশ্বাস এই যে এতাদৃশ কোন ব্যাকরণ বঙ্গভাষায় এখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং একখানি হওয়ারও প্রয়োজন আছে।" গ্রন্থকার বাঙলার তদ্ভব শব্দগুলির উৎপত্তি-নির্ণায়ক সূত্র প্রণয়ন ক'রেছেন, তদ্ভব রূপটির বিশেষ আলোচনা ক'রেছেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর 'শব্দতত্ত্ব' তারপর খাঁটি বাঙলার সম্বন্ধে একখানি প্রধান মৌলিক পুস্তক। রবিবাবুর পরে পূজনীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের 'শব্দকথা'র প্রবন্ধাবলীকে উল্লেখ করা যেতে পাবে। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর পরিষদের তবফ থেকে যে ব্যাকরণ বা'র ক'রেছেন, তা অতি চমৎকার জিনিস। তিনি তাঁর 'বাঙ্গালাশব্দকোষ'-এ যতটা সংস্কৃতের দিকে ঝুঁকেছেন, বাঙলার প্রকৃতি ঠিক মতো বুঝে লেখার দরুন তাঁব বাঙলা ব্যাকরণে খাঁটি বাঙলাই বহাল আছে। তিনি একখানি সুন্দর বাঙলা ব্যাকরণ লিখেছেন —কিন্তু কাজ এখনও ঢের বাকী। ঐতিহাসিক আব তুলনামূলক পদ্ধতিতে সব দিক বিচার ক'রে আমাদের ভাষার ইতিহাস এখনও লেখা হয় নি। বাঙলার ধ্বনি-ও উচ্চারণ-তত্ত্ব এক অতি জটিল জিনিস—একে সহজে ধরা ছোঁয়া যায় না —নানান্ জাতের বিশেষত্ব এতে লুকিয়ে আছে—ধাতু আর শব্দ-রূপের মতো উপর থেকেই এর আলোচনা শেষ হ'তে পারে না। অথচ এই ধ্বনি আর উচ্চারণ-তত্ত্বেই বাঙলা ভাষার আধেকের উপর গুপ্ততত্ত্ব নিহিত র'য়েছে। পূজনীয় রবীন্দ্রবাবু বাঙলা উচ্চারণের আর বাঙলার ছন্দের মূল সূত্রগুলি ধ'রে দিয়েছেন। এ বিষয়ে অল্প-স্বল্প কাজ চ'ল্‌ছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এবিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত— বিশেষত শাস্ত্রী মহাশয় 'অকারতত্ত্ব' ব'লে সম্প্রতি যে প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ -পত্রিকায় প্রকাশ ক'রেছেন (১৩২৫, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৩-৬২) তা অপূর্ব, তাতে

অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

ভাষাতত্ত্ব জিনিসটা আলোচনা ক'র্‌বার অধিকার সকলেরই আছে। ভাষা সকলেই ব্যবহার করেন। এই বিদ্যা বা বিজ্ঞান চর্চা ক'র্‌তে গেলে ল্যাবরেটারি আর যন্ত্রপাতির দরকার নেই—মনই হ'চ্ছে এর রসায়নাগার। কিন্তু যুক্তিসংগত উপায়ে চর্চা না ক'র্‌লে কোনও লাভ নেই, বরং উল্টো উৎপত্তি হয়। এই বিদ্যার ব্যাকরণ শিখে না নিয়ে এতে হাত দিলে লোকে তাল ঠিক রাখ্‌তে পারে না—রকমারি হাস্যজনক ভুল ধারণায় প'ড়ে যায়। যাঁরা বাঙলা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কিছু কাজ ক'র্‌তে চান, তাঁরা আগে ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যার মূলসূত্রগুলি পড়ুন, এদেশের আর্য্য অনার্য্য ভাষাগুলির সম্বন্ধে ঠিক ঠিক খবরগুলি জানুন, বিদেশে আর্য্য ভাষাগুলির ইতিহাসেরও একটু পরিচয় ক'রে নিন। **He knows not England who only England knows.** যিনি কেবল বাঙলা, সংস্কৃত আর প্রাকৃতে দিগ্‌গজ পণ্ডিত, অথচ প্রাচীন ঈরানীয় বা পুরানো গ্রীক, বা মধ্যযুগের রাজস্থানী, বা আনাম প্রদেশের ভাষা বা এমন কি দক্ষিণ আমেরিকার ভাষাগোষ্ঠীর কোনও খবর রাখেন না বা রাখা আবশ্যক মনে করেন না, তাঁর দ্বারা এ কাজ ভাল ক'রে হবে না। দু'রকমে একটি জিনিসকে বোঝা যায়—**static** আর **dynamic** –স্থিতিশীল বা অভ্যন্তরীণ, আর গতিশীল বা বহির্মুখী হিসাবে। এ জ্ঞানে গভীরতা আর ব্যাপকতা দুই-ই চাই। নাড়ী-নক্ষত্রের জ্ঞান চাই—ভিতরের সব খুঁটি-নাটির সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের জগতেব খবরও সেই অনুপাতেই রাখ্‌তে হবে। অন্যথা আলোচনা একদেশদর্শী হ'য়ে প'ড়্‌বে।

সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভ্যরা বাঙলা ভাষার সেবায় কী কী কাজ ক'র্‌তে পারেন তা পরিষদের পরিচালকগণ নিয়মাবলীতে ব'লে দিয়েছেন। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের কথা আমি ব'ল্‌তে পারি না—তবে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা সহজেই অনেক কাজ ক'র্‌তে পারেন। যাঁদের এদিকে ঝোঁক আছে, তাঁদের বিশেষ ভাবে আমি ব'ল্‌ছি, সংগ্রহের কাজে লেগে যান। গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ (শব্দগুলির প্রয়োগের দৃষ্টান্তের সঙ্গে) ; বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে প্রযুক্ত শব্দসংগ্রহ (যেমন তাঁতীর কাজের যন্ত্রপাতির আর তার পা'টের ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ের শব্দ, কিংবা নৌকা-ঘটিত সমস্ত শব্দ) ; নিজ নিজ থানা বা মহকুমার মধ্যে যে সকল নাম মেলে, যার মানে কেউ ক'র্‌তে পারে না, সেই সকল নাম সংগ্রহ। এগুলি যোগাড় করা বিশেষ পরিশ্রমের কাজ নয়, এতে খুব বিদ্যার দরকার করে না, এর জন্যে কেবল কান একটু খাড়া রাখ্‌তে হয়, আর একখানা

নোটবুকে যা শুন্‌লাম আর অসাধারণ ব'লে মনে লাগ্‌ল, সেগুলিকে টুকে রাখ্‌লেই হ'ল। এটি হচ্ছে বুনিয়াদ-কাটা মজুরের কাজ, কিন্তু এর সাহায্য না হ'লে দালান-কুঠী উঠ্‌তেই পারে না।

মুরুব্বিয়ানা চালে, যাকে **ex-cathedra** বলে, অনেকগুলি কথা ব'ল্‌লুম। এ বিষয়ে আমরা কী রকম ভাবে কাজ ক'র্‌তে পারি, সে সম্বন্ধে আমার মনে যা এসেছে তাই আপনাদের গোচর ক'র্‌লুম। এরূপ ভাবে ফরমাইস ক'রে যাওয়া আমার মতো ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে নিতান্ত অশোভন, কারণ আমি এই পথের একজন সামান্য যাত্রী মাত্র; কিন্তু অনুরোধে প'ড়ে এই অনধিকার চর্চা ক'রেছি, আপনারা আমাব এই ধৃষ্টতা মাজনা ক'র্‌বেন॥

কৃষ্ণনগব নদীয়া সাহিত্য-পবিষদেব পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

সবুজ পত্র, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। বাঙলা ১৩৭৮ সালেব শারদীয় 'অমৃত' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গলা

বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে আমাদের খুব প্রাচীন উপাদানের অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগের বাঙ্গলার সর্বাপেক্ষা কার্য্যকর নিদর্শন হইতেছে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ; এই বইয়ে আমরা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত কবিতার বা সাহিত্যের ভাষার একটি খাঁটি নিদর্শন পাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বেকার কালের বাঙ্গলার নমুনা এ পর্য্যন্ত যাহা আমাদেব হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইতেছে এই কয়টি :— [১] বৌদ্ধ চর্য্যাপদ—পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক তাঁহাব 'হাজাব বছরের পুরাণ বাঙ্গলায বৌদ্ধ গান ও দোহা' পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। চয্যাপদেব ভাষাব স্বরূপ লইয়া বাঙ্গলা দেশে অল্প-স্বল্প আলোচনা হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত গীতিকবিতাগুলিব ভাষা বাঙ্গলা নহে। এ স্থলে মজুমদার মহাশয়ের মন্তব্যগুলির বিচার করিব না, প্রবন্ধান্তবে সে বিষয়ে আলোচিত হইতে পারে। চর্য্যাপদের ভাষা আলোচনা কবিয়া আমার নিজের সুদৃঢ় ধারণা এই হইয়াছে যে, এই ভাষা প্রাচীন বাঙ্গলা, আমার মতবাদের কারণগুলি আমি মৎপ্রণীত *The Origin and Development of the Bengali Language* পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ১১০ হইতে ১২৩-এর পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে দিয়াছি। [২] দ্বিতীয় নিদর্শন ১০৮২ শকাব্দ বা খ্রীষ্টীয় ১১৫৯ সালে বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ-লিখিত অমরকোষের টীকাসর্বস্বে প্রদত্ত তিনশতাধিক ভাষাশব্দে কতকটা পাই ;[১] এই শব্দাবলী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৬ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম-এ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়দ্বয় দ্বারা সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। [৩] তৃতীয় নিদর্শন হইতেছে প্রাচীন বাঙ্গলা দেশের তাম্রশাসনে প্রাপ্ত স্থানাদির নাম। তাম্রশাসনে রাজা বা অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক ভূমিদানের কথা থাকে ; দত্ত ভূমির চতুঃসীমা-নির্দেশকালে গ্রাম নদী প্রভৃতির বহু নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল নাম, তুর্কী মুসলমানদের আসিবার পূর্বে বাঙ্গলাদেশে যে প্রাকৃত লোকভাষা আধুনিক বাঙ্গলার পূর্বরূপ হিসাবে বিদ্যমান ছিল, সেই প্রাকৃত ভাষার শব্দ। যেমন 'ডোঙ্গা' গ্রাম, 'বাগ্নি'

১ সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে প্রদত্ত বাঙ্গলা শব্দের সংখ্যা চার শতেরও অধিক হইতে পারে।

গ্রাম, 'বখট' গ্রাম, 'কণামোটিকা' (=কাণামুড়ি) পাহাড়, 'বডগাম', 'মহরাপুর', 'থবসোন্তী', 'সাতকোপা', 'হডীগাঙ্গ', 'চবটী' (=চটী), 'লচ্ছুবডা', 'বুটি পোথিরি', 'জোগল্ল' নদী, 'গাল্লিটিপ্যাক' বিষয়, ইত্যাদি।

এই তিন প্রকারের নিদর্শন ছাড়া পুরাতন বাঙ্গলার আর কিছুই আমাদের নাই। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' নামে শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষার ছন্দের উপর একখানি বই সংকলিত হয়, তাহাতে প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন হিন্দীতে লেখা শ্লোক বা কবিতা কিছু সংগৃহীত আছে। এই বইয়ের মধ্যে সংগৃহীত কতকগুলি কবিতা নাকি প্রাচীন বাঙ্গলায় লেখা, এইরূপ মতও প্রচার করা হইয়াছে। হইতে পারে যে, কতকগুলি কবিতা প্রথমটা বাঙ্গলা দেশে প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষায় লেখা হইয়াছিল; কিন্তু যে আকারে ইহাদিগকে আমরা প্রাকৃতপৈঙ্গলে পাইতেছি, তাহাকে বাঙ্গলা বলিতে পারা যায় না। প্রাকৃতপৈঙ্গলের ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশ-প্রাকৃতের বিশেষত্বগুলি স্পষ্ট বিদ্যমান; ইহাতে প্রাকৃতের দ্বিত্বাবস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া এক ব্যঞ্জনে পরিবর্তিত করা হয় নাই (অর্থাৎ 'ভক্ত' হইতে জাত প্রাকৃত 'ভত্ত' শব্দ এখনও 'ভাত' অবস্থায় পরিবর্তিত হয় নাই)। শব্দ ও ধাতুরূপে বা সর্বনামগুলির আকৃতিতে বাঙ্গলার বিশেষত্ব কিছুই নাই, বরং পশ্চিমা ভাষাগুলির বিশিষ্ট রূপই ইহাতে স্পষ্ট বিদ্যমান। এই জন্য প্রাকৃতপৈঙ্গলে প্রাচীন বাঙ্গলার অবস্থান স্বীকার করা কঠিন হইয়া উঠে।

প্রাচীন বাঙ্গলার ছোটো একটি নমুনা মহারাষ্ট্র দেশে লেখা একখানি সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুক্যবংশের রাজা সোমেশ্বর ভূলোকমল্ল খ্রীষ্টীয় ১১২৭ হইতে ১১৩৮ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শকাব্দ ১০৫১ = খ্রীষ্টীয় ১১২৯-তে ইহার নির্দেশে 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষার্থচিন্তামণি' নামে একখানি সংস্কৃত **encyclopaedia** বা বিশ্বকোষ প্রস্তুত করা হয়। এই বইয়ের পরিচয় স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় ১৩১৭ সালে মাঘ মাসের 'আর্য্যাবর্ত' পত্রিকায় বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপহার দেন, এবং ইহার মধ্যে অবস্থিত দুই ছত্র বাঙ্গালা যাহা পাওয়া যায়, তাহাও প্রথম আমাদের গোচরে আনয়ন করেন। মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাডে মহাশয় এই পুস্তকের উপর একটি প্রবন্ধ প্রথম মারহাট্টা সাহিত্য-সম্মেলনে পাঠ করেন, এবং দেউস্কর মহাশয়ের বাঙ্গলা প্রবন্ধ ইহারই আধারের উপর লিখিত বলিয়া বোধ হয়। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত *Early*

History of the Deccan পুস্তকে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৯৫ সাল, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০-তে) রাজা সোমেশ্বর ভূলোকমল্ল ও তাঁহার উৎসাহে প্রকাশিত 'মানসোল্লাস' গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন।

দেউস্কর মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই সংস্কৃত বিশ্বকোষগ্রন্থে কতটুকু বাঙ্গলা পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করি। 'মানসোল্লাস' এখন বড়োদায় গায়কবাড় সংস্কৃত গ্রন্থমালায় মূদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে, ইহার প্রথম খণ্ড গত বর্ষে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র বইখানি প্রকাশিত হইতে বোধ হয় কিছু দেরি লাগিবে।[২] এই বইয়ে 'গীত-বিনোদ' নামক সংগীত ও ছন্দঃশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অংশে সংস্কৃত, প্রাকৃত (লাটী), অপভ্রংশ ও দ্রাবিড়ভাষা কানাড়ীতে লিখিত কবিতা আছে। তদ্ভিন্ন প্রাকৃত-জ আরও দুই একটি ভাষার কবিতা পাওয়া যায়। বইখানির অনুলিপি পুঁথি ভারতবর্ষের নানা স্থানে রক্ষিত আছে—বীকানের দরবার পুস্তকভাণ্ডারে, পুনায়, তাঞ্জোর রাজপুস্তকভাণ্ডারে। পুনা হইতে আনীত এই বইয়ের একখানি পুঁথি ১৯২৩ সালে কলিকাতায় বসিয়া দেখিবার সুযোগ হয়। তখন তাহা হইতে আবশ্যক অংশগুলি উদ্ধাব করিয়া লই। এই পুঁথিখানি সংবৎ ১৯৩০ = ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা হইয়াছিল এবং খুব ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, বিশেষ প্রাকৃত অংশগুলিতে। আমার বন্ধু ইঞ্জিনীয়ার ও বাস্তুশিল্পী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন বীকানের রাজ্যে কর্ম করিতেছিলেন। আমার প্রার্থনা-মতো ইনি বীকানের হইতে বীকানের গড়ের বা দরবারের পুস্তকাগারে অবস্থিত এই বইয়ের খ্রীষ্টীয় ১৬৭১ সালে লেখা একখানি পুঁথি হইতে নির্দিষ্ট অংশের নকল আনাইয়া দেন। বীকানের পুঁথির নকল এবং পুনার পুঁথি—এই দুইয়ের পাঠ মিলাইয়া আধুনিক প্রাকৃত-জ ভাষায় যে অংশটুকু ঐ বইয়ে মেলে, সেটুকু উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বহু স্থলে পাঠ করিয়া কিছুই অর্থসংগতি হয় না। দুইখানি পুঁথিই ভ্রমপূর্ণ আর বোধ হয় দুইখানিই এক মূলের নকল—কারণ, উভয়ের মধ্য পার্থক্য বেশি নাই। আমি নিম্নে ভাষায় লিখিত অংশের পাঠ দিতেছি :—

১। (বীকানের, পত্র ১৪১ ক ; পুনা, পত্র ১৬৮ খ)

……ছাড়ু ছাড়ু মই জাইবো (?) (= জাইবোঁ ? জাইব ?) গোবিন্দ সহ খেলণ…নারায়ণু জগহকেরু (= ?কের) গোসাঁবী।

২ সমগ্র গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে—প্রথম খণ্ড ১৯২৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৯ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯৬১ সালে।

'ছাড়্ ছাড়্, আমি যাইব গোবিন্দ সহ খেলন (হেতু)…নারায়ণ জগতের গোঁসাই।'

এটি একটি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতের অংশ বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে পূর্বী ভারতীয় ভাষার—বাঙ্গলার—রূপ হইতেছে 'মই' = মুই (= সংস্কৃত 'ময়া' + বিশেষ্যের তৃতীয়া বিভক্তি '-এন'), এবং 'জাইব' (= সংস্কৃত 'যাতব্যম্') ; 'জগহকেরু'—এখানে প্রাকৃতের '-কের-' প্রত্যয় রক্ষিত হইয়াছে, যে প্রত্যয় হইতে আমাদের বাঙ্গলার ষষ্ঠীর '-এর' উদ্ভূত।

২। (বীকানেরের পুঁথি, পৃষ্ঠা ১৪১ খ ও ১৪২ ক, পুনাব পুঁথি, পত্র ১৬৯, ক, খ)

বিষ্ণুব দশাবতার-স্তোত্র।

(ক) মৎস্য অবতাব—

জেণেঁ রসাতল-উণু মৎস্য-রূপেঁ ব্রেদ আণিয়লেঁ…তো সংসাব-সায়ব-তাবণু মহ-র্তে রাখো নাবায়ণু।

'যৎকর্তৃক রসাতল হইতে মৎস্যরূপে বেদ আনীত হইয়াছে…সেই সংসার-সাগর-তারণ আমাকে রক্ষা করুন নারায়ণ।'

এই অংশের ভাসা প্রাচীন মাবহাট্টী। তবে ইহার মূল রূপ প্রাচীন বাঙ্গলা হওয়া অসম্ভব নয়।

(খ) কূর্মাবতাববিষয়ক দ্বিতীয় পদটি অতি বিকৃত অবস্থায়, কিছু অর্থগ্রহ হইল না।

(গ) বরাহ অবতার—

জো সুব্বর-রূবেঁ পায়লু পইশি দাণউ হরিণ-কছপু মাচরি (?), দাঢ গোব্বিন্দ ধরণি উদ্ধরিঅঁ, সো দেউ…

'যিনি শূকর-রূপে পাতালে পশিয়া দানব হিরণ্যকশিপু মৃত্যুতে [পাতিত করিয়াছিলেন], দংষ্ট্রা-দ্বারা গোবিন্দ ধরণী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই দেবতা…'

এটি কোন্ প্রদেশের ভাষা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, ইহাতে গুজরাটী, রাজস্থানী, হিন্দী, সবগুলির সাধারণ বিশেষত্ব বিদ্যমান। শৌরসেনী-জাত প্রাচীন হিন্দীই ইহার আধার ধরিয়া লইতে পারা যায়।

(ঘ, ঙ) নৃসিংহ ও বামন অবতার বিষয়ক পদ দুইটি উদ্ধার করা দুরূহ।

(চ) পরশুরাম অবতার—

জে ব্রাহ্মণের কুলেঁ উপজিয়াঁ, কাতবীযা (কার্তবীর্য) জেণেঁ বাহুফরসে খাণ্ডিয়া, পরশরাম্ দেউ (দেব্ৰ্) শে মাহর (=মোহর ?) মঙ্গল করউ।

'যে (=যিনি) ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কার্তবীর্য্য যাঁহার-দ্বারা বাহু-পরশে খণ্ডিত (=বিধ্বস্ত) হইয়াছিল, সেই পরশুরাম দেবতা আমার মঙ্গল করুক (=করুন)।'

এই অংশটুকুর ভাষাকে প্রাচীন বাঙ্গলা বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের কোনও আপত্তি হইতে পারে না। ইহাতে পূর্বী আর্য্যভাষার ও বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট রূপ মিলিতেছে ; সর্বনামে 'জে' (=যে), 'শে' (=সে 'শে' শব্দের তালব্য শ লক্ষ্য করিবার বিষয়) ; ষষ্ঠীতে '-এর' প্রত্যয় (উড়িয়া ও অসমিয়াতে '-অর', মগহী-মৈথিলী-ভোজপুরীতে '-ক্,-ক,-কে,' পূর্বী হিন্দীতে '-ক্', পশ্চিমা হিন্দীতে '-কো, -কৌ, -কা, -কী', পাঞ্জাবীতে '-দা, -দী', সিন্ধীতে '-জো, -জী', রাজস্থানীতে '-কো, -কী, -রো, -রী', গুজরাটীতে ' নো, -নী', মারহাট্টীতে '-চা, -চেঁ, -চী') ; সংস্কৃত 'র্য' স্থলে 'য়' (তুলনীয়, চর্য্যাপদ ৩৬—'আচাএ' = আচার্য ; দ্বিতীয় নরসিংহদেবের উড়িয়া অনুশাসনে—ত্রয়োদশ শতকের উড়িয়ায়— 'আচাএ' ; বাঙ্গলা 'আইমা' = আয়ি মা = আর্যিকা মাতা) ; অতীত ক্রিয়ার রূপ 'উপজিল' এবং 'খাণ্ডিল, খণ্ডিল' স্থলে 'উপজিয়া' (চন্দ্রবিন্দুযুক্ত রূপ লিপিকরপ্রমাদে ঘটিয়া থাকিবে) এবং 'খাণ্ডিয়া' আপাত-দৃষ্টিতে বাঙ্গলার নয় বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু ' -ইল্ল' বা ' -ইল' প্রত্যয় যোগ না করিয়াও কেবল 'ক্ত'-প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত অতীত ক্রিয়ার রূপ প্রাচীন বাঙ্গলায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়—'-ইঅ, -ইআ, -ই, -ঈ' প্রাচীন বাঙ্গলায় ' -ইল'-র পাশাপাশি অতীত কাল দ্যোতনার জন্য ব্যবহৃত হইত ; যেমন—

(৵০) 'মৌন করিআঁ দুহেঁ থাকি (=থাকিল) এক পাশে।'

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২১৭)

(৵০) 'তোকে তত্ত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী।
যোড় হাথ করী (=করিল) বনমালী ॥
তাত বড় পাইল আপমান।
তেঁসি তোহ্মা ছাড়ী গেল কাহ্ন ॥'

(শ্রীকৃঃ কী, পৃঃ ৩৪৩)

(৶০) 'দুই চক্ষু ঢাকিঞা রাণী হেঁট মাথা করি (=করিল)।
নারদ মুনি তবে দিল টিটকারী ॥'
(কৃত্তিবাস, উত্তর, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ১৬)

(।০) 'হাথে ধরি কন্যা আনিল দেব শূলপাণি ॥
কন্যা লঞা হর ছায়ামণ্ডপে বসি (=বসিল)।
চারি দিকে বেঢ়িল সব দেব ঋষি ॥'• (=ঐ, পৃঃ ১৭)

(।/০) 'পুষ্পক রথ সাজিঞা ব্রহ্মা তাহাক দিল দান ॥
ব্রহ্মার বরে তুষ্ট হইলা বাপেরে নমস্করি (=নমস্করিল)।
জত বর পাইল তাহা বাপকে গোচরি (=গোচরিল) ॥
দুর্ল্লভ বর ব্রহ্মা মোকে দিল দান।' (ঐ, পৃঃ ১৪)

(।৵০) 'তার দন্ত উপাড়িয়া নিল দুই ভাই।
সেই দন্তে মাহুত মাবি যমঘরে পাঠাই (=পাঠাইল) ॥'
(মালাধর বসু-কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, পৃঃ ৭৭১)।

(।৶০) 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি (=অবতরিলেন , অবতরিয়া)
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি (=বিহরিলেন) ॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান ॥'
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, অধ্যায় ১৩)

এইরূপ '-ই'-কারান্ত অতীত রূপের ভূরি ভূরি প্রয়োগ পুরাতন বাঙ্গলায় পাওয়া যায়। চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গলায় তদ্রূপ '-ইল'-র পাশাপাশি '-ই', '-ইঅ' এবং শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবে '-ইউ', '-উ' রূপও মেলে ; যেমন 'কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ (= চলিল)' (চর্য্যা ১৯) ; 'দশবলরঅণ হরিঅ (=হরিল) দশদিসেঁ' (চর্য্যা ৯) ; ইত্যাদি। অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং অতীতে '-ইআ' বা সংক্ষিপ্ত রূপে '-ইঅ, -ই, -ঈ' প্রত্যয় যখন আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গলায় দেখিতে পাইতেছি, তখন মানসোল্লাসের দশাবতারস্তোত্রে পরশুরাম-বিষয়ক অংশে 'উপজিআ, খাণ্ডিআ'কে প্রাচীন বাঙ্গলা বলিতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না।

[সংস্কৃত 'চলিত' =প্রাকৃত 'চলিঅ', তাহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গলার লকারহীন অতীত রূপ 'চলিঅ', 'চলিআ', 'চলি', 'চলী'। এবং প্রাকৃত 'চলিঅ'তে স্বার্থে- '-ইল্ল' প্রত্যয় জুড়িয়া 'চলিঅইল্ল', 'চলিল্ল' ; তাহা হইতে বাঙ্গলার লকার-যুক্ত অতীতের রূপ 'চলিল']।

(ছ) রামাবতার সম্বন্ধে পদটি এই তুইখানি পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই।

(জ) শ্রীকৃষ্ণাবতার—

নন্দগোউল জায়ো কনৃহু জো গোব্বীজনেঁ পজিহে (? পড়িহে)……

'নন্দগোকুলে জাত কানু, যে (যিনি) গোপীজনের সহিত পতিত হইবেন …'

এটির সবটা পড়া গেল না। ভাষায় প্রাচীন ব্রজভাখা হিন্দীর ভাব আছে।

(ঝ) বুদ্ধাবতার—

বুদ্ধরূপেঁ জো দাণব্র-স্থরা ব্রঞ্চউণি ব্বেদদূসণ বোল্লউণি মায়া মোহিয়া, তো দেউ মাঝি পসাউ করু।

'বুদ্ধরূপে যে (= যিনি) দানব ও সুরকে বঞ্চিয়া বেদদূষণ বাক্য বলিয়া মায়ার দ্বারায় মোহিত করিলেন, সেই দেবতা আমায় প্রসাদ করুক (করুন)।'

এই ভাষা প্রাচীন মারহাট্টি।

(ঞ) কল্কি অবতারের উপর অংশটি সংস্কৃতে। তাই তাহা দিলাম না।

১৭-র পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'ছাড়ু ছাঁড়ু…' অংশের এবং ১৯-এর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত চ' অংশের ভাষাকে প্রাচীন বাঙ্গলা বলিলে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। এই অংশটুকুকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম অর্ধের বাঙ্গলা ভাষার নিদর্শন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সব দিক দিয়া সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের বাঙ্গলার সহিত সম্পূর্ণ রকমে মেলে। প্রাচীন বাঙ্গলার যে তিন প্রকারের নমুনার কথা গোড়ায় বলিয়াছি, এই অংশটুকুকেও তাহাদের সামিল করিয়া ধরিয়া, ইহাকে প্রাচীন বাঙ্গলার চতুর্থ নিদর্শন বলিতে পারা যায়।

দ্বাদশ শতকে দেখিতেছি যে, নানা দেশভাষায় দশাবতারস্তোত্র ও অন্য বৈষ্ণব কবিতা লেখা হইত। শৌরসেনী অপভ্রংশে ও প্রাচীন হিন্দীতে এই প্রকার দশাবতারস্তোত্র ও অন্য বৈষ্ণব কবিতা এবং শিবতুর্গা-সংক্রান্ত কবিতা প্রাকৃতপৈঙ্গলেও পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর পর, মুসলমান আগমনের আগে, যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, ভাষায় রচিত এইপ্রকার কবিতা হইতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের চব্বিশটি পদ সম্বন্ধে একটি মতবাদ আছে যে, এগুলি প্রথমে (শৌরসেনী) অপভ্রংশে অথবা প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে সেগুলিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে; ছন্দোগতি, অন্ত্যানুপ্রাস, শব্দসমাবেশ

বিচার করিলে জয়দেবের 'মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী' ভাষার কবিতার সহিত বেশি মেলে, সংস্কৃতের সহিত নহে। দ্বাদশ শতকে রচিত মানসোল্লাসে রক্ষিত ভাষাস্তোত্র দেখিয়া মনে হয়, এইরূপ অভিমতের পরিপোষক বস্তু আমাদের হাতে আসিল ॥

[প্রাচীন বাঙ্গলার নিদর্শন সম্পর্কে বিশেষ ক রয়া দ্রষ্টব্য অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পূর্বার্ধ।]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বর্ষের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৩।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গলা কাগজ-পত্র

ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে যে বাঙ্গলা পুঁথি ও কাগজ-পত্র আছে, ১৯০৫ সালে শ্রীযুক্ত জে. এফ্. ব্লুম্‌হার্ট্ মহাশয় তাহার এক বিবরণী[১] প্রকাশিত করেন। এই বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, এই সংগ্রহে প্রাচীন বা উল্লেখযোগ্য পুঁথি তেমন কিছুই নাই। সংখ্যাতেও এই সংগ্রহ নগণ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বৃন্দাবনদাসের ভক্তিচিন্তামণি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য, কাশীরামের মহাভারত, অন্নদামঙ্গল—এই প্রধান বইগুলি এই সংগ্রহে আছে; কিন্তু কোনও পুঁথি অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বের নহে। অধিকাংশ পুঁথি ও অন্য বাঙ্গলা কাগজ-পত্র বাঙ্গলা-ব্যাকরণ-রচয়িতা হাল্‌হেডের সংগৃহীত। বাঙ্গলা সাহিত্যের পুঁথি ভিন্ন অন্য কতকগুলি বাঙ্গলা নথী-পত্র চিঠি প্রভৃতিও আছে। বিবরণীতে ব্লুম্‌হার্ট্ সাহেব তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী মনে করিয়া এই সকল নথী-পত্র হইতে কতকগুলি নকল করিয়া আনিয়াছি। এই পত্রাদির সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার মতো জ্ঞান ও অবসর আমার নাই, কিন্তু যাঁহারা অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গলার ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে ইহার মূল্য থাকিতে পারে। (মূল কাগজে যেখানে পংক্তি শেষ হইয়াছে, সেই স্থল নির্দেশের জন্য এই প্রবন্ধে মুদ্রিত পত্রাদিতে [/] চিহ্ন দেওয়া হইল।)

[১]

Sloane 3201. G. একখানি পত্র।

/৭শ্রীশ্রীহরিঃ

মহামহিম শ্রীযুত কাপতান / মেস্ত্রী ইস্টবিনসেন সাহেব জীউ / মহোগ্রপ্রতাপেষু—

বন্দে খেদমতগার পরওরদে নমক শ্রীকৃষ্ণকান্ত / সর্ম্মণঃ কোরনিষ বন্দগি নিবেদনঞ্চ আগে সাহে/বের উমর দৌলত জেআদা হামেসা ৺স্থানে / চাহি তাহাতে এখানকার কুসল বিসেষ শ্রীযুত / সিবি ফতাজী কলিকাতা জাইতেছেন

১ Catalogue of the Marathi, Gujarati, Bengali, Assamese, Oriya, Pushtu & Sindhi Manuscripts in the Library of the British Museum by J. F. Blumhardt, M. A.

জে বিসএ / সাহেবজী কহেন মুনেন গৌর করিবেন আর / শ্রীযুত সিবি সাহেব জেমন সাহেবেরদিগের / কর্ম্মে তাহা জানিতেছেন অতএব জে বিহিত তাহা / করিবেন নিবেদন ইতী—৪ শ্রাবণ।

পত্রের শিরোদেশে পুনর্লিখন—

এ পত্রে শ্রীযুত রসিকলাল / জী সেলাম লিখিতে কহিলেন / সেলাম জাহির হবেক—

চিঠিখানি ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোনও কর্মচারী কর্তৃক লিখিত। 'শ্রীযুত কাপতান মেস্ত্রী ইস্টবিনসেন সাহেব' (= কাপ্তেন মিস্টার স্টিভেন্‌সন্‌ ?—ব্লুম্‌হার্ট সাহেব এই নামটি কিন্তু Captain Wilson ধরিয়াছেন) কবে কোথায় ছিলেন, আর 'সিবি ফতাজী'-ই বা কে ছিলেন ও সাহেবদের কোন্‌ কর্মে বা সহায়ক ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গলায় কোম্পানির দেশী ও ইংরেজ কর্মচারিগণের স্থিতি ও গতিবিধি আলোচনা করিলে, পত্রোল্লিখিত ব্যক্তিত্রয়ের পরিচয় মিলিতে পারে। দ্বিতীয় পত্রে এক 'ইষ্টীবিনশেন' সাহেবের কথা রহিয়াছে। এই দুই চিঠিতে উল্লিখিত ব্যক্তি একজন হইতে পারেন।

পত্রের মধ্যে এই ফার্সী শব্দ কয়টি উল্লেখযোগ্য :—বন্দে = বান্দা = বন্দহ্‌ = দাস। খেদমতগার = আজ্ঞাকারী, সেবক, এখনকার বাঙ্গলায় 'খানসামা'। পরওরদে নমক = লবণ (অর্থাৎ অন্ন)-পুষ্ট। কোরনিষ = কুরনিশ্‌। গৌর করা = প্রণিধান করা।

[২]

Sloane 4090. Fol. 19. একখানি পত্র। ১১৩৩ সাল = ১৭২৭ খ্রীঃ

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ =

শ্বরন°—

নকলপত্র মোকাম ভাগলপুরের—

শ্রীগুরুবক্স রোডার লিখন—

স্বস্তী সকলমঙ্গলালয়/

শ্রীযুত মে° হেমটেম সাহেব শ্রীযুত মে বরাডিন সাহেব / শ্রীযুত মে° কেটরেট সাহেব শ্রীযুত কা°রবলেষ সাহেব / আজ্ঞাকারী সদাপোষ্য শ্রীগরুবক্স রোডা ৺সেলাম বহুত ২ / লিখন° নিবেদনঞ্চ। আগে সাহেবের দৌলত কী জেয়াদা হামেসা / ৺স্থানে প্রার্থনা করিতেছী তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ—/ এখানকার

চোপদারের সমাচার পূর্ব্বে নিবেদন পত্র লিখি / য়াছী পরে ২২ মাঘ রবিবারে মুরসীদাবাদ হইতে শ্রীযুত নবাব / সাহেবের তরফ এক সওয়ার ও দস্তক এখানে আসীয়াছে কহে—/ মাল ইঙ্গবেজের নহে ইঙ্গরেজ মুরসীদাবাদে মুচলকা / দিয়াছেন তোমরা আপন মাল লইয়া ইঙ্গরেজের সঙ্গে বেবকাওতে / মহষুল মারিয়া আসীয়াছ। আমারদিগের সহিত রদবদল / অনেক জাইতেছে। পুনশ্চ করার হইল আমরা ইঙ্গরেজ সাহেবের / লিখন এবং শ্রীযুত নবাব সাহেবের লিখন আনাইয়া দিব / ইহা নিবেদন লিখি মাল সাহেবলোকের আমী চাকর / ইঙ্গরেজের। কাসীমবাজারে সাহেবের লিখন জায় মেং / ইষ্টীবিনশেন সাহেবেকে জতোউচীত লিখন করিয়া পাঠাইতে / আঙ্গা হইবেক সেখান হইতে শ্রীযুত নবাব সাহেবের এক লিখন / আইষে জে ভাগলপুরে ইঙ্গরেজের নমক উতরিয়াছে গমাস্তা / লোক খাতিরজমাতে খরিদ ফোরক্ত করহ আমরা সওয়ার / চোপদারের আমদানীতে ভয় করি নাই আমল তেমত দি নাই / মাল ইঙ্গরেজের আমরা চাকর খামীন্দের বলেই সক্তি করিতেছী / খামীন্দের নামদরম্যান থাকীতে কোন পরয়া নাই মাল ইঙ্গরেজের / নহে এই ধোকাতে খরিদার বন্ধ করিয়াছে ইহ ধমকে আমী / ডরাই না সাহেবেলোকের ছায়া আমার সিরপর থাকীতে / কোন চীন্তা নাই মুরসীদাবাদের লিখন আইলে মাল খালাষ / হইবেক ইহা নিবেদন করিলাম ইতি—

তারিখ / ২৫ মাঘ রোজ বুধবার সনে ১১৩৩ সাল—

পত্রের মধ্যে এই ফার্সী শব্দগুলি প্রণিধানযোগ্য।— দস্তক = আজ্ঞাপত্র। বেবকাওতে = বে-বকাৱতহ্ = নিশ্চিন্তভাবে, কিছু গ্রাহ্য না করিয়া। খাতিরজমাতে = নিঃশঙ্কচিত্তে। খরিদ ফোরক্ত = খরীদ্-ব-ফরোখ্ৎ = ক্রয়-বিক্রয়। খামীন্দ = খাৱিন্দ্ = স্বামী, প্রভু। দরম্যান = মধ্যে। (ব্লুম্‌হার্ট্ সাহেব বিবরণীতে পত্রোল্লিখিত ইংরেজ কর্মচারী চারিজনের নাম দিয়াছেন—**Mr. C. Hampton, Mr. Braddon Mr. E. Carteret** ও **Captain O. Borlace.**)

অন্তর্বাণিজ্য ও শুল্ক আদায় লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার সুবাদার ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে যে গোলযোগ চলিতেছিল, ও নবাব-নাজিমের সরকার হইতে কোম্পানির কর্মচারীদের নামে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইতেছিল, যাহার পরিণামে মীর-কাসিমের পতন, এই পত্র হইতে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।
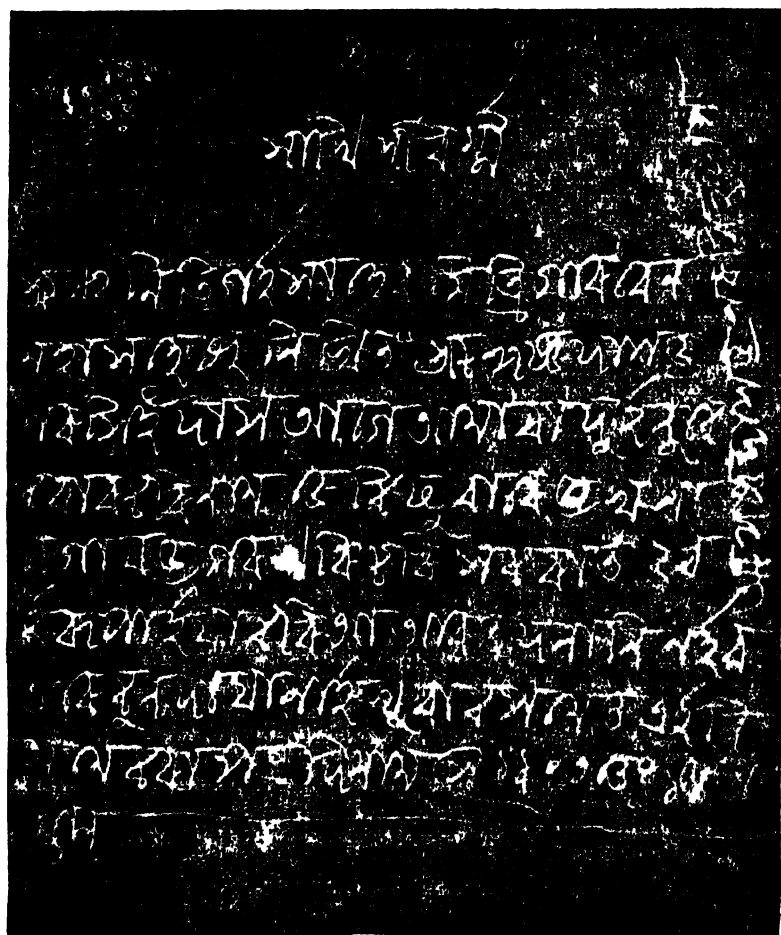
১৭০৩ সালের একখানি বাঙ্গলা চুক্তিপত্র (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
(ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত)

[৩]

Sloane 4090. Fol. 20. একখানি প্রাচীন চুক্তিপত্র।

১১০৩ সাল = ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীকৃষ্ণ

সাখি শ্রীধর্ম্ম

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল / মহাসহেষু
লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও / নরসিংহ দাস আগে আমারা তুই লুকে / করার করিলাম জে কিছু বারে (= কারে ?) স্থনা/রগায় ও গর খ (?) রিকরি সকরাত ২ দ্ব (= দু) / ই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব / আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নি / অমে করা [র] পত্র দিলাম স ১১০৩ তেং ১৪ আ / গ্রান—

পত্রের দক্ষিণ ভাগে উপরে আড়াআড়ি নাম-স্বাক্ষর—

শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস

খ্রীঃ ১৬৯৬ সালের এই চুক্তিপত্রখানি বিশেষভাবে বিচারযোগ্য। ধর্ম সাক্ষী করিয়া একরার-পত্র দেওয়া হইতেছে। 'শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল', ব্লুম্‌হার্ট্‌ সাহেবের মতে **Mr. Gay** ও **Mr. Garbell.** করার-পত্রের স্থান হইতেছে সোনারগাঁ, স্থানীয় উচ্চারণে 'স্থনারগা' (তদ্রূপ, 'লুক' = লোক, 'কুন' = কোন, 'খুরাক' = খোরাক)। এই পত্রের মধ্যে কয়টা অক্ষরের সমাধান করিতে পারিলাম না ; 'স্থনারগায়' = সোণারগাঁয়ে—প্রাচীন বাঙ্গলাতে 'স্থ' অনেক স্থলে 'খ্‌'র মতো লেখা দেখা যায় ; কিন্তু তাহার পরের কথা কয়টি কী ? 'গর' শব্দের পরের অক্ষরটি (= 'খ' ?) কাটা বলিয়া মনে হয়। তাহার পরে 'রিকরি', না, 'বিকরি' ? 'সকরাত' = শ'করাতে, শতকরাতে ? = 'গড় বিক্রি শতকরা' ? পুরাতন লেখা যাঁহারা পড়িতে পারেন, তাঁহারা, যে অক্ষর কয়টি আমি ঠিক করিতে পারিলাম না, তাহার যথার্থ পাঠোদ্ধার করিবেন, এই আশায় দলিলখানির এক প্রতিলিপি দিলাম। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ অনুসারে 'আড়ত' শব্দ সোনারগাঁয়ের এই মহাজনদের লেখায় 'আরত' রূপ ধরিয়াছে। 'দায়া' = দাওয়া, দাবি। 'এই নিঅমে করা [র] পত্র দিলাম'—এই অংশটুকুর পাঠ মান্যবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

পত্রখানির পিছনে অতি পুরাতন ছাঁদের ইংরেজি হাতে লেখা আছে—The

Bramanies Carackter/from Dacca the Metropolis of/Bengall in the East Indies. ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভের দিকে কোনও কৌতূহলী ইংরেজ প্রাচ্য লিপিবিশেষের ('ব্রাহ্মণী' অর্থাৎ হিন্দু লিপির) নিদর্শন হিসাবে এটি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই পত্রখণ্ড, ফার্সী, কায়থী, আরমানী, তেলুগু, চীনা ও সংস্কৃতে (দেবনাগরীতে) লেখা অন্য কতকগুলি কাগজের সঙ্গে একত্র একখানি বহিতে বাঁধানো আছে।

ইহা প্রায় ২৩০ বৎসর পূর্বেকার অঙ্গীকার-পত্র। বাঙ্গলায় এত পুরাতন চিঠি বা দলিল সহজে মিলে না।

[৪]

5660 F. Various Papers in Bengali, Persian etc.

Instructions to the Aumeen & Gomasteh / at Hurrypaul (a true translation.—N. B. H.)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।—

শরণং—

মো° হরিপাল আমিন ও গোমাস্তা———

সে আড়ঙ্গের দালাল সকল কএক সন হইতে মোকরর / আছে ইহারা কুম্পানির কাজ অনেক খতরা করিয়াছে / তাতিরদিগের উপর একান্ত এক্তিয়ার পাইয়া তাহা / দিগের উপর জোর ও জবরদস্তিতে ও গোমাস্তা ও / কোটীর দোসরা আমলাহায়ের সঙ্গে এক এতফাক হইয়া / মবলগ বাকি পড়িয়াছে তাহার কিছুই আদায় / করিতে পারে না। এ কারন আমি ষুন্দর তজবিজ করিয়া / তাহারদিগেরে কাজ হইতে তগির করিলাম আমার / মনস্ত দালাল রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না / কিন্তু দালাল ছাড়াইলে কুম্পানির দাদনির দফার / জামিন কেহ থাকে না একারন এই কএক জন ফলানা ২ / সেখানকার নিকটাবত্তি ও মাতবরিও আছে ইহা / দিগের দালালিতে মোকরর করিলাম।——

নয়া দালালেরদিগের কর্ত্তব্য কাজ এই মধ্যে ২ তাঁত / নজর করিবেক ও কাপড়ের রকম বুনিবার সময় / তজবিজ করিয়া দেখিবেক খবরদারি করিবেক / জেন নমুনাসহি সরস রকম হয় ও জে কিছু দাদনি / তাঁতিদিগকে তুমি করিবা তাহার জামিন / ওই নয়া দালালরা হইবেক ওই জামিনির জন্যে / দালালি খরচ বদস্তর সাবেক থানকরা জেমত ২ / মোকরর আছে তাহা পাইবেক নয়া

দালালদিগকে / আপন এক্তারিতে দাদনি কএক টাকা হরগিজ / দিবা না কারন এই এমত ধারায় বেআন্দাজ বাকী / কদাচ হইতে পাইত না জদি মপশ্বল কুটীর আমলা / লোক করার কিস্তিবন্দিমাফিক কাপড় বুঝিয়া / লইত ও মপশ্বল তজবিজ করিয়া দাদনি করিত অতএব / এ হুকুম ও নাপচন্দ কাজের মহকুম হামেসগির জন্মে / লিখিতেছি।——

জত্যাপি কারবারের আনওাল বদলির জন্যে / তোমার কাজ্য কথক তফাত পড়িবেক জে ধারার / কাজ করিতে হবেক ভাল বুঝিয়া তাহার আনওাল / নসিয়ত মত লিখি ইহাতে মালুম করিবা ও বেহতর / জানিবা যে তোমার কাজ ষুবিতামত ও খোলাসারূপে / জাহাতে চলিবেক তাহা লিখিতেছি।———

তোমাকে বেগর হেম্মত ও এরাদতে ও নেহাইয়ত / চালাকিতে একাজ করিবা ইহা বেগর তোমাকে মোকরর / করি নাই আমি একান্ত মোস্তজর থাকীলাম তুমি / কাজ ভাল করিবা বিশেষত তোমাকে জেয়াদা মেহনত / আপন হাতে দাদনির কারণ করিতে হবেক একারণ সাবেক বরাওর্দ্দ হইতে দুই মুহরির জেয়াদা মোকরর / করিলাম।———

সদর আড়ঙ্গ দ্বারহাটায় তুমি আপন দস্তে / দালাল কিম্বা দালালের গোমাস্তার মোকাবিলাতে / তাতিকে দাদনি করিবা ও জখন তাতি কুটীতে কাপড় / দাখিল করিবেক তখন দালাল কিম্বা দালালের / তরফ গোমাস্তা হাজির থাকীবেক এবং থান / [২] চুক্তির সময় তাতিসাক্ষাতে থাকিয়া চুক্তি করিবেক / জখন থান খামসোজ ধোলাই হইবেক সাবেক / দস্তরমত সেই সময় চুক্তি হইবেক।

যে কাপড় ফেরত হবেক সে কাপড় তাবত কুটীতে কোরক / রাখিবা জাবত তাহার এওজ কাপড় সরকারি গোছ / মত দাখিল না করে জদি নমুনাসই কাপড় দাখিল / করিতে না পারে তাবত ঐ ফেরত কাপড় কুম্পানির / তরফ হইতে বিক্রি হইয়া তাতির নামে টাকা জমা হইবেক / এ হুকুম হাজত আছে জদি সরবরাহ ষুন্দরমত হয় / তবে বাকী হরগিজ পড়িবেক না জদি তাতি খবরদার / না হয় ও কাপড় সরস না করে ও সরবরাহে খতরা / করে গোমাস্তার নসিয়ত না ষুনে ও এতো জেয়াদা / কিম্মতেও বেগাফিল না হয় তবে তাহারদিগকে আনওলি / মত কথক সাজাই করিবা কিন্তু তুমি বেহুদা সাজাই জদি / করহ তবে তাতি তোমার নামে মোক্তারের নিকট / নালিস করিতে পারিবেক এ হুকুম খুব তহকিক জানিয়া / কখনো বদল করিবা না

পহিলা তাতি জে রকম কাপড় দিবার করার করিবেক তাহার হাতে হরগীজ / তাহার দুই থানের জেয়াদা দাদনি দিবে না তাঁতি / এক থান দাখিল করিবার পুর্ব্বে আর এক থানের / দাদনি করিবে না থান দাখিল হইলে পর দাদনি করিবা / মালুম হইল তাতি ফি তাঁত দুই থানের জেয়াদা কাপড় / দাখিল করিতে পারে না এই কারণ ফি মাহা একবার / সেওয়ায় দাদনি হইতে পারিবেক না।——

সংপ্রতি খাজনা পৌছিলে পর এই মত দাদনির / দস্তরমাফিক করার বমৌজিব তুমি দিবা / ও নায়েবগোমাস্তাকে হুকুম করিয়া তাহার হাতে / দেয়াবা এবং দাদনির দফায় তুমি ও তোমার / নাএব কিছু গৌন করিবা না অনেক লোক পূর্ব্বে / আপন মুনফার জন্যে তাতির খতরা করিয়া / তাহাদিগকে আজিজ করিয়াছে জদি তুমি / সে ধারা কাজ করহ তবে জে তাগাদি কুর্দ্দ তোমার উপর বেজার হইব।———

একথা খুব এয়াদ রাখিবা তুমি ও নাএব ও আমলা/হায় জে কেহ সরকারে মাহিনা পায় হরগিজ কেহ / আগামি মাহিনা খরচ করিবে না এবং খরিদের / কারন দাদনি হইবে না।———

পেটার আড়ঙ্গের মধ্যে হরিপাল ও মোড়া দ্বার / হাটার নিকটে কারন সেখানকার আলাদা / কোটী ছাড়াইয়া দ্বারহাটার সামিল করিবা সেখান / কার তাতিলোক সদর কোটীতে সববরাহ করিবেক / কিন্তু দোসরা পেটার আড়ঙ্গ ধন্যাখালি মায়াপুর রাজবলহাট কৈকালা কলি জয়নগর ও সকল / জায়গার তাতিলোক সদর কোটীতে কাপড় দাখিল / [৩] করিতে লাগিলে তাহারদিগের অনেক তছদিয়া হয় / একারন সে সকল আড়ঙ্গ মোকরর থাকীবেক নাএব / গোমাস্তা ও আমলাহায় দোসরা মাফিক তফসিল / মনফুক এই সকল নাএব-গোমাস্তা আপন / কাজে জায়গায় ২ মোকরর হইয়া মাফিক হুকুম / কী তোমাকে লিখিলাম এই মাফিক কাজ্য করিবেক—

তোমাকে উচিত জেহানেসা পেটার আড়ঙ্গের কাজ / নজর করহ মোকামি গোমাস্তা ও দালালরা / কি ধারায় কাজ করে এবং তাতি ও পেটার আমলা / দালালের সহিত কোন মোকদ্দমা রোয়দাদ হয় / কিম্বা তাতি তাতিতে মোকৰ্দ্দমা হয় তাহাও ফয়সল / করিবা ফয়সল করিবার দফায় খুব সেতাবি ও আদালত করিবা।———

বেগর তোমার নিতান্ত খরদারি ও মোকামি গোমাস্তা / দিগের স্থানে সেলামি

ও রেসয়ত কিছু লইবে না / আর অবস্য কুম্পানির কাজে ভালমতে সরবরাহ / হইবেক জদি তুমি এ দফার সাচা হইতে পারহ / তবে তোমার নেকনামি হইবেক এবং জে উপযুক্ত তোমার দেনবরি করিব কিন্তু জদি তুমি কিম্বা / আমলহায় দোসরা হুকুম ছাড়া কোন কাজ করহ / তবে উপযুক্ত সাজাইতে পৌছিবা।———

হুকুম জানিবা মাষকাবার কাগজ সদবকুটীর ও / পেটার কুটীর মাষ ২ কলিকাতায় মোক্তারকারের / নিকট পাঠাইবা সে কাগজেব এই বেওরা লিখিবা / মাষ ২ কতো দাদনি করহ তাহার আসামিওার / নামনবিসি ও মজুত তহবিল এবং যে কাপড দাখিল / তাহাব আলাদা হিসাব পাঠাইবা কোন রকম / কার কতো জাচাইসই কতো ফেরত তাহা লিখিবা করারের / বাকি কাহার কতো তাহা লিখিবা কি কারন / কবাবের বাকি পড়ে তাহাবো বেওরা লিখিবা এ কাগজ / হবেক মাষেব ত্রিষা তঈয়াব করিয়া দস্তখতি মুদে / আগামি মাষের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিতে / চাহ জখন খাজানা তহবিল জেয়াদা হবেক তখন / কতো টাকাব দরকাব তাহা দরজ দিয়া লিখিবা / আইন্দায় জমাখরচী কাজ দুব করিবাব কারন যে কিছু / বাকি দালালির জিম্মে আখেরি মৌষুমে হইবেক তাহা / আদায় করিয়া লইবা তাতিদিগের করার সাল / তমামি করারি কাপড আখরি ফিবরিল নাগাদি / দাখিল করিবেক তবেই তজবিজ ও ফয়সল কারন / ত্রিবা আবরিল মুদ্দা তোমাকে আইয়ামের ফোরসত / খুব মিলিবেক জদি একাজে কোন বখেড়া বোয়দাদ / হয় সিঘ্র মোক্তারকারকে খবর লিখিবা। তাহারা খোলাসা হইয়া আইলে ফয়সল হইবেক ও ওজর / ওহিনা (ওছিলা?) জারি হইবেক না আর তাতিলোক জে মাফিক / করার করিয়াছে তাহার করারনামার নকল মনফুক / [৪] করিয়া পাঠাই তাহাতেই হবেক পেটার আড়ঙ্গের / করার মালুম হইবেক তোমার কাজ এই খবরদার / হইয়া করার মাহফিক কাপড় / আদায় করিয়া লইবা।

জদি নয়ারকম কাপড় পেটার আড়ঙ্গে পয়দা হয় / তাহাব নমুনা মোকতারকারের নিকট পাঠাইবা / মোক্তার তজবিজ করিয়া দেখিবেক কুম্পানির / কাজের উপযুক্ত হয় কিনা ও বেওরা লিখিবা / কতো কাপড় ঐ নয়ারকমের সরবরাহ সালিয়ানা / হবেক তাহার মাফিক জবাব লিখিবে।—

ছোট ২ মোকদ্দমা জে রোদাদ হইবেক তাহা স্থন জগ্নে তাহাদিগকে সমঝাহ / সালিস দুরায় রফা করিয়া দিবেক জদি তাতিলোক / ইজারদারের নামে নালিষ

করে কিম্বা ইজারদার তাতির / নামে নালিষ করে তবে ঐমত তাহাদিগকে সমঝাইয়া / সালিষ তুমি মোকরর করিয়া দিবা এক সালিষ সদর / ইজারদার করিয়া দিবেক জদি ইহাতে মোকদ্দমা রফা / না হয় তবে মোকদ্দমার তামাম হকিকত আরজি লিখিয়া / মোক্তারকারকে খবর জানাইবা তাতিলোক সকলে / গোল করিয়া নালিষ কারণ জদি কলিকাতা জাইতে / উদ্যতো হয় তবে খুব মোজাহেম হইবা কারন এই / তাহাদিগের জায়নে খরিদের কাজের খতরা এবং / মালগুজরিতে ও খতরা হয় অতএব জদি তাহাদিগের কোন ফরিয়াদী দফা সালিসিতে রফা / না হয় তবে কলিকাতায় তাহারা গোল করিয়া / না গিয়া আপন তরফ জনেক উকিল পাঠাইবেক / সেই উকিল সকল তাতির হইয়া মালিকের কাছে ফরিয়াদ করিবেক।—

দালালের মারফতের বাকী তিন সনের টানা (টাকা?) হিসাবে / আন্দাজী ৯০০০ হাজার টাকা তাতিলোকের জিম্মে / আছে এ বাকি উসুল করিবার জন্যে তুমি খুব / মুকেদী করিবা জে উসুল হইবেক তাহা সাবেক দালা / লেরদিগের বাকীর আন্দরে জমা করিয়া লইবা।—

সফেদ কাপড় একসী যুত না হওাতে অনেক কথা জন্মিয়াছে / ও একসী না হওন কেবল গোমাস্তাব কম তরদ্বুদি সংপ্রতি / হুকুম লিখি তুমি কিম্বা তোমার খাতির্জ্জমা মত জনেক / মাতবর লোক হপ্তা ২ তাত সকল ও তানা ভরনির সুত নজরা করিবা / তানা হাটাবার সময় বারিক ও একসী সুত তজবিজ / করিয়া দিবা জেনো ভারি যুত ও ফড্যা তানার মধ্যে / না থাকিতে পায় আর বুনিবার সময় ভরনির যুতে ও / কোন ফড্যা দিগর আএব না থাকে ভরনির যুতা / বারিক হয় খবরদারি করিবা তাতি জেন আপন / কেফাইতের জন্য ভারি যুত পড়্যানের মধ্যে আমেজ / না করে সকল পাত একসী হয় এই / সকল জন্যে কাপড বেআন্দাজ হয় ও সরবরাহে খতরা / হয় তুমি খুব খবরদারিতে হরেক থান কাপড় / তজবিজ করিয়া লইবা গজ ও বর ও গোছে হরগিজ……

[অসমাপ্ত—মূল কাগজ এইখানেই সাঙ্গ হইয়াছে।]

উপরে মুদ্রিত কাগজখানির ইংরেজি শিরোলিখন হইতে বুঝা যায় যে ইহা ইংরেজিতে খসড়া-করা একখানি হুকুম-নামার বাঙ্গলা অনুবাদ। N. B. H. এই অক্ষরত্রয় নাথ্যানিএল ব্রাসি হাল্‌হেডের নামের আদ্যক্ষর, ইহা নিঃসন্দেহ; হাল্‌হেড্‌ ইংরেজি-ভাবায় সর্বপ্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ লেখেন, খ্রীষ্টীয় ১৭৭৮ সালে হুগলীতে

এই বই মুদ্রিত হয়; হাল্‌হেড্‌ বাঙ্গলা তর্জমাটি দেখিয়া 'ঠিক অনুবাদ' বলিয়া দস্তখত করিয়া দিতেছেন। হাল্‌হেডের নামের আদ্যক্ষর হইতে বুঝা যায় যে কাগজখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বাঙ্গলা-দেশে বয়ন-শিল্প ও বস্ত্র-ব্যবসায়ের সহিত ঈস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির কী সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি তথ্য এই কাগজ হইতে পাওয়া যায়।

হরিপাল হুগলী জেলায়, তারকেশ্বরের নিকটস্থ বিখ্যাত গ্রাম। এখনও ঐ অঞ্চলের তাঁতের কাপড় সুপরিচিত।

মূল কাগজখানি বড়ো ফুলস্কাপ চারি পৃষ্ঠায়, লম্বে আধাআধি ভাঁজ করিয়া প্রতি পৃষ্ঠায় অর্ধ অংশ ধরিয়া লেখা। [২] [৩] ও [৪] পৃষ্ঠায় আরম্ভ, উপরের মুদ্রিত পাঠে বন্ধনীদ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। ক্বচিৎ দাঁড়ির ব্যবহার ভিন্ন মূলে আর কোনও বাক্য-চ্ছেদ-চিহ্ন নাই; একটানা পড়িয়া গেলে প্রথমটায় দুই এক জায়গায় সহজে অর্থগ্রহণ হইবে না, কিন্তু তথাপি মুদ্রিত পাঠে কমা দাঁড়ি প্রভৃতি দিবার বিশেষ কোনও আবশ্যকতা বিবেচনা করি নাই, মূলের রীতিই বজায় রাখিয়াছি।

কাগজখানির ভাষা দেখিয়া মনে হয়, অনুবাদকারী বাঙ্গলা গদ্যে এতটা একটানা রচনা করিয়া যাইতে অনভ্যস্ত, ইহার বাক্য-রীতিতে স্থলে স্থলে অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়িয়াছে, যেমন ২৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অংশে প্রথম প্যারার প্রথম বাক্যটি, ও দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের গোড়ায় প্রথম পুরুষ হইতে বাক্যকে মধ্যম পুরুষে আনয়ন; ২৯ পৃষ্ঠায় ১০-এর ছত্রে 'তোমাকে এ কাজ করিতে হইবে' স্থলে 'তোমাকে…একাজ করিবা', ১২ ও ১৩-র ছত্রে 'তোমাকে জেয়াদা মেহনত আপন হাতে দাদনির কারণ করিতে হবেক'; ৩০ পৃষ্ঠায় ১৬-র ছত্রে 'নিকটে কারন' = নিকটে বলিয়া; ইত্যাদি। তাঁতি পৌঁছ প্রভৃতি শব্দে লেখক বা অনুলেখক চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ সর্বত্র করেন নাই।

কাগজখানিতে ফার্সী শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য উল্লেখযোগ্য। পুরাতন বাঙ্গলায় গদ্য-রচনা নিতান্ত বিরল, অল্প স্বল্প গদ্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা বেশির ভাগ চিঠি পত্রে ও দলিল দস্তাবেজে, প্রায় সমস্তই বিষয়কর্ম লইয়া; এতৎসম্পৃক্ত শব্দ বাঙ্গলায় ভূরি পরিমাণে ফার্সী হইতে গৃহীত; তদ্ভিন্ন মুসলমান শাসকদের প্রভাবে বহু সাধারণ ফার্সী শব্দও বাঙ্গলার মৌখিক ভাষায় সর্বত্র ব্যবহৃত হইত। এই সকল শব্দের অনেকগুলি আজকালকার সাধারণ বাঙ্গলায় অপ্রচল হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নে এইরূপ কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দেওয়া গেল। ইহা ভিন্ন দুই

চারিটি দেশী শব্দেরও টিপ্পনী আবশ্যক হইবে মনে করিয়া নীচে [বন্ধনীর মধ্যে] দেওয়া গেল।

২৮ পৃষ্ঠা.—[খতরা = হানি; ক্ষতি-শব্দ হইতে]। [কোটী = কুঠি]। আমলাহায় (= আমলাহ (?) = আরবী ∠অমলহ্‌, ∠অমলৎ) = কর্মচারিবৃন্দ। এতফাক (= আ° ইত্তিফাক্‌) = একমত। মবলগ (= আ° মুব্‌লঘ্‌) = আগমস্থান, পূর্ণতা, মোট টাকা, অনেক। তজবিজ (= আ° তয্‌ব্রীজ্‌) = অনুসন্ধান, বিচার। তগির = (উর্দু ও ফার্সী তঘীর্‌, আ° তঘ্‌য়ীর্‌ হইতে) = পরিবর্তন, কর্মচ্যুতি। হরগিজ (= ফা° হরগিজ, হরগজ) = কখনও, সদা। রকম (= আ° রক্‌ম্‌) = প্রকার, কাজকরা বস্ত্র।

২৯ পৃষ্ঠা :—মহকুম (= আ° মুহ্‌ব্‌কম্‌) = পরিষ্কার, স্পষ্টীকৃত (নিয়ম)। হামেসগি (= ফা° হমেশগী) = চিরকাল। আনওাল (= আ° অন্‌ব্রাল্‌) = রীতি, পদ্ধতিসমূহ। নসিয়ত (= আ° নস্বীহ্বৎ) = পরামর্শ, উপদেশ, বিধান, শাসন। মালুম (= আ° ম∠লূম্‌) = জ্ঞাত। বেহতব (= ফা° বিহ্‌তব্‌) = শ্রেয়, অপেক্ষাকৃত ভালো। [ষুবিতা (= হিন্দী সুভীতা) = সুবিধা]। বেগর (ফা° ব + ঘয়্‌ব্‌) = ব্যতিরেকে। হেম্মত (= আ° হিম্মৎ) = চিন্তা, দুশ্চিন্তা। এরাদত (= আ° ইরাদত) = ইচ্ছা, চেষ্টা, অভিসন্ধি। নেহাইয়ত (= আ° নিহায়ৎ) = বৃদ্ধি, সীমা, বিশেষ। মোস্তজর (= আ° মুস্তজ্বির্‌) = প্রার্থী, অপেক্ষী। বরাওর্দ (= ফা° বর্‌-আব্বর্‌দ্‌) = বরাদ্দ, পূর্ব হইতে নির্ধারণ। মুহুরির (= আ° মুহ্বর্‌রর্‌) = মুহরি, কেরানি। দস্ত (= ফা° দস্‌ৎ) = হাত। খামসোজ (= ফা° খাম্‌ শোব্‌ ?) = অর্ধধৌত, কচলান। এওজ (= আ° ∠ইব্বদ্‌) = বদল। হাজত (= আ° হ্বাযৎ) = আবশ্যক। কিম্মত (= আ° ক্বীমৎ) = মূল্য। বেগাফিল (= ফা° বে + আ° ঘাফিল) = সাবধান। তহকিক (= আ° তহ্ব্‌ক্বীক) = সত্য, সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত।

৩০ পৃষ্ঠা :—সেওয়ায় (= ফা° সিব্রা-ই, আ° সিব্রা) = অধিক। বমৌজিব (= ফা° বহ্‌ + আ° মুযিব) = হেতু অনুসারে। আজিজ (= আ° ∠আযিজ) = অক্ষম, বলহীন, নিপীড়িত। তাগাদি কুর্দ্দ (= আ° তকা∠উদ্‌ + ফা° কর্‌দহ্‌) = অমনোযোগিতা কৃতে। এয়াদ (= ফা° য়াদ) = স্মরণ। [পেটা (দক্ষিণী শব্দ) = দুর্গযুক্ত স্থান, সুদৃঢ় পল্লী, সুদৃঢ় স্থানের নিকটবর্তী পল্লী, দেশীলোক কর্তৃক অধ্যুষিত স্থান; পল্লী অঞ্চল]। তছদিয়া (= আ° তস্ব্‌দী∠) = ঝঞ্ঝাট, আপদ, শিরঃপীড়া, ক্লেশ। মাফিক (= আ° মুব্রাফিক্‌) = অনুসারে। তফসিল (আ° তফ্‌স্বীল) = বর্ণনা। = মনফুক (= আ° মুন্‌ফক্‌) = আলাদা আলাদা। রোয়দাদ (৩১ পৃষ্ঠায়

রোদাদ) (=ফা° রূ-দাদ)=উপস্থাপিত, আদালতে আনীত। ফয়সল (=আ° ফয়্স্বলহ্)=বিচার। সেতাবি (=ফা° শিতাবী)=তাড়াতাড়ি, ত্বরিত, অগৌণে। আদালত (=আ° ∠অদালৎ)=ন্যায়বিচার। খরদারি=খঅর, খবরদারি ; তুলনীয়, পৃষ্ঠা ৩২-এ শেষ ছত্রে, বর=বঅর, বহর।

৩১ পৃষ্ঠা :—রেসয়ত (=আ° রিশ্ৱৎ)=ঘুষ। নেকনামি (=ফা° নামী)=সুনাম। দেনবরি (=? হিন্দী দেনা—তুলনীয় দেন-হার্, দেনৱার্=দেনেৱালা) =পুরস্কার। সাজাই (উর্দু সজাঈ, ফা° সজা হইতে)=শাস্তি। মোক্তারকার (=আ° মুখ্তার+ফা° কার) =কার্য্যাধ্যক্ষ, কর্মচারী। আসামীওার (=আ° অসামী + হিন্দী ৱার)=নাম ধরিয়া, লোকের নামানুক্রমিক। নামনবিসি (=ফা° নাম্-নৱীসী)=নামলিখন। [বেওরা=হিন্দী বেৱরা=ব্যাপার, বিবরণী]। দস্তখতি ষুদে (=ফা° দস্ত-খতী (আ° খত্ত্)+শুদহ্)=সহী হইলে পর। দরজ (=আ° দর্য্)=খাতায় লিখন। আইন্দা (=ফা°-ন্দহ্)=আগামী। মৌষুম (=আ° মৱ্সিম্)=সময়। [ফিব্রিল=ইংরেজি ফেব্রুয়ারি ; আবরিল=ইংরেজি এপ্রিল]। যুদ্দা—শুদ্ধ ? পর্য্যন্ত ? আইয়াম (=আ° অয়্য়াম)=দিনসমূহ। মাহফিক=মাফিক ; স্থন (=আ° স্ব ন্∠)=প্রস্তুত করণ, করণ=নিষ্পত্তি। [সালিশ দুরায়=দ্বরায়, দ্বারায়]।

৩২ পৃষ্ঠা :—হকিকৎ (=আ° হ্বকীকৎ)=সারসত্য। মোজাহেম (=আ° মুজাহ্বিম্)=বিরোধী, বাধাদায়ক। ফরিয়াদী দফা (=ফা°+আ° দফ্∠অ) =নালিস আনয়ন, পেশ করণ। মুকেদী (=আ° মুকয়্য়দ্)=সচেষ্টভাব, আগ্রহপূর্ণতা। তরদ্দুদি (=আ° তরদ্দুদ্)=পরিশ্রম, চেষ্টা, যত্ন। খাতির্জ্জমা (আ° খাত্বির্ যম∠)=নিঃসন্দেহ বিশ্বাস, দৃঢ় ধারণা, সন্তোষ। বারিক (=ফা° বারীক্)=সরু, সূক্ষ্ম। [ফড্যা=ফড়িয়া, ফোড়ে='নাল-ফোড়', পড়িয়ানার সুতা তানার সুতার সহিত জড়াইয়া যাওয়া]। আএব (আ°∠অয়্ব্)=অসম্পূর্ণতা, দোষ। কেফাইত (=আ° কিফায়ৎ)=প্রাচুর্য্য, সুবিধা। আমেজ (ফা°)=মিশাল।

উপরের আরবী [ও ফারসী] : শব্দে নিম্নলিখিত রীতি অনুসারে আরবী [ও ফারসী] অক্ষরের বাঙ্গালা প্রত্যক্ষর স্থির করা হইয়াছে :—অলিফ্-হম্জহ্ =' ; বা=ব ; [পে=প] ; তা=ত ; থা=থ ; যীম=য ; [চেহ্=চ] ; হ্বা=হ্ব ; খা=খ ; দাল্=দ ; ধাল্=ধ ; রা=র ; জা=জ ; [ঝে=ঝ] ; সীন্=স ; শীন্=শ ; স্বাদ্=স্ব ; দ্বাদ্=দ্ব ; ত্বা=ত্ব ; জ্বা=জ্ব ; ∠অয়্ন্=∠ ;

ঘয়্‌ন্‌=ঘ; ফা=ফ্‌; কাফ্‌=ক্ব; কাফ্‌=ক; [গাফ্‌=গ]; লাম্‌=ল; মীম্‌ =ম; নূন্‌=ন্‌; ৱাৱ=ৱ; হা=হ; য়া=য়; [ফার্সীর ৱাৱ-ই-ম∠দূলহ্‌ যুক্ত খে=খ্ব।]

[৫]

5660. F. গন্ত গল্প

৭ শ্রীশ্রীদুর্গাঃ—

শ্বহায়—

৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র।—

সা° অবন্তিকে—

মো° ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম/ শ্রীমতি মৌনাবতি সোড়ষ বরিস্যা বড় ষুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য / কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ন্ন পয্যন্ত যুঙ্গ্য ভ্রূর ধনুকের / নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ন্ন হস্ত পদ্মের মৃনাল স্তন দাড়িম্ব / ফল রুপলাবন্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন ষুন্দরি / সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব। একথা / ভোজরাজা স্থনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক / এক ২ রাজার পূত্রকে এক ২ দীন রাত্রের মধ্যে এক ২ জোন কে সয়ন / ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকে না কেবল / কন্যাঃ আর রাজপুত্র এক খাটে কন্যা সোযে ঃ এক খাটে রাজপুত্র / সোযে। জে রাজপুত্র জেমন ঙ্গানবান হয়। সে ঃ সেইরূপ কথা / সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পারে না ঃ সকালে উঠেঃ/ রাজপুত্র ঃ ঘরে জায়। এইরূপ প্রকারে কত ২ রাজপূত্র আইল / কেহো কথা কহাইতে পারিলেক না ঃ কতমৎ প্রকার করিলেক / তবু ঃ কন্যাকে ঃ কথা কহাইতে পারিলেক না। এইরূপে অনেক / দীন গেল ঃ পরে রাজা বিক্রমাদিত্য ঃ কন্যার ঃ রুপগুন ষুনে/ বড়ই তুষ্ট ঃ হইলেন ঃ কাহাকেও ঃ কহিলেন না ঃ সঙ্গে এক জোন / মনস্যু ঃ লইলেন না ঃ কেবল আপূনি একা ঃ বড় ঘোড়ায় আরোহন / হইয়া ঃ সিকারের ঃ নাম করিয়া ঃ দুই চারি ঃ রোজের পরে ঃ মোকাম ঃ ভোজপুর ঃ শ্রীযুত ভোজরাজার ঃ বাটীতে ঃ উবিস্থীত / হইলেন ঃ রাজার লোক জিঙ্গাষা ঃ করিলেক ঃ কে তুমি ঃ কোথা ঃ / হইতে ঃ আইলে ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ আপনার ঃ পরিচয় ঃ / দীলেন না ঃ কহিলেন ঃ আমি ঃ আতিত ঃ একথা

স্থনে : / শ্রীযুত ভোজরাজার : লোক : অপূর্ব্ব : আষন : বশীতে : / দীলেন : রাজা বসিলেন : খাওানের : অপূর্ব্ব ২ : সামিগ্র : / আনিয়া দীলেন : রাজা বিক্রমাদীত্য : খাইলেন : পরে : / সয়ন : করিলেন : / বৈকালে : শ্রীযুত ভোজরাজা : স্থনিলেন : / এক : আতিত : আসিয়াছে : লোক : পাঠাইয়া : ডাকাইয়া : / আনিলেন : রাজা বিক্রমাদীত্যকে : জীঙ্গাষা : করিলেন : / কী জন্যা : আগমোন : হইয়াছে : এখানে : কী নাম : । / তোমার : প্রকত্ত কহিবে : তাহাতে : রাজা আপনার / : নাম : ভাঁড়াইয়া : আর এক : নাম : কহিলেন : শ্রীযুত / ভোজরাজা : পুনুর্ব্বার : জিঙ্গাসা : করিলেক : তোমাকে :/ এমন স্থন্দর : এমন গুণবান : দেখিতেছী : বুঝি : তুমি : / কোন : রাজা হইবেক । পরে : রাজা বিক্রমাদীত্য : কহিলেন : / আমি : জে হই : তোমার পরিচয়ে : কায্য কী আছে : তোমার : / কন্যার পন স্থনিঞা : আসিয়াছী : আমি : তাঁহাকে : / কথা কহাইব : রাজা : কহিলেন : ভালোই : থাকোহ :/ পরে : রাত্রে : এক ঘরে : দুই খাট : বিছাইলেক : / দুই জনে : দুই খাটে : সয়ন : করিলেন : ক্ষেনেকে : কাল / পরে : রাজা বিক্রমাদীত্য : জিঙ্গাষা : করিলেন : এ ঘরে / কেহ আছহ : আমার সঙ্গে : কথা কহো : কন্যা উত্তর :/ দীলেক না : পরে : রাজা : কী করিলেন : তাঁহার সঙ্গে : / পোসা : দুই ভূত ছীল : তাহার : নাম তাল : বিতাল : তাহাকে / স্মরণ : করিলেন : তখনি তাহারা : দুই জনে : আইলেন : / ৭ কী আঙ্গা মহাঁরাজ : কী করিব কহ : রাজা কহিলেন : / তুমি : কন্যার খাটে গিয়া : বইসহ : আমি : জীঙ্গাসা : / করিলে : কথা কহিও : তাল : বিতাল গিয়া : কন্যার খাটে / বসিল : পরে : রাজা°: ডাকীয়া : কহিলেন : এ ঘরে কে জাগ্রত / আছহ : তাল বিতাল : উত্তর : দীলেক : কী জন্যা : ডাক / মহাঁরাজ : রাজা কহেন একী আশ্চয্য : কন্যার : কথা নাঞী / তুমি : কে : তাল বিতাল : কহিলেক : মহাঁরাজ : আমি : / কন্যার খাট : রাজা কহিলেন তবে তুমি : স্থনহ : এক দেসে / এক : সওদাগর ছীল : সে বানির্য্যতে গিয়াছীল : পরে / তাহার : জাহাজ ও নৌকা সেই : দেসে এক মায়ে সকল : ডুবিয়া গেল : এক / খান তক্তা ধরিয়া : সওদাগর : কীনারায় : উঠিল : / মানুষ : জল : আনিতে আসিয়াছীল / সে : সওদাগরকে : লইয়া : আপনার বাটীতে গেল : । / বিস্তর : সেবা করিয়া সওদাগরকে বাঁচাইলেক । কতক দীন / তাকাদী সেই খানে থাকীল । পরে এক দীন এক মালীর : / মায়ে : স বড় জাদুগীর : তার সঙ্গে । আর

সওদাগরের / সঙ্গে সাক্ষ্যাত হইল : সে মালিনি এক ঔসধ : সওদাগরের : গায়ে ফোলিয়া ফেলিয়া মারিলেক। সে ঔসধ তার গায়ে / লাগিতে : ভেড়া হইল : সওদাগরকে এক দড়ি দীয়া : বাঁদীয়া / আপনার : ঘরে লইয়া গেল। রাত্রে এক ঔসধ গায়ে ছোঁয়াইয়া / মান্নুষ করে : দীনে আরবার ভেড়া করে। এইমত করিয়া / প্রত্তহ বেহার করে। এক দীন : সে ভেড়া দড়ি ছীড়িয়া : / পালিয়া : এক রাজার : বাটীর ভিতর : গেল : রাজার / লোক : সে ভেড়া ধরিয়া : কাটীয়া। তাহার মাংষ। / খাইলেক। বল মুনি : রাজকন্যার : খাট : অপরাধ / কার হইল। তাল বিতাল কহিলেক। জে ময়ে জলের ঘাটে / হইতে। লইয়া গিয়া : বাঁচাইয়াছিল : সকল দোষ তাহার / হইল। মালিনির : কিছু দোষ নাঞী। কন্যা একথা / স্থনিয়া : আপনার খাট দুর করিয়া। ফেলিয়া দীলেক। / মাটীতে সয়ন : করিয়া : রহিল : পরে রাজা বিক্রমাদীত্য / কহিতে লাগিল : কন্যার খাটের সঙ্গে কথা কহিতেছীলাম / কন্যা তাহা গোষা করিয়া ফিরিয়া দীলেন : এ ঘরে / আর কেহো আছহ : তাল বিতাল : উত্তর দীলেক : / কেনো মহাঁরাজ : পরে রাজা কহিলেন : কে তুমি : তাল বিতাল / কহিলেক : আমি রাজকন্যার পরিধিয় বস্ত্র : বড়ই ভালো / হইল : কথা স্থন। এক দেসে : এক সওদাগরের : কন্যার : / সঙ্গে : বিভাহের কথা চারি জোনের সঙ্গে হইয়াছে : / বিভাহের দীনে চারি জোন : আশীয়া : উবিস্থীত হইল / কেহ বলে আমি বিভাহ : করিব : আর কেহ কহে তুমি কে / আমি : করিব : এই কথায় : বড়ই ঝকড়া হইল : সে কন্যা / এ কথা স্থনে : রাত্রের মধ্যে জহর করিয়া মরিলেক / প্রাতঃকালে সে কন্যাকে : বাহিরে : আনিলেক। / চারি জোনে সে কন্যাকে দেখিয়া বিস্তর খেদ করিলেক / এক জোন কন্যার সোকে জহর খাইয়া মরিল : এক জোন / ফিরে ঘরে গেল এক জোন বসিয়া থাকীল। এক জোন / এক ঔসধ খাওইয়া : দুই জোনকে : বাঁচাইলেক : বল স্থনি / কন্যার কাপড় সে কন্যা কে পাইবে তাল বিতাল কহিলেক : জে ফিরা / ঘরে গিয়াছে সেই পাইবেক : কন্যা একথা মুনিঞা কাপড় / ফেলিতে : পারেন। না : হাসিয়া : উঠিলেন। কথা কহিলেন / রাজা কন্যার হাত ধরিয়া : আপনার খাটে লইলেন : সারা / রাত্র হাসীখুসি করিলেন। তার পর দীন ভোজরাজা কন্যার / বিভাহ দীলেন। রাজা বিক্রমাদীত্যর সঙ্গে।।।।

পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্যের বিশেষ অভাব। এই গল্পটি অষ্টাদশ

শতাব্দীতে লিখিত বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা হিসাবে খুবই উপযোগী। যথাযথ মূলানুযায়ী মুদ্রিত হইল।

[৬]

5660 F. একটি গান।—লালচন্দ্র ও নন্দলাল দুই জনের ভনিতা দেওয়া।

ওকি অপরূপ দেখি ধনি : পিষ্টেতে লম্বিত ধরনি সম্বিত কিম্বা ফনি কিম্বা বেনী : অলকা বেষ্টীত / কনকে রচিত শিতি কিম্বা সৌদামিনি : তার অধ / দেসে অন্ধকারো নাসে : সিন্দুর কি দিনমনি : / খঞ্জন যুগল নয়ান চঞ্চল কি সফরি অনুমানী / কিবা বিধুবর কি মুখ সুন্দর কিছুই না জানি ॥২॥ কিবা কামকুঞ্জ কি তড়িতপুঞ্জ কিবা হয় তনুখানি : / কি কুচ কি গিরি কি বুঝিতে না পারি কি কোক / বিহিন পানি ॥৩॥ কি মৃনালদণ্ড কিবা করিসুণ্ড / কিবা বাহুর সুবলনি ত্রিবলি ত্রিগুন কি কাম / সোপানো কিবা নাভি তরঙ্গনি কিবা কোটি / দেস কিবা পষুইষ মধ্যে সোভিছে কিঙ্কনি / কিবা রম্বা তরু কিবা যুগ্য উরু কিবা মরাল / চলনি ॥৫॥ লালচন্দ্র কহে এ বেসে কোথায় / চল্যাছ লো বিনোদিনি নন্দলাল ভনে চায়্যা / আমাপানে হাস্যা কথা কহ সুনি ॥৬॥::—

[৭]

5660 F. লাল কালিতে লেখা কতকগুলি মন্ত্র।—উপরে লাটিন ভাষায় পুরাতন ছাঁদের ইংরেজি হাতে লেখা Carmen Shanskrit cujus Ops Morsus Serpentis admodum Lethalis innoxius reddatur atque cito Moribundus convalescat / Inefficax foret nisi litter rubida scriptum অর্থাৎ "সংস্কৃত ছড়া, যাহার সাহায্যে অতি বিষাক্ত সাপের কামড় বিষমুক্ত করা যায়, ও মরণোন্মুখ শীঘ্র আরাম হয়। লাল অক্ষরে লিখিত না হইলে কার্য্যকর হয় না।"

[লাল রঙ্গে সাপের মন্ত্র লেখা সম্বন্ধে পরিষদের অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন যে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো" নাটকে কতকগুলি সাপের মন্ত্র নাটকের একটি পাত্রের মুখ দিয়া বলানো হইয়াছে এবং যখন ঐ বইয়ের প্রথম মুদ্রণ করা হয়, তখন মন্ত্রগুলি লাল অক্ষরেই ছাপানো হইয়াছিল।]

হাতচালা। উচল চালম স্থচল চালম অরে হাত তোরে চা(ল)ম থাকে চৌসাপার বিস ছামু ধর না থাকে চৌসাপার বিস ডাইনে বাঁয় চল কার আঙ্গা বিসহরির / আঙ্গা ।১। উচ উচ ভামুহে রক্তবরনে বিস নাই গুরু হে গামছা-মোড়ান রথে চাপিয়া হনুমন্ত জায় তুল তুল বিষ তুই গামছার বায় শ্রীমনসার আঙ্গা ১॥ / গামছা পাড়িয়া মারিবে॥ তাগাবান্ধা॥ মুই বান্ধি তাগা ব্রহ্মা বিষ্ণু তিনজনে গেলগা তাগা তাগনের সাত ভার বিষ পিচকর আকুল সমুদ্র উবুকরি / তুই পা তোর স্মামি সাপে খালে তাগা বান্ধ্যা ঘরে জা ১॥ ভাগান্যার মামা সম্বুর বিস ভাগিন্যা বৌ হেটয়েড্যা উপর ধাইস খাইস গুরনৌ উড়্যাবান্ধী / উড়নি ভিডা বান্ধে ডোর কোথা আইস করঙ্গ (কু ?)র বেটা সিন্দমুষান্যা-চোর ইন্দ্রপুরের মাটি ব্রহ্মপুরের ফুল মহাদেব বাঁধেন তাগা বাঁধ্যা চাঁপার / ফুল ইঁহার উদ্দিস করিস বল ধর্ম্ম ইসাদ পায় তল ১॥ / আবেস দুর করা॥ আদবার বছরের পদসকুমার(রি ?) পার মগরমুট খাড়ু ডাইন হাতে ধোধবল / ছাতা বাঁহাতে বিসের নাড়ুবিস খায় খলবলায় মনে মনে হাসে তিন্দিনির জায়া। না (লা ?) ধান সেহয়নে ভাসে ছাওাল কাঁদানি বাড়ুন ভাঙ্গানি আলাক / দিয়া বাতি অন্ধ কার গার বিস ঝাড়াই সাক্ষি ব্রহ্মানি নাই বিস বিসহরির আঙ্গা ১॥ / ঝাড়ান॥ স্বর্গের পায়রা / সাগরপারি অমতভুবনে তোর বাসা / বিস উপজিল কোথা বিস উপজিল পদ্মা / র স্মরনে নাই বিস। জগতে গৌরিহুংকার॥ ১॥ মস্তকামহিল (যাইল ?) বিস পবন খরসান বাহড় বাহড় বিস / সিব পর / মান বাহড় রে বিষ তোরে ডাকেন পাঁও আপনার স্মাপ দর্পে বিস রক্তে দিলা ঝাপ বাহড়ে রে বিস তোরে অনাদিকৃষ্ণের ১॥ গড়ুর নাচে নপুর বাজে / ঘুঙ্গুর বাজে পায় পথ ছাড়্যা দেয় তাহে গোসাঁই গড়ুর জায় ।১॥ / পিলাকাটা॥ উকং কালীয়ং ব্লং লং বং সং ষং শং হং ক্ষ ডাকিনী ঝম্পে পিলা কম্পে / পিলার বুকে মারম আগুনবান অমুকার আঙ্গের পিলা কাটা করম খান খান কার আঙ্গা উগ্রচণ্ডার আঙ্গা ১॥

এই মন্ত্রের সবটা বুঝিতে পারিলাম না; মিলাইবার জন্য অন্য কোনও সাপের মন্ত্রেরও পাঠ পাই নাই, ভবিষ্যতে আলোচনার জন্য কেবলমাত্র মূল কাগজে যেমন পাইয়াছি, তেমনি মুদ্রিত করিয়া দিলাম॥

১৩২৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা ১৩২৯।

ভারতচন্দ্রের একখানি পুঁথি

কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানি প্রধান কাব্যগ্রন্থ, এবং ইহার রচনার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিম মধুসূদন রঙ্গলাল প্রমুখ সাহিত্যিক ও কবিগণের রচনায় বাঙ্গলা সাহিত্যের আধুনিক ধাবা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্য্যন্ত, এক শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া 'অন্নদামঙ্গল'-কে বাঙ্গলা ভাষার সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। অবশ্য, রামায়ণ মহাভারত চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি বাঙ্গলার জনসমাজে আদৃত হইত, কিন্তু মুখ্যতঃ পৌরাণিক আখ্যান হিসাবে লোকের কাছে ঐ পুস্তকগুলির আদব ছিল—কাব্যরসেব আস্বাদনের জন্য, সুকুমার সাহিত্য হিসাবে, 'অন্নদামঙ্গল'-ই প্রথম ও প্রধান কাব্যগ্রন্থ ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্যসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমরা, অর্থাৎ বৈষ্ণবসম্প্রদায়-বহির্ভূত সাধারণ বাঙ্গালী, অতি অল্পকাল হইল, মাত্র উপস্থিত দুই এক পুরুষের মধ্যে, সচেতন হইতে আরম্ভ করিয়াছি। কোনও লেখকের লোকপ্রিয়তার একটি বড়ো প্রমাণ এই যে, তাঁহার রচনা হইতে বহু বচন বা ভাব সাধারণ্যে প্রচার লাভ করিয়া থাকে, অনেক সময়ে তাঁহার রচিত বচন ভাষায় প্রবাদের মতন সকলের মুখে মুখে ফেরে। আমরা এখন বৈষ্ণব পদকার 'চণ্ডীদাস'-কে গত পঞ্চাশ বৎসরেব মধ্যে পুনরাবিষ্কার করিয়াছি—চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদের সংগ্রহের প্রকাশ দ্বারা, সাহিত্যিক আলোচনা দ্বারা, শিক্ষিত সমাজে কীর্তন সংগীতের পুনঃপ্রচারের দ্বারা, বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্মমত শ্রদ্ধার সহিত বাঙ্গালা শিক্ষিতজন কর্তৃক আলোচনার ফলে, এবং ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে, নাটক ও চলচ্চিত্রের সহায়তায়, 'চণ্ডীদাস' এখন বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছেন, তাঁহার রচনা বলিয়া "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ", "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই" প্রভৃতি বহু পদাংশ আমরা সকলে আওড়াইতেছি, আলাপে ও রচনায় উদ্ধার করিতেছি। আমার মনে হয়, বাঙ্গলার পুরাতন (অর্থাৎ ইংরেজি সভ্যতার ও মনোভাবের প্রচারের পূর্বেকার) যুগের বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে যত পয়ার বা ত্রিপদী বা পদাংশ অথবা বাক্য বাঙ্গলা ভাষায় প্রবচন বা প্রবাদ রূপে আপনা হইতেই গৃহীত হইয়াছে, এমন আর কোনও কবির লেখা হইতে হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল, আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে।

তাঁহার জীবৎকালে 'অন্নদামঙ্গল' রচনার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রথম তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রণের সময় পর্য্যন্ত, হাতে লেখা পুঁথিতে তাঁহার রচনা লোকসমাজে প্রচারিত হইত। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের সংস্করণের পরে ১২৩৫ সালে (১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতা সিমুলিয়ার 'পীতাম্বর সেন দিগরের' (and Company-র খাসা বাঙ্গলা তরজমা—'দিগরের') ছাপাখানায় 'অন্নদামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর' মুদ্রিত হয়। তাহার পরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একখানি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করেন। কবির মৃত্যুর পরে ষাট বৎসরের মধ্যে তাঁহার রচিত কাব্য সমগ্রভাবে মুদ্রিত হওয়ায়, উক্ত গ্রন্থে বিশেষ পাঠবিকৃতি ঘটিতে পারে নাই। গঙ্গাকিশোর-প্রমুখ প্রথম সংস্কর্তা ও প্রকাশকগণ যে পুঁথি বা পুঁথিসমূহ অবলম্বন করিয়া বই ছাপান, সে সমস্ত পুথি ভারতচন্দ্রের সময়ের কত কাছাকাছি লিখিত হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ভারতচন্দ্রের কাব্যের তারিখ-দেওয়া ছয়খানি পুথি আছে। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনটির তারিখ হইতেছে ১২০৪ সাল (=১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ), তাহার পরে আছে ১২০৯ সাল (=১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ), ১২২৮ সাল (=১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ), ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭৫১ শক (=১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ), ১২৩৯ সাল (=১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। খণ্ডিত তারিখ-বিহীন পুথিও কতকগুলি আছে। বাঙ্গলা দেশে বা অন্যত্র বাঙ্গলা-পুঁথি-সংগ্রহ-সমূহে ভারতের এইরূপ পুঁথি আরও মিলিতে পারে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের একটি যুগোপযোগী প্রমাণিক এবং সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া উচিত। বাঙ্গলার ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যশিল্পী হিসাবে ভারতচন্দ্রের কাব্যের এরূপ একটি সংস্করণ না থাকা বাঙ্গলা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা। আমাদের সাহিত্যিকগণের মধ্যে ভারতচন্দ্রের গুণগ্রাহী সমালোচকের অভাব নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম[১] ;—তাঁহার সম্পাদনায় ভারতচন্দ্রের কাব্যটি প্রকাশ করার কথা এক সময়ে আমাদের অনেকেরই মনে হইয়াছিল। সম্প্রতি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত, বাঙ্গলার সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যালোচক সমাজে সুপরিচিত 'দুষ্প্রাপ্য

১ এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁহার 'ভারতচন্দ্র'-শীর্ষক প্রবন্ধ—দ্রষ্টব্য প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধসংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী।

গ্রন্থমালা'-তে ভারতচন্দ্রের একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ভারতচন্দ্রের পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন।[২]

প্যারিসের 'বিব্লিওতেক্ নাসিওনাল' বা ফরাসী জাতীয় গ্রন্থাগারের ভারতীয় পুঁথির সংগ্রহের মধ্যে একখানি বিদ্যাসুন্দরের পুথি আছে। **A. Cabaton** আ. কাবার্ত-সংকলিত উক্ত পুথিসংগ্রহের তালিকায় এই সংবাদ পাইয়া, ব্রজেন্দ্র-বাবু ও সজনী-বাবু, এইবার যখন আমি ইউরোপে যাই তখন আমায় অনুরোধ করেন, সম্ভব হইলে প্যারিসে ঐ পুঁথিটি যেন আমি দেখিয়া আসি। তদনুসারে আমি এই বৎসরের (১৯৩৮ সালের) জুলাই মাসে ও সেপ্টেম্বর মাসে পুথিখানি দেখি। সুখের বিষয়, পুথিতে লিখনের তারিখ দেওয়া আছে; সন ১১৯১ সাল ১৪ কার্ত্তিক তারিখে ইহার লিখন সমাপ্ত হয়; ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা এই পুথি; উপস্থিত আমাদের গোচর-মতো ইহা-ই হইতেছে ভারতচন্দ্রের কাব্যের সব-চেয়ে প্রাচীন পুথি।

Augustin Aussaint ওগ্যুস্তঁ্যা ওসঁ্যা নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক চন্দননগরে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে ছিলেন, ইনি ফরাসী সরকারের বাঙ্গলা দোভাষীর কাজ করিতেন। ইহার সংকলিত ফরাসী-বাঙ্গলা অভিধান অমুদ্রিত অবস্থায় প্যারিসের বিব্লিওতেক্ নাসিওনাল-এ রক্ষিত আছে—এই অভিধানে বাঙ্গলা শব্দগুলি ফরাসী বানানে রোমান অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, 'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃঃ ১৩৬-১৩৭)। পুঁথিখানি ইনি-ই ভারতবর্ষ হইতে প্যারিসে লইয়া যান।

পুঁথিখানি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ২৫ বৎসরের মধ্যে লিখিত। সাধারণ অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গলা পুঁথি, একটু বড়ো আকারের লম্বা চওড়া পুথি। পত্র-সংখ্যা ৫০। পুঁথির আরম্ভে ফরাসী ভাষায় টানা হাতের লেখায় মন্তব্য লেখা আছে—**Calikkya Mongal on Biddya Choundour Oupoyekhyana —Mariage de Biddya et Choundour sous l'aprobation de Calikkya femme de la Divinité Chib, trié de l' Histoire de la ditte Divinité—coppié en 1784**; তদনন্তর, অন্য হাতে লেখা,

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী' বাঙ্গলা ১৩৪৫ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়।

Poème Bengali modern intitulé Vidyasundara ou les Amours de Vidyá et de Sundara. MS Bengaly d' Aussaint. অর্থাৎ, 'কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান—শিব দেবতার স্ত্রী কালিকার অনুমোদন অনুসারে বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ, উক্ত দেবতার ইতিহাস (বা পুরাণ) হইতে উদ্ধৃত, ১৭৮৪ সালে অনুলিখিত ; বিদ্যাসুন্দর অর্থাৎ বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম নামক আধুনিক বাঙ্গলা কাব্য,—ওস্যাঁর (আনীত) বাঙ্গলা পুঁথি'।

এই পুঁথির লেখা সর্বত্র গোটা-গোটা ও সহজপাঠ্য। ইহার আরম্ভ এইরূপ—"৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ। অথ অন্নপূর্ন্না ঠাকুরানির পুস্তক লিক্ষতে। কবি সক্তী শ্রী ভারথচরণ রায়। আঙ্গা শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়।" ইত্যাদি।

তদনন্তর "আল আমার প্রাণ কেমন লো করে না দেখি তাহারে॥" এই ছত্রশীর্ষক গান দিয়া পালা আরম্ভ হইয়াছে।

ইহার সমাপ্তি এইরূপ—"বিদ্যাসুন্দরে লইয়া কালিকা কৌতুকী হয়্যা কৈলাসেতে করিলা প্রবেস। কালিকা-মঙ্গল সায় : ভারথ ব্রাহ্মণে গায় : রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেস॥ ইতি কালিকামঙ্গল সমাপ্ত। সন ১১৯১ সাল তারিখ ১৪ কার্ত্তিক।"

এই পুঁথিখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্যারিসে বিশেষ উদ্বেগের সময় গিয়াছিল, আর নানা কাজে নকল করিবার সময় হয় নাই, সমস্তটার ফোটোগ্রাফ আনাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। প্রামাণিক সংস্করণের জন্য এই পুঁথি প্রাচীনতম বিধায় আমাদের মিলাইয়া দেখা দরকার। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের সর্বপ্রাচীন পুঁথিখানির তুলনায় বোধ হয় প্যারিসের এই পুঁথি খুব বেশি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইবে না।

ভারতচন্দ্রের পুঁথিগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার কাব্যের একটা নাম স্থির-নির্ধারিত হয় নাই। 'কালিকামঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর', 'কালিকাপুরাণ', এই রূপ বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। তবে 'অন্নদামঙ্গল' নামটি-ই সমধিক প্রচলিত ছিল। প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে এই নামই পাই।

আধুনিক সংস্করণে ভাষা অল্পবিস্তর আধুনিক রূপ পাইয়া বসিয়াছে, ১৭৮৪-এর পুঁথি সে বিষয়ে আমাদিগকে অনেকটা সংশোধন করিয়া দিবে। পুঁথির পাঠে দেখা যায়, এখনকার "মাথা খেতে এলি মোর" অষ্টাদশ শতকে ছিল "মাথা খাত্যি আল্যি মোর"। পুঁথির পাঠে দুই পাঁচটি শব্দও প্রাচীন রূপেই মিলিতেছে—ফরাসী **Hollandaise** 'ওলাঁদেজ্' হইতে বাঙ্গলা 'ওলন্দাজ', এই পুঁথিতে 'ওলন্দেজ' রূপে পাই। পুঁথিতে—এমন কি, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পরও যে সব

পুঁথি লিখিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে কোনও-কোনওটিতে—'ভারতচন্দ্র' এই নামটি বহুশঃ 'ভারথচন্দ্র' রূপে পাই। সংস্কৃতে ত-কার যুক্ত 'ভারত' রূপ-ই প্রচলিত; কিন্তু থ-কার-যুক্ত 'ভারথ'-রূপও প্রাচীন ভারতে কথ্য ভাষায়—যে ভাষার আধারে সাহিত্যিক সংস্কৃত গঠিত হইয়াছিল তাহাতে—বিদ্যমান ছিল; এই 'ভারথ' শব্দ, প্রাকৃতে 'ভারধ' ও 'ভারহ' রূপ গ্রহণ করে, এবং ইহা মধ্য-যুগে হিন্দী বাঙ্গলা প্রভৃতিতে 'ভারথ' রূপেই গৃহীত হয়। প্রাচীন বাঙ্গলায় প্রায় সর্বত্র 'ভারত' অপেক্ষা 'ভারথ' শব্দ-ই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—'মহাভারথ, ভারথ-পুরাণ' প্রভৃতি শব্দে। ভারতচন্দ্রের নামেও এই অসংস্কৃত রূপ হাতের লেখা পুঁথিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে—কেবল ছাপার সময়ে সংস্কৃত শুদ্ধ রূপই গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ভাষায় 'ভারত—ভারথ' এই দুই রূপের পাশাপাশি অবস্থান, একক বা বিশিষ্ট ব্যাপার নহে; চীনা ভাষায় রামায়ণের আখ্যানের তিনটি অনুবাদ হয়, তাহার দুইটিতে রাজা দশরথের নাম 'দশ-রথ' রূপেই আছে, অন্যটিতে 'দশ-রত' রূপে পাওয়া যাইতেছে; চীনারা সাধারণতঃ বড়ো বড়ো সংস্কৃত নাম চীনা অক্ষরে প্রতিবর্ণীকরণ দ্বারা জানাইত না, অনুবাদ করিয়া লইত; Ten-Chariots ('দশ-রথ'), এই রূপ অনুবাদের পার্শ্বে আবার Ten-Pleasures ('দশ-রত') অনুবাদ হইতে, 'দশ-রত' শব্দের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষে আর্য্য ভাষার আদি-যুগে 'ত' ও 'থ' প্রত্যয়দ্বয়ের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

ভারতচন্দ্রের শব্দসম্পদ্ বিশেষ লক্ষণীয়। বোধ হয়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র শব্দসংখ্যায় তুল্যমূল্য হইবেন। ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত বহু শব্দ মুদ্রিত পুস্তকে বিকৃত রূপে পাওয়া যায়; এগুলির পুরাতন বা যথাযথ রূপ পুঁথি দৃষ্টে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, শব্দগুলির ব্যাখ্যাও সহজ হইবে। অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গলা দেশের গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে, এই দেশের নাগরিকতার একমাত্র প্রকাশক ছিলেন কবি ভারতচন্দ্র। অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গলার সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে আশা করি মৌজুদ পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক অবলম্বন করিয়া শীঘ্রই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪৫।

বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুদিন-পোষিত প্রস্তাব এতদিনে বাঙ্গালা সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যম দ্বারা গৃহীত হইবে।—ছাত্রদিগকে ইংরেজি ছাড়া আর সমস্ত বিষয় বাঙ্গালা ভাষাতেই পড়িতে হইবে, তজ্জন্য বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বা অনূদিত হইবে। এই কার্য্য সহজ-সাধ্য করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষায় নানা বিজ্ঞানের পরিভাষা সংকলন ও প্রণয়ন করিতেছেন, নানা বিদ্যা ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরিভাষা বিশ্ববিদ্যালয় যথাসম্ভব শীঘ্র সাধারণ্যে প্রকাশ কবিবেন,—পাঠ্যপুস্তক যাঁহারা লিখিবেন তাঁহারা এই সকল পরিভাষা ব্যবহার করিবেন। ১৯৩৯ হইতে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া এই পরীক্ষা প্রথম প্রবর্তিত হইবে। বাঙ্গালার ন্যায় আর তিনটি ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্মান দিয়াছেন—হিন্দুস্থানী-ভাষার দুই রূপ হিন্দী ও উর্দুকে, এবং অসমিয়াকে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এইবার এমন একটি সংস্কার প্রবর্তিত হইল, যদ্দ্বারা বাঙ্গালীর মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে একটি ক্রান্তি বা যুগান্তর আসিবে। এই যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল, ইহাতে আমি আশা ও আনন্দের অনেক কিছু দেখিতে পাইতেছি। বিগত পনেরো-বিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর জীবনে একটা অবসাদ আসিয়াছে ; ঘরে ও বাহিরে উভয়ত্র তাহার মনে পরাজয়ের ভাব যেন স্থায়ী হইয়া বসিতেছে ; বাহিরের ও ভিতরের সংঘাত তাহার জীবনকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। এই সংঘাত তাহার পক্ষে নানা গুরুতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার শিক্ষা আর তাহার জীবনে কার্য্যকর হইতেছে না। শিক্ষার ফলে সে উৎসাহ ও কার্য্যশক্তি পাইতেছে না। তাহার বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি তাহাকে যেন ছাড়িয়া যাইতেছে—বিপরীত বুদ্ধি আসিয়া, তাহার অন্তকালই উপস্থিত, বহুস্থলে যেন এইরূপই সূচনা করিতেছে। বিদেশী ভাষার শিক্ষা পূর্বে প্রধানতম অর্থকরী বিদ্যা ছিল, বাঙ্গালী এই বিদ্যার সাধনায় দুই তিন পুরুষ পূর্বে অবহিত ছিল। এই বিদ্যা এখন আর অর্থকরী নাই,— অথচ গতানুগতিকতা হেতু সে এই বিদেশী ভাষারই মাধ্যম দ্বারা তাহার আবাল্য-শিক্ষার প্রণালী গঠিত করিয়া লইয়াছে। বিদেশী ভাষা শিখিতে তাহার আর তেমন প্রবৃত্তি নাই, তাহার জন্য এখন আর তেমন শ্রম-স্বীকারও নাই, কারণ তাহার অর্থকরতা সম্বন্ধে মোহ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। আবার

এদিকে তাহার আলোচ্য সমস্ত বিদ্যা ও জ্ঞান এই বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়াই হয় বলিয়া, এই ভাষার উপর পূর্ণ অধিকার অর্জন বিষয়ে তাহার অবহিত হওয়ার অভাবই তাহার বিদ্যা-আলোচনাকে পণ্ড করিয়া দিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রতিষ্ঠা হওয়ায়, একটা গৌরব-বোধের সঙ্গে যে বাঙ্গালার দিকে ঝুঁকিতেছে, ইংরেজির দিকে তেমন মন দিতে পারিতেছে না ; আবার ইংরেজি ভাষায় সমস্ত বিষয় তাহাকে পাঠ করিতে হয় বলিয়া, ভাষাজ্ঞানের অভাবে যথার্থ জ্ঞান-লাভ হইতে, এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য ও জীবন-যাত্রার পক্ষে লাভ-দায়ক তথ্যসমূহের ধারণা ও প্রয়োগ হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইতেছে। এইরূপ অনুচিত অবস্থার একমাত্র প্রতিষেধক মিলিবে—তাহার মাতৃভাষাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে।

এক কথায় বলিতে গেলে, আজ-কাল বাঙ্গালীর ছেলেরা না শিখিতেছে লেখাপড়া, না শিখিতেছে ইংরেজি ; জনৈক প্রাচীন ব্যক্তির মুখে আজকালকার শিক্ষার এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা শুনিয়াছিলাম। বাস্তবিক, ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বলিতে মুখ্যতঃ ইংরেজি-ভাষা-শিক্ষাই বুঝাইত। এই শিক্ষা-ই ছিল প্রধান সাধনা। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাকেই শিক্ষার মুখ্য পথ বলিয়া মনে করা, প্রাচীন শিক্ষাবীতির অনুমোদিত ছিল। ১৯০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম 'ঘটা করিয়া' বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রবর্তিত হইল। Arts-এর পাশে তাহার সমকক্ষ স্বরূপ Science-ও মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। এ যুগে Science-এর উপযোগিতা সকলকেই মানিতে হইতেছে ; এতদ্ভিন্ন, দেশের উন্নতির জন্যও বিজ্ঞানের দরকার। সুতরাং নিছক সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসের চর্চার অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা আর রহিল না, সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যেরও সমাদর কিছু পরিমাণে কমিল। বাঙ্গালীর জীবনে আর ভালো করিয়া ইংরেজি জানিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক,—'কাজ-চালানো-গোছ' ইংরেজি হইলেই যথেষ্ট—সাধারণ্যে এইরূপ একটা ধারণা আসিয়া গেল ; বিশেষতঃ যখন ভালো ইংরেজি শিখিলেও সরকারি ও অন্য চাকুরি পাওয়া যায় না। শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার আবশ্যকতা সকলে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন। বাঙ্গালা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ আমাদের চক্ষুর সমক্ষে একটি নূতন দৃষ্টিকোণ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

বাঙ্গালীর শিক্ষায় তাহার মাতৃভাষার স্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কার্য্যে স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ প্রথম চেষ্টা করিলেন।

১৯০৭ সালে প্রবর্তিত নূতন বিধি অনুসারে বী-এ ও আই-এস্-সী পরীক্ষা পর্য্যন্ত মাতৃভাষা অবশ্য-পঠনীয় বিষয়-রূপে ধার্য্য হইল, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইতিহাস-বিষয়ে উত্তর-লিখনে মাতৃভাষার ব্যবহার ঐচ্ছিক করা হইল। ইহাতে আর কিছু না হউক, মাতৃভাষার চর্চার দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার স্থান হইল। ১৯১৯ সালে ভারতীয় আধুনিক ভাষায় এম-এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হইল, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য লইয়া আলোচনা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত হইল। আশুতোষ ইহা অপেক্ষা আরও কিছু করিতে চাহিয়াছিলেন—প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা পর্য্যন্ত মাতৃভাষার সাহায্যেই সম্পন্ন করাইবার অভিলাষ তাহার ছিল,—প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাতৃভাষার প্রয়োগ আবশ্যিক-করণের জন্য প্রারম্ভিক প্রয়াসেরও তিনি সূত্রপাত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার আরব্ধ কর্ম কয়েক বৎসরের জন্য অসমাপ্ত রহিয়া গেল। আজ প্রায় দশ বৎসর পরে, আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র, উৎসাহশীল কর্মী ও কৃতী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারত্বের (অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গদেশের ও আসামের উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের) গুরুভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া, পিতার আরব্ধ সংস্কার-কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। এই কার্য্যের জন্য আমাদের তরুণ ভাইস-চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদের নাম বাঙ্গালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, বাঙ্গালী চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার সাধুবাদ করিবে। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা এই কামনা করি, বাঙ্গালীর শিক্ষার এই নবযুগের আবাহন যেন তাঁহারই নেতৃত্বে ও পরিচালনায় বাঙ্গালীর জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া যেন তাহা সার্থক হয়, বাঙ্গালীকে যেন সর্বতোভাবে কল্যাণের পথে আগাইয়া দেয়।

মাতৃভাষায় শিক্ষা হইলে, আমাদের প্রথম লাভ হইবে—সাধারণ ছেলেদের পক্ষে জ্ঞান অর্জনের পথ সহজ হইবে, অল্পেই তাহাদের বুদ্ধি খুলিবে। মাতৃ-ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষায় কোনও ফাঁকি চলিবে না। শিক্ষক হয়তো অনভিজ্ঞ, তায় আবার ইংরেজি ভাষায় লেখা বই, বা ইংরেজি ভাষা আশ্রয় করিয়া ব্যাখ্যা; ছাত্রও সব সময়ে এই ভাষা ভালো করিয়া বুঝে না, এবং বুঝে না বলিয়াই ভয়ে চুপ করিয়া থাকে। ফলে, 'গুরু বোব সে শীশা কাল'—গুরু হইলেন বোবা, আর শিষ্য কালা; বিদ্যাদান হইয়া থাকে, 'কালেঁ বোব-সম্বোহিঅ জৈসা'—কালার সঙ্গে বোবার আলাপ যেমন। কিন্তু মাতৃভাষায় বই পড়িয়া মাতৃভাষায় ভাবপ্রকাশ

করিবার উদ্দেশ্য লইয়া শিখিতে আরম্ভ করিলে, ছাত্রেরা বুঝিবার বয়স হইতেই সহজেই বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের জ্ঞানলাভ হইতেছে কি না; তাহাদের চিন্তাপ্রণালী মার্জিত হইবে, শিক্ষার আনন্দ তাহারা পাইবে; শিক্ষা তাহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিবে, শিক্ষা সত্য-সত্যই তাহাদের মনের খোরাক যোগাইবে। এখন যে শিক্ষা ছেলেরা পায়, তাহাতে সামান্য একটু মুখস্থ-করা বিদ্যা হয় মাত্র; ছেলেরা ইস্কুল-কলেজ ছাড়িলেই যত শীঘ্র সম্ভব অধীত বিদ্যা ভুলিয়া যায়, মনে যেটুকু ছাপ পড়ে, তাহা নিতান্ত উপর-উপর পড়ে। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি—বাল্যাবস্থায় বরাবরই আমরা 'উচ্চ ইংরেজি ইস্কুল'-এ পড়িয়াছিলাম—ইস্কুলে পড়িবার কালে, যেসব ছেলে বাঙ্গালা বা 'মধ্য-ইংরেজি' ইস্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি ('মাইনর') পরীক্ষা দিয়া আমাদের ইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে (আজকালকার শ্রেণীবিভাগ অনুসারে সপ্তম শ্রেণীতে) ভরতি হইত, তাহারা এক ইংরেজি ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ে আমাদের চেয়ে চৌকস ছিল; গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃত এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালায় তাহারা সহজেই আমাদের চেয়ে ভালো করিত। আমরা ঠকিয়া যাইতাম, হারিয়া যাওয়ার রাগটুকু আমাদের ইংরেজির বিদ্যা জাহির করিয়া মিটাইবার চেষ্টা করিতাম। উচ্চ-ইংরেজি ইস্কুলে আগাগোড়া পড়িয়াছে এমন ছেলেদের চেয়ে ছাত্রবৃত্তি-পাস-করা ছেলেরা সাধারণ জ্ঞানে ভালো হইত—তাহার কারণ এই ছিল যে তাহাদের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা-গ্রহণ মাতৃভাষার মধ্য দিয়া হইত বলিয়া সমস্তটাই স্বচ্ছন্দভাবে হইত, কোথাও বিদেশী মাধ্যমের অবস্থিতির জন্য আড়ষ্ট ভাব আসিতে পারিত না। আমার মনে হয়, মধ্য- ইংরেজি বা বাঙ্গালা ইস্কুলের সংখ্যা কমাইয়া, তাহাদের স্থানে উচ্চ-ইংরেজি ইস্কুলের সংখ্যা বাড়ানো আমাদের জাতীয় শিক্ষার পক্ষে অনুকূল হয় নাই; ইংরেজির মোহে পড়িয়া যথার্থ জ্ঞান-অর্জনের পথ আমরা সংকুচিত করিয়াছি—আমরা 'সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরা' দিয়া আসিয়াছি। বিধাতার আশীর্বাদে আমাদের সুবুদ্ধি হইয়াছে। এখন মাতৃভাষার মধ্য দিয়া প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা-কার্য্যের বিধি প্রবর্তিত হওয়ায়, 'মাইনর' ইস্কুলগুলি আবার নবজীবন লাভ করিবে। বাঙ্গালী শিক্ষা-বিস্তারে পশ্চাৎপদ নহে; উচ্চশিক্ষার জন্য নূতন উন্নত বিদ্যালয়ের চাহিদা সারা বাঙ্গালায় সর্বত্র আছে। উচ্চ-শিক্ষার বিদ্যালয় খোলা সর্বত্র হয়তো সম্ভব হইবে না, কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থায় সারা বাঙ্গালা দেশে আরও শত শত 'মাইনর' বা বাঙ্গালা ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে কোনও বিশেষ অন্তরায় হইবে না। এই সকল 'মাইনর' ইস্কুল, পূর্বের চেয়ে আরও বেশি উৎসাহ লইয়া,

উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে গিয়া প্রবেশিকা-পরীক্ষার জন্য পড়িবে এমন ছেলেদের তৈয়ার করিয়া দিবে—মোটের উপর বেশ পাকাভাবে বহু সহস্র বাঙ্গালী ছেলে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া ভালো রকম শিক্ষাই পাইতে থাকিবে।

অনেকে হয়তো এইরূপ আশঙ্কা করিবেন, প্রবেশিকা পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা প্রচলিত হইলে আমাদের দুইটি হানি হইবে—[১] আমাদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা কমিয়া আসিবে—তাহাতে আধুনিক বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইবে ; অন্যদিকে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোকেরা (যেমন বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ) ইংরেজি শিক্ষায় আরও অগ্রসর হইতেছে, বাঙ্গালার ছেলেরা কম ইংরেজি শিখিবে এবং সেই কারণে সরকারি চাকুরি এবং অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে ইংবেজিতে জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক সেই সব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অন্য প্রদেশের লোকেদের কাছে হঠিয়া আসিবে ; ইংরেজি জানার দরুন বাঙ্গালীব যেটুকু প্রতিপত্তি আছে সেটুকু বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হইবে। [২] দ্বিতীয় হানিব সম্ভাবনা এই যে, প্রবেশিকা পর্য্যন্ত ছেলেরা তো বাঙ্গালায় সব কিছু পড়িল, সব কিছু বুঝিল, কিন্তু তাহার পরে কলেজে ঢুকিয়াই তাহারা অকূল পাথারে পড়িবে,—সমস্ত বিদ্যা তাহাদিগকে ইংরেজি ভাষার মারফত শিখিতে হইবে, ভবিষ্যৎ জ্ঞানালোচনায় যখন তাহাদের ইংরেজিরই সাহায্য লইতে হইবে, তখন প্রবেশিকা পর্য্যন্ত আলোচিত বাঙ্গালা ভাষায় নিবদ্ধ পরিভাষা ইত্যাদি অতঃপর তাহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে না।

এই দুইটি আপত্তি-ই অমূলক।

প্রথমতঃ, নূতন বিধি অনুসারে ইংরেজিকে বাদ তো দেওয়া হইবে না, বরঞ্চ ইংরেজি যাহাতে আরও ভালো করিয়া শিখানো হয় তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। এ কথা সত্য যে, উচ্চশিক্ষার জন্য আমরা ইংরেজি বাদ দিতে পারি না। ইংরেজি এখন খালি ইংলাণ্ডের ভাষা নয় ; বিশ্ব-সভ্যতার প্রধানতম বাহনস্বরূপ ইংরেজি ভাষা এখন বিশেষ জাতি ও দেশের বহু উর্ধ্বে উন্নীত হইয়াছে, জগতের শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে, ভাবী বিশ্বমানবের প্রধান ভাষা হিসাবে ইংরেজি এখন সকলেরই আলোচ্য। ছেলেদের মাতৃভাষার ভিতর দিয়া বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার পথ করিয়া দিলে, তাহাদের বোঝা হালকা হইয়া যাইবে, তখন তাহারা ইংরেজি ভাষার জন্য বেশি সময় দিতে পারিবে, ইংরেজির জন্য বেশি শ্রম করিতে পারিবে। মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্য দিকে সহজ হইলে, ইংরেজি শিক্ষাও সহজ হইবে। এতদ্ভিন্ন, জীবনে কয়জন ছাত্রের পাকা ইংরেজি জ্ঞানের আবশ্যক

হয়? যে দুইচারি জন মেধাবী ছাত্র প্রতি শ্রেণীতেই থাকিবে, ইংরেজিতে ভালো দখল থাকা দরকার এমন পেশার দিকে যাহাদের লক্ষ্য থাকিবে, তাহারা ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করিতে বেশি করিয়া যত্নপর হইবে; অন্য সাধারণ ছাত্রের সেদিকে ততটা জোর দিবার অবশ্যকতা নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত যেটুকু ইংরেজি শিখানো হইবে, কলেজে ঢুকিয়া তাহার সাহায্যে সহজেই ছেলেরা বিভিন্ন বিদ্যায় উচ্চ-জ্ঞান লাভের জন্য অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবে। ইস্কুলে বাঙ্গালায় যাহা পড়িবে, বাঙ্গালায় যে-সব পরিভাষা শিখিবে, আবশ্যক-মতো সে সব বিষয় এবং সে সব বিষয়ের পরিভাষা ইংরেজিতে আয়ত্ত কবিয়া লওয়া এমন কিছুই কঠিন ব্যাপার হইবে না। মনস্বী শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতি যে ভাবে বাঙ্গালায় পরিভাষার সংকলন করিতেছেন, তাহাতে বাঙ্গালা ছাড়িয়া ইংরেজিতে পঠন আরম্ভ করিবার সময় ছাত্রদের বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। লাভের মধ্যে, বিজ্ঞানের বহু পারিভাষিক শব্দ মাতৃভাষায় তাহাদের জানা থাকিবে, ভবিষ্যতে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া জ্ঞান-প্রচারের ও জ্ঞান-বর্ধনের কার্য্যে তাহারা যোগ্যতা অর্জন করিবে।

আমার নিজের দেখা, মাতৃভাষায় যথার্থ শিক্ষা হইলে, একটি বিদেশী ভাষা দখল করিয়া লইতে বেশি কষ্ট হয় না। বিলাতে অবস্থানকালে দেখিয়াছি— আমাদের ছাত্রাবাসে রুমানিয়ান, রুষ, যুগোশ্লাব ছাত্র আসিত। এইরূপ নবাগত ছাত্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ এক টেবিলে বসিয়া আহারের কালে—তখন সে একবর্ণও ইংরেজি জানিত না, আমার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ফরাসি বা জর্মানের সাহায্যে তাহার সঙ্গে প্রথম আলাপ হইত। এই সব ছাত্র ১৮।২০ বৎসর বয়সের, দেশে কেবল মাতৃভাষাতেই শিক্ষালাভ করিয়াছে, ইস্কুলে উচ্চ শ্রেণীতে পড়িবার কালে একটি বিদেশী ভাষা ধরিয়াছিল, তা সে বিদেশী ভাষাটি ইংরেজি নহে। অথচ তিন মাসের মধ্যেই এই-সব ছেলে খাসা ইংরেজি বলিতে ও লিখিতে শিখিয়া ফেলিত। অবশ্য ইংলাণ্ডে ইংরেজিভাষীদের মধ্যে বাস করায় এত শীঘ্র এ ব্যাপার সম্ভব হইয়াছিল; কিন্তু আমি এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি, ভালো ভাবে মাতৃভাষায় সাধারণ শিক্ষা পাইয়া যে ছেলের বুদ্ধিবৃত্তির সুপরিচালনা হইবে, ইংরেজিতেও সে কাঁচা থাকিবে না। দুই চারি বছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় নূতন বিধি চলিলে পরে আমার এই বিশ্বাসের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না।

বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা তো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এক রকম প্রবর্তিত হইল; আশা করা যায়, বাঙ্গালা ভাষার চর্চার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

যথানিয়মে হইবে। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে চলিতে হয়। কিন্তু এই বিষয়ে সাধারণের মধ্যে মতানুকূল্য এবং সহযোগিতা অপেক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার মারফত শিক্ষার নিয়ম হইতেছে—ইহাতে কেহ কেহ ক্ষুব্ধ, অনেকে নিরপেক্ষ,—অনেকে আবার হর্ষপ্রকাশও করিতেছেন। যাঁহারা ক্ষুব্ধ বা নিরপেক্ষ, মাতৃভাষা সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারা যায়; তাঁহারা মাতৃভাষার প্রতি তাদৃশ আস্থাশীল নহেন। তাঁহাদের মত পরিবর্তন করাইবার বা তাঁহাদের মনে মাতৃভাষার প্রতি আস্থা জন্মাইবার প্রয়াস এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। যাঁহারা মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবান্, মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থায় যাঁহারা আনন্দিত, তাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া দুইটি কথা বলিব।

জাতি বড়ো না হইলে তাহার ভাষা ও সাহিত্য বড়ো হয় না। বড়ো অর্থে, নৈতিক গুণে বড়ো। আমরা অনেকে এখন বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের গৌরব সম্বন্ধে একটু বেশি করিয়া সচেতন হইয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক কি আমরা সমবেত ভাবে সে গৌরব রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকি? মাতৃভাষাকে কি আমরা সত্যসত্যই প্রাণ দিয়া ভালোবাসি? তাহার শিক্ষা ও আলোচনার জন্য আমরা কি যথোচিত পরিশ্রম করি, যাহাতে তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়, তাহার বিশুদ্ধি যাহাতে রক্ষা পায়, তদ্বিষয়ে আমরা কি চেষ্টা করিয়া থাকি? না, সাধারণতঃ মাতৃভাষা সম্বন্ধে বড়োগলা করিয়া আমরা যাহা প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা কেবল কথার কথা মাত্র? আমার মনে হয়, একদিকে আমরা যেমন 'জননী বঙ্গভাষা' বলিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া ভাবাবেগে দশায় পড়ি, নানা প্রকারের কবিত্ব করি, তেমনি অন্য দিকে এই ভাষা সম্বন্ধে আমরা কোনও কষ্ট স্বীকার করিতে বা চিন্তা করিতে প্রস্তুত নহি। সেই সত্তর বৎসর পূর্বে 'হুতোম পেঁচার নক্শা'য় কালীপ্রসন্ন সিংহ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখনও বাঙ্গালা ভাষা ও তাহার লেখকদের অনেকের সম্বন্ধে খাটে; বাঙ্গালা ভাষা এখনও যেন বেওয়ারিস একতাল ময়দা-মাখা, ছোটো ছেলের হাতে এই ময়দার তাল পড়িলে যেমন হয়, বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা সেইরূপ। অনেক লেখক-ই ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন, ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে নিরঙ্কুশ। তাঁহাদের ভাবটা এইরূপ—দয়া করিয়া তাঁহারা মাতৃভাষায় পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা যাহা লিখিবেন লোকে তাহাই মাথা পাতিয়া লইবে; বিশেষতঃ যদি তাঁহারা সংবাদপত্রের লেখক হন, তাহা হইলে তাঁহাদের লেখা লোকে মানিয়া লইতে বাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে উপদেশ রমেশচন্দ্রকে দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ তাঁহারা

নিজেদের পক্ষেও প্রযোজ্য বলিয়া মনে করেন ;—'তুমি যাহা লিখিবে, তাহাই ভালো বাঙ্গালা হইবে, এবং লোকে তাহাই গ্রহণ করিবে', এই রকম একটা কথা বলিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্রকে মাতৃভাষায় উপন্যাসাদি লিখিতে প্রণোদিত করিয়াছিলেন, শুনা যায়।

বাঙ্গালার লেখকদের অনেকেই নিজেদের দায়িত্ব বুঝেন না। যেমন বানান বিষয়ে :—এটি ভাষালিখনের প্রথম সোপান। চলিত ভাষার, বাঙ্গালা তদ্ভব বা প্রাকৃতজ এবং বিদেশী শব্দের বানান যাঁহার যেমন খুশী তিনি তেমন লিখিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বানান একটা ধরা-বাঁধা পদ্ধতি অনুসারে ছাপাইবার জন্য বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে চেষ্টা পূর্ণরূপে ফলবতী হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের বইগুলির আলাহিদা-আলাহিদা সংস্করণে যে বানান অনুসৃত হইয়াছে, তাহা খুবই সমীচীন, খুবই যত্নের সহিত সেই সংস্করণের প্রুফ দেখা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পাক-প্রণালী' প্রভৃতি পুস্তকের বাঙ্গালা বানানেও বিশেষ অবধান-শীলতা দেখা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে যেন সাধারণ লেখকেরা চিন্তা বা রীত্যনুসারিতার কোনও প্রয়োজন মানেন না। কোন্ বানান অনুসরণ করা উচিত তাহা ভাবিয়া বিচার করিয়া দেখিবার কষ্টটুকু কেহ স্বীকার করিবেন না। অথচ গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া সকলে মাতৃভাষার প্রতি প্রীতি প্রকট করিবেন। চিন্তা করিবার ভার—দুই চারিজন হতভাগ্য ভাষাতাত্ত্বিকের উপর ; তাঁহাদের নির্দেশ লইয়া মজলিসী 'বোট্‌কিরা' করাটাও ইহাদের নিকট উপভোগ্য।

আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিলে, আমরা সব দিক সমঝিয়া চলিতাম। অনাবশ্যক ভাবে বিদেশী শব্দ ব্যবহারে যে একটা মানসিক দৈন্য, একটা জাতীয়তাবোধের অভাব আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা সেদিক হইতেও জিনিসটির প্রতি দৃষ্টিপাত করি না। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে রাস্তার নামগুলি যেমন ইংরেজিতে দেওয়া হয়, তেমনি বাঙ্গালাতেও দেওয়া হইবে। তখন আমি 'কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট' পত্রের মারফৎ একটি প্রস্তাব করিয়া পাঠাই [দ্রষ্টব্য *Street Names in the Vernacular,* **Calcutta Municipal Gazette, Vol v, No 5, December 18, 1926, P 227, 229**]—নামগুলি কেবল বাঙ্গালা অক্ষরে প্রত্যক্ষরীকৃত না হইয়া, বাঙ্গালা ভাষায়ও যেন অনূদিত হয়। অর্থাৎ, বাঙ্গালা অক্ষরে 'কর্নওয়ালিস স্ট্রীট', 'হ্যারিসন রোড', 'মদন মিত্র

লেন', 'চিত্তরঞ্জন আভেনিউ' না লিখিয়া, 'কর্নওয়ালিস সড়ক', 'হারিসন রাস্তা', 'মদন মিত্রের গলি', 'চিত্তরঞ্জন বীথি'—এই রূপে যেন লেখা হয়। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালার বাহিরে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে অনুবাদেরই রীতি দেখিয়াছি; বোম্বাইয়ের রাস্তায় নাম-ফলকে ইংরেজিতে লেখা **Hornby Road**, তলায় দেবনাগরীতে লেখা 'হোর্ণবি রাস্তা'; মির্জাপুরে তেমনি **New City Road** এই ইংরেজি নামের নীচে দেবনাগরী ও ফার্সী হরফে হিন্দী ও উর্দুতে লেখা আছে, 'নয়া শহর সড়ক'। ভারতের বাহিরে এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের যে সব দেশে রাস্তার নাম-ফলকে একাধিক ভাষা প্রযুক্ত হয়, সে সব দেশে সর্বত্রই অক্ষর (যেখানে অক্ষর আলাহিদা) এবং ভাষা দুই-ই পৃথক থাকে; যেমন আয়র্লাণ্ডে—ইংরেজিতে **Dawson Street**, আইরিশ ভাষায় **Srad Dasuin**; গ্রীসে, গ্রীকে **Plateia Homonoia**, ফরাসিতে **Place de la Concorde**; মিসরে, আরবীতে **Sharia Abd al-Aziz**, ফরাসিতে **Rue Abdelaziz**; ইত্যাদি। **Esplanade, Square, Place, Tank, Circus** প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ যখন কলিকাতারই অধিবাসী, তাঁহাকে অনুরোধ করিলে এই সব শব্দের শোভন ও সুখোচ্চার্য্য অনুবাদ আমরা পাইতে পারি, এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের নাম-ফলকে সেই সব বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহৃত হইলে, লোকে অনাবশ্যক ভাবে আর 'স্ট্রীট', 'রোড', 'লেন', 'স্কোয়ার', 'সার্কাস' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিবে না; আর আমার মনে হয়, এইরূপ বাঙ্গালা নাম বাঙ্গালা অক্ষরে দেখিলে, বাঙ্গালী জনসাধারণের আত্মসম্মান-বোধ বাড়িবে বই কমিবে না। কিন্তু আমাদের **City Fathers**—শহরের মা-বাপ কাউন্সিলরগণ—অন্য রকম মনে করেন। আমার প্রস্তাবের কথা শুনিয়া একজন **City Father**—দেশ-হিতৈষণায়, স্বরাজের আকাঙ্ক্ষায় ইনি কাহারও চেয়ে কম নন—আমায় বলিলেন—"দেখুন **Dr. Chatterji**, এই যে 'রাস্তা, সড়ক, চত্বর' প্রভৃতি বাঙলা কথা রাস্তার **name-plate**-এ বসাবার কথা ব'ল্‌ছেন—এ-সব **philological prank** আর আমাদের উপর **inflict** ক'র্‌বেন না,—আমাদের শান্তিতে ম'র্‌তে দিন, তার পরে এ সব যত খুশী চালাবেন।" কর্পোরেশনের কর্তারা বোধ হয় এইরূপ মনোভাবের অনুমোদন করেন; নহিলে তাঁহারা 'স্ট্রীট, লেন, রোড' প্রভৃতি ছাড়া, 'চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, মুখার্জি', এই সব বিকৃত বাঙ্গালা রূপ নাম-ফলকে নিরঙ্কুশভাবে দিবেন কেন? বাঙ্গালা ভাষার প্রতি দরদ তাঁহারা দেখাইয়াছেন, 'চৌরঙ্গী' এই বাঙ্গালা

নামটিকে ইংরেজি কদুচ্চারণ-ঘটিত ইংরেজি বানান Chowringhee-র অনুসরণ করিয়া 'চৌরিংঙ্গী' এই অভূতপূর্ব বর্বর রূপে লিখিয়া।

'চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়'-স্থানে চলিত রূপ 'চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, মুখুজ্যে'-র ইংরেজি বিকৃত রূপের বাঙ্গালা বিকারকে সংবাদপত্রের লেখকেরাও সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন—মাতৃভাষার পক্ষে মুখ-ভেঙ্গচানো উচ্চারণ ও বানান 'চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, মুখার্জি' ইহাদের দিয়া বর্জন করানো যাইতেছে না; সুখের বিষয়, ইঁহারা এখনও রবীন্দ্রনাথকে 'টেগোর-কবি' বলিতে আরম্ভ করেন নাই, এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে 'ডক্টর রে' রূপে লিখিতে আরম্ভ করেন নাই; 'দত্ত, মিত্র' ইহাদের মহিমায় বাঙ্গালা অক্ষরে 'চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, মুখার্জি'-র দেখাদেখি 'ড্যাটা (বা ডাট্), মিটার' এখনও হন নাই। খাঁটি বাঙ্গালা নামগুলিকে ইহারা বাঙ্গালা লিখিবার কালে এইভাবে বধ করেন; আবার ওদিকে দিনের পর দিন, যাহার প্রাচীন নাম ছিল 'অজয়মেরু', সেই চিরপরিচিত 'আজমীর' বা 'অজমের' নগরকে 'আজমীঢ়' রূপে লিখিয়া চলিয়াছেন,—এটুকু খেয়াল নাই যে 'অজমীঢ়' কোনও স্থানের নাম নহে, পৌরাণিক রাজার নাম। চারিদিক হইতে যদি বাঙ্গালা ভাষার চর্চা, বাঙ্গালা ভাষায় লেখা এইরূপ খোশ খেয়ালের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, মাতৃভাষার চর্চায় যদি আমরা এইরূপ অনবধানতার পরিচয় সর্বত্রই দেই, তাহা হইলে ইস্কুলের শিক্ষা এই অপকারের কতটুকু প্রতিরোধ করিবে? এই প্রকারের ছোটো বড়ো কত শত বিষয়ে আমাদের পত্র-পত্রিকায় ও অন্য সাহিত্যে যে আমরা আমাদের মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহা বলিতে গেলে একাধিক দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা চলিলে, এবং বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার সময়ে বিশেষ সমীক্ষা ও অবধানতার সহিত চলিলে, আমার আশা হয়, বাঙ্গালীর চিত্তে অত্যন্ত আবশ্যক discipline বা চর্য্যাশীলতা আসিবে; তাহার মনে একটা আত্মসম্মানবোধও জাগিবে।

পোর্তুগীসেরা আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ অতিক্রম করিল, তাহাদের আশা হইল, এইবার তাহারা ভারতবর্ষে পৌঁছিবে; তাই আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে যে অন্তরীপ পার হইয়া তাহাদের জাহাজ মোড় ফিরিল, সেই অন্তরীপের নাম তাহারা নিজ ভাষায় দিল—Capo da Boa Esperanza. ইংরেজেরা নিজ ভাষায় এই নামের অনুবাদ করিল--Cape of Good Hope; ফরাসীরা

করিল—Cap de Bonne Esperance; জর্মানেরা করিল—Kap der Guten Hoffnung; বাঙ্গালায় আমরা কেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ' বলিব না? গ্রীকেরা আরবদেশ ও মিসরের মধ্যে অবস্থিত সাগরের নাম দিয়াছিল—Eruthrē Thalassa; তাহার ইংরেজি অনুবাদ হইল Red Sea, ফরাসিতে Mer Rouge, জর্মানে Rotes Meer; বাঙ্গালায় অবশ্যই 'লোহিত সাগর' বলিব। চীনারা নিজ দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত সাগরাংশকে Hwang Hai বলে, ইংরেজি অনুবাদে Yellow Sea, জর্মানে Gelbes Meer, ফরাসিতে Mer Jaune; বাঙ্গালায় 'পীত সাগর' না বলিয়া আর কী বলিব? অন্ততঃ শতখানেক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালায় 'রুস' শব্দ চলিয়া আসিতেছে,—'রুষ দেশ, রুষ জাতি'; রুষেরা নিজেদের বলে Rus 'রুষ'। মূলের অনুসারী এই পুরাতন ও জোরালো বাঙ্গালা রূপটি ছাড়িয়া হঠাৎ কিসের মোহে আমরা ইংরেজির দেখাদেখি 'রাশিয়া' বা 'রাশ্যা' লিখিতে যাই? সহজেই যখন 'দশমিক, ভগ্নাংশ, গ-সা-গু, ল-সা-গু, বীজগণিত, পদার্থবিদ্যা, অজৈব রসায়ন' প্রভৃতি বহু বহু শব্দ ইস্কুলে পড়িয়া মাতৃভাষা প্রয়োগের কালে মুখে বলিতে বাঙ্গালীর ছেলে আর বাধো-বাধো বোধ করিবে না, তখন সে আমাদের City Father-দের মতো 'কর্নওয়ালিস সড়ক', 'চিত্তরঞ্জন বীথি', 'গড়-চত্বর' (Esplanade), 'উত্তর চিৎপুর রাস্তা' বলিতে সংকোচ বোধ করিবে না,—মাতৃভাষার শব্দ প্রয়োগ করাকে সে philological prank মনে করিবে না; এবং সে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিককে 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' অথবা 'বঙ্কিম চাটুজ্যে' না বলিয়া 'বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি' বলা রূপ ভাষাগত অশিষ্টতা ও অভব্যত্য প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইবে।

পরমেশ্বর আমাদের সেই শুভদিন দিন, যেদিনে আমাদের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়া যথার্থ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধভাবে মাতৃভাষা বলিতে ও লিখিতে আনন্দ পাইবে, মাতৃভাষার প্রতি যথার্থ ভালোবাসা তাহাদের মনে জন্মিবে এবং এই ভালোবাসা জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সব বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতাতে, অনুসন্ধিৎসায়, শ্রমশীলতায় ও ভাবশুদ্ধিতে প্রকাশ পাইবে॥

আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৪১।
সামান্য বর্জন ও সংশোধন অন্তে পুনর্মুদ্রিত।

বাঙলা ভাষার শব্দ

মানুষের কণ্ঠ, মুখ-বিবর আর নাসিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করার নাম-ই 'ভাষা'। একটি ধ্বনি দিয়ে অথবা একাধিক ধ্বনি মিলিয়ে, এক-একটি বিশেষ ভাব জানাবার জন্য 'শব্দ' তৈরী হয়, আর কতকগুলি শব্দ একত্র ক'রে হয় 'বাক্য'। 'ভাষা' ব'ল্‌লে, সাধারণতঃ কথাবার্তায় বা লেখায় যে-সমস্ত শব্দময় বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাকেই আমরা বুঝে থাকি। "আমি", "এখন", "বাঙলা", "ভাষায়", "কথা", "কইছি"—এই পাচটি হ'ল পাঁচটি বাঙলা শব্দ, শব্দ-হিসাবে এগুলির অবশ্য পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পৃথক্ শব্দ ধ'রে ধ'রে ভাষা হয় না। শব্দগুলিকে একত্র ক'রে একটি প্রস্তাবে গেঁথে সাজিয়ে ব'ল্‌লে, তবে বাঙলা ভাষার একটি অর্থময় বাক্য হ'ল—"আমি এখন বাঙলা ভাষায় কথা কইছি।" বিভিন্ন, আলাদা-আলাদা অবস্থিত গাছের সমষ্টি নিয়েই বন, তেমনি বিভিন্ন শব্দ, যা পৃথক্ পৃথক্ ভাষায় বিদ্যমান, তা নিয়েই ভাষা। 'শব্দ' ভাষা নয়, শব্দ হ'চ্ছে ভাষারূপ দেহের অঙ্গ। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সুস্থ, পুষ্ট আর সুন্দর হ'লেহ দেহের সৌষ্ঠব আর সৌন্দর্য্য সম্ভবপর হয়। সেই জন্য দেখা দরকার, ভাষার শব্দ-সম্পদ কী ধরনের, শব্দগুলি যথাযথ ভাব-প্রকাশের উপযোগী কি না, সেগুলি সহজ আর সুন্দর, সুখোচ্চার্য্য আর শ্রুতি-মধুর কি না। শব্দের শক্তি আর সৌন্দর্য্য, দুই-ই বিচার ক'র্‌তে হয়।

শব্দ হ'চ্ছে মানুষের মনের ভাব বা চিন্তার ধ্বনিময় প্রকাশ। সেইজন্য, সহজেই এ কথাটি আমরা বুঝ্‌তে পারি যে, যেখানে মানুষের মন হ'চ্ছে নানাপ্রকার সুন্দর ভাব বা উচ্চ-চিন্তার ক্ষেত্র, সেখানেই তার ভাষার শব্দ নানাবিধ ভাবের ও চিন্তার প্রকাশের উপযোগী হ'তে বাধ্য। এক কথায়, জাতির মানসিক সভ্যতা আর সংস্কৃতি, তার বিজ্ঞান, দর্শন আর সৌন্দর্য্য-বোধের উপরেই তার ভাষার ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠিত—তার ভাষার শব্দের স্থূল সূক্ষ্ম নানা অর্থ বা অর্থভেদকে প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। সুসভ্য প্রাচীন ভারতীয়, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন চীনা জাতি, মধ্য-যুগের আরবী-ভাষী জাতি, আধুনিক ইউরোপের ইংরেজ, ফরাসী, জর্মান, রুষ প্রভৃতি নানা জাতি, সভ্যতার অত্যন্ত উচ্চ স্তরে উন্নীত হ'য়েছিল বা হ'য়েছে, এইজন্য এদের ভাষাগুলি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ভাষার আসন প্রাপ্ত হ'য়েছে, এদের ভাষার শব্দ এমন সুন্দর আর সার্থক, নিখুঁতভাবে উদ্দিষ্ট ভাব বা অর্থের প্রকাশক, এদের ভাষার শব্দগুলি বাগ্মিতা-গুণে এমন ভরপুর

যে সেই-সব শব্দ এদের চেয়ে অনুন্নত অন্য নানা-জাতির ভাষার সার্থক শব্দের অভাব পূরণ ক'রে এসেছে—সংস্কৃত, গ্রীক, চীনা, আরবী, ইংরেজি, ফরাসি, জর্মান, রুষ প্রভৃতি ভাষার শব্দ তাদের নিজ গুণেই নানা ভাষা কর্তৃক সাদরে (কোথাও বা স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত শব্দ রূপে, কোথাও বা নিরুপায়ে আবশ্যিকভাবে একমাত্র শব্দ রূপে) গৃহীত হ'য়েছে আর হ'চ্ছে। সুতরাং শব্দের আলোচনায় **back-ground** বা পটভূমিকা রূপে আমাদের সর্বদা মনে রাখ্‌তে হবে, জাতির সংস্কৃতির ক্ষেত্র কত দূর বিস্তৃত, তার সাংস্কৃতিক জীবন কত গভীর কত উচ্চ।

কোনও ভাষার শব্দের আলোচনা দুই দিক থেকে ক'র্‌তে পারা যায়; আর এই আলোচনার সাহায্যেই ভাষার শব্দের শক্তির বিচার-বিশ্লেষণ সহজ হয়। প্রথম দিক হ'চ্ছে দার্শনিক দিক; আর দ্বিতীয় দিক হ'চ্ছে ঐতিহাসিক দিক। দার্শনিক আলোচনার ফলে আমরা শব্দের উৎপত্তির কথা না ভেবে, অথবা উৎপত্তির উপরে জোর না দিয়ে, ভাষায় কিভাবে শব্দগুলির ব্যবহার হয়, কী উপায়ে নানা ভাব প্রকাশে শব্দগুলি সমর্থ হয়, সেটা ধ'র্‌তে পারি। আর ঐতিহাসিক বিচারের ফলে, বিভিন্ন যুগে কোনও জাতি কোন্ পথ ধ'রে সভ্যতা আর সংস্কৃতিতে অগ্রসর হ'য়েছে, এই যাত্রাপথে আবশ্যক-মতো তার ভাষা নিজের আভ্যন্তর বেগে কিভাবে নোতুন নোতুন শব্দ গ'ড়ে তুলেছে বা শব্দ ব'দ্‌লে নিয়েছে, বাইরের চাপে বা প্রভাবের ফলে বাইরেকার ভাষা থেকে তার ভাষা কিভাবে নোতুন নোতুন শব্দ নিয়েছে, চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার শব্দ-সম্ভারও ধ্বনিতে আর অর্থে কিভাবে পরিবর্তিত হ'য়েছে—সেই-সব কথা আমরা বুঝ্‌তে পারি। শব্দের আলোচনায় এই দুইটি দিক বা আলোচনার পথ পরস্পর-সম্পর্কিত—যেন টাকার এ পিঠ আর ও পিঠ।

আগে আমরা সাধারণভাবে শব্দের গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান প্রধান কথার আলোচনা ক'রে নিই। কোনও শব্দের বিশ্লেষণ বা শব্দটিকে ভেঙে নিয়ে তার বিচার, দুই ভাবে হ'তে পারে; এক—তার ধ্বনির বিশ্লেষণ; আর দুই—তার মধ্যকার ধাতু-প্রত্যয় প্রভৃতির অর্থ বা ক্রিয়া ধ'রে বিশ্লেষণ। যেমন—"রাখিলাম" এই শব্দটি; এর ধ্বনি ধ'রে বিশ্লেষণ ক'র্‌লে আমরা পাই তিনটি **syllable** বা অক্ষর—"রা", "খি", "লাম্"; আবার এই অক্ষরগুলির বিশ্লেষণ আরও সূক্ষ্মভাবে ক'রে আমরা পাই এই ধ্বনিগুলি—"র্—আ—খ্—ই—ল্—আ—ম্"। ধাতু আর প্রত্যয়কে অবলম্বন ক'রে, তাদের অর্থ শক্তি বা কার্য্য ধ'রে দেখ্‌লে, এই শব্দটিকে এইভাবেও বিশ্লেষণ ক'র্‌তে পারি—"রাখ্" ধাতু, তার

উত্তরে "-ইল্" প্রত্যয়, অতীত-কালের ক্রিয়ার অর্থে, আর তার পরে "-আম্" প্রত্যয়, উত্তম-পুরুষ জানাবার জন্য—"রাখ্—ইল্—আম"।

এ ছাড়া, ভাষার শব্দগুলির হিসাব ক'র্‌লে দেখা যায়, শব্দগুলি দুই প্রকারের হ'য়ে থাকে; এক—মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ, আর দুই—সাধিত। যে-সব শব্দকে বিশ্লেষ করা যায় না, যে-সব শব্দ বহুশঃ কোনও বস্তু বা গুণ বা কার্য্যের নাম, যেগুলিকে আর ভেঙ্গে সেই ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না, যেগুলির প্রকাশিত অর্থ-ই চরম অর্থ, সেইরূপ শব্দকে 'মৌলিক' বা 'স্বয়ংসিদ্ধ' শব্দ বলে। যেমন, "মা, ভাই, ফুল, গাছ, হাত, ঘোড়া, উট, বউ, রঙ", প্রভৃতি। অন্য ভাষার অনেক শব্দকে এইভাবে আমরা বাঙলাতে মৌলিক শব্দের মতো ব্যবহার ক'রে থাকি—তাদের মূল ভাষায় হয়তো সে-সব শব্দের বিশ্লেষ আর ধাতু প্রত্যয় ধ'রে অর্থ নির্ধারণ সম্ভব হয়। কিন্তু বাঙলার দিকে দৃষ্টি রাখ্‌লে তা সম্ভবপর নয়। যেমন—সংস্কৃত "হস্ত, সূর্য্য, পতি, আতিথ্য"; আরবী-ফার্সী "মঞ্জুর, মহকুমা, দরখাস্ত, বাজেয়াপ্ত"; ইংরিজি "ইয়ারিং, মাষ্টার, পিজবোড";—বাঙলার পক্ষে এগুলিও মৌলিক শব্দের সামিল হ'য়ে গিয়েছে। আরবী ও ফার্সীতে "মঞ্জুর" আর "বাজেয়াপ্ত", ইংরিজিতে "ইয়ারিং" আর "পিজবোড" কিভাবে গ'ড়ে উঠেছে, তার বিচার করার গরজ বাঙলার নেই। দ্বিতীয় প্রকারের শব্দ হ'চ্ছে 'সাধিত' শব্দ, এ-সব শব্দকে বাঙলাতেই ভাঙা যায়, ভাঙ্‌লে দেখা যাবে যে এগুলি হয় দুইটি বিভিন্ন বাঙলা শব্দের যোগে হ'য়েছে, নয়-তো এগুলিতে একটি বাঙলা ধাতু আছে আর একটি বা একের বেশি প্রত্যয় আছে, যার দ্বারা ধাতুর অর্থ একটু ব'দ্‌লে গিয়েছে; যেমন "অজানা" শব্দটি—এখানে 'না' অর্থে অব্যয় "অ" শব্দটির গোড়ায় পাচ্ছি, তার পরে "জানা"-তে "জান্" ধাতু পাচ্ছি আর শেষে পাচ্ছি বিশেষণ-সূচক "-আ"-প্রত্যয়; "পাগলামি" শব্দে তেমনি "পাগল" শব্দের পরে গুণ-অর্থে "-আমি"-প্রত্যয় পাচ্ছি। "পা-গাড়ি, বিয়ে-পাগলা, দৃষ্টি-কটু" প্রভৃতি শব্দে আবার দুইটি পদের সংযোগ বা সমাস মিল্‌ছে।

ভাষায় প্রচলিত শব্দগুলিকে অর্থ ধ'রে আবার তিনটি অন্য ধরনের শ্রেণীতে ফেলা যায়—'যৌগিক', 'রূঢ়ি' আর 'যোগরূঢ়'। এই শ্রেণী-বিভাগ প্রাচীন কালে ভারতের ব্যাকরণকারগণ ক'রে গিয়েছেন, আর অর্থ বিচার ক'র্‌লে এর দ্বারা বেশ সুন্দরভাবে শব্দের প্রকৃতি বা শক্তি ধরা যায়। 'যৌগিক' শব্দ—শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে তার যে অর্থ প্রকাশ পায়, শব্দটি যদি সেই অর্থেই ভাষায় প্রচলিত থাকে, অর্থাৎ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আর তার ব্যাবহারিক বা

ভাষায় প্রচলিত মুখ্য অর্থ যদি অভিন্ন হয়, তা হ'লে সেই শব্দকে বলে 'যৌগিক' শব্দ; যেমন—"রাখালি" (রাখালের ভাব), "রাঁধুনী" (যে রান্না করে); "পিতৃহীন, রাজপুরুষ, মালগাড়ি", প্রভৃতি। যে শব্দের মুখ্য বা ব্যাবহারিক অর্থ তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে ভিন্ন, নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কেবল ব্যুৎপত্তি ধ'রে যে শব্দের অর্থবোধ হয় না—সেরূপ শব্দকে বলে 'রূঢ়ি'; যেমন—"হস্তী, জ্যাঠামো", ইত্যাদি। আর যে শব্দেব ব্যাবহারিক অর্থ তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে ধবা গেলেও তার তুলনায় কিছুটা সংকুচিত বা বিশিষ্ট, সেইরূপ শব্দকে বলে 'যোগরূঢ়' শব্দ; যেমন "সরোজ", মূল অর্থ, "যা সরোবরে জন্মায়", কিন্তু বিশেষ বা নোতুন অর্থ হ'চ্ছে "পদ্ম", আর কিছুই নয়। "সুহৃৎ" অর্থে "বন্ধু", মূলগত অর্থ "যার হৃদয় হ'চ্ছে সুন্দর"; "রাজপুত" অর্থে "ক্ষত্রিয় জাতির যোদ্ধা পুরুষ", কিন্তু মূলগত অর্থ, "রাজার ছেলে"। অর্থ ধ'রে শব্দগুলিকে এইভাবে দেখা যায়।

আবার অন্য দিক দিয়ে দেখ্‌লে, শব্দগুলিকে আর একভাবে তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়। অর্থ তিন রকমের হ'য়ে থাকে—মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ আর ব্যঙ্গার্থ। শব্দটি কানে শুন্‌লেই বা লেখায় দেখ্‌লেই সঙ্গে সঙ্গে যে স্পষ্ট আর প্রচলিত অর্থ আমরা বুঝ্‌তে পারি, তা হ'চ্ছে শব্দের 'মুখ্যার্থ' বা 'শক্যার্থ' বা 'বাচ্যার্থ'। আগে যে যৌগিক, রূঢ়ি আর যোগরূঢ় শব্দের কথা বলা হ'য়েছে, সেগুলি সবই মুখ্যার্থের মধ্যে আসে। যেখানে মুখ্য বা প্রচলিত অর্থ না বুঝিয়ে, মুখ্য অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর কোনও অর্থের ইঙ্গিত করা হয়, সেখানে আমরা 'লক্ষ্যার্থ' পাই। যেমন, "অঙ্কে তার মাথা নেই"—এই বাক্যে "মাথা" শব্দের দ্বারা "বুদ্ধি"কে লক্ষ্য করা হ'চ্ছে। আর যেখানে শব্দটির দ্বারা মুখ্য বা লক্ষ্য অর্থকে অতিক্রম ক'রে অন্য ধরনের অনপেক্ষিত অর্থ আসে, সেখানে পাই ব্যঙ্গার্থ। যেমন "তুমি তো ডুমুরের ফুল হ'য়েছ"—এখানে "ডুমুরের ফুল" অর্থে, "যাকে চোখে দেখা যায় না"; "সীঁথির সিঁদূর অক্ষয় হ'ক"—এখানে বাক্যটির অর্থ "স্বামী দীর্ঘজীবী হোক"।

আবার নানাভাবে অর্থের পরিবর্তন হয়—অর্থের উন্নতি, অর্থের অবনতি, অর্থের প্রসার, অর্থের সংকোচ, নূতন অর্থের আগমন, প্রভৃতি। এ-সব কথা **Semantics** অর্থাৎ 'শব্দার্থতত্ত্ব' ব'লে ভাষাতত্ত্ববিদ্যার যে বিভাগ আছে তার আলোচনার বিষয়। এ বিষয় নিয়ে অতি প্রাচীনকাল থেকেই পণ্ডিতেরা মাথা ঘামিয়ে এসেছেন। আমাদের দেশে বৈদিক সাহিত্য আলোচনার কালে 'নিরুক্ত' নামে ভাষাতত্ত্ববিষয়ক বইতে ঋষি যাস্ক এই শব্দার্থ নিয়ে নানা বিচার ক'রে গিয়েছেন।

বাঙলা আর আধুনিক ভারতীয় নানা ভাষাতে শব্দের অর্থ নিয়ে অল্প-বিস্তর চর্চা চ'লেছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার দেখা যায়—সেটি হ'চ্ছে Onomatopoeia অর্থাৎ 'ধ্বনির অনুকার'। এই জিনিসটি সকল ভাষাতেই, পৃথিবীর সর্বত্র, অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে অনুকার-শব্দের একটু বিশেষ অর্থগত সূক্ষ্মতার জাল বোনা হ'য়েছে দেখা যায়। ইংরিজিতে ding-dong, splash-dash, ting-a-ling, screech bow-wow, tick-tock, প্রভৃতি কতকগুলি অনুকার-শব্দ মেলে। কিন্তু বাঙলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় অনুকার-শব্দের প্রসার আর অর্থ-প্রকাশের শক্তি অসাধারণ। বাঙলায় "ঝনঝন, টুংটাং, গডগড়, হুড়মুড়, দুড়দাড়, ক্যাচম্যাচ, চ্যাঁভ্যাঁ" প্রভৃতি অজস্র অনুকার-শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু কানে শোনা ধ্বনির অনুকারে যে-সমস্ত শব্দ বাঙলায় ব্যবহৃত হ'চ্ছে, সেই শব্দগুলিব সাহায্যে, চোখ বা দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্তি প্রভৃতির সাহায্যে উপলব্ধ অনুভূতিকে প্রকাশ করা হয়; যেমন, "কনকন, ঝনঝন, টনটন", এগুলি এক-একটি ধ্বনির অনুকার; কিন্তু "দাঁত কনকন করে, মাথা ঝনঝন করে, ফোড়া টনটন করে"। লাল রঙের বৈশিষ্ট্য জানাতে হ'লে, আমরা ধ্বনির অনুকারী শব্দের সাহায্য নিয়ে বাঙলায় বলি "টক্‌টকে লাল, টুক্‌টুকে লাল, কট্‌কটে লাল, ঢ্যাব্‌ঢেবে লাল", ইত্যাদি। বাঙলা ভাষায় অনুকার-শব্দের এই এক অদ্ভুত শক্তি—এই শক্তি বাঙলা পেয়েছে এদেশের অনার্য্য ভাষাগুলির থেকে, সংস্কৃত বা আর্য্য ভাষায় এই শক্তি নেই। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আর আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে সার্থক আর সুন্দর আলোচনা ক'রে গিয়েছেন, তা নিজের মাতৃভাষার সম্বন্ধে কৌতূহলী প্রত্যেক বাঙালীরই পাঠ করা উচিত।[১]

আমাদের ভারতীয় ভাষায় আর এক ধরনের শব্দ পাওয়া যায়—বিকার-জাত শব্দ, সেগুলি সার্থক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হ'য়ে নানাভাবে সেই শব্দের অর্থ ব'দলে দেয়। যেমন, বাঙলায় "জল-টল"—"টল" শব্দ সার্থক "জল"-এর বিকার; "টল", এই শব্দটির নিজের কোনও অর্থ নেই, এককভাবে এরূপ বিকৃত শব্দ ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু "জল" এই শব্দটির পরে এসে, অর্থ ব'দলে দেয়—"জলের অনুরূপ জিনিস, জলের সঙ্গে যার সংযোগ বা যা জলের সঙ্গে চলে"। তেমনি—"ঠাকুর-

১. দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব' বইয়ের কয়েকটি প্রবন্ধ (অষ্টম, ষষ্ঠ আর একাদশ) আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'শব্দকথা' বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ।

ঠুকুর, মানুষ-মুনুষ, দোকান-টোকান, মিটমাট, ঘোড়া-টোড়া, মুড়ি-টুড়ি, কাজ-ফাজ, নেড়ে-চেড়ে, লুটে-পুটে',' ইত্যাদি।

শব্দদ্বৈত বা পদদ্বৈত বাঙলা ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শব্দদ্বৈত ব'ল্‌তে সাধারণভাবে বোঝায় এক-ই শব্দ বা পদের পুনরাবৃত্তি; যেমন—'বাড়ি বাড়ি, পাতায় পাতায়; বড়ো বড়ো, রোগা রোগা; আস্তে আস্তে, ভালোয় ভালোয়; ব'লে ব'লে, যেতে যেতে; গেল গেল'; ইত্যাদি। এক-ই পদের পুনরাবৃত্তি ছাড়াও, এক শ্রেণীর যুগ্মশব্দকেও—রবীন্দ্রনাথের কথায়, "জোড়-মেলানো শব্দ" বা "জোড়া শব্দ"কেও—শব্দদ্বৈতের মধ্যে ধরা হয়; যেমন—'মাথা-মুণ্ডু, লোক-জন, কাগজ-পত্র, আপদ-বিপদ, সাজানো-গোছানো, ধীরে-সুস্থে; ভেবে-চিন্তে, ব'ল্‌তে কইতে'; ইত্যাদি। এই শ্রেণীর শব্দদ্বৈতে উভয় অংশই সমার্থক বা অনুরূপার্থক, কিন্তু সমগ্র পদটিতে অর্থের বিস্তার ঘ'টেছে। আবার একটি সার্থক শব্দ (বা পদ) আর তার অনুকার- বা বিকার-জাত শব্দের যোগেও বাঙলাতে শব্দদ্বৈত হয়; যেমন—'ঠাকুর-ঠুকুর, জল-টল, জড়-সড়, চুপ-চাপ; বুঝে সুঝে, খেয়ে দেয়ে, কেঁদে কেটে; নাড়ে চাড়ে, ব'ল্‌লে ট'ল্‌লে'; ইত্যাদি। এক্ষেত্রে "জোড়া শব্দে" অর্থের বিস্তার ঘটে। আর আছে ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত—দ্বিরুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা জোড়া ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত; যেমন—'টক-টক, খট-খট, ঝম-ঝম, ঝাঁ-ঝাঁ, ম্যাজ-ম্যাজ, রি-রি, উস-খুস, নিশ-পিশ'; ইত্যাদি। 'ডাকাডাকি, বকাবকি, গড়াগড়ি, মিছামিছি, মাঝামাঝি' ইত্যাদিও বাঙলা শব্দদ্বৈতের বিশিষ্ট উদাহরণ। পৌনঃপুন্য, বীপ্সা প্রভৃতি কয়েকটি অর্থে সংস্কৃত পালি প্রাকৃতেও পদের দ্বিরুক্তি হ'য়ে থাকে, কিন্তু এ সব অর্থে ছাড়াও বাঙলাতে নানা বিচিত্র অর্থে পদদ্বৈতের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, যার তুলনা সংস্কৃতে মেলে না। বাঙলায় নামপদ আর অসমাপিকাব দ্বিরুক্তি ছাড়াও বিশেষ অর্থে সমাপিকা ক্রিয়ারও দ্বিরুক্তি হ'য়ে থাকে—এটি বাঙলা ভাষার অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য; যেমন—"জ্বর হবে হবে", "আমার বয়স তখন কুড়ি পেরোয় পেরোয়", "আমি পালাই পালাই ক'রছিলুম", 'বলি বলি ক'রেও ব'ল্‌তে পারলুম না'; ইত্যাদি। বাঙলাতে শব্দদ্বৈত প্রসঙ্গে অনেক কিছুই ব'ল্‌বার আছে।[২]

২. দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গ'লা ব্যাকরণ: নবীন সংস্করণ', বাক্-সাহিত্য,

ইতিহাসের দিক থেকে ভাষার বিচার ক'র্‌লে তার শব্দ সম্বন্ধে নানা আবশ্যক তথ্য পাওয়া যায়। কোনও ভাষা কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। ভাষা হ'চ্ছে নদীর মতো বহতা, ভাষা কুয়া বা জলাশয়ের মতো স্থির বা নিশ্চল নয়। ভাষার স্রোত বইতে বইতে নানা জায়গা থেকে শব্দ নিয়ে তার জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। নিজের শব্দ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বদ্‌লাতে থাকে—বদ্‌লায় উচ্চারণে, বদ্‌লায় অর্থে। নিজের ধাতু-প্রত্যয় নিয়ে, অন্য শব্দ নিয়ে, ভাষা নোতুন-নোতুন শব্দ বানাতে-বানাতে চ'ল্‌তে থাকে; আবার নিজের শব্দ নানা কারণে ভাষায় অপ্রচলিত হ'য়ে যায়।

বিদেশী জাতির প্রভাবে এসে, কোনও ভাষা সেই বিদেশী জাতির ভাষারও শব্দ ধার ক'রে ব্যবহার করে, ক্রমে সেই-সব শব্দকেও নিজের ক'রে নেয় তখন; সেগুলি যে বিদেশী শব্দ তা বোঝ্‌বার আর উপায় থাকে না, শব্দগুলি এমনিই ভোল ফিরিয়ে বসে। আমাদের বাঙলা ভাষায় এইভাবে আমরা ফার্সী, তুর্কী, পোর্তুগীস, ইংরিজি, এ কয়টি ভাষার অনেক শব্দ নিয়েছি। বিস্তর আরবী শব্দও আমরা নিয়েছি—তবে এই আরবী শব্দগুলি এসেছে সরাসরি আরবী থেকে নয়, ফার্সীর মারফত। বাঙলায় এখন প্রায় আড়াই হাজার ফার্সী-আরবী শব্দ প্রচলিত আছে, কিন্তু মাত্র গুটি-পঁয়ত্রিশ তুর্কী শব্দ, শত-খানেক পোর্তুগীস শব্দ আর প্রায় হাজার ইংরিজি শব্দ; আর এই ইংরিজি শব্দের সংখ্যা এখন বেড়েই চ'লেছে। এই-সব বিদেশী শব্দের মধ্যে অনেকগুলি একেবারে বাঙলা শব্দ হ'য়ে গিয়েছে—এদের আর বর্জন করা চলে না। যেমন "হাওয়া, রোজ, হপ্তা, সরম, শহর, উকিল, আদালৎ" ইত্যাদি—এগুলি ফার্সী-আরবী শব্দ; যেমন "লাট, ভোট, রেল, টিকিট, পেনশন, মাষ্টার" প্রভৃতি বহু বহু ইংরিজি শব্দ। কোনও ভাষার শব্দ কিভাবে পরিবর্তিত হয়, আর কিভাবে বিদেশী ভাষার শব্দ আসে, তার আলোচনা আর এক সময়ে করা যেতে পারে ॥

(বেতার ভাষণ?)

অর্চনা, আশ্বিন, ১৩৫৩। সংযোজন সহ পুনর্মুদ্রিত।

বাঙলা ভাষায় বিদেশী শব্দ

আধুনিক বাঙলার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আলোচনার উদ্দেশ্যে এই যে বক্তৃতামালা, এর প্রথম বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী মহাশয় বিদেশী শব্দের অনুবাদ নিয়ে বাঙালী লেখক আর সাধারণ বাঙালীকে যে ঝঞ্ঝাটে, যে ফ্যাসাদে প'ড়্‌তে হয় তার সুন্দর আলোচনা ক'রেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের সার কথা ছিল এই যে, মুখের ভাষায় আমরা যে শব্দ ব্যবহার করি সেইটেই ভাষার সত্যকার শব্দ, লেখার ভাষায় ব্যবহারের জন্যে পণ্ডিতেরা নানা রকম শব্দ তৈরী ক'রে দেন বটে, কিন্তু সে সব শব্দ ছাপার অক্ষরেই বদ্ধ থাকে; সে সব শব্দ যতক্ষণ না লোকে সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহার করে, ততক্ষণ সে ধরনের শব্দের কোনও বিশেষ সার্থকতা ভাষায় নেই। তিনি একটি বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েই ব'লেছেন—আধুনিক জগতে মানুষের জীবনধারা যে পথের মধ্যে চ'ল্‌ছে, যে ভাবে, নানা নোতুন নোতুন জিনিস বিজ্ঞান আবিষ্কার ক'রে মানুষের সেবায় এনে দিচ্ছে, তাতে নিত্য নোতুন নোতুন শব্দ এই সব জিনিসের নাম হিসেবে ভাষায় আস্‌ছে। এসব জিনিস নোতুন, এগুলির নামও নোতুন।

ইউরোপ আমেরিকা এই সব জিনিস বা'র ক'র্‌ছে, এদের নাম ইউরোপ আমেরিকা থেকেই আমাদের দেশে আস্‌ছে। অনেক সময় আমরা বাঙলা ভাষায় এই সব শব্দের একটা অনুবাদ ক'রে নেবার চেষ্টা করি; কিন্তু সে অনুবাদ বহু স্থলে আবার ঠিক হয় না। বস্তুর নাম হ'লে বিদেশী নামটা ব্যবহার ক'র্‌তে কারো বাধে না, ভাষায় সেই শব্দটাই প্রচলিত হ'য়ে দাঁড়ায়। তিনি কতকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন—যেমন 'এয়ারপ্লেন' বা 'এয়ারোপ্লেন', 'রেডিও', 'মোটর-কার' বা 'মটর-কার', 'ক্রুজার,' 'ট্যাঙ্ক, 'মেশিন-গান,' 'ডেপথ্‌-চার্জ,' 'টর্পেডো', প্রভৃতি। জিনিস- বা বস্তু-বাচক ছাড়া, ভাব-বাচক, ক্রিয়া-বাচক বা অন্যবিধ শব্দ নিয়ে আরও মুস্কিলে প'ড়্‌তে হয়। একেবারে নোতুন দেখা দিয়েছে এমন কোনও জিনিসের নাম নিতে আমাদের তেমন বাধে না—বিশেষতঃ নামটা যদি সংক্ষিপ্ত আর ছোটো হয়; কিন্তু অনেক সময়ে একটা 'স্বদেশী মনোভাব' এসে, কোনও ভাব, গুণ, শ্রেণী, ক্রিয়া ইত্যাদির বোধক বিদেশী শব্দকে অনুবাদ ক'রে নেবার প্ররোচনা দেয়; অনেক সময়ে কথাবার্তার ভাষায় আমরা ব্যবহার না ক'র্‌লেও (আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর সুবিধাবাদী কিনা, বিশেষতঃ ভাষার ব্যাপারে), সেরূপ অনুবাদ লেখার ভাষায় চলে আর কচিৎ সুপরিচিত

হ'য়েও দাঁড়ায়—সাহিত্যে বেশি ব্যবহারের ফলে মুখের ভাষাতেও ক্রমে সেগুলি চালু হ'য়ে যায়। Armoured Car-এর বাঙলা 'সাঁজোয়াগাড়ি' খবরের কাগজে চ'ল্‌ছে;—মুখে ব'ল্‌তেও তেমন আটকাবে না; distilled water অর্থে 'পরিশ্রুত জল' আমার মনে হয় বাঙালা ভাষায় বিজ্ঞান পড়ানোর ফলে মুখের ভাষাতেও গৃহীত হবে; Air Raid-এর বাঙলা একটা না কর্‌'লে, মনে হয়, যেন এ বিষয়ে আমাদের ভাষার দৈন্য আছে ব'লে আমরা মেনে নিচ্ছি; কিন্তু celluloid সেলুলয়েড, bakelite বেক্‌লাইট, parafin পারাফিন, petrol পেট্রল, asbestos আস্‌বেস্টস্‌—প্রভৃতির নাম বাঙলায় হওয়া মুস্কিল, আর এ সব শব্দের খাঁটি বাঙলা অনুবাদ পাওয়া না গেলে আমরা তেমন দুঃখিত হই না। মোট কথা, আমরা মাতৃভাষার মারফত আমাদের মানসিক খোরাক কতটা পাই, সাংস্কৃতিক উপাদান কতটা বিদেশী ভাষা আমাদের জোগায় আর কতটাই বা মাতৃভাষা, তার উপর বিদেশী শব্দের অনুবাদের, নোতুন নোতুন ভাব আর ক্রিয়ার জন্য মাতৃভাষায় নোতুন শব্দ তৈরি ক'রে নেওয়ার সার্থকতা নির্ভর করে। আজকাল মাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত আমাদের ছেলেদের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হ'চ্ছে, সুতরাং আশা করা যায় যে ইংরেজি সাহিত্যের বাইরে আর সব বিষয়ে বহু বাঙলা শব্দ ক্রমে ছেলেদের গা-সওয়া অর্থাৎ অভ্যস্ত হ'য়ে যাবে—গণিতের 'দশমিক', 'ত্রৈরাশিক', 'গ-সা-গু', 'ল-সা-গু'-র, মতো বিজ্ঞানের বহু শব্দ (পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রভৃতির), ভূগোলের বহু শব্দ আর নাম (ভূমধ্যসাগর, পীতসাগর, প্রশান্ত-মহাসাগর, উত্তমাশা-অন্তরীপ প্রভৃতি) আর আমাদের অদ্ভুত ঠেক্‌বে না।

বাঙলায় বিদেশী শব্দের কথা আলোচনা ক'র্‌তে গেলে বাঙলা ভাষার ইতিহাস নিয়ে দু কথা ব'ল্‌তে হয়। হাজার বছর হ'ল আমাদের বাঙলা ভাষা, যে রূপে এখন প্রচলিত, অনেকটা সেই রকম রূপ নিয়ে, 'বাঙলা ভাষা' বা 'প্রাচীন বাঙলা' পদবাচ্য হ'য়ে দেখা দেয়। অর্থাৎ এখন থেকে হাজার বছর আন্দাজ আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা 'ভত্ত' না ব'লে 'ভাত', 'হত্থ' না ব'লে 'হাথ', 'চন্দ না ব'লে 'চাঁদ', 'চলিঅ-ইল্ল' বা 'চলিল্ল' না ব'লে 'চলিল', 'করিঅব্ব' না ব'লে 'করিব' ব'ল্‌তে আরম্ভ করেন। আগে এদেশে যে মাগধী প্রাকৃত আর মাগধী অপভ্রংশ চ'ল্‌তো, সে ভাষা ব'দ্‌লে ব'দ্‌লে পুরানো বাঙলার রূপ গ্রহণ করে। সংস্কৃত ব'দ্‌লে প্রাকৃত, প্রাকৃত ব'দ্‌লে অপভ্রংশ, অপভ্রংশ ব'দ্‌লে বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, নেপালী প্রভৃতি আধুনিক ভাষা; এই হ'চ্ছে এদেশে আর্য্য ভাষার

পরিবর্তনের ধারা। সংস্কৃত শব্দ বংশানুক্রমিক পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃত শব্দ হ'য়ে দাঁড়াল, আবার এই সব প্রাকৃত শব্দ আরও পরিবর্তিত হ'য়ে বাঙলা হিন্দী প্রভৃতির শব্দ হ'ল। বাঙলা হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক ভাষা প্রাকৃতের মারফত যে সমস্ত পরিবর্তিত শব্দ পেয়েছে সেইগুলি-ই হ'চ্ছে এই আধুনিক ভাষাগুলির inherited words অর্থাৎ 'রিকৃথ' শব্দ—সেগুলি-ই শুদ্ধ খাঁটি বাঙলা বা হিন্দী শব্দ। 'মাথা, আঁখ, নাক, কান, মুখ, দাঁত, হাত, পা, আঙ্গুল' প্রভৃতি অঙ্গবাচক শব্দ; 'হ, খা, যা, দেখ্, নে, দে, চল্, ধর্, হাস্' প্রভৃতি ধাতু; 'এক, দুই, তিন, চার' প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক শব্দ; 'গোরু, ঘোড়া, বেড়াল, উট, উদ, মাছি, সাপ, পাখি, মাছ, হাঁস' প্রভৃতি প্রাণিবাচক শব্দ; 'ভাই, বোন, মা, মাসী, শাশুড়ী, যা, ননদ, দেওর' প্রভৃতি সম্পর্ক-বাচক শব্দ —এইরূপ শত শত শব্দ হ'চ্ছে সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের পথ ধ'রে পাওয়া খাঁটি বাঙলা শব্দ। এই সব শব্দকে নিয়েই বাঙলা ভাষাব বাঙলাত্ব। কিন্তু এই ধবনের শব্দ উচ্চ বা গভীর ভাবের প্রকাশক নয়, এগুলি বেশির ভাগ-ই হ'চ্ছে ঘরোয়া, সাধাসিধে, সরল জীবন যাপনের উপযোগী শব্দ। একটু উঁচুভাবের কথা ব'ল্‌তে গেলেই প্রচলিত শব্দে কুলিয়ে উঠ্‌তে না পেরে, প্রাচীন কাল প্রাকৃতের যুগ থেকেই পণ্ডিতেরা সংস্কৃত থেকে শব্দ এনে ভাষায় ব্যবহার ক'র্‌তেন। পালি প্রভৃতি প্রাচীন প্রাকৃতে এগুলিকে ভেঙে, এদের উচ্চারণ ব'দ্‌লে, যথা-সম্ভব প্রাকৃতের উপযোগী ক'রে নেওয়া হ'ত। অন্য পাঁচটি প্রাকৃত শব্দের সঙ্গে, এই বিকারের ফলে এগুলি এক পর্য্যায়ের হ'য়ে দাঁড়ালেও, মোটের উপরে সত্য-সত্যই এগুলি ছিল learned words, পণ্ডিতি বা শাস্ত্রীয় কেতাবি শব্দ। সংস্কৃত প্রাচীনকালে উচ্চ জ্ঞানের একমাত্র ভাষা ছিল। পণ্ডিত মাত্রেই সংস্কৃত জান্‌তেন, সেইজন্য সংস্কৃত থেকে শব্দ ভাষায় আনা এতটা সহজ হ'য়েছিল। যখন বাঙলা হিন্দী প্রভৃতির উদ্ভব হ'ল, তখন উচ্চ কোটীর শব্দ ভাষায় আনার দরকার হ'লে এই প্রাচীন রীতি ই অতি সহজে অনুসৃত হ'ত। বাঙলা ভাষার যে প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা পাই, ৪৭টি বৌদ্ধ চর্য্যাপদ বা গান, তাতে আমরা মোটামুটি দুই প্রকারের শব্দ পাই; এক—প্রাকৃত থেকে (বা অপভ্রংশ থেকে) উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া 'প্রাকৃতজ' অর্থাৎ খাঁটি বাঙলা শব্দ—সংস্কৃত-প্রাকৃত-বাঙলা, এই ধারা ধ'রে সেগুলি বাঙলায় এসেছে; আর দুই—সংস্কৃত শব্দ—এগুলিকে বাঙলা ভাষার দরকার-মতন সংস্কৃত বই বা অভিধান থেকে নেওয়া হ'য়েছে। প্রাকৃত থেকে যে সব শব্দ বাঙলায় এসেছে, তার মধ্যে দু' দশটা শব্দ হ'চ্ছে সংস্কৃত থেকে ধার-করা

পণ্ডিতি শব্দ; আবার তা ছাড়া অনার্য্য ভাষা থেকে প্রাকৃতে যে সমস্ত অনার্য্য শব্দ ঢুকে গিয়েছিল, তার দশ-বিশটা বাঙলাতে চ'লে আসে; এ ভিন্ন, প্রাচীন কালে ভারতবাসীরা ভারতে আগত বিদেশী লোকেদের সংস্পর্শে এসে দু'-দশটা বিদেশী শব্দও শিখেছিল—যেমন প্রাচীন পারসীক জাতির কাছ থেকে, গ্রীকদের কাছ থেকে, চীনাদের কাছ থেকে, তুর্কীদের কাছ থেকে—সে রকম শব্দের কতকগুলিও বাঙলা পেয়েছে। যেমন বাঙলায় 'দাম' শব্দটি, 'মূল্য' অর্থে এটি একটি গ্রীক শব্দ, drakhme 'দ্রাখ্‌মে' সংস্কৃতে 'দ্রম্য' রূপে গৃহীত হয়, প্রাকৃতে 'দ্রম্ম' বা 'দম্ম'; তা থেকে বাঙলা 'দাম', আগে এর মানে ছিল এক রকম মুদ্রা। বাঙলা 'পুঁথি' শব্দটি—এটি প্রাচীন পারসীক post 'পোস্‌ৎ' শব্দ থেকে এসেছে —post মানে লেখবার জন্য তৈরী ভেড়ার চামড়া, 'পার্চমেণ্ট', পরে এর অর্থ দাঁড়াল 'লেখা বই' বা 'বই'; তখন ভারতে শব্দটি নেওয়া হ'ল 'পুস্ত' রূপে, তা থেকে 'পুস্তক, পুস্তিকা'। এই শব্দের প্রাকৃত রূপ হ'ল 'পোত্থিআ', তা থেকে হিন্দী 'পোথী', বাঙলা 'পুথি, পুঁথি'।

এসব হ'চ্ছে বাঙলা শব্দের ইতিহাসের কথা। এদেশে ইসলামধর্মাবলম্বী বিদেশী তুর্কীদের আগমন হয় খ্রীষ্টীয় বারোর শতকের শেষ আর তেরোর শতকের গোড়া থেকে। মোটামুটি ধ'রতে পারা যায় যে, তুর্কীরা ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা দেশে প্রথম আসে। তুর্কীরা যখন এদেশে প্রথম দেখা দিলে, মোহম্মদ বখ্‌ত্যার খল্‌জীর অধীনে, তার আগে বাঙলা দেশে মুসলমান ছিল না। বাঙলা দেশের [অর্থাৎ সমগ্র গৌড় বঙ্গ রাঢ় সুহ্ম বরেন্দ্র কামরূপ সমতট ও চট্টলের] ভাষায় দু-চারটে প্রাকৃত থেকে যা পাওয়া গিয়েছিল, তা ছাড়া অন্য বিদেশী শব্দ ছিলই না। বাঙলা ভাষায় তার প্রাচীনতম যুগে তা হ'লে তিন রকমের শব্দ ছিল: [১] খাঁটি বাঙলা প্রাকৃতজ শব্দ, [২] সংস্কৃত থেকে নেওয়া শব্দ, আর [৩] দেশী শব্দ। কিন্তু বাঙলা দেশে তুর্কীদের আগমনের পর থেকে তিন-তিনটা বিদেশী ভাষা থেকে বাঙলা ভাষায় শব্দ আস্‌বার সূত্রপাত হ'ল।

ভারতের একটি কোণ, সিন্ধু-প্রদেশ, জয় ক'রেছিল ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক থেকে আগত আরব বা আরবী-ভাষী মুসলমানেরা,—এদের সেনাপতি ছিলেন মোহম্মদ বিন্‌-কাসিম। সিন্ধু-প্রদেশের হিন্দু রাজাকে হারিয়ে দিয়ে তাঁর রাজ্য এরা দখল করে। পঞ্চাশ বছর ধ'রে আরব মুসলমানেরা সিন্ধুদেশ শাসন করে, কিন্তু শেষে সিন্ধুর প্রজারা বিদ্রোহ ক'রে আরবদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। আরব শাসন ভারতবর্ষে ঐ প্রথম, আর ঐ শেষ। তারপরে, পাঞ্জাব- সীমান্তে আফগানিস্থান

থেকে তুর্কী আর ঈরানীরা ভারতবর্ষে হানা দিতে থাকে। মধ্য-এশিয়ার তুর্কী-জাতীয় লোকেরা পূর্ব পারস্য আর আফগানিস্থান দখল ক'রে বসে—তারা ঐ দেশের রাজা হয়। এই তুর্কীরা আগে ছিল বৌদ্ধ, পরে মুসলমান হয়, আর এরা ছিল অতি দুর্ধর্ষ জাতি, এরা খ্রীষ্টীয় দশম শতক থেকে পাঞ্জাব আর ভারতবর্ষ আক্রমণ ক'রতে থাকে। মাহমূদ (গজনীর রাজা), সবুক্তগীন, মোহম্মদ ঘোরী (পৃথ্বীরাজকে যিনি হারিয়ে দেন), কুতুবুদ্দীন (ভারতের প্রথম মুসলমান সুলতান) —এঁরা সবাই ছিলেন তুর্কী; বঙ্গবিজেতা বখ্ত্যার খল্জীও ছিলেন তুর্কী। এই তুর্কী যোদ্ধারা ঘরে ব'ল্তেন তুর্কী ভাষা, কিন্তু সাহিত্যের ভাষা হিসাবে এঁরা এঁদের সুসভ্য ঈরানী প্রজাদের ভাষা ফার্সী-ই ব্যবহার ক'রতেন, রাজকার্য্যেও ফার্সী ব্যবহার ক'রতেন। বিজেতা তুর্কীদের সঙ্গে তাঁদের অনুচর হিসাবে বহু ফার্সী-ভাষী সৈন্য আর অন্য লোক ভারতবর্ষে আসে। তুর্কীরাই যেন ভারতে ফার্সী ভাষাকেও এনে প্রতিষ্ঠিত ক'রলে; ফার্সী ভাষার পাশে তাদের মাতৃভাষা তুর্কীর কোনও জৌলুশ ছিল না। তুর্কী ভাষা এল, তার গোটা-কতক শব্দ, নোতুন রাজার জাতির ঘরোয়া ভাষার শব্দ হিসেবে হিন্দী বাঙলা প্রভৃতিতে ঢুক্ল। এই রকম তুর্কী শব্দ হিন্দীতে আছে প্রায় ৭০টা, বাঙলায় মাত্র ৩৫।৪০টা; 'তুর্ক, তোপ, কাঁচী, চাকু, বোঁচকা, লাশ, সওগাত, খাঁ, খানুম, খাতুন, বক্শী, বাহাদুর, আচকান, রোয়াক, কাবু, তক্মা, লড়াই, উর্দূ' প্রভৃতি—তুর্কী আভিজাত্য, আদব-কায়দা, আর দু'পাঁচটা নোতুন জিনিস নিয়ে এই সব শব্দ। ফার্সীর প্রভাব কিন্তু আরও ঢের বেশি ক'রে হিন্দী বাঙলা প্রভৃতির উপর আস্তে থাকে। ফার্সী ছিল রাজ-দরবারের সাধারণ ভাষা—রাজ-সরকারের লেখা-পড়া যা কিছু হ'ত সব-ই ফার্সীতে, আদালতে ফার্সী-ই চ'ল্ত; যদিও প্রথমটা মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠিত আদালতের সঙ্গে দেশের প্রজাসাধারণের যোগ তেমনটা ছিল না, এক রাজধানীর মতন দুই-একটি নগর ছাড়া, দেশটা বেশির ভাগ হিন্দু সামন্ত রাজাদের শাসনে ছিল। রাজসরকারে স্থান বা প্রতিপত্তি ক'রতে হ'লে ফার্সী জান্তে হ'ত। সেই জন্য হিন্দুদের মধ্যেও আস্তে-আস্তে ফার্সীর চর্চা একটু-একটু ক'রে প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে—যদিও প্রথম প্রথম আর সব হিন্দুর চোখে এটা ভালো লাগ্ত না। এর ফলে আস্তে আস্তে বাঙলাতে দুটো পাঁচটা ক'রে ফার্সী শব্দ এসে যেতে লাগ্ল। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতন্যদেবের পূর্বেকার সময়ের বই; আঠারো হাজার লাইনের এই বইতে মাত্র গোটা-পাঁচেক ফার্সী শব্দ আছে [আরও কয়েকটি বেশি থাকতে পারে]; অর্থাৎ ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, তিন-শ' বছর

ধ'রে মুসলমান শাসনের পরও, ফার্সী শব্দ বেশি ক'রে বাঙলায় আসতে পারেনি। কিন্তু ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লেখা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে প্রায় দেড়শ'র অধিক ফার্সী শব্দ আছে। খ্রীষ্টীয় ষোল'র শতকের বই জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের জীবৎকালে বামুনের ছেলে সংস্কৃত না প'ড়ে ফার্সী প'ড়্লে লোকে সেটা অনুচিত মনে ক'র্ত, আর ভারতচন্দ্রের জীবন-কাহিনী থেকে এই খবরটুকু আমরা পাই যে, তিনি ষোলো বছর বয়সে ফার্সী না প'ড়ে সংস্কৃত প'ড়্তে চেয়েছিলেন ব'লে তাঁর বাবা আর দাদারা তাঁর উপর খুব চ'টে গিয়েছিলেন। আড়াই-শ' বছরে বাঙালী হিন্দুর ফার্সী সম্বন্ধে মনোভাব এমনিই ব'দ্‌লে গিয়েছিল।

তুর্কীদের সঙ্গে তুর্কী ভাষা এল, ফার্সী এল, আর এল আরবী। আরবী হ'চ্ছে কোরানের ভাষা, মুসলমানদের ধর্মের ভাষা; যাঁরা মুসলমান শাস্ত্রে পণ্ডিত হ'তেন তাঁদের আরবী ভালো ক'রে জান্‌তে হ'ত। এদেশের মক্তবে, ফার্সী আর তারপরে আরবী, এই দুইয়েরই পড়ার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুর ছেলেরা ফার্সী প'ড়ে 'মুন্‌শী' হ'ত; তারা সাধারণতঃ আরবী প'ড়্ত না, আরবী ভাষাটা মোটের উপরে মুসলমান মোল্লা আর আলেম অর্থাৎ শিক্ষিত পুরোহিত আর পণ্ডিতদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাক্‌ত। আরবী ভাষার শব্দ অনেকগুলি কিন্তু ফার্সীর মারফত বাঙলা হিন্দী প্রভৃতিতে এসে পড়ে। ফার্সী ভাষায় উচ্চ ভাবের সমস্ত শব্দ আরবী থেকে নেওয়া হয়, ফার্সী ব'নে যায় এই সব আরবী শব্দ আর এগুলি ফার্সী রূপেই বাঙলায় আসে। আরবীর নিজস্ব উচ্চারণও এই সব শব্দে আর ঠিক থাকে না, ফার্সীর মোতাবেক ব'দ্‌লে যায়। আরবীর ḥadʷrat শব্দ ফার্সীতে হয় hazrat, আর hazrat 'হজ্‌রৎ'-ই বাঙলা হিন্দীতে চলে—কেউ খাঁটি আরবী উচ্চারণ ধ'রে ḥadʷrat বলে না। তেমনি dhʷalim আরবী শব্দ, ফার্সীতে হ'ল zalim, হিন্দী বাঙলায় 'জালিম' zalim বা jalim। আরবী thalith ফার্সীতে হ'ল salis, তা থেকে বাঙলায় 'সালিস', বলি shalish।

১৫৭২ সালে আকবর বাদশাহের সেনাপতিরা পাঠানদের কাছ থেকে বঙ্গদেশ জয় করেন। তার ফলে বাঙলাকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে উত্তর-ভারতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়; আর তাতে ক'রে বাঙলায় ফার্সীর চর্চা আরো বেশি ক'রে হ'তে থাকে। অষ্টাদশ শতকে, আর ইংরেজ আমলের গোড়ায় উনবিংশ শতকের প্রথম অর্ধে, বাঙলা ভাষায়, হিন্দুর ঘরে ব্যবহৃত বাঙলাতেও, বিস্তর ফার্সী শব্দ ঢুকেছিল। কিন্তু ১৮৩৮ সালে বাঙলা-দেশে আদালতের ভাষাকে যাই ফার্সীর বদলে ইংরেজি

আর বাঙলা ক'রে দেওয়া হ'ল, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে ফার্সী শব্দের প্রচার বাঙলাদেশে বাঙলা ভাষায় ক'র্‌তে আরম্ভ হ'ল।[১] কিন্তু তবুও একথা ব'ল্‌তে হয় যে সাত-শ' বছর ধ'রে ফার্সী-ব্যবহারকারী তুর্কী, ঈরানী, পাঠান, মোগল আর দেশী মুসলমানদের আর বাঙালী হিন্দু ফার্সী-জানিয়ে'দের প্রভাবের ফলে, বাঙলা ভাষায় বিদেশী শব্দ এখন যত আছে তার মধ্যে ফার্সী শব্দেরই সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙলা অভিধানের প্রথম সংস্করণে সব-শুদ্ধ প্রায় ৭৫০০০ শব্দ আছে, তার মধ্যে ফার্সী শব্দ সংখ্যায় প্রায় ২৫০০। হিসেব ক'রে দেখা গিয়েছে, ক'ল্‌কাতা-অঞ্চলের ভদ্র হিন্দু সমাজের ঘরোয়া ভাষায় শতকরা ৭।৮টি শব্দ হ'চ্ছে ফার্সী শব্দ; ভদ্র মুসলমানের ঘরে এই সংখ্যা আর একটু বেশি হবে।

এখন বাঙলা ভাষায় দু-চার জন মুসলমান লেখক মুসলমানী ভাবের প্রাধান্য আন্‌বার জন্য বেশি ক'রে ফার্সী (অর্থাৎ আরবী আর ফার্সী) শব্দ ব্যবহার ক'র্‌তে চান। এ সম্বন্ধে এই কথা ব'ল্‌তে পারা যায় যে, বাঙলাতে শত-শত ফার্সী শব্দ কায়েমী জায়গা ক'রে নিয়েছে, এরূপ শব্দ ভাষা থেকে দূর কর্‌বার কথা কেউ কখনও মনে ক'র্‌তেই পারে না, এগুলি গেলে ভাষার শক্তি আর সৌন্দর্য্য দুই-ই যাবে। যেমন, 'হাওয়া জিদ শরম সরকার দরকার চাঁদা চরখা আইন শর্ত আমীর দরখাস্ত খোয়াব খাতির খাস আইন হুনর হুজুর জমীদার জমাদার ফৌজদারি', ইত্যাদি ইত্যাদি। আবশ্যক হ'লে বিশেষতঃ যখন আরবী-ফার্সী সাংস্কৃতিক জগতের খাস বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে, তখন সেই সব বস্তুর আরবী আর ফার্সী নাম বা শব্দ নিতে বাধা নেই। কিন্তু খামখা সকলে (এমন কি মুসলমান জনসাধারণ যাঁরা আরবী-ফার্সীর আলেম নন তাঁরাও) যে সব আরবী ফার্সী কথা বোঝেন না সে রকম শব্দ ভাষায় এনে ভাষাকে দুর্বোধ্য করার কোনও মানে হয় না। 'শরীয়তে মতন আছে যে ওয়ালিদায়েনের কদমের তলায় বেহেশ্‌ৎ', 'নজাতের অসলী রাহ্‌', 'রূহানী মসরূরতের তরক্কী', 'কৌমী ইজ্জতের মোবলগা করা', ইত্যাদি ঢঙের বাক্য বাঙালী মুসলমানদেরও শিখিয়ে নিয়ে তবে তাদের বোধগম্য ক'র্‌তে হয়। বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ লেখক ও শ্রেষ্ঠ চিন্তানেতা, সুখের বিষয়, তাঁরা এতটা বেশি ক'রে ফার্সী-করণের পক্ষপাতী নন।

১ এখানে 'বাঙলা-দেশ' অর্থে ১৯৪৭ সালের আগেকার অবিভক্ত সমগ্র বাঙলাভাষী ভূখণ্ড বুঝ্‌তে হবে।

আর একটা কথা ভাব্‌বার বিষয়। প্রায় সব দেশেই দেখা যাচ্ছে, বিশেষ ক'রে দুই মুসলমান দেশ তুর্কী আর ঈরানে, ভাষায় আগত বিদেশীয় শব্দের বহিষ্কারের দিকে একটা ঝোঁক এসে গিয়েছে। আরবী ফার্সী শব্দ তুর্কী থেকে বিতাড়িত হ'চ্ছে, ফার্সী থেকে আরবী শব্দও বিতাড়িত হ'চ্ছে। তুর্কীরা আরবী 'অল্লাহ্' (আল্লা) শব্দ তাড়িয়ে তার জায়গায় তাদের নিজেদের খাঁটি তুর্কী শব্দ 'তেঙরি' (=স্বর্গদেব), 'ইদি' (=প্রভু) আর 'মুক্কু' (=অমর) ব্যবহার ক'র্‌ছে। ফার্সীর আর্য্য-শব্দ 'খুদা' (=সংস্কৃত 'স্বধা', যিনি নিজে করেন) বরাবরই আছে। আজকাল তারা 'অল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার ক'র্‌তে চায় না। এখন পৃথিবীর জনগণ সাংস্কৃতিক দো'টানায় প'ড়েছে। আমাদেরও এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি না ক'রে একটু ধীরে-সুস্থে চ'ল্‌লেই ভালো হয়।

ফার্সী শব্দ ছাড়া অন্য বিদেশী শব্দের মধ্যে বাঙলায় শত-খানেকের কিছু বেশি পোর্তুগীস শব্দ আছে, এগুলি হ'চ্ছে বেশির ভাগ পোর্তুগীসদের আনীত বিদেশী জিনিসের (গাছপালা আর অন্য জিনিসের) আর বিদেশী রীতি- নীতির নাম। আর আছে গুটি পাঁচ সাত ক'রে ওলন্দাজ শব্দ, ফরাসী শব্দ।

তারপরে আসে ইংরেজি শব্দ। সতেরো শতকের শেষ থেকে ইংরেজি শব্দ বাঙলায় আস্‌তে আরম্ভ করে। বাঙলায় প্রায় ৮।৯ শত ইংরেজি শব্দ ইতিমধ্যেই **naturalised** অর্থাৎ পূর্ণরূপে গৃহীত হ'য়ে বাঙলা ব'নে গিয়েছে; যেমন 'লাট, ডাক্তার, কৌঁশুলি, মোকদ্দমা পাঁপরে গিয়েছে, আগর, লজেঞ্চুস, কার-সুতা, টুর্ণী, জাঁদরেল', প্রভৃতি। ইংরেজি শব্দের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান; প্রত্যেক দিনই নব-নব অবস্থার ফলে নোতুন-নোতুন ইংরেজি শব্দ বাঙলায় আস্‌ছে। আমাদের জীবনের সব দিক্ এখন ইউরোপীয় প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'চ্ছে, এই প্রভাব আস্‌ছে ইংরেজির মাধ্যমে। বস্তুর নাম তো শত শত নিয়েছি ইংরেজি থেকে, আরও শত শত নিতেই হবে; বহু প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান রীতি-নীতি-পদ্ধতির শব্দ ইংরেজি থেকে আস্‌ছে। সেগুলিকে আট্‌কানো আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়॥

বেতার ভাষণ, অক্টোবর ২৫ (?), ১৯৪১।

রূপ ও রীতি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮।

বাঙলা উচ্চারণ

সাড়ে ছয় কোটির উপর লোকের মাতৃভাষা বাঙলা[১]—জনসংখ্যা ধ'রলে পৃথিবীর বড়ো বড়ো ভাষাগুলির মধ্যে বাঙলার স্থান হ'চ্ছে নবম—বাঙলার আগে নাম ক'রতে হয় পর-পর এই কয়টি ভাষার—উত্তর-চীনা, ইংরেজি, হিন্দী, স্পানীয়, রুষ, জর্মান, জাপানী, ইন্দোনেসীয়; তার পরে আসে বাঙলা। এত লোকের মাতৃভাষা, আর ভারতের পূর্বভাগে পশ্চিমবঙ্গ আর তার লাগোয়া নোতুন স্বাধীন রাষ্ট্র 'বাঙ্গলাদেশ' জুড়ে যার প্রসার, তার উচ্চারণ যে সব জায়গায় এক রকম হবে, তা সম্ভবপর নয়। এক চাটগাঁ অঞ্চল আর কিছুটা নোয়াখালি কুমিল্লা শ্রীহট্ট আর মণিপুরের বিষ্ণুপুর অঞ্চল—এই ক'জায়গার লোকেদের মধ্যে প্রচলিত বাঙলার ব্যাকরণে, ঐ ঐ অঞ্চলের নিজস্ব কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু তা ছাড়া, প্রায় সারা বাঙলা অর্থাৎ বাঙলাভাষী দেশ জুড়ে যে ভাষা প্রচলিত আছে, তার ব্যাকরণটি হ'চ্ছে মোটামুটি এক। যা পার্থক্য নানা অঞ্চলের কথ্য ভাষায় দেখা যায়, তা হ'চ্ছে প্রধানতঃ উচ্চারণকে অবলম্বন ক'রে। উচ্চারণের পার্থক্যকেই আমরা প্রধান জিনিস মনে করি বা ক'রে থাকি; আর তাই নিয়েই বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার মধ্যে পরস্পর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার অভ্যাসও আমাদের আছে। কারণ উচ্চারণ একেবারে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশে। 'চলিলাম, চলিলুম, চলিলেম'—এই ক্রিয়াপদে '-ইলাম, -ইলুম, -ইলেম' এই তিনটি প্রত্যয়ই খাঁটি বাঙলার প্রত্যয়, সকলেই আমরা ঐ তিনটিকে মেনে নিয়েছি। তদনুসারে 'চ'ল্‌লাম, চ'ল্‌লুম, চ'ল্‌লেম' তিনটেই ঠিক—যদিও '-লাম' প্রত্যয় হ'চ্ছে পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলের নিজস্ব প্রত্যয়, '-লুম' হ'চ্ছে ক'ল্‌কাতা অঞ্চলের আর '-লেম' একটু সাহিত্য-ঘেঁষা রূপ; বোধ হয় ন'দে শান্তিপুরের ভাষা থেকেই এর প্রচার। উচ্চারণে কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ 'চ্‌' আর 'চ'-এর সংশ্লিষ্ট 'অ'-কার, এই দুই-এর উচ্চারণে যে পার্থক্য এসে যায়, তা থেকেই উচ্চারণের প্রাদেশিকতা ধরা পড়ে—ক'ল্‌কাতায় এই শব্দের আদ্য 'চ' অক্ষর হ'য়ে যায় 'চো' (chō), কিন্তু ঢাকায় হয় 'চই' (tsoi)—cōllum, tsoillam ; তেমনি অন্তঃস্থ 'য' আর 'ক্ষ' এই দুইয়ে যে সংস্কৃত শব্দ হ'ল, তার শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ হ'চ্ছে yak-ṣa

১ বর্তমানে (১৯৭৩) ভারতে এবং স্বাধীন বাঙ্গলাদেশে দশ কোটিরও বেশি লোকের মাতৃভাষা বাঙলা।

হিন্দীতে ব'ল্‌বে yaksh বা yacch, কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় ক'ল্‌কাতা অঞ্চলে এর উচ্চারণ jokkho, পূর্ব বাঙলায় ঢাকা অঞ্চলে dzoikkho। 'ঘ ঝ ঢ ধ ভ'—এই মহাপ্রাণ ঘোষবদ্ ধ্বনিগুলির উচ্চারণ পশ্চিম বাঙলায় এক রকম, আর প্রায় সারা পূর্ববঙ্গ জুড়ে আর এক রকম—যেমন 'বাঘ ভাগ দান ধান'-এর উচ্চারণ পশ্চিম বঙ্গে bɑg bhāg dɑn dhɑn, কিন্তু পূর্ববঙ্গে b'ãg b'ãg dãn d'ãn—'ঘ ধ' এই দুই ধ্বনি পূর্ববঙ্গের ভাষায় একটু গলা-চেপে উচ্চারণ ক'র্‌তে হয়। স্বরধ্বনির উচ্চারণেও সারা বাঙলায় নানা রকম পার্থক্য আছে। ক'ল্‌কাতা অঞ্চলে মাত্র এক রকমের 'আ'-কার আছে, সেই একই 'আ'-কারের ধ্বনি আমরা 'সময়' অর্থে 'কাল' শব্দে, আর 'কল্য' অর্থে 'কাল' শব্দে, kɑl দুইয়েতেই শুনি, কিন্তু বাঙলার প্রায় বেশির ভাগ স্থানে এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ করা হয় নানা ভাবে—যেমন 'সময়' অর্থে 'কাল' হ'চ্ছে kɑl, কিন্তু 'কল্য' অর্থে kãil kɑil kæl kæl^{y} ইত্যাদি। রাঢ়ের বহু স্থলে চলিত অর্থাৎ ক'ল্‌কাতা অঞ্চলের বাঙলার সরল স্বরধ্বনিতে একটু মোড় দিয়ে বাঁকিয়ে বলা হয়—যেমন 'হ'ল এল'-র মতো শব্দে—ক'ল্‌কাতায় hōlō elō, কিন্তু রাঢ়ের কোথাও কোথাও hoiluo eiluo। বাঙলার উচ্চারণের এই যে সমস্ত প্রান্তিক পার্থক্য, সেগুলি উপেক্ষা কর্‌বার বিষয় নয়, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে তা নিয়ে আমরা যতই ঠাট্টাঠুট্টি করি না কেন। এই-সমস্ত আঞ্চলিক উচ্চারণ কেউ কারো চেয়ে হীন বা গ্রাম্য নয়। সকলেই পুরাতন বাঙলা উচ্চারণ-ধারার বংশধর; আর এই-সব প্রান্তিক উচ্চারণ আলোচনা না ক'র্‌লে বাঙলা ভাষার ইতিহাসের নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার করা অসম্ভব। বাঙলা ভাষার আলোচনায় একটা প্রধান অঙ্গ হ'চ্ছে এই সমস্ত প্রাদেশিক বুলি বা উপভাষার ব্যাকরণ আলোচনা; আর ব্যাকরণের জড় বা আধার হ'চ্ছে ধ্বনিতত্ত্ব, উচ্চারণের বিশ্লেষণ। এ তো গেল ঐতিহাসিক আর বৈজ্ঞানিক বিচারের ক্ষেত্র। এ ছাড়া practical বা ব্যাবহারিক দিক একটা আছে। সব বড়ো বড়ো ভাষাতেই সকলের সুবিধার জন্য একটা বিশেষ ধরনের উচ্চারণ সমেত একটি সাধারণ সর্বজনবোধ্য ভাষা গ'ড়ে ওঠে। সেই ভাষাকে শিক্ষিত বা ভদ্র সমাজের মধ্যে ব্যবহার-যোগ্য ভাষা ব'লে সকলেই গ্রহণ ক'রে থাকে; বিভিন্ন অঞ্চলের লোক সভায় একত্র হ'লে সকলেই চেষ্টা করে সেই সর্বজন-বোধ্য আর সর্বজন-স্বীকৃত ভাষা আর তার উচ্চারণ যথাসাধ্য অনুসরণ ক'র্‌তে। অনেক স্থলে এই ভাষা রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে নির্দিষ্ট আর প্রচারিত হ'য়ে থাকে। আজকাল সিনেমা আর রেডিও এই

সর্বজনমান্য ভাষার বুনিয়াদ দেশের লোকেদের মধ্যে পাকাপোক্ত করবার কাজে বিশেষ ভাবে সাহায্য ক'রছে। থিয়েটার সিনেমা আর রেডিওর কল্যাণে আর তা ছাড়া বহুশঃ ইস্কুল-কলেজের মাধ্যমেও—এখন অন্য সব দেশে যেমন পশ্চিমবঙ্গ আর বাঙ্গলাদেশেও তেমনি এক ধরনের সর্বজনস্বীকৃত বাঙলা তার বিশিষ্ট উচ্চারণ-পদ্ধতি নিয়ে গ'ড়ে উঠ্ছে, সর্বত্র প্রচারিত হ'চ্ছে, বাঙলাভাষী জনগণকে এক ক'রে দিচ্ছে। ইংরেজ আমলের আরম্ভ থেকে পশ্চিম বাঙলার ক'ল্‌কাতা শহর সব বিষয়ে বাঙলাভাষী জনগণের মস্তিষ্ক আর হৃদয় হ' য়ে দাঁড়িয়েছে, শিক্ষার কেন্দ্র আর সংস্কৃতির কেন্দ্র—বিষয়-কর্ম রাজ্য-শাসন ব্যবসায়-বাণিজ্য শিল্প-কলকারখানার কেন্দ্র তো বটেই। সারা বাঙলার মানুষ ক'ল্‌কাতায় এসে জমা হ'য়েছে। এতে ক'রে ক'ল্‌কাতার খাঁটি আঞ্চলিক ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর থাকছে না, সে বৈশিষ্ট্য এখন অনেকখানিই অতীতের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ক'ল্‌কাতার উচ্চারণ অবশ্য এখনও অনেকটা সকলের অনুকরণীয় হ'য়ে আছে—আর সর্বজন-স্বীকৃত আধুনিক চল্‌তি বাঙলার ব্যাকরণ—শব্দরূপ ক্রিয়ারূপ প্রভৃতি ক'ল্‌কাতার মৌখিক ভাষার আধারের উপরে হ'লেও অন্য অঞ্চলের ভাষার ছাপও বহুল পরিমাণে তার উপর এসে গিয়েছে আর এসে যাচ্ছে। শব্দপ্রয়োগে Idiom বা ভাষার ভঙ্গিতে এইটি-ই বেশি পরিস্ফুট। উচ্চারণ-বিষয়ে এখন কিন্তু ক'ল্‌কাতার শিক্ষিত সমাজের মৌখিক ভাষা (যে শিক্ষিত-সমাজ খালি পশ্চিম বঙ্গের মানুষ নিয়ে নয়, যার মধ্যে বোধ হয় শতকরা ৬০ এখন বাঙলার অন্য অঞ্চলের—বিশেষ ক'রে পূর্ববঙ্গের মানুষ) সকলের দ্বারা স্বীকৃত হ'য়েছে। ক'ল্‌কাতার রেডিও আর ঢাকার রেডিওর ভাষার মধ্যে উচ্চারণ-গত পার্থক্য কতটুকু? উচ্চারণ-বিষয়ে এক-ই বাঙলা এই দুই বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে প্রচলিত। শিক্ষিত লোকের উচ্চারণ, Standard Colloquial বা Spoken Bengali অর্থাৎ সর্বজন-মান্য মৌখিক বা কথিত বাঙলার উচ্চারণ, এখন সকলের আয়ত্তের বিষয়। এসব বিষয়ে যাঁরা একটু অবহিত, তাঁরা চট্‌পট্‌ ক'রে শিখে ফেল্‌তে পারেন। আবার অনেকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দেন না বা গ্রাহ্য করেন না; তাতে অবশ্য মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। আমার মাতৃভাষা, ঘরের বা পরিবারের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা, আমি যথাযথ ভাবে ব'ল্‌বো, তাতে লজ্জা হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু সমাজে সকলের সুবিধার জন্য সর্বজনের মানদণ্ড স্বরূপ একটা পোষাকী ভাষা আর উচ্চারণ নিতেই হয়, অন্ততঃ নেবার চেষ্টা ক'রতে হয়। সুখের বিষয়, চলিত ভাষার উচ্চারণ নানা বিষয়ে বাঙলার অন্য প্রাদেশিক উচ্চারণের

তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল আর সহজ। অবশ্য, স্বরধ্বনির পরিবর্তনের কতকগুলি নিয়ম বাঙলা উচ্চারণের এক খাস বৈশিষ্ট্য—সেই সব নিয়ম সারা বাঙলায় বিভিন্ন প্রাদেশিক বুলিতে কোনও-না-কোনও ভাবে বিদ্যমান আছে ; অবাঙালীর পক্ষে সে-সব নিয়ম পরিশ্রম ক'রে আয়ত্ত করার ব্যাপার, আমরা অবশ্য সহজ ভাবেই ক'রে থাকি। যেমন 'অ'-কারের 'ও' উচ্চারণ : 'কর্' ধাতুতে—'সে করে' ব'ল্লে, এখানে 'অ' -উচ্চারণ, কিন্তু 'আমি করি'-র বেলায় 'কর্'-ধাতুর 'অ'-কারটি 'ও'-কার হ'য়ে যায়। 'একাকী' শব্দে সহজ 'এ', কিন্তু 'একা' বা 'একটা' শব্দে বাঁকা 'এ' (অ্যা)। চল্তি বাঙলায় মোটামুটি সাতটি স্বরধ্বনি আছে—'ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ'। আর এই সব স্বরধ্বনি মিলিয়ে ২৫টি **diphthong** বা সন্ধ্যক্ষর হয়, যেমন 'এই, উই, আই, এউ, ইয়ে, উয়ে, ওই, ওউ' (**ei, ui, ai, eu, ie, ue, oi, ou**), ইত্যাদি। ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি মোটামুটি নিখিল ভারতের অন্যান্য কয়েকটি প্রধান ভাষার সঙ্গে তাল রেখে চলে—শব্দের আদিতে মহাপ্রাণ বর্ণ ঠিকমতো উচ্চারিত হয় (খ, ছ, ঠ, থ, ফ ; ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ)। ই-কারের উচ্চারণ বিকৃত হয় না ; আর তালব্য বর্ণগুলিকে ঘৃষ্টতালব্য রূপেই উচ্চারণ করা হয়—**c, ch, j, jh**—ঘৃষ্ট বা সোষ্ম দন্ত্য রূপে নয় (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের **ts** বা **s, dz, dz'** উচ্চারণ, ক'ল্‌কাতার চলিত ভাষাতে অজ্ঞাত)। অবাঙালীর পক্ষে একটু কঠিন হয় আমাদের কতকগুলি সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ—যেমন 'ক্ষ' অর্থাৎ 'কৃষ' স্থানে 'খ্য, 'জ্ঞ' অর্থাৎ 'জ্‌ঞ' স্থানে 'গ্যঁ', 'হ্য' স্থানে 'জ্‌ঝ', ইত্যাদি। বাঙলা উচ্চারণ আরও বহু ভাষার উচ্চারণের মতো একটু জটিল ব্যাপার ॥

বেতার জগৎ, বর্ষ ২৮, সংখ্যা ১৯, ১৩৬৪।

বাঙলা উচ্চারণ শিক্ষা

সেদিন ক'ল্‌কাতার সাহিত্যিকদের বিখ্যাত মিলন-সভা 'রবিবাসর'-এর এক অধিবেশনে, আজকাল বাঙলা উচ্চারণ নিয়ে যে দুর্দশা দেখা দিয়েছে, সে কথা নিয়ে একটু আলোচনা হ'য়েছিল—তাতে আমাকে আহ্বান করা হয়। 'রবিবাসর'-এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই বিষয়ের অবতারণা করেন। তিনি আক্ষেপ ক'রে বলেন—আজকাল বাঙলা যে ভাবে পড়া হয় বা বাঙলায় যে ভাবে বক্তৃতা দেওয়া হয়, তাতে পাঠক বা বক্তা এই ভাষার যে একটা স্বকীয় ভদ্র উচ্চারণ-রীতি আছে, সে বিষয়ে কিছু মেনে চলেন না। তিনি আজকাল প্রায়ই রেডিও শোনেন। তাঁর অনুযোগ হ'ল যে রেডিওতে খবর বল্‌বার সময়ে রেডিওর কর্মচারীরা যে ভাবে বাঙলা পাঠ করেন, সেটা তাঁকে পীড়া দেয়। তাঁর অভিযোগ হ'ল যে অনেক দেশী নামের কদর্য্য উচ্চারণ করা হয়, যে সব নাম সহজেই শুদ্ধভাবে বলা যায়। আরও ব'ল্‌লেন যে, খবরের কাগজের লেখকেরাও এ বিষয়ে অবহিত বা সংযত নন; যেমন, আজকাল প্রায় রোজই কেরলের কথা শোনা যায়, কিন্তু রেডিওতে কোনো কোনো সংবাদ-পাঠক উচ্চারণ করেন "কেরালা"; আর সেটা কতকটা শোনায় যেন "ক্যারালা"। একমাত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নাকি "কেরল" এই শুদ্ধ বানান ঠিকমতন লেখেন। বাঙলা রেডিওর সংবাদ-পাঠক ইংরিজি **Kerala** বানানটার দিকে নজর রাখেন, কিন্তু বাঙলাতে যে সংস্কৃত শব্দেরই মতন এই শব্দটিরও উচ্চারণ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে খেয়াল করেন না। তা ছাড়া, চল্‌তি বাঙলা শব্দের ক্ষেত্রেও অনেক গোলমাল দেখা যায়। যেমন শব্দের আদ্যক্ষরে 'অ'-কারের উচ্চারণ নিয়ে। শুদ্ধ চলিত ভাষায় কতকগুলি নিয়ম আছে —কোথায় কোথায় প্রথম অক্ষরের 'অ'-ধ্বনি 'ও'-রূপে উচ্চারিত হয় তা নিয়ে। নাম হিসাবে আমরা যখন 'অখিল, অতুল' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করি, তখন আমরা ব'লে থাকি, 'ওখিল, ওতুল'। আর যখন আমরা এই 'অ'-এর বিশুদ্ধতা বজায় রাখি, তখন তার একটা কারণ থাকে।—এইরকম তিনি কতকগুলি উদাহরণ দেখালেন আর এই আক্ষেপ ক'র্‌লেন যে এটা মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার-ই পরিচায়ক। প্রায় সব দেশেই রেডিওতে যে উচ্চারণ গ্রহণ করা হয়, লোকে সেটিকে সেই দেশের ভাষার পক্ষে প্রামাণিক ব'লে মনে করে। আর সেইজন্যে তিনি এই কামনা জানান যে, এই বিষয়ে যেন রেডিওর কর্তৃপক্ষ

একটু সচেতন হন। তিনি আশা প্রকাশ ক'র্লেন যে, এই বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই একটু সচেতন হবেন।

এ বিষয়ে আমাকে কিছু ব'ল্তে অনুরোধ করা হয়। আমি বলি, আজকাল বড়ো দুঃখের বিষয় যে অনেক ইস্কুলেই মাষ্টার-মহাশয়েরা বাঙলা উচ্চারণ বিষয়ে ছেলেদের কোনো রকম নির্দেশ দেন না। এক তো আমরা এখন একটা সন্ধিক্ষণে প'ড়েছি। সমগ্র বাঙলা দেশের নানা জায়গা থেকে বিভিন্ন প্রাদেশিক উচ্চারণে অভ্যস্ত মানুষ—মেয়ে, পুরুষ—পশ্চিম বঙ্গে বিশেষতঃ ক'ল্কাতার মতো বড়ো শহরে এসে একত্র হ'চ্ছে, আর আমাদের সব রকমের প্রাদেশিক উচ্চারণের প্রভাব-ই চল্তি বাঙলা বা কথিত বাঙলাতে এসে যাচ্ছে—তাকে আট্কাবার কোনো উপায় নেই। এটা সকলে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে, ক'ল্কাতা আর ভাগীরথী নদীর দুই তীরের অঞ্চলের ভাষা ব্যাকরণে আর উচ্চারণে সারা বাঙলার পক্ষে একটা মান বা আদর্শ ব'লে গৃহীত। চট্টগ্রামের কোনো বঙ্গভাষী ব্যক্তি যদি রংপুরের আর একজন বাঙালীর সঙ্গে কথা কন, তা হ'লে দু'জনেই চেষ্টা ক'র্বেন যতটা সম্ভব ভাগীরথী-অঞ্চলের চলিত ভাষার-ই রীতি আর উচ্চারণ অনুসরণ ক'র্তে। কেউ যদি তা ক'র্তে পুরোপুরি সমর্থ না হন, তাতে কেউ ভয়ংকর একটা অপরাধ হ'য়ে গিয়েছে মনে ক'র্বেন না, যদিও প্রাদেশিক উচ্চারণ নিয়ে একটু হয়তো ঠাট্টাহাসি মশকরা হ'য়ে থাকে। আর যাঁরা নিজেদের প্রাদেশিক উচ্চারণ সম্বন্ধে সচেতন, তাঁরাও জোর গলায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখ্লে কারো আপত্তি করার কিছু থাকে না। কিন্তু তা হ'লেও ইস্কুলে সর্বত্র কতকগুলি বিষয়ে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। অন্ততঃ আমরা যখন ইস্কুলে প'ড়েছি, সেই সময়ে আমরা এটা দেখেছি। খাস ক'ল্কাতার অধিবাসী কোনও কোনও বাঙালী হিন্দুর মুখে 'ড়' আর 'র' এই দুইয়ের উচ্চারণে গোলমাল হ'ত—"ঘরভাড়া"-র স্থলে 'ঘড়ভারা' লেখাও দেখা যেত। পূর্ববঙ্গের বহু স্থলে 'ড়'-এর বদলে 'র'-এর ধ্বনি প্রচলিত, যদিও ঢাকা জেলার কোথাও কোথাও 'র'-এর পরিবর্তে 'ড়'-ই শোনা যায়। আবার বীরভূম প্রভৃতি জেলায় 'ড়' উচ্চারণই বেশি প্রচলিত। আমাদের ইস্কুলের মাষ্টার-মশায়েরা এইসব উচ্চারণ সংশোধন ক'রে দিতেন—'পাড়' আর 'পার', 'খড়' আর 'খর', 'বাড়ন' আর 'বারণ', 'পাক' আর 'পাঁক' প্রভৃতি শব্দ উদ্ধার ক'রে বুঝিয়ে দিতেন উচ্চারণে গোলমাল হ'লে অর্থেও গোলমাল হয়; সেটা বুঝিয়ে দিয়ে ঠিক উচ্চারণ শিখ্তে তাঁরা সাহায্য ক'র্তেন। এখন কিন্তু দেখ্ছি এ বিষয়ে কেউ-ই যেন গ্রাহ্য করেন

না। কোনও একটি সভায় একটি মেয়ে রবীন্দ্রনাথের রচিত গান গাইছে—চমৎকার গলার স্বর আর তালের জ্ঞানও তার সুন্দর, কিন্তু সব গোলমাল ক'রে দিলে এই রকম ভাবে গানের কথাগুলি উচ্চারণ করাতে—

আমাড় মাথা নত ক'ড়ে দাও হে তোমাড়
চড়ণ-ধূলাড় তলে।

কোনো ইস্কুলের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় গিয়েছি। সেখানে ছেলেদের মুখে বাঙলা 'আব্‌রিত্তি' শুন্‌তে হ'ল (মাষ্টার-মশাইদের মুখে শুনেছি এইরকম উচ্চারণ—'আবৃত্তি বিকৃত পিতৃদায় অমৃত' প্রভৃতির স্থানে 'আব্‌রিত্তি বিক্‌রিত পিত্‌রিদায় অম্‌রিত')। কেউ তাদের ব'লে দেন নি যে, 'ঋ'-কার আর 'ই'-যুক্ত 'র'-ফলা, এই দুইয়ের মধ্যে শুদ্ধ বাঙলা উচ্চারণে পার্থক্য করা হয়।

ছেলেরা বেশ ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ ব'লে যাচ্ছে, কিন্তু সর্বত্রই, 'শ ষ স' এই তিনটির যে চলিত বাঙলা উচ্চারণ হ'চ্ছে তালব্য 'শ', সে বিষয়ে খেয়াল না ক'রে আজকাল ক'ল্‌কাতার ছেলেরা হিন্দুস্থানী-ঘেঁষা ইংরিজি s-এর মতো উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছে। বাঙলায় একটিমাত্র 'শ' ধ্বনি আছে—এটি মাগধী প্রাকৃতে ছিল, বাঙলা তা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে এই 'শ'-উচ্চারণ পেয়েছে। শুদ্ধ বাঙলা ব'ল্‌তে গেলে সংস্কৃত 'সবিশেষ' শব্দটাকে আমরা যে ভাবে বাঙলা উচ্চারণ ক'রে থাকি—'শবিশেশ্‌'—তাতে সংস্কৃত উচ্চারণের রীতি ধ'র্‌লে আমরা পাঁচটি ভুল ক'রে থাকি; কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু বাঙলা হ'চ্ছে বাঙলা, সংস্কৃত নয়, বাঙলার পক্ষে 'শবিশেশ্‌' উচ্চারণ-ই ঠিক। যদিও যখন আমরা সংস্কৃত ব'ল্‌বো, তখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত সংস্কৃতের মতো **sa-wi-śe-ṣa** এইভাবে বল্‌বার। কিন্তু এখানেও যদি বাঙলায় দন্ত্য 'স' বা ইংরেজি s-এর উচ্চারণ শুনি, তা হ'লে এ-রকম উচ্চারণের ফলে যিনি উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছেন তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা আর সামাজিক পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে লোকের মনে একটি বিপরীত ভাব হওয়া অসম্ভব নয়।

এই আলোচনায় আরও দুই-একজন যোগ দিয়েছিলেন। কেবল একটি সাহিত্যিক-মণ্ডলীর ঘরোয়া আলোচনার মধ্যে এটি নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়। আমাদের শুদ্ধ বাঙলা শিক্ষাতেও এটি আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত। যেমন **orthography** বা 'শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস' লিখিত ভাষাকে আয়ত্ত কর্‌বার জন্য অপরিহার্য্য ব'লে বিবেচিত হয়, তেমনি **ortho-epy** বা 'শুদ্ধ উচ্চারণ' সে ভাষাতে সংলাপ-শিক্ষার একটা অনুরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হওয়া উচিত।

এ বিষয়ে আমাদের কর্তারা বা শিক্ষকেরা আমাদের বাল্যকালে ততটা জোর দেন নি। প্রথম কথা, বেশি ছেলে ইস্কুলে প'ড়্‌তে আস্‌ত না, আর তাদের অনেকের উচ্চারণে হয়তো প্রথমটায় একটু প্রাদেশিকতা থাক্‌ত। শুদ্ধ চলিত ভাষায় উচ্চারণ তারা নিজেরাই আয়ত্ত ক'রে নিত, আর সহপাঠীদের ঠাট্টাবিদ্রূপ এই কাজটিতে তাদের সাহায্যও ক'র্‌ত। এখন ছেলেরা সংখ্যায় অনেক হ'য়ে গিয়েছে, নানা জায়গা থেকে ছেলেরা আস্‌ছে, তা ছাড়া ক'ল্‌কাতার মতো শহরে হিন্দী প্রভৃতি ভাষারও একটা পরোক্ষ প্রভাব তাদের মধ্যে এসে যাচ্ছে। এখন উচ্চারণ শেখাবার দরকার দেখা দিয়েছে। ইংলাণ্ডে শুদ্ধ ইংরিজি উচ্চারণ এখন ছেলেদের যত্ন ক'রে শেখানো হয়। আর ইংরিজির মতো ভাষার এক **United Kingdom** বা সংযুক্ত রাজ্যে দুটি মান বা **standard** মেনে নেওয়া হ'য়েছে— **Scottish Standard** আর **South English Standard**। আবার আমেরিকাতেও উত্তর-পূর্ব স্টেটগুলির উচ্চারণও সাধারণতঃ মার্জিত ব'লে স্বীকার করা হয়। বহুদিন পূর্বে যখন স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় তাঁর বিরাট বাঙলা ভাষার অভিধান প্রকাশিত করেন, তখন তিনি কতকগুলি শব্দের উচ্চারণ বাঙলা অক্ষরের মাধ্যমে প্রকাশিত কর্‌বার চেষ্টা করেন। যেমন, 'অকস্মাৎ' শব্দ —এটির উচ্চারণ তিনি দিয়েছেন এভাবে 'অকোশ্‌শাৎ'। তাঁর অভিধানের ভূমিকায় তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন—শব্দের আদ্য অক্ষরের 'অ'-কারের উচ্চারণ ধ'রে কিরকম অর্থের পরিবর্তন হয়; যেমন, "অস্থির অঙ্গার"; যদি বলি "ওস্থির অঙ্গার", তা হ'লে বুঝ্‌বো "হাড়ের কয়লা"; 'ওস্থির' শব্দটি 'অস্থি' শব্দের, অর্থাৎ বাঙলা উচ্চারণে 'ওস্থি' শব্দের, 'র'-বিভক্তিযুক্ত সম্বন্ধ-পদের রূপ। আবার "অ-স্থির অঙ্গার" ব'ল্‌লে বুঝ্‌বো, যে আগুনের ফিন্‌কি স্থির নয়। কোনও বাঙালী কবি এক জায়গায়, "খোয়াবগা", এই সাধারণ্যে অপরিচিত শব্দটি ব্যবহার ক'রেছিলেন; শব্দটির মানে হ'চ্ছে 'শোবার ঘর'—'খোয়াব্‌' অর্থে 'নিদ্রা' আর 'গাহ্‌' অর্থে 'স্থান'; কিন্তু অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠক প'ড়্‌লেন "খোয়া-বগা" রূপে, যেন ঐ শব্দটা 'খোয়া' আর 'বগা' এই দুটো ভিন্ন শব্দ জুড়ে তৈরি হ'য়েছে—'খোয়া' আর 'বগা' শব্দ দুটোর মানে যাই হোক।

বিদেশী শব্দের ঠিক বাঙলা উচ্চারণ আর প্রতিবর্ণকরণ দেখাবার প্রয়াস জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে করা হ'য়েছে। তাঁর বইয়ের প্রথম আর দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তর বিদেশী নামের বাঙলা প্রতিবর্ণ দেখানো হ'য়েছে। ছেলেদের এই

বিষয়ে একটু দৃষ্টি দেওয়ার সময় এসেছে। ইংলাণ্ডে ইংরিজি ভাষার উচ্চারণ শিখ্‌বার জন্যে ছোটোখাটো বই আছে, আর আছে অধ্যাপক **Daniel Jones** ডেনিয়েল জোন্স্‌-এর বিখ্যাত বই **The Pronouncing Dictionary of the English Language**। অনুরূপ চেষ্টা বাঙলাতেও হ'য়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ ঠাকুর একটি ছোট্ট বাঙলা উচ্চারণ-নির্দেশক অভিধান বা'র ক'রেছেন। কিন্তু সব জায়গায় জিনিসটা এখনও পরিষ্কার হয় নি। বাঙলাতে হিন্দীর নকলে এক নোতুন সংযুক্ত-বর্ণ 'স্ট' চ'ল্‌ছে। এই নোতুন বর্ণটি তৈরি ক'র্‌তে হ'ল এইজন্যে যে, ইউরোপীয় ভাষায় দুটি সংযুক্ত ধ্বনি পাওয়া যায়—sh+t আর s+t। ইংরিজিতে stone, stop প্রভৃতির জন্যে 'স্টোন্‌, স্টপ্‌' লিখ্‌লে, উচ্চারণটা অনেকটা-ই ধরিয়ে দেওয়া হয়; কিন্তু অনেকে এই ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেন না। বাঙলার শব্দ হ'চ্ছে 'খ্রীষ্ট', 'খ্রীষ্টান', 'মাষ্টার'; কিন্তু ইংরিজিতে 'ক্রাইস্‌ট্‌', 'ক্রিশ্চিয়ান্‌', 'মাস্‌টর'। বাঙলায় 'যীশু খৃষ্ট' লেখা ভুল, কারণ কোনো বাঙালী 'খ্রীস্‌ট' বলেন না, 'মাষ্টার মশাই'কে কেউ 'মাস্‌টর মশাই' বলেন না।

এরকম অনেক ছোটোখাটো ব্যাপার আছে। মাতৃভাষার প্রতি আমাদের সকলের একটু ভালোবাসা নিয়ে একটু দরদ নিয়ে চলা উচিত; আর মাতৃভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে যদি আমরা অবহিত না হই, তা'হলে ভাষার দ্রুত অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে আমাদের ক'লকাতার ছেলেরা একেবারে নিরঙ্কুশ। কল্‌'কাতার ছেলেদের মুখে এরকম কথাও শুনেছি—"কি মোআই, আওঁনার জন্যে যে মিঁইপ্‌-পোঁ-ওঁ-ওঁ ধোএ বোয়ে আছি", অর্থাৎ "কি মশাই, আপনার জন্যে যে মিনিট পনেরো ধ'রে ব'সে আছি।" এরকম প্রাকৃতকে-হার-মানানো অনেক উচ্চারণ শুন্‌তে অনেক পাওয়া যায়। ইংরিজিতে **Sanskrit** শব্দটি ছেলেদের মুখে শোনায় যেন 'স্যায়েঁস্‌কীট্‌'; ইংরিজি **generally** শোনায় যেন 'জে'এঁয়ালি'। আমাদের মাতৃভাষার অনেক শব্দেরও এই রকম দুর্দশা হ'য়েছে আর হ'চ্ছে। প্রত্যেক বাঙলা ব্যাকরণে বাঙলা উচ্চারণের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দেখানো উচিত; আর এ বিষয়ে প্রধান কর্তব্য হ'চ্ছে বাঙলার শিক্ষক মহাশয়দের। তাঁরা কতটুকু ভালোবাসা নিয়ে, শ্রদ্ধা নিয়ে মাতৃভাষার চর্চা করেন, তার উপর নির্ভর করে তাঁরা ছেলেদের কী শেখান না শেখান॥

শিক্ষক, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৬।

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ও 'চলন্তিকা'

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের নাম, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত স্বল্প মাত্রও পরিচয় যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের নিকট সুপরিচিত। ইঁহার রচিত 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী' অনাবিল হাস্যরসের উৎস হইয়া চিরকাল বাঙ্গালা সাহিত্যকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। ভারতবর্ষের সাহিত্যে ইঁহার এই রসরচনা একটি নূতন ধারা আনয়ন করিয়াছে। তিনি যে প্রগাঢ় সহানুভূতি, সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত মানুষের মুখের কথায় এবং চলা-ফেরায় ও ধরন-ধারণে তাহাদের মনের ভাব ধরিয়া ফেলিয়াছেন, ও আমাদের প্রত্যেকের পরিচিত এক-একটি সামাজিক type বা বিশেষ চরিত্রের প্রতীককে তাহার স্বরূপে সকলের প্রীতি-বিস্ময়পূর্ণ কৌতুক-হাস্যের মধ্যে আমাদের চোখের সামনে উপস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচায়ক,— এবং এই প্রতিভার যাদুকরের মতো শক্তি আমাদেরও ভীতি উৎপাদন কবে— বুঝি বা লেখক আমাদেরও দুই একটা বাজে মুখের কথায় বা অজ্ঞাতে কৃত কাজের দ্বারা আমাদেব মধ্যে যে সমস্ত হাস্যকর দৌর্বল্য আছে তাহা ধরিয়া ফেলিয়া সকলের সমক্ষে আমাদেবও হাস্যাস্পদ করিয়া ফেলেন। বিশেষ সাধুবাদের সহিত বাঙ্গালী জাতি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বাবুর এই দান গ্রহণ করিয়াছে। শুধু বাঙ্গালী জাতি বা বঙ্গভাষাপাঠী জনগণ কেন, ইঁহার গল্পের হিন্দী অনুবাদের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালার বাহিরে হিন্দী পাঠকমণ্ডলীও ইঁহার গুণগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছেন। সম্প্রতি এই হাস্যস্নিগ্ধ রসরচনার স্রষ্টার নিকট হইতে বাঙ্গালী এক অপ্রত্যাশিত নূতন দান পাইল—তাঁহার সংকলিত 'চলন্তিকা' অভিধান (প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ)। নানা বিষয় ধরিয়া বিচার করিলে, বইখানি যে অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে, এবং বাঙ্গালভাষা-আলোচনাকারী ব্যক্তির পক্ষে এই কাজের কথায় পূর্ণ, সংক্ষিপ্ত, সরল, সহজ-ব্যবহার্য্য অভিধানখানি যে অপরিহার্য্য হইবে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান প্রণয়ন ব্যাপারটি খুব পুরাতন নহে। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে হাজার বছর হইল, এই হাজার বছরের মধ্যে বাঙ্গালী নিজভাষার অভিধান প্রণয়ন করিবার আবশ্যকতা আপনা হইতেই উপলব্ধি করে নাই। এ বিষয়ে বিদেশী আসিয়া তাহাকে প্রথম পথ দেখাইল। তাহার

মাতৃভাষার প্রচলিত শব্দগুলি তাহার নিকটে সুপরিজ্ঞাত। উচ্চ বা নূতন ভাব প্রকাশ করিতে হইল, তাহাকে সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হইত। এই জন্য বাঙ্গালীকে সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার আলোচনা করিতে হইত, এবং যে বাঙ্গালী সংস্কৃত লিখিবে না, কেবল বাঙ্গালাই লিখিবে, তাহারও পক্ষে অমরকোষ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দকোষ মুখস্থ করা আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হইত; গভীরভাবে সংস্কৃতের চর্চা করার উদ্দেশ্য না থাকিলেও বাঙ্গালা দেশের পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা লেখায় ও হিসাবে ছেলেরা কিছু অগ্রসর হইলেই তাহাদিগকে অমরকোষ ধরানো হইত। সংস্কৃত অভিধানের সহিত পরিচয় থাকিলেও মাতৃভাষার অসংস্কৃত শব্দের অভিধান সংকলন করিবার কথা বাঙ্গালী কখনও মনে করে নাই। অথচ সংস্কৃত অভিধানের শব্দের অর্থ বুঝাইবার জন্য অনেক সময় পণ্ডিতেবা বাঙ্গালার প্রাকৃতজ বা দেশী শব্দের আশ্রয় লইতেন। খ্রীষ্টীয় ১১৫৯ সালে বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ বাঙ্গালা দেশে অমরকোষের একখানি বিরাট টীকা লেখেন। এই টীকার স্থানে স্থানে শব্দগুলির প্রতিশব্দ হিসাবে তখনকার দিনে প্রচলিত প্রায় তিনশত বাঙ্গালা শব্দ তিনি দিয়া গিয়াছেন।[১] সর্বানন্দের টীকা বাঙ্গালা দেশে লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু সুদূর কেরল দেশে ইহার চর্চা ছিল, কেরলাক্ষরে মালয়ালীভাষী পণ্ডিতদের মধ্যে ইহার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, এবং এই পুঁথি হইতে সমগ্র পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে। কেরল দেশে রক্ষিত হওয়ার দরুন এই টীকায় ধৃত বাঙ্গালা শব্দগুলি তাহাদের প্রাচীন রূপ বেশি বদলাইতে পারে নাই; বাঙ্গালা দেশে বইখানির চল থাকিলে, নূতন করিয়া ইহার পুঁথি নকলের সময়ে এই শব্দগুলির রূপও পরিবর্তিত হইয়া যাইত, দ্বাদশ শতকের প্রাচীনত্ব থাকিত না। এখন এই শব্দগুলি প্রাচীন বাঙ্গালার আলোচনার জন্য বড়োই উপযোগী। এক হিসাবে—লেখকের অনভিপ্রেত বা উদ্দেশ্য-বহির্ভূত হইলেও সর্বানন্দের টীকা-সর্বস্বে প্রথম বাঙ্গালা শব্দ-সংগ্রহ আমরা পাই, ইহা বলিতে পারি।

পরিবর্তন-ধর্ম অনুসারে, প্রাচীন ভাষা যেখানে বুঝিবার পক্ষে কঠিন হয়, কিংবা যেখানে অজ্ঞাত বা বিদেশী ভাষা শিখিবার দরকার হয়, সেখানেই অভিধানের সৃষ্টি না হইয়া যায় না। বৈদিক ভাষার অনেক শব্দ পরবর্তী যুগে অপ্রচলিত হইয়া গেলে, ইহাদিগকে বুঝিয়া আয়ত্ত করিবার জন্য নিঘণ্টু ও নিরুক্ত হইল। পরবর্তী সংস্কৃতের শব্দসম্পদ অতুল হইয়া দাঁড়াইল, অনেক শব্দ কেবল

---

১ দ্রষ্টব্য বর্তমান সংকলনে পুনর্মুদ্রিত 'খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গলা' প্রবন্ধ, পৃঃ ১৫।

সাহিত্যেই প্রযুক্ত হইত, লোক-ব্যবহারে সেগুলির তাদৃশ চলন ছিল না; সুতরাং যাহারা সাহিত্য-চর্চা করিবে তাহাদের পক্ষে সেই সকল বিশেষ শব্দ জানিবার সুবিধার জন্য নানা কোষগ্রন্থ অর্বাচীন যুগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ ঘরে যাহারা দ্রাবিড় ভাষা বলে, এরূপ লোকেদের পক্ষে সংস্কৃত অভিধান অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়িল। চীনারা এদেশে আসিয়া বা এদেশের বাহিরে থাকিয়া সংস্কৃত পড়িত, তাহারা সংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ করিয়া চীনা অক্ষরে তাহার উচ্চারণ ও চীনা ভাষায় তাহার অর্থ দিয়া কতকগুলি সংস্কৃত-চীনা অভিধান রচনা করিয়া ফেলিল; খ্রীষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতকের এইরূপ দুইখানি অভিধান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক কিছুকাল হইল প্যারিস হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।[২]

বাঙ্গালী মন দিয়া সংস্কৃতই পড়িত, এবং সহজ জ্ঞানের বলে মাতৃভাষা বাঙ্গালায় কাব্য লিখিত বা বাঙ্গালা ভাষায় গান বাঁধিত, ও নিজ শিক্ষা রুচি ও সাহিত্যিক শালীনতা-বোধ অনুসারে সংস্কৃতের শব্দ চয়ন করিয়া আনিয়া তাহার বাঙ্গালা রচনা অলংকৃত করিতে চেষ্টা করিত। যে বিদেশী তুর্কী পাঠান ও মোগল বাঙ্গালা দেশের রাজা হইয়া আসিত, তাহাদিগকে এই দেশে ঘর বাঁধিয়া বসবাস করিতে হইত, এবং ক্রমে বাধ্য হইয়া ভাষায় ও ভাবে আস্তে আস্তে তাহাকে বাঙ্গালী বনিয়া যাইতে হইত। এই সকল বিদেশী এদেশের বাঙ্গালা ভাষীদের সহিত বাস করিয়া আস্তে আস্তে বাঙ্গালা শিখিত; ইহাদের শিখিবার তাড়াতাড়ি ছিল না বলিয়া, ইহাদের উপযোগী করিয়া ফার্সী ভাষায় বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হয় নাই।

তারপর বিদেশীদের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে আসে পোর্তুগীসেরা। স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্য লইয়া ইহারা আইসে নাই; এ দেশের লোকেদের সহিত ব্যবসা করিয়া অর্থশালী হইবে, এবং এ দেশের লোকেদের মধ্যে নিজেদের ধর্ম প্রচার করিবে, ও সুবিধা পাইলে নিজেদের রাজশক্তি বিস্তার করিবে,—এই উদ্দেশ্যে ইহাদের ভারতে আগমন হইয়াছিল। দেশের লোকেদের সহিত বন্ধুত্ব করা ইহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ছিল—বিশেষতঃ ইহাদের ধর্ম প্রচারকদের পক্ষে। ভারতে ও অন্য দেশে যে যে স্থানে পোর্তুগীস পাদ্রিদের আগমন ঘটিল, সেই সেই

---

২ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য লেখকের 'প্রবোধচন্দ্র বাগচী'-শীর্ষক প্রবন্ধ, 'জিজ্ঞাসা' হইতে প্রকাশিত 'মনীষী স্মরণে' পুস্তকের পৃঃ ২০৫-০৬।

স্থানের ভাষা শীঘ্র শীঘ্র আয়ত্ত করিয়া লইবার জন্য ইহারা চেষ্টিত হইল। ফলে, ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন প্রথম পোর্তুগীসদের হাতেই ঘটিল। গোয়ার ভাষা কোঙ্কণী-মারাঠী, দ্রাবিড় দেশের ভাষা তামিল, এবং বাঙ্গালা—এই তিনটি ভাষা প্রথমেই পোর্তুগীস পাদ্রিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল; এবং এইরূপে পোর্তুগীসদের হাতে বাঙ্গালার প্রথম ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন ঘটিল—তাহাদের নিজেদের শিখিবার জন্য।

খ্রীষ্টীয় ১৫৯৯ সালে Dominic Sosa দোমিনিক সোসা নামে একজন পোর্তুগীস পাদ্রি বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া লইয়া এই ভাষায় খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন (এই বইখানি পাওয়া যায় নাই)। দোমিনিক সোসার অনুবর্তী পাদ্রিরা ইঁহার নিকটেই প্রথমে বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। এবং ইহাও সম্ভব যে নিজ ছাত্রদেব ব্যবহারের জন্য পাদ্রি দোমিনিক বাঙ্গালার প্রথম ব্যাকরণ ও অভিধান লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, বাঙ্গালা দেশে আগত পোর্তুগীস পাদ্রিদের মধ্যে এই রূপে বাঙ্গালা ভাষা আলোচনার রীতি চলিয়া আইসে, এবং এই বীতির ফলে, ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন নগরে পাদ্রি মানোয়েল-দা-আস্‌সুম্প্‌সাওঁ-এর কৃতি প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ (পোর্তুগীস ভাষায়) ও বাঙ্গালা-পোর্তুগীস এবং পোর্তুগীস-বাঙ্গালা শব্দ-সংগ্রহ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বিদেশী ভাষার সাহচর্য্যে বাঙ্গালা ভাষার ইহা-ই প্রথম অভিধান।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা অক্ষর প্রথম ছাপায় উঠিল—হুগলী হইতে নাথানিয়েল ব্রাসী হালহেড বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লিখিলেন ইংরেজি ভাষায়, কিন্তু বাঙ্গালা হরফ ব্যবহার করিলেন। ইহার কুড়ি বছর পরে কলিকাতায় ইংরেজ কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য কলেজ-অফ-ফোর্ট-উইলিয়াম-এ দেশভাষা আলোচনার একটি বড়ো কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল এবং বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য পাঠ্য পুস্তক ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নের ধুম পড়িয়া গেল। শ্রীরামপুরে ইংরেজ মিশনরীগণ একটি প্রাচ্যবিদ্যার কেন্দ্র গড়িয়া তুলিলেন, সেখানেও উইলিয়াম কেরী প্রমুখ পাদ্রিদের চেষ্টায় নানা দিক দিয়া বাঙ্গালা ভাষার সেবা হইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে ফরুস্টার সাহেব ১৭৯৯ হইতে ১৮০২ সালের মধ্যে দুই খণ্ডে এক ইংরেজি-বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা-ইংরেজি অভিধান প্রকাশ করিলেন। অন্য ছোটোখাটো অভিধানও বাহির হইল। উইলিয়ম কেরী ১৮১৫ সালে শ্রীরামপুর হইতে তাঁহার বিখ্যাত বাঙ্গালা-ইংরেজি অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিলেন (দ্বিতীয় সংস্করণ,

সংশোধন ও সংযোজন সহ, ১৮১৮); ইহার দ্বিতীয় খণ্ড দুই ভাগে প্রকাশিত হইল ১৮২৫ সালে। কেরীর পরে লণ্ডন হইতে ১৮৩৩ সালে স্যর জী. সী. হটন (Haughton) তাঁহার বিরাট **A Dictionary, Bengalee and Sanskrit, explained in English, and adapted for students of either language; to which is added An Index, serving as a reversed Dictionary** প্রকাশ করেন। এই বইয়ে বাঙ্গালা বর্ণমালার ক্রমে শব্দগুলি সজ্জিত আছে, এবং হটন যথাসম্ভব শব্দগুলির মূল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায় একশত বৎসর হইল এই বই সংকলিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও ইহার উপযোগিতা ফুরাইয়া যায় নাই।

ইহার পর পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ছোটো বড়ো অনেকগুলি অভিধান প্রকাশিত হয়; কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই সে-সব অভিধানের উদ্দেশ্য—বাঙ্গালীকে ইংরেজি শেখানো; বেশির ভাগ অভিধানই হইতেছে ইংরেজি-বাঙ্গালা অভিধান। রামকমল সেন ১৮৩৪ সালে ডাক্তার জন্‌সনের বিরাট ইংরেজি অভিধানকে অবলম্বন করিয়া এক ইংরেজি-বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। এই সকল অভিধান প্রণয়নে ইংরেজি শব্দের বাঙ্গালা (অর্থাৎ সংস্কৃত) প্রতিশব্দ স্থির করিয়া দিতে ইঁহাদের অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অনেক নূতন সংস্কৃত শব্দও ইঁহাদের বানাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এই সব বইয়ের ভার যতই হউক না কেন, ধার ততটা ছিল না; ইঁহাদের প্রদত্ত অনেক শব্দ এখন বাঙ্গালায় অচল। বাঙ্গালা-ইংরেজি অভিধানগুলির উদ্দেশ্য ঐ এক—ইংরেজি অনুবাদের সাহায্য করিয়া ইংরেজি শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেওয়া। এই বাঙ্গালা-ইংরেজি অভিধানগুলি অধিকাংশ স্থলে কেরীর ও হটনের গ্রন্থদ্বয়েরই আধারের উপর সংকলিত হইত।

বাঙ্গালা শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাখ্যা বা প্রতিশব্দ-মূলক (অর্থাৎ খাঁটি বাঙ্গালা) অভিধান অনেক কাল ধরিয়া বাহির-ই হয় নাই। সেই পূর্বের মতো কেবল অমরকোষ মুখস্থ করা হইত,—ক্বচিৎ বা অমরকোষের লঘু বাঙ্গালা সংস্করণও চলিত, পাঠশালার ছেলেরা মুখস্থ রাখিত। কেবল সংস্কৃতের জন্য বিরাট বিরাট অভিধান ছিল, তন্মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' (১৮১৯-১৮৫১-১৮৫৮) ও তারানাথ তর্কবাচস্পতির 'বাচস্পত্য' অভিধান (১৮৭৩-১৮৮৩) বিগত শতকে বাঙ্গালীর সংস্কৃত-চর্চা বিষয়ে দুইটি কীর্তিস্তম্ভ। বাঙ্গালা ভাষায়

প্রযুক্ত দুরূহ বা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থ বুঝিবার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী করিয়া কেবল সংস্কৃত শব্দ লইয়া কতকগুলি ছোটো বা নাতিদীর্ঘ অভিধান ১৮৫০ সালের পর হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় আগত এই সকল সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহ ও বাঙ্গালা ভাষায় তাহাদের ব্যাখ্যা—এইরূপে প্রথম খাঁটি বাঙ্গালা অভিধানের সূত্রপাত হইল।

লোকে 'শক্ত কথা'র মানে জানিবার জন্যই অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করে। বাঙ্গালা ভাষা বচনায় 'শক্ত কথা' বলিতে এখনও সাধারণ ব্যবহারে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দই বুঝায়। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ তো গ্রাম্য কথা, সামান্য কথা, ইতর কথা—সকলেই সেগুলি বুঝে। এই সকল শব্দেব খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা দিবার তখন প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া, কেবল দুরূহ সংস্কৃত শব্দের দিকে লক্ষ্য করা স্বাভাবিক ছিল। বিশেষতঃ তখনকাব দিনে, অর্থাৎ এখন হইতে ৭০/৮০ বৎসর পূর্বে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষায় সহজ-বুদ্ধিব প্রসার হয় নাই। সর্বাঙ্গে সংস্কৃতের ভারী ভারী অলংকার পরিয়া বাঙ্গালা ভাষা আড়ষ্ট হইয়া থাকিত, এই সকল অলংকার বর্জন করিয়া তাহার স্বাভাবিক চলাফেরার যে একটি সৌন্দর্য্য, একটা শক্তি আছে, তাহা কেহ কল্পনাই করিতে পারিত না। সাহিত্যের দরবারে খাঁটি বাঙ্গালার স্থান ছিল না। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম পেঁচার নক্সা' প্রকাশের পরে, খাঁটি বাঙ্গালার সৌকুমার্য্য ও তাহার শক্তি সম্বন্ধে বাঙ্গালী কিছুটা সচেতন হইল। ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ জীবনে খাঁটি বাঙ্গালার আধারের উপর তাঁহার অপূর্ব শক্তি- ও সুষমা-ময় গদ্যশৈলী উদ্ভাবন করিলেন—সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হইলেন। বাঙ্গালা ভাষা এতদিন পরে 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন তাহার সৌন্দর্য্য ও শক্তি কেবল ধার-করা সংস্কৃত শব্দকে লইয়াই নহে ; তাহার স্বকীয় সম্পদকে বুঝিবার আবশ্যকতা আসিয়া গেল। আগেকার যুগের মনোভাবের এবং আগেকার যুগের ভাষার অবস্থার অনুকূল একখানি বড়ো এবং কার্য্যকর অভিধান সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন পণ্ডিত রামকমল বিদ্যালংকার। তাঁহার 'সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে (সংবৎ ১৯২৩) প্রকাশিত হয়, এবং এই অভিধানকে প্রথম প্রধান বাঙ্গালা অভিধান বলা যাইতে পারে। অবশ্য এই অভিধানে মুখ্যতঃ সংস্কৃত শব্দই ধরা হইয়াছে এবং সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে ; অ-সংস্কৃত বাঙ্গালা শব্দ ইহাতে অতি অল্প আছে। কিন্তু এই বই তখনকার দিনে বাঙ্গালা পাঠে অনেক সহায়তা করিয়াছে। এই অভিধান এবং ইহার অনুকরণে বলরাম পাল কর্তৃক সংগৃহীত ও ১৮৯২ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত

সচিত্র 'প্রকৃতিবিবেক' অভিধান, সেদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার দুই প্রধান অভিধান বলিয়া পরিগণিত হইত।

ইহার পরে প্রকাশিত হয় সুবলচন্দ্র মিত্রের বাঙ্গালা অভিধান (প্রথম সংস্করণ ১৯০৬)। এই বইয়ের কতকগুলি সংস্করণ হইয়াছে, এবং ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে চরিতাভিধান ও বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান প্রধান আখ্যায়িকার ও অন্য কথাসাহিত্যের পাত্র-পাত্রীদের প্রসঙ্গও থাকায়, ছাত্রমহলে ও সাধারণ পাঠকমহলে ইহার উপযোগিতা বিশেষ ভাবেই হইয়াছিল। কিন্তু শব্দ-সংগ্রহ বিষয়ে এই বই অনেকটা প্রাচীন-পন্থী, যদিও বিশুদ্ধ বাঙ্গালার প্রতি ইহাতে পূর্বাপেক্ষা কিছুটা বেশি ঝোঁক দেখা যায়।

'বৈজ্ঞানিক' ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অর্থাৎ জিনিসটিকে স্বরূপে ধরিবার চেষ্টা করিয়া প্রথম বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিলেন রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর। ইঁহার 'বাঙ্গালাশব্দ-কোষ' ১৩২০-২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। ভাষার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে নূতনভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া ইনি শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন। বাছিয়া বাছিয়া অপ্রচলিত বা দুরূহ সংস্কৃত শব্দ দেওয়াকেই ইনি অভিধান-প্রণেতার একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই; ভাষায় প্রচলিত তাবৎ শব্দই অভিধানের উপজীব্য, অভিধানে স্থান লাভের ও যথাযথভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য, এই সহজ বুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া, ইনি পশ্চিম বঙ্গের ভদ্র ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত অসংস্কৃত তাবৎ শব্দ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহার পুস্তক অবশ্য খুব বিরাট নহে—২০,০০০ শব্দের অধিক বোধ হয় ইহার প্রসার হইবে না, কিন্তু আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য ভদ্র-সমাজে প্রচলিত এরূপ বহু শব্দকে ইনি নিজ অভিধানে গ্রহণ করিয়াছেন, যেগুলি আগেকার আভিধানিকদের দ্বারা সামান্য গ্রাম্য বা ইতর বোধে বর্জিত হইত। যোগেশবাবুর অভিধানের আর একটি বিষয়ে অভিনবত্ব আছে—ইনি তাবৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন—সংস্কৃত, প্রাকৃতজ, দেশী বা অনার্য্য, বিদেশী, কোনও প্রকারের শব্দকে ইনি ছাড়িয়া দেন নাই। এই কার্য্যে বাঙ্গালীর মধ্যে ইনি একজন অগ্রণী, সুতরাং এ বিষয়ে পথিকৃৎ হিসাবে সকলেরই নমস্য। কিন্তু প্রাকৃতজ শব্দের উৎপত্তি নির্ধারণে, ভাষাতত্ত্বানুমোদিত পন্থা অনুসরণ না করায়, ইঁহার ব্যুৎপত্তি নির্দেশে বহু স্থলে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। পরিবর্তন-ধর্মের যে সকল নিয়ম অনুসারে আদি যুগের আর্য্য ভাষা প্রাকৃত হইয়া গেল, এবং প্রাকৃত ক্রমে আধুনিক ভাষায় পরিণত হইল, সেই সকল নিয়মের ও তাহাদের আনুষঙ্গিক

সূত্রগুলির দিকে লক্ষ্য না রাখায়, তাঁহার গ্রন্থের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় অংশের উপযোগিতার হানি ঘটিয়াছে। অন্যথা শব্দার্থ ও প্রয়োগ বিষয়ে এই অভিধানখানি অপূর্ব, এবং পদে পদে সংকলয়িতার বহুশাস্ত্রবেত্তৃত্বের পরিচয় দিতেছে।

বাঙ্গালার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অভিধান হইতেছে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় সংকলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১৩২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত)। পূর্বের সমুদয় অভিধানের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যেগুলি রক্ষণীয়, ইহাতে সেগুলি রক্ষা করা হইয়াছে। ইহাতে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত উভয়বিধ শব্দের প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে; এবং নানা লোকোক্তি ও শব্দের নানা দ্যোতনার প্রকাশক প্রয়োগ, মুদ্রিত ও লিখিত সাহিত্য হইতে আহরণ করিয়া দেওয়ায়, আলোচ্য শব্দাবলীর ব্যাখ্যা বেশ পূর্ণতার সহিতই করা হইয়াছে; এবং এইরূপ নানা গুণে এই বইখানি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ অভিধান হইয়া আছে। বাঙ্গালা ভাষা এখন একটি বড়ো সাহিত্যের ভাষা; বিদেশী লোকেরাও এখন ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন; ভদ্র-সমাজে ব্যবহৃত ইহার একটি বিশিষ্ট কথিত ও সাহিত্যিক রূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে; কথোপকথনে উচ্চারণে ও প্রয়োগে সর্বপ্রকার প্রাদেশিকতা বর্জন করিয়া সকলের অনুমোদিত শিষ্ট ও মার্জিত ভাবে ইহাকে ব্যবহার করা সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষিত জনগণের চেষ্টার বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এইজন্য এই অভিধানে বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণও প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি আবশ্যকীয় পরিশিষ্ট থাকায় জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বই অনুপম হইয়াছে।

এই বৃহৎ পুস্তক প্রকাশের চৌদ্দ বৎসর পরে আমাদের আলোচ্য অভিধান 'চলন্তিকা' প্রকাশিত হইল। কোনও নূতন অভিধান প্রকাশিত হইলে, তাহার পূর্বেকার তাবৎ অভিধানগুলির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, যদি তাহাতে কিছু নবীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য থাকে, যদি তাহা পূর্বেকার বইগুলির কোনও-না-কোনও অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া থাকে, তবেই তাহার সার্থকতা। 'চলন্তিকা'খানি দেখিয়া ইহার প্রকাশ যে সার্থক হইয়াছে তাহা বলিতে হয়।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বড়ো অভিধানের সহিত ইহার তুলনা করিব না। দুইয়ের আকারের পার্থক্য এত বেশি যে, একের সহিত আরের তুলনা সমীচীন হয় না। বড়ো অভিধানখানি আকারে ১১"×৭½", পৃষ্ঠাসংখ্যা (প্রথম সংস্করণের) ১৫৭৭, এবং ইহাতে শব্দ আছে ৭৫,০০০;[৩] ছোটোখানি আকারে ৭"×৫",

৩ ইহার "দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনে (৯"×৬¾")" দুই খণ্ডে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে

পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০০-র কিছু বেশি, এবং ২৬,০০০ শব্দ লইয়া। বড়ো অভিধানে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা আছে, ছোটোটিতে বহু স্থলেই উৎপত্তিপর্ব বাদ দেওয়া হইয়াছে। বড়ো বইখানি আবশ্যক; কোনও শব্দের সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য জানিতে হইলে উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ ও বিশ্বাসযোগ্য অভিধান বাঙ্গালায় আর নাই; এখানি reference-এর জন্য, অর্থাৎ জিজ্ঞাস্যের যথাসম্ভব পূর্ণ সমাধানের জন্য। কিন্তু 'চলন্তিকা' সর্বদা হাতের কাছে রাখিবার জন্য। ইংরেজিতে যেমন ওয়েব্‌স্টারের মতো বড়ো অভিধান আছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাত শিলিং দামের অভিধানও আছে। ২৬,০০০ শব্দ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। সাধারণতঃ একজন শিক্ষিত লোকে হাজার দুইয়ের বেশি শব্দ ব্যবহার করেন না। অতি বড়ো পণ্ডিতেরা হয়তো বা হাজার চার পাঁচ শব্দ লইয়া নাড়াচাড়া করেন। তাহার বেশি সংখ্যার শব্দ একই ব্যক্তির লেখায় বিরল। ইংরেজিতে এক শেক্‌স্পিয়রই সবচেয়ে বেশি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—তাঁহার সমগ্র নাটক ও কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ সমষ্টি সাকল্যে নাকি পঁচিশ হাজার। সাধারণ বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তির দৌড়ের মধ্যে যত শব্দ আসিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই 'চলন্তিকা'-র বিশেষ বিচারপূর্বক নির্বাচিত ২৬,০০০ শব্দের মধ্যে পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যায়। অবশ্য অনেক শব্দ বাদ পড়িয়া গিয়াছে —সব শব্দ কোনও অভিধানের প্রথম সংস্করণে ধরা কঠিন হয়; কিন্তু শিক্ষিত জনসাধারণ, যাঁহারা এই অভিধান ব্যবহার করিবেন এবং আমার আশা হয় এই বইয়ের বহু প্রচার হইবে, তাঁহাদের সাহচর্য্যে, অর্থাৎ তাঁহারা যদি কৃপা করিয়া অভিধানে অগৃহীত সাধারণ শব্দের দিকে সংকলয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেন, তাহা হইলে এই অসম্পূর্ণতা ক্রমে সংশোধিত হইয়া যাইবে।[৪] অভিধান সংকলন করা, বিশেষতঃ অল্পের মধ্যে সব দরকারী জিনিস পুরিয়া দিয়া এই ধরনের অভিধান সংকলন করা, একজনের কাজ নহে, ইহাতে জাতির বহু শিক্ষিত জনের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।

'চলন্তিকা'-র প্রধান গৌরব ও বিশেষত্ব, ইহা একাধারে চলিত-ও সাধু-ভাষার

প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে গৃহীত শব্দ-সংখ্যা ("শব্দ, শব্দ-সমুচ্চয় ও সমস্ত পদাদির" সংখ্যা) "এক লক্ষ পঞ্চদশ সহস্রাধিক"। ইহার পর এই অভিধানের আর কোনও সংস্করণ বাহির হয় নাই।

৪ 'চলন্তিকা'র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বহু নূতন শব্দ গৃহীত হইয়াছে।

অভিধান। আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় চলিত-ভাষাকে বাদ দিবার উপায় নাই। বাঙ্গালা লিখিতে হইলে অবশ্য খালি সাধু-ভাষার সহিত পরিচয় হইলে চলে। কিন্তু বাঙ্গালা মুদ্রিত সাহিত্য পড়িতে হইলে এবং শিক্ষিত সমাজে বাঙ্গালা ভাষায় আলাপ করিতে হইলে, উপরন্তু চলিত-ভাষার সহিতও বিশিষ্ট পরিচয় আবশ্যক। এই চলিত-ভাষা মুখ্যতঃ পশ্চিম বঙ্গের ভাগীরথী নদীর দুই কূলের কথ্য ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অঞ্চলের ব্যক্তিগণ মাতৃস্তন্যের সঙ্গে-সঙ্গে এই ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির ও ইহার শব্দসম্ভারের ও প্রয়োগের অধিকার লাভ করিয়া থাকেন; এবং অন্য অঞ্চলের বহু স্থলে শিক্ষিত সমাজেও এই ভাষা প্রসার লাভ করায়, অন্য স্থলেরও অনেকে স্বভাবতঃ এই ভাষার অধিকারী হন। কিন্তু চলিত-ভাষা এখনও সমগ্র বঙ্গে সর্বত্র ঘরের ভাষা না হওয়ায়, বাঙ্গালার অনেক অংশ জুড়িয়া শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও চলিত-ভাষার উচ্চারণ তথা বিশেষ শব্দ এবং ব্যাকরণের রীতি-নীতি ও প্রয়োগাদি সাধু-ভাষার মতো চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত করিবার বস্তু হইয়া আছে। এইরূপ চলিত-ভাষায় অনভিজ্ঞ কিন্তু ইহাকে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছুক ছাত্র ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের এ বিষয়ে দিগ্‌দর্শন করাইবার উপযোগী না আছে ব্যাকরণ, না আছে অভিধান। নানা অসুবিধার মধ্যে ঠেকিয়া, পদে পদে পরের সাহায্য লইয়া দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়া চলিত-ভাষার বৈশিষ্ট্য ইঁহাদের আয়ত্ত করিতে হয়। সৎসাহিত্যে প্রযুক্ত বাঙ্গালার স্বকীয় রূপটি বাঙ্গালার ব্যাকরণে ও অভিধানে বর্ণিত ও গৃহীত হইবে, এই সহজ বুদ্ধির কথাটি এখনও বাঙ্গালা ভাষার বৈয়াকরণ ও শিক্ষকগণ বুঝিলেন না। অথচ ইহার অভাব সকলেই অনুভব করেন। এক্ষেত্রে ‘চলন্তিকা’-র সংকলয়িতা নিজ গ্রন্থের ভূমিকায় ক্রিয়ার রূপ সম্পর্কে যাহা বলিতেছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য: “…বাংলা ক্রিয়ার বহু রূপ। একই ক্রিয়ার সাধু ও চলিত রূপ আছে, তাহার উপর পুরুষ, বচন, গুরু-সামান্য-তুচ্ছ প্রয়োগ, কালের নানা ভেদ, অনুজ্ঞা, ণিজন্ত প্রয়োগ, কৃদন্ত রূপ প্রভৃতি আছে। সাধারণতঃ অভিধানে বাংলা ক্রিয়ার একই রূপ দেওয়া হয়, যথা—‘করা, খাওয়া’। সমস্ত রূপের নির্দেশ না করিলে অভিধান অসম্পূর্ণ হয়, অথচ প্রত্যেকটি পৃথক্ কবিয়া দেখানো অসম্ভব। ব্যাকরণের উপর বরাত দেওয়া বৃথা, কারণ এমন ব্যাকরণ নাই যাহাতে সকল বাংলা ক্রিয়ার রূপ জানা যায়। বিদেশীর কথা দূরে থাক, বাঙালী লেখকেরই বহুস্থলে সন্দেহ উপস্থিত হয়—‘জন্মিল’ না ‘জন্মাইল’? ‘ঘুরনো’ না ‘ঘোরানো’? ‘মুচড়িয়া, মুচড়াইয়া’ না ‘মোচড়াইয়া’? ‘উলটে’ না ‘উলটিয়ে’? ‘করতেছিলাম’ না ‘করছিলাম’?” বাঙ্গালার নানা

প্রাদেশিক উচ্চারণ-রীতির প্রভাবের ফলে চলিত-ভাষায় ও সাধু-ভাষায় এই প্রকারের বিভ্রমকারী রূপের বাহুল্য আসিয়া যাইতেছে। কারণ যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকারের বহু অরাজকতা বিদ্যমান। কালে হয়তো সমস্তের সমাধান হইয়া একটি বিশেষ রূপ-ই সাধারণ্যে গৃহীত হইয়া যাইবে, কিন্তু উপস্থিত যিনি অভিধান প্রণয়ন করিতেছেন, তাঁহার কর্তব্য তো হালকা করা চলে না। বৈয়াকরণও এ বিষয়ে তাঁহাকে কোনও সাহায্য করিতেছেন না। ‘চলন্তিকা’-র সংকলয়িতা হতাশ হইয়া এই পরিশ্রম-সাপেক্ষ চিত্তভ্রমকারী জটিল বিষয়টি ছাড়িয়া দেন নাই। বাঙ্গালা চলিত-ভাষার আপাতদৃশ্যমান অরাজকতার মধ্যে নিয়মসূত্র আবিষ্কার করিবার জন্য, এবং সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষার যোগ দেখাইয়া দিবার জন্য, তাঁহার অভিধানের শেষে ব্যাকরণ-বিষয়ক পরিশিষ্টের অবতারণা করিয়াছেন। এই পরিশিষ্টটি বাঙ্গালার ব্যাকরণ বিষয়ে এক অতি সূক্ষ্ম এবং সার্থক গবেষণার ফল। অ-সংস্কৃত শব্দের বানান বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা নিরঙ্কুশ, কিন্তু এই সংযম বা নিয়মের অভাবের অন্তরালে যে একটা অস্পষ্ট গতানুগতিকতা বা নিয়মের আমেজ পাওয়া যায়, ‘চলন্তিকা’-য় তাহার আলোচনা আছে। সংস্কৃত শব্দের মূল রূপের প্রাতিপদিক ও প্রথমার একবচনের পার্থক্য হেতু এই সকল শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহারের কালে একাধিক রূপ গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকের মনে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়; পরিশিষ্টে সংক্ষেপে এই সকলেরও বিচার আছে। সংস্কৃত ষত্ব-ণত্বের ও সন্ধির অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সূত্রাকারে নির্ণয়ের পর, বাঙ্গালা ধাতুরূপ সম্বন্ধে নানা মৌলিক ও অনালোচিতপূর্ব তথ্যে পূর্ণ, সাধু ও চলিত-ভাষার প্রয়োগের সমস্ত খুঁটিনাটি ধরিয়া, ২২।২৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি সুন্দর আলোচনা আছে। বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত প্রায় ৮০০ খাঁটি বাঙ্গালা ধাতুর রূপ ধরিয়া ২০টি গণ বা শ্রেণীতে ইহাদের ভাগ করা হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের বিচারে হয়তো এতগুলি শ্রেণী ধরা একটু বাহুল্য বলিয়া বোধ হইবে, এবং গণ-বিভাগে এই সংখ্যার আধিক্যও হয়তো মনে রাখার পক্ষে একটু কষ্টকর হইবে। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে বাঙ্গালা চলিত-ভাষায় ক্রিয়ার রূপের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং চলিত-ভাষার সর্বাপেক্ষা কঠিন এই অঙ্গ ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়া প্রয়োগ শিখিতে ইহার দ্বারা সাহায্য হইবে। বাঙ্গালায় ক্রিয়ার কাল-নির্ণায়ক রূপের যে শ্রেণীবিভাগ ‘চলন্তিকা’-য় করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে একটু মন্তব্য করা আবশ্যক। বাঙ্গালা ক্রিয়ার কাল-বাচক রূপগুলিকে সহজেই নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় :—

(ক) সরল বা মৌলিক কাল-নির্দেশক রূপ (Simple Tenses) :—

১। সাধারণ বা নিত্য বর্তমান (Simple বা Indefinite Present)—সে করে (does);

২। সাধারণ বা নিত্য অতীত (Simple বা Indefinite Past)—সে করিল (did);

৩। সাধারণ ভবিষ্যৎ (Simple Future)—সে করিবে (will do);

৪। পুরানিত্যবৃত্ত, বা নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past)—সে করিত (used to do);

[যদি-যোগে এই নিত্যবৃত্ত অতীতের অর্থ বা দ্যোতনা পরিবর্তিত হইয়া যায়, ইহার দ্বারা অতীত কারণাত্মকতা (Past Conditional) এবং অতীত সম্ভাব্যতা (Past Potential) বুঝায়; যথা—'যদি আমি তাহাকে মারিতাম (=অতীত কারণাত্মক), তাহা হইলে সকলে আমাকে মন্দ বলিত' (=সম্ভাব্যতা) If I had beaten him, every body would then have blamed me.]

(খ) মিশ্র বা যৌগিক কাল-নির্দেশক রূপ (Compound Tenses) :—

[খ (✓০)] ঘটমান (Progressive)

১। ঘটমান বর্তমান (Present Progressive বা Present Continuous)—সে করিতেছে (=করিতে+আছে), ক'রছে (প্রাচীন বাঙ্গালায় ও পদ্যে 'করিছে') (he is doing);

২। ঘটমান অতীত (Past Progressive)—সে করিতেছিল (=করিতে +আছিল), ক'রছিল (প্রাচীন বাঙ্গালায় 'করিছিল') (he was doing);

৩। ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Progressive)—সে করিতে থাকিবে (he will be doing); ['আছ্' ধাতু ভবিষ্যৎ কালে 'থাক্' ধাতুর আশ্রয় গ্রহণ করে]

[খ (✓০)] সমাপ্ত বা পুরাঘটিত (Perfect):

১। পুরাঘটিত বর্তমান (Present Perfect)—সে করিয়াছে (=করিয়া +আছে) (he has done);

২। পুরাঘটিত অতীত (Past Perfect)—সে করিয়াছিল (=করিয়া+ আছিল) (he had done);

৩। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ ভবিষ্যতের রূপে পুরাঘটিত ভাব, কিংবা

পুরাঘটিত সম্ভাব্য বা সম্ভাব্য অতীত (Future Perfect)—সে করিয়া থাকিবে (he will have done)]

[উপরে প্রদত্ত মিশ্র বা যৌগিক কাল-নির্দেশক রূপগুলির মধ্যে [খ (⁄৹) ৩]কে ও [খ (৵৹) ৩]-কে বাঙ্গালা ব্যাকরণে ধরা হয় না, কারণ ইহাদের বিশ্লেষ-অবস্থা বিদ্যমান—'আছে' ও 'আছিল' বা 'ছিল'-র মতো, 'থাকিবে', ('আছিবে'-স্থলে 'করিতে' ও 'করিয়া'-র সহিত মিশিয়া যায় নাই, ইহা এখনও তিঙ্-প্রত্যয়ে পর্য্যবসিত হয় নাই।]

(গ) অনুজ্ঞাবাচক (Imperative) :—

১। বর্তমান বা সামান্য অনুজ্ঞা (Simple বা Present Imperative) —তুমি কর।

২। ভবিষ্যৎ বা অনুরোধাত্মক অনুজ্ঞা (Future বা Precative Imperative)—তুমি করিও।

'চলন্তিকা'-য় ব্যবহৃত 'ঘটমান' (Progressive) এবং 'পুরাঘটিত' (Perfect) এই সংজ্ঞা দুটি বেশ ভালোই হইয়াছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণের কতকগুলি প্রচলিত সংজ্ঞা, যথা 'অদ্যতনী, পরোক্ষ, বর্তমান-সামীপ্য', বাঙ্গালা ক্রিয়া-রূপ বর্ণনায় আর ব্যবহাব না করাই ভালো। এ বিষয়ে আমি 'চলন্তিকা'-র সহিত একমত। কিন্তু 'চলন্তিকা'-য় যে 'করিল'-কে 'অচির-অতীত' বলা হইয়াছে এবং ইংরেজিতে ইহার অনুরূপ কাল নাই বলা হইয়াছে, তাহা এবং 'করিত'-কে 'did' বলিয়া অনুবাদ করিয়া ইহাকে 'নিত্য অতীত' (Past Indefinite) বলিয়া বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। 'সে দেখিল' (He saw) —সামান্য বা সাধারণ অতীত ; 'সে দেখিত' (He used to see)—নিত্যবৃত্ত অতীত ; এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। আশা করি, এই বর্ণনা ও সংজ্ঞা-প্রদান বিষয়টি 'চলন্তিকা'-র লেখক আর একটু বিচার করিয়া দেখিবেন।*

পরিশিষ্টে শব্দবিভক্তি ও কারক সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞাতসারে যে সকল নিয়ম বাঙ্গালা ভাষায় কার্য্য করিয়া থাকে, সেগুলি নির্দেশ করার চেষ্টা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ব্যাকরণের আরও অন্য বিষয়ের আলোচনা আছে। শেষে আছে, দর্শন বিজ্ঞান ও অন্যবিদ্যাবিষয়ক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ; আজকাল বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে এইরূপ পরিশিষ্ট অত্যন্ত আবশ্যকীয়, এবং

* 'চলন্তিকা'র পরবর্তী সংস্করণে আমার প্রস্তাবিত সংজ্ঞা গৃহীত হইয়াছে।

এতাবৎ বিভিন্ন বিদ্যার বিশেষজ্ঞগণ যে সব পারিভাষিক শব্দ বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় ও অন্যত্র নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, 'চলন্তিকা'-য় বিষয় অনুসারে সেইগুলি সজ্জিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির মানসিক উৎকর্ষ বিধানে সহায়তার জন্য উপস্থিত রহিয়াছে।

ব্যাকরণ-বিষয়ক পরিশিষ্টটি 'চলন্তিকা'-র বিশেষ মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই পরিশিষ্ট থাকায়, এই অভিধানে একাধারে অভিধান ও ব্যাকরণের সমাবেশ হইয়াছে, এবং চলিত-ভাষা ও সাধু-ভাষা উভয়বিধ বাঙ্গালার এরূপ ব্যাকরণ বাঙ্গালায় আর নাই বলিয়া ইহার কার্য্যকরতা আরও অধিক।

এই বারে মূল অভিধানের কথা। সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রভৃতির সাহায্যে যে ভাবে প্রদত্ত শব্দগুলির ব্যাখ্যা প্রভৃতি সাজানো হইয়াছে, তাহাতে সুন্দরভাবে অল্প স্থানের মধ্যেই অনেক কথা বলা গিয়াছে। এই ব্যাখ্যা-বিন্যাসের রীতি ভূমিকায় বিশদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতিশব্দের সাহায্যে যেখানে প্রদত্ত শব্দগুলির অর্থ-নির্ণয় সম্ভব নহে, সেখানে একটু করিয়া ব্যাখ্যা দিতে হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, সংকলয়িতা একটু বেশি রকম ইংরেজির শরণাপন্ন হইয়াছেন, বহু স্থলে অতি সাধারণ বিষয় বুঝাইবার জন্যও ইংরেজি প্রতিশব্দ দিয়াছেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৫/৬টি করিয়া শব্দের ইংরেজি অনুবাদ বা প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে,—যেন এই ইংরেজি প্রতিশব্দের সাহায্যেই বাঙ্গালী বাঙ্গালা শব্দটি বুঝিবে। অবশ্য ইংরেজি-শিক্ষিত বহু বাঙ্গালীর পক্ষে হয়তো এই ব্যবস্থা ভালোই লাগিবে। অবশ্য ইহাও সত্য যে, ক্বচিৎ অন্য কোনও ভাষার বিভিন্ন শব্দের দ্বারা আলোচ্য ভাষার একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ বেশ সুস্পষ্ট হয়; যেমন, 'পাত্র' শব্দে (১) আধার—**Vessel**, (২) বিষয়—**Object**, (৩) নাটকীয় ব্যক্তি—**Character** : এরূপ স্থলে ইংরেজি প্রতিশব্দ দিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু 'পাথর'-এর প্রতিশব্দ **Stone**, 'পাপী'-র **Sinner**, 'পায়রা'-র **Pigeon**, 'পোড়া'-র **to burn**—এ সব দিয়া লাভ কী?

ব্যাখ্যাগুলি সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ, অভিধানের পিছনে যে বৈজ্ঞানিক ও কৃতকর্মা ব্যক্তির মস্তিষ্ক কাজ করিতেছে, তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। অবশ্য, চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর মৌখিক বর্ণনা সব সময়ে জিনিসটিকে পরিস্ফুট করিয়া দিতে পারে না, যথা, "ঢেঁড়ি—কানের গহনা বিঃ (সেকেলে)" বলিলে যে ঢেঁড়ি দেখে নাই সে হয়তো অন্য কর্ণভূষণ হইতে ইহার পার্থক্য বুঝিবে না। এক্ষেত্রে এই সব বস্তুর চিত্র দেওয়াই সর্বাপেক্ষা কার্য্যকর হইয়া থাকে। **Littré** (লিত্রে) কর্তৃক সংকলিত বিখ্যাত ফরাসী অভিধানে এই পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছে, ওয়েব্‌স্টারের ইংরেজি

অভিধানেও তাই। বাঙ্গালী অভিধানকারের সেইরূপ অর্থবল হইলে, চিত্রসম্পদে তাঁহার অভিধান বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রার অবলম্বন তৈজসপত্র ও অন্যান্য বস্তুর এক মূল্যবান্ চিত্রময় টীকা হইয়া দাঁড়াইবে।

'চলন্তিকা'-র শব্দগুলির সাধু রূপের পাশে-পাশে চলিত-ভাষার বিশিষ্ট রূপও প্রদর্শিত হইয়াছে।

বইখানি খুবই চমৎকার হইয়াছে, এবং আশা করি নূতন নূতন সংস্করণে ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকিবে। ইহার শব্দ-সংখ্যা আশা করি আরও বৃদ্ধি পাইবে। গুটিকয়েক শব্দ আমি পাই নাই; পাঁচজনে মিলিয়া গ্রন্থকারের দৃষ্টিগোচর করিলে এই অলব্ধপ্রবেশ আবশ্যকীয় শব্দের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ বিষয়ে আরও একটু স্থান দিলে বোধ হয় ভালো হয়। তবে এ বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের সাহায্য না হইলে কিছুই হইবে না, এবং বহু বহু বাঙ্গালা শব্দের মূল নির্ধারণ ভাষাতাত্ত্বিকেরা এখনও করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে সংকলয়িতার ত্রুটী নাই। গুটিকতক শব্দের ব্যুৎপত্তি চোখে পড়ায় ও সেগুলি ঠিক মনে না হওয়ায় এই স্থলে উল্লেখ করিয়া দিতেছি।

আয়তী—'আয়ুষ্মতী' শব্দ হইতে নহে; 'অবিধবত্ব' হইতে 'আইহত---আয়ত', তাহার প্রসারে ('এয়ো, এয়োত, এয়োতি, আয়তি' শব্দ-প্রসঙ্গে ইহাদের মূল 'অবিধবা' শব্দ ঠিক দেওয়া হইয়াছে)।

সকড়ি—সংস্কৃত 'সঙ্কার' হইতে নহে, 'সঙ্কট' হইতে। প্রাচীন প্রাকৃতে ও পালিতে 'সঙ্কট' অর্থে 'আবর্জনা-স্তূপ'। 'সঙ্কটিকা' হইতে 'সঙ্কডিআ—সঁকড়ী, সকড়ি' (উড়িয়াতে 'সংখুড়ী'; পুরীর মন্দিরের ভোগে ঘৃত- বা তৈল-পক্ক ভোগ'ও হয়, আবার কাঁচা ভোগ, যেমন কেবল জলে সিদ্ধ ভাত ডাল ব্যঞ্জনাদি, 'সংখুড়ী' ভোগও হয়)।

সজারু, সেজারু, সাঁজারু—সংস্কৃত 'ছেদার' হইতে নহে; পূর্ব-বঙ্গে কোনও কোনও স্থলে 'সেঁজা' বা 'হেঁজা' রূপে এই শব্দ মিলে; মূল রূপ—'শল্যক+রূপ'; সংস্কৃত 'শল্যক' অশোকের প্রাচ্য প্রাকৃতে 'সেয্যক' হইয়া যায়, তাহা হইতে পরবর্তী প্রাকৃতে 'সেজ্জঅ', ইহা হইতে 'সেঁজা, হেঁজা'; তাহাতে স্বার্থে 'রূপ' শব্দ যোগ—'সেজ্জঅ-রূঅ' = 'সেজারু'।

হাঁটু—মূল রূপ 'অস্থি, অষ্ঠি' নহে, ইহা সম্ভবতঃ দেশী শব্দ, 'হাঁট্' ধাতুর সহিত সংশ্লিষ্ট।

বাচ্চা—ফার্সী শব্দ; সংস্কৃত 'বৎস' হইতে 'বাছা'।

নিটোল—মূল সংস্কৃত 'নিস্তল' নহে; নি+টোল—'টোল' শব্দের উৎপত্তি অজ্ঞাত।

নিঝুম—মূল সংস্কৃত 'নির্ধুন' নহে, নি+ঝুম; ঝুম, ঝিম, ঘুম—নিদ্রা- বা স্তব্ধতা-দ্যোতক দেশী শব্দ।

শিমুল—এই শব্দের মূল সংস্কৃত 'শিম্বলী', 'শাল্মলী' নহে।

মেম—ইংরেজি Madam-শব্দজ, কিন্তু ইহার সংক্ষিপ্ত রূপ Ma'am হইতে।

পাতা উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিতে দেখিতে এই কয়টি পাইলাম। তবে সাধারণতঃ অ-সংস্কৃত শব্দের যে ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়, কচিৎ মতভেদ হইবেই।

বইখানির আকার বেশ সহজে নাড়াচাড়া করিবার উপযোগী,—ছাপায় বাঁধানোতে সজ্জায় বেশ একটা আভিজাত্যের ভাব আছে, এবং Oxford Dictiorary-র ক্ষুদ্র সংস্করণটিব কথা মনে কবাইয়া দেয়। আশা করি, এইরূপ গুণের বই বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রাপ্য সমাদর লাভ করিবে॥*

উত্তরা, কার্ত্তিক, ১৩৩৭।

*'চলন্তিকা' প্রথম প্রকাশিত হইলে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার আলোচনা উপলক্ষ্যে, 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অভিধান'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (আশ্বিন, ১৩৩৭), বাঙ্গালা ভাষার অভিধান প্রণয়ন সম্পর্কে বহু তথ্য পরিবেষণ করেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কেও মৌলিক বিচারেব কথা কিছু বলেন। এই অতিমূল্যবান্ প্রবন্ধটি কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকারা পড়িয়া দেখিতে পারেন। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলালের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'র দ্বিতীয় সম্ভারে (১৯৬০) এই প্রবন্ধটি, আবশ্যক সম্পাদকীয় টীকা সহ, পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

একখানি উর্দু-বাঙ্গালা অভিধান

(ফ.রূহঙ্গ-ই-রব্বানী)

মানুষের দেহের সজীবতার লক্ষণ, বাহিবেব বস্তু হইতে কতটা পুষ্টি এই দেহ সংগ্রহ করিতে পারে। জাতি ও সমাজের পক্ষেও সেই কথা খাটে। যে জাতি বা সমাজ স্থিতিশীল, যাহার গতি বা উন্নতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, নূতন নূতন ভাবধারা বা বস্তু হইতে যে জাতি তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টি এবং পার্থিব বা ভৌতিক উন্নতি সাধন করিতে পারে না, সে জাতিকে রুগ্ণ বলিতে হয়। ভারতের মানব আবহমান কাল ধরিয়া বাহিবের জগৎ সম্বন্ধে আগ্রহশীল ছিল বলিয়া, নিজ সংস্কৃতির মূল প্রকৃতি আঁকডাইয়া থাকিলেও কখনও মৃত হয় নাই। যখনই যখনই বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে তাহার আগ্রহের অভাব দেখা দিয়াছে, তখনই তাহার মানসিক এবং পার্থিব অসুস্থতাই সূচিত হইয়াছে। কোনও বিশিষ্ট জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় আন্তর্জাতিক মিলন, বিরোধ এবং শেষটায় মিশ্রণের ফলে। এই ভাবে দেখিলে, প্রত্যেক সভ্যতাকে মৌলিক না বলিয়া মিশ্র সভ্যতাই বলিতে হয়। প্রাচীন গ্রীক ও ভাবতীয় সভ্যতার সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ-ভাবে খাটে; এবং মধ্য-যুগের ইস্‌লামী সভ্যতাও এই মিশ্র সভ্যতার পর্য্যায়ের—আবব, ঈরানী, শামী, হিন্দী বা ভারতীয়, যূনানী বা গ্রীক, মিসবী, হিস্পানী, এই সকল জাতির উপাদান মুসলমান সভ্যতাকে আন্তর্জাতিক ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে। এমন কি, প্রাচ্য জগতের এক কোণে আলাহিদা হইয়া যে চীনা সভ্যতা বিদ্যমান, তাহার গঠনে ও পরিপোষণেও ভারতীয়, ঈরানী ও গ্রীক সভ্যতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কাজ করিয়াছে।

ইস্‌লামী সভ্যতা, অর্থাৎ (ভারতের পক্ষে) মুখ্যতঃ ঈরানী ও আরব সভ্যতা, বিজেতা তুর্কীদের দ্বারা ভারতে আনীত এবং প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার সহিত প্রাচীন ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু সভ্যতাকে বোঝাপড়া করিতে হইল। তুর্কী জাতি তখন ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নূতন করিয়া প্রবেশ করিয়াছে, প্রাণ-শক্তিতে, কর্ম-শক্তিতে, গঠন-শক্তিতে তুর্কী তখন দুর্দম; মুসলমান ধর্ম তাহাকে এক নবীনতর অনুপ্রাণনা আনিয়া দিল। মানসিক ও দৈহিক জরায় আক্রান্ত ভারতকে তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে জয় করিল। কিন্তু এই তুর্কী বিজয়ের ধাক্কায় ভারতের সুপ্ত প্রাণ আবার জাগিয়া উঠিল; এবং ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, ভারতকে, অর্থাৎ হিন্দু

ভারতকে, মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং তুর্কীর প্রভুত্ব, এই দুইয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে ও পরে মিলনে আসিতে হইল। ফলে, ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন যুগ আসিল—মুসলমান যুগ বা তুর্কী-ঈরানী-আরব যুগ ; এবং আধুনিক ভারতীয় সভ্যতা হইতেছে এই নূতন যুগের সভ্যতা, মুসলমান প্রভাব যাহার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই মুসলমান প্রভাব আমরা আধুনিক ভারতের জীবনের সব দিকেই পাইতেছি—আধিভৌতিক বা পার্থিব বা বাহ্য জীবনে, আধিমানসিক জীবনে, এবং আধ্যাত্মিক জীবনে। বাহিরের জীবনে অনেকগুলি নূতন জিনিস মুসলমান প্রভাবের ফল—আমাদের অসন-বসন, আমাদের রহন-সহন, আমাদের চাল-চলন, আমাদের শিল্পকলা, এসবে প্রচুর মুসলমান উপাদান আছে। কত নূতন জিনিস মুসলমান সংস্পর্শের ফলে ভারতবর্ষ পাইয়াছে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই সমস্ত উপাদানের মধ্যে নাম করিতে পারা যায় ভারতীয় মুসলমান বাস্তুরীতি—তুর্কী, পাঠান, মোগল, প্রভৃতি নানা প্রাদেশিক রূপ লইয়া যাহা ভারতের আধুনিক সংস্কৃতির এক মুখ্য প্রকাশভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; মোগলাই রান্না, যাহা পারসীক রান্নার সহিত ভারতের মশলার অপূর্ব সমন্বয়ে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাহাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাক-পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; মোগল চিত্রশিল্প ; এবং নানা মুসলমানী অলংকরণ-শিল্প ; এবং উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানী চালের সংগীত। মানসিক প্রভাব আসিয়াছে মুখ্যতঃ ফার্সী সাহিত্যের মারফত, বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্যে ; হকীমী চিকিৎসার মারফত ; এবং ফার্সী ও আরবী বিদ্যা ও দর্শনাদির আলোচনায় আধ্যাত্মিক প্রভাবের স্থানও উপেক্ষণীয় নহে ; কোনও-কোনও সাকার-পূজা-বিরোধী হিন্দু ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সগুণ ঈশ্বরের অরূপত্বের দিকে আগ্রহ মুসলমান-শাস্ত্রোক্ত ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব বলিয়া মনে হয় ; এবং মুসলমান সূফী দর্শন ও অনুষ্ঠান, সূফী মঠ ও সমবেত-উপাসনা-পদ্ধতি মধ্য-যুগের কতকগুলি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও মিলিবে।

বিজিত ও বিজেতার বিভিন্ন জাতের ধর্ম ও সভ্যতা বিধায় ভারতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতার পরস্পর বিরোধের সঙ্গে-সঙ্গেই কিন্তু সূফী দার্শনিকতা ও সাধনার প্রভাবে মিলনের একটা মস্ত দিক্‌ও খুলিয়া গিয়াছিল। এই মিলনের চেষ্টা প্রথম যুগ হইতেই—সুল্‌তান্ মহ্‌মূদ গ.জ্.নবীর সময় হইতেই দেখা যায়। কাশ্মীরের রাজা জ.য়নুল্ আবেদীন, মহাত্মা আকবর বাদশাহ্, শাহ্‌জাদা দারা শিকোহ্—ইঁহারাও এক 'মজ্.ম'উ-ল্-বহ্.রয়্.ন্' অর্থাৎ 'দুইটি সমুদ্রের সংগম'

সম্ভবপর করিবার চেষ্টায় ছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে অতি সহজ ভাবে নির্বিরোধে এই দুই সভ্যতার মিলন ঘটিয়া যাইতেছিল; এবং এই সভ্যতার সমন্বয়-ই হইতেছে অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের সব-চেয়ে বড়ো কথা।

এই অষ্টাদশ শতকে ইস্‌লামীকৃত উত্তর-ভারতীয় সভ্যতার, অথবা ভারতীকৃত বহিরাগত ইস্‌লামী সভ্যতার, এক লক্ষণীয় মানসিক প্রকাশভূমি হইল উর্দু ভাষা। উর্দু মূলে উত্তর ভারতের 'পছাহাঁ' বা পশ্চিম অঞ্চলের, অর্থাৎ দিল্লী, আগরা, মেরঠ অঞ্চলের লোকভাষার আধারে গঠিত। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার লিপি এবং ইহার আরবী ও ফার্সী শব্দ-বাহুল্য। অন্যান্য প্রায় তাবৎ ভারতীয় ভাষা লেখা হয় এক মূল ভারতীয় বর্ণমালা বা লিপির বিভিন্ন প্রান্তীয় রূপভেদে: নাগরী, বাঙ্গালা, অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিল, নেবারী, গুজরাটী, গুরুমুখী, শারদা, লাণ্ডা, মোড়ী, তেলুগু, কানাড়ী, তামিল, গ্রন্থ, মালয়ালম্ প্রভৃতি লিপি পরস্পরের ভগিনী, এক-ই লিপির বিভিন্ন রূপ মাত্র। কিন্তু উর্দু লিপি হইতেছে ফার্সী ভাষা হইতে গৃহীত, এবং মূলে ইহা আরবী লিপি। এতদ্ভিন্ন, উর্দুর শব্দাবলী কতকগুলি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক এবং কতকটা ধর্ম-সম্বন্ধীয় কারণে, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত শব্দ বর্জন কবিয়া আরবী ও ফার্সী ভাষাদ্বয় হইতে উদ্ধারিত শব্দসমূহ মাত্র।

উর্দু ভাষার উৎপত্তি লইয়া গবেষকদের মধ্যে কতকগুলি ছোটো-খাটো বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, উহার উদ্ভব ও বিকাশের ধাবা প্রায় একরকম সর্ববাদিসম্মত। ভারতে তুর্কী- ও ফার্সী-ভাষী বিদেশী মুসলমান আসিয়া উপনিবিষ্ট হইতে লাগিল খ্রীষ্টীয় এগারোর শতক হইতে। ইহারা বেশির ভাগ ভারতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে লাগিল। এই ভাবে এক মিশ্রিত ভারতীয় মুসলমান শ্রেণীর উদ্ভব হইল। আবার খ্রীষ্টীয় এগারোর শতক হইতেই খাঁটি ভারতীয় লোক কেহ-কেহ মুসলমান হইতে লাগিল। এই ভাবে মিশ্র ও বিশুদ্ধ ভারতীয় মুসলমানকে লইয়া আধুনিক যুগের 'ভারতীয় মুসলমান' সম্প্রদায়ের পত্তন হইল। বহুদিন ধরিয়া পরিবেশ-প্রভাবে অথবা রক্তের টানে এই ভারতীয় মুসলমান ভাষায় এবং মানসিক সংস্কৃতিতে শুদ্ধ ভারতীয়-ই ছিল। ভারতীয় মুসলমান তাহার হিন্দু ভ্রাতার মতোই প্রান্তীয় ভাষা ব্যবহার করিত। সেই ভাষা ব্যাকরণে ও শব্দে হিন্দুর ভাষা হইতে পৃথক্ ছিল না। কিন্তু দেশের রাজভাষা ছিল ফার্সী, এবং এই ফার্সী ভাষায় বহু আরবী শব্দ স্থান লাভ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, মুসলমান শাসক-সম্প্রদায়ের ধর্মের ভাষা ছিল আরবী। আরবী ভাষায় মুসলমান-মাত্রই তাহাদের নমাজ

বা প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকে। আরবী-শব্দ-বহুল ফার্সী আবার ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে সংস্কৃতের পাশে, কোথাও বা সংস্কৃতকে হটাইয়া দিয়া, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং উচ্চ শিক্ষার আলোচ্য বিদ্যা হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য ফার্সী তথা আরবী ভাষার একটা বড়ো স্থান শিক্ষিত মুসলমানের জীবনে আসিয়া যায়। উচ্চ বংশের বহু হিন্দুও ভালো করিয়া ফার্সীর চর্চা করিত। মুসলমানগণ ঈরান-তুরান এবং ইরাক-আরব হইতে বহু নূতন-নূতন বস্তু এবং রীতি-নীতি ও ভাব-ধারা আনিতে থাকেন। এই সব অবলম্বন কবিয়া ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই মধ্যে বহু বহু ফার্সী ও আববী শব্দ প্রচাব লাভ করিতে থাকে। এই সমস্ত শব্দের অনেকগুলি আবার সর্বজনেব ভাষাব মধ্যে পূর্ণ ভাবে গৃহীত হইয়া কায়েমী জায়গা বানাইয়া লয়।

ইহা স্বাভাবিক যে, বিনা বাধায় ভাবতীয় ভাষাব মুসলমান লেখকগণ নূতন বস্তু ও ভাবের পরিচায়ক এই সব বিদেশী শব্দ লেখায় প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা বরাবর-ই একটু প্রাচীন-পন্থী। ভারতের মুসলমান লেখকগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অনাবশ্যক ভাবে বেশি আরবী ফার্সী শব্দ তাঁহাদের হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার রচনায় ব্যবহার করেন নাই। ভারতীয় ভাষার সর্বপ্রাচীন মুসলমান লেখক সূফী সাধক বাবা শেখ ফবীদুদ্দীন গঞ্জ-শকর পাকপত্তনী (১১৭৩-১২৬৬) হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭-র শতকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত, ইঁহাদের লেখায় আরবী ফার্সী শব্দ আজকালকার উর্দূর চাহিতে অনেক কম। কবীর শুদ্ধ-সংস্কৃত-শব্দ-বহুল ভাষায় লিখিয়াছেন (১৫-র শতক), এবং মালিক মুহম্মদ জৈসী (১৬-র শতক) যে 'পদুমাবৎ' বলিয়া আওধী হিন্দীতে বই লেখেন, তাহার ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। হিন্দীর এক প্রাথমিক মুসলমান লেখক ছিলেন অমীর খুস্রৌ (মৃত্যু ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে), ইঁহার ভাষাও শুদ্ধ হিন্দী। কিন্তু যত আমরা এদিকে আসি, ততই ফার্সীর সহিত পরিচয় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বাড়িয়া যাওয়ার ফলে, ফার্সীব শব্দও লোকের মুখের ভাষায় এবং পরে সহজেই মুখের ভাষা হইতে বইয়ের ভাষাতেও প্রবেশ করিতে থাকে। কবীর অনেক সময় সজ্ঞানে ফার্সী আরবী শব্দ দু'পাঁচটা বেশি করিয়া ছড়াইয়া দিয়া তাঁহার হিন্দী কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই 'ফার্সী ছড়ানো' ভাষাকে 'রেখ্‌তা' বলিত, 'রেখ্‌তা' ফার্সী শব্দ, ইহার অর্থ 'ছড়ানো'। এই 'রেখ্‌তা' হিন্দী-ই উর্দূর পূর্ব রূপ।

শিক্ষিত মুসলমানেরা, ধর্মের ভাষা আরবী এবং সংস্কৃতির ভাষা ফার্সী, এই

উভয়েরই লিপি আরবী লিপির সহিত সমধিক পরিচিত ছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ, বিশেষতঃ আরবী-ফাসীর পণ্ডিত ছিলেন যাঁহারা, তাঁহারা মাতৃভাষা হিন্দী লিখিতেও ফার্সী-আরবীর লিপি ব্যবহার করিতে থাকেন। এই ভাবে ষোড়শ শতকের মধ্যেই উত্তর-ভারতে মুসলমান লেখকদের কাহারও-কাহারও হিন্দী ভাষার রচনায় কিছু-কিছু আরবী-ফাসী লিপি ব্যবহৃত হইতে থাকে। খ্রীষ্টীয় ১৪-র শতকের প্রারম্ভ হইতে উত্তর-ভারতেব 'পছাহাঁ' (বা পশ্চিম উত্তর-প্রদেশ এবং পাঞ্জাবেব) মুসলমান হিন্দী-ভাষী যোদ্ধাবা দক্ষিণাপথে যাইতে আরম্ভ করে। এবং সেখানে তাহারা মারাঠী, তেলুগু ও কানাড়ীদের মধ্যে প্রথমটায় বহ্‌মনী সাম্রাজ্য (১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে), ও পরে এই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পাঁচটি নূতন রাজ্য বীজাপুর, আহ্‌মদনগর, গোলকুণ্ডা, বীদব ও বেবাড় স্থাপন করে (১৫২৫)। এই সব রাজ্যের রাজধানীগুলি দক্ষিণাপথে উত্তব-ভারতের মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট মুসলমানগণ উত্তর-ভারতের স্বভাষাভাষী হিন্দুদেব পবিবেশ-প্রভাব হইতে অনেকটা মুক্ত হয়, এবং সম্পূর্ণ মুসলমান ভাব-ধাবাব আবেষ্টনীব মধ্যে সেখানকার ভাষা-কবিরা নূতন ভাবে সাহিত্য-রচনায় লাগিয়া যান। ইহাদেব মধ্যে নাগরী লিপির আর জোর রহিল না। তেলুগু, কানাড়ী এবং মারাঠীর মোড়ী লিপির দেশে ইহারা সহজেই নাগরীকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, ও পরিবর্তে ফার্সী লিপি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইঁহাদের ব্যবহৃত উত্তব-ভারতের ভাষার সহিত ভারতীয় (হিন্দী ও সংস্কৃত) শব্দ বহুদিন ধবিয়া একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়া চলিল। এই যে হিন্দীর সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত উত্তর-ভারতের ভাষা দাক্ষিণাত্যে একটি নূতন ধরনের মুসলমান সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রকাশক হইয়া দাঁড়াইল, তাহার একটি স্থানীয় নাম হইল 'মুসলমানী' এবং আর একটি নাম (উত্তর-ভারতের হিন্দী ভাষার সমক্ষে) দাঁড়াইল 'দখনী'। আবার পাঞ্জাবের গূজর জাতির লোকের নাম ধরিয়া উহাকে 'গূজরী'-ও বলা হইত। ইহা ছাড়া ইহার পুরাতন নাম 'ভাখা' অর্থাৎ ভাষা বা লোক-ভাষাও বহাল রহিল। দখনী ভাষায়, তাহার ফার্সী লিপির কল্যাণে, এবং তাহা মুসলমান কবিদের ভাষা বলিয়া, নিরঙ্কুশ ভাবে আরবী-ফাসী প্রবেশের সুযোগ মিলিল। সুতরাং, এক হিসাবে, ফার্সী লিপিতে লিখিত এই দখনী ভাষাকেও উর্দূর পূর্ব রূপ বলা চলে।

উত্তর-ভারতে দিল্লী শহরের মৌখিক ভাষা ('খড়ী বোলী') বহু দিন ধরিয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই। যখন দিল্লী পূরাপূরি মোগল বাদশাহ্‌দের নিবাসভূমি

হইয়া দাঁড়াইল—সম্রাট শাহ্‌জহানের সময় হইতে—তখন দরবারী লোকে এবং স্বয়ং বাদশাহের খানদান বা স্ববংশীয় লোকেরা দিল্লীর ভাষা ঘরে বলিতেন। কিন্তু দেশী ভাষার চর্চার বেলায় ইহারা পশ্চিম হিন্দুস্থানের সাহিত্যের ভাষা 'ব্রজ-ভাষা'তেই লিখিতেন। ব্রজ-ভাষা মূলতঃ মথুরা-বৃন্দাবনের মৌখিক ভাষা, এবং ইহা-ই ছিল পশ্চিম হিন্দুস্থানের সর্বজন-সমাদৃত মার্জিত সাহিত্যের ভাষা। দিল্লীর মৌখিক ভাষার প্রভাব ইহার উপর আসিতে থাকে—স্বয়ং অমীর খুস্‌রৌয়ের ভাষায় দুইটির মিশ্রণ পাই। কবীরেও পাই। অবিমিশ্র দিল্লীর মৌখিক ভাষায় কেহ লিখিতে সাহস করিত না। কিন্তু দরবারের ভাষা বলিয়া ইহার একটি প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়—ইহার নাম দাঁড়ায় 'জ়বান-ই-উর্দূ-ই-মু'অল্লা' অর্থাৎ 'মহামহি রাজসভার (উর্দূর) ভাষা'। ১৭৫০ সালের পরে কোনও সময়ে রাজঘরানা এবং দরবারী এই ভাষার নাম সংক্ষিপ্ত হইয়া কেবল 'উর্দূ' রূপেই প্রচলিত হয়।

ঔরঙ্গজেব বাদশাহ্‌ তাঁহার জীবনের শেষ যুগ দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন মুসলমান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অতিবাহিত করেন, এবং ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গাবাদে দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার দরবার ভ্রাম্যমাণ হইয়া দাক্ষিণাত্যে ফৌজী লস্কর এবং তাঁবুকে আশ্রয় করিয়া ঘুরিত। দক্ষিণাপথে উত্তর-ভারতীয় মুসলমানের ভাষা, অর্থাৎ এই বাদশাহী 'জ়বান-ই-উর্দূ-ই-মু'অল্লা', দখনীর পাশে আসিল। দখনী হইতে আলাহিদা করিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ-দেশেই ইহার নামকরণ হইল 'হিন্দুস্তানী', অর্থাৎ হিন্দুস্থান বা উত্তরাপথের ভাষা। কিন্তু এই হিন্দুস্তানীতে অর্থাৎ 'জ়বান-ই-উর্দূ-ই-মু'অল্লা'-তে তখনও কোনও সাহিত্য-সৃজন হয় নাই।

হিন্দুস্তানী-বলিয়ে' উত্তর-ভারতের লোকেরা দখনীর সহিত পরিচয় লাভ করিল, এবং দখনীর আদর্শে ফার্সী-অক্ষরে-লেখা ও ফার্সী-শব্দে-ভরা দিল্লীর হিন্দুস্তানীতে ফার্সী সাহিত্যের আব-হাওয়া বহাইয়া নূতন ধরনের সাহিত্য-সৃষ্টির কথা কতকগুলি আরবী-ফার্সীতে আলেম বা পণ্ডিতজনের মনে উদিত হইল। ঐ সময়ে দক্ষিণাপথে ঔরঙ্গাবাদে ছিলেন দখনী ভাষার কবি ওঅলী (ৱলী)। তিনি উত্তরের এই নূতন ভাষায় সাহিত্য-রচনার কাজে মন দিলেন। ১৭২০ সালে তিনি দিল্লী আসিলেন, এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া দিল্লীর মুসলমান পণ্ডিত-সমাজে নবীন আন্দোলন দেখা দিল। তাহারা প্রায় সকলেই ফার্সী সাহিত্যের রসে ডুবিয়াছিলেন। ওঅলীও তাই। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায়, ভারতে মুসলমান সভ্যতার প্রতীক স্বরূপ, একটি নূতন সাহিত্য-শৈলীর, একটি নবীন ভাষার প্রতিষ্ঠা ঘটিল ; সেটি হইতেছে উর্দূ সাহিত্য ও উর্দূ ভাষা।

যে-সকল মুসলমান লেখক শুদ্ধ হিন্দীর পোষক ছিলেন, তাঁহারা শুদ্ধ নাগরীতে লেখা হিন্দীতেই সংস্কৃত-বহুল ভাষার প্রয়োগ করিয়া চলিলেন। কিন্তু ধীরে-ধীরে মুসলমান সমাজে ফার্সী-বহুল উর্দূরই জয় হইল ; এবং এই বিষয়ে ঈরান ও মধ্য-এশিয়া হইতে আগত দরবারী ব্যক্তিরা যথেষ্ট সহায়তা করেন। মহামহিম মোগল বাদশাহের ঘরোয়া ভাষা, পোশাকী ভাষা ; অতএব দিল্লীর এই 'জ়বান-ই-উর্দূ-ই-মু'অল্লা' বা উর্দূ, ক্রমে মোগল সাম্রাজ্যের অন্য নানা শহরেও ছড়াইয়া পড়িয়া নব-নব কেন্দ্র গড়িয়া তুলিল—লখনৌ, লাহোর, আগরা, এলাহাবাদ, জৌনপুর, কাশী, পাটনা, মুরশিদাবাদ, এবং ঔরঙ্গাবাদ, বীদর, হৈদরাবাদ। মোগল রাজসরকারের বিস্তর হিন্দু কর্মচারী ফার্সী জানিতেন, এই ফার্সী-বহুল উর্দূও তাঁহাদের কাছে সাদরে গৃহীত হইল।

উর্দূ ভাষা মূলে ভারতীয়, কিন্তু উহার সাহিত্যের ভিতরের রস-বস্তু ও বাহিরের আভরণ পারস্যদেশীয়। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় মুসলমানত্বের প্রতীক বলিয়া এই ভাষা গৃহীত হইয়াছে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, ভারতের মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্র বা পীঠস্থান উত্তর-ভারতের ভাষা বলিয়া ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা। তৎপরে, উত্তর-ভারতের মুসলমান পণ্ডিত ও ধর্ম-গুরুদের বিশেষ মর্যাদা আছে, তাঁহারা এই ভাষা অবলম্বন করিয়াই ভারতে মুসলমান ভাব-ধারাকে প্রচারিত ও সুদৃঢ় করিবার প্রয়াস করেন। এই হেতু, ইহাতে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-সম্পৃক্ত মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থ যত পাওয়া যায়, অন্য কোনও ভারতীয় ভাষায় এত পরিমাণে মিলিবে না। যদিও বাঙ্গালা ভাষা প্রায় দখনী উর্দূর সামসময়িক কালে, খ্রীষ্টীয় ১৭-র শতকের প্রারম্ভ হইতে, দৌলত কাজী, আলাওল প্রমুখ কবির হাতে মুসলমান সংস্কৃতির অন্যতর প্রধান বাহক হইয়াছিল, তথাপি বাঙ্গালা দেশের মুসলমান নিজ ভাষাকে এই ধারায় ততটা না ফেলিয়া, উত্তর-ভারত ও ফার্সী-উর্দূরই মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে।

এখন Union of India বা যুক্তরাষ্ট্রময় ভারত-খণ্ডে উর্দূ কোনও বিশেষ রাজ্যের ভাষা বলিয়া গৃহীত হয় নাই—যদিও ভারতের ১৪টি মুখ্য ভাষার মধ্যে একটি বিশেষ জনসমাজের ভাষা হিসাবে উর্দূও স্থান পাইয়াছে। উর্দূকে অনেকে চাহিতেছেন যে, ইহা হিন্দীরই রূপভেদ বলিয়া হিন্দীরই একটি বিশিষ্ট Style বা শৈলী রূপে হিন্দীর সহিত অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হউক ও হিন্দীর সহিত সম্মিলিত হইয়া যাউক—"সাগরে মিলাবত সাগর-লহরী-সমানা"। উর্দূর জন্মভূমি হইতেছে দিল্লী ; উর্দূ কবির কথায়—

"বাজেঁ.া-কা গুমাঁ হৈ, কি—'হম্ অহ্‌লে জ.বাঁ হৈঁ' ;
দিল্লী নহী দেখী, জ.বাঁ-দাঁ য়হ্ কহাঁ হৈঁ ?"

(অন্য লোকদের গর্ব আছে যে আমরাই এই ভাষার মানুষ, দিল্লী-ই দেখিল না, ইহারা ভাষাজ্ঞ কি করিয়া হয় ?) কিন্তু দিল্লীতে আর তাহার সে প্রতিষ্ঠা নাই—যদিও পাকিস্তানে তাহার মর্য্যাদা হইয়াছে, ইংরেজির পাশে রাষ্ট্র-ভাষা রূপে তাহার স্থান হইয়াছে। এই নূতন রাষ্ট্রের অন্যতর রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে এখন উর্দূর একটা নূতন মূল্য আসিয়া গিয়াছে। উর্দূ এক অতি অদ্ভুত অবস্থায় পড়িয়াছে। পাকিস্তানের কোথাও উর্দূ স্থানীয় জনগণের মাতৃভাষা নহে—পশ্চিম পাকিস্তানে বলে পাঞ্জাবীর নানা উপভাষা ও সিন্ধী (এই দুইটি ভারতীয় আর্য্য ভাষা), দ্রাবিড়ী ভাষা ব্রাহুই, এবং ঈরানী আর্য্য ভাষা পশ্‌তু ও বলোচী এবং তিরাহী ; এবং পূর্ব-পাকিস্তানের [বর্তমান স্বাধীন রাষ্ট্র 'বাংলা-দেশের'] ভাষা হইতেছে বাঙ্গালা। তবুও এতগুলি বিভিন্ন ভাষার মানুষের জন্য উর্দূকে এক নবীন বন্ধন-সূত্র রূপে স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে উর্দূর মূল্য অত্যধিক।

উর্দূর বিরোধী ব্যক্তিরাও স্বীকার করিবেন, উর্দূ একটি জোরদার ভাষা, মিঠা ভাষা। পৃথিবীর তাবৎ ভাষার মধ্যে ফার্সী ভাষার শ্রুতিমধুরতা সকলেই স্বীকার করেন, এবং আরবীর শব্দ-সম্পদ্ ও সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের শক্তিও আসাধারণ। একটি উক্তি আছে— " 'অর্‌বী 'অক.ল্, ফারসী শকর্,
হিন্দী নিমক্, তুরকী হুনর্"—

(আরবী হইতেছে জ্ঞান, ফার্সী শর্করা, হিন্দী লবণ ও তুর্কী হইতেছে শিল্প-কলা)—হিন্দীর রূপভেদ বলিয়া উর্দূতে তাহার নিজস্ব 'নিমক' বা লাবণ্য তো বিদ্যমান রহিয়াছে, তদুপরি উর্দূর মধ্যে গৃহীত তাহার আরবী ও ফার্সী শব্দের বাহুল্য দ্বারা ফার্সীর মিষ্টতা এবং আরবীর বৈজ্ঞানিকতা দুই-ই তাহাতে আসিয়া গিয়াছে। উত্তর-ভারতের মুসলমান সভ্যতা ও নাগরিকতার, আভিজাত্যের ও মানবিকতার প্রতীক এই ভাষা, বহু কবি ও লেখক ইহাকে আশ্রয় করিয়া বিগত ২৫০ বৎসর ধরিয়া ইহাতে তাঁহাদের আদর্শ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, কর্মচেষ্টা, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সমস্ত-ই সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভাষায় বলী, সৌদা, মীর, নজ.ীর, জে.াক., গ.ালিব, হ.ালী, অকবর, ইক.বাল প্রভৃতির মতো ভারত-গৌরব কবি নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি মনোহর এবং শক্তিশালী ভাষায় রসিক জনের আস্বাদনের জন্য দিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙ্গালী অর্থাৎ বঙ্গভাষী জনগণের মধ্যে এই সুন্দর ভাষার পরিচয় বিশেষ বাঞ্ছনীয়। পশ্চিম-বাঙ্গালায় হিন্দীর শিক্ষা ধীমা চালে চলিতেছে। [পূর্ব-পাকিস্তান এখন 'স্বাধীন বাংলা-দেশ' হওয়ায়, সেখানে উর্দুর প্রভাব অবশ্যই হ্রাস পাইবে।] তাহা হইলেও, হিন্দী যাঁহারা শিখিবেন, তাঁহাদের এমন সমস্ত আরবী ও ফার্সী শব্দ শিখিতে হইবে, যে-সব শব্দ বাঙ্গালায় তেমন প্রচলিত নাই, কিন্তু হিন্দীতে সমধিক পরিমাণে আছে। বাঙ্গালায় গৃহীত আরবী-ফার্সী শব্দ সংখ্যায় মাত্র ২৫০০ আন্দাজ হইবে, হিন্দীতে অন্ততঃ ইহার দ্বিগুণ আরবী-ফার্সী শব্দ মিলিবে। এই জন্য উর্দুর সহিত—অন্ততঃ উর্দুর অভিধানের সহিত—হিন্দী পাঠকের পরিচয় বিশেষ কার্য্যকর হইবে। বহু পূর্বে বাঙ্গালা অক্ষরে 'উর্দু উপদেশ' নামে একখানি উর্দু শিখিবার বই বাহির হইয়াছিল, সেইরূপ বইয়ের আবশ্যকতা এখন দেখা দিয়াছে।

প্রস্তুত নাতিবৃহৎ উর্দু-বাঙ্গালা অভিধান 'ফ.রহঙ্গ-ই-রব্বানী' বিশেষ যুগোপযোগী গ্রন্থ হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম দুই বাঙ্গালার লোকেদের সুবিধার জন্য এই অভিধানের সংকলয়িতারা যে চমৎকার বইখানি প্রকাশিত করিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমরা সকলেই সাধুবাদ দিতেছি। নানা দিক্ দিয়া বইখানির বিশিষ্টতা এবং মূল্যবত্তা আছে। সংকলয়িতারা উর্দু লিপিতে উর্দু শব্দগুলি দিয়াছেন, তৎপরে বন্ধনীর মধ্যে বাঙ্গালা অক্ষরে এগুলির প্রত্যক্ষর করিয়াছেন, পরে শব্দটির ব্যুৎপত্তির নির্দেশ করিয়াছেন—এটি আরবী, কি ফার্সী, কি খাঁটি হিন্দী, কি ইংরেজি। তদনন্তর সংক্ষেপে প্রচার-বাহুল্য ধরিয়া বাঙ্গালায় অর্থ দিয়াছেন, বহু উর্দু 'মুহাবরা' বা বাগ্‌ভঙ্গী, ইংরেজিতে যাহাকে 'ইডিয়ম্' বলে, তাহাও দিয়াছেন, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির, ভৌগোলিক নাম প্রভৃতিরও পরিচয় দিয়াছেন। এইভাবে বইখানি সকলের পক্ষে ব্যবহার্য্য করা হইয়াছে।

উর্দুর বাঙ্গালা প্রত্যক্ষরীকরণে বিশেষ সুযুক্তি ও সুবুদ্ধি এবং উর্দু উচ্চারণের প্রকৃতির সঙ্গে বাঙ্গালা লিপির সামঞ্জস্য-বোধ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমি পূর্ণরূপে এই বইয়ে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষরের অনুমোদন করি। কেবল 'বড়ী হে' (ح) অক্ষরের জন্য যদি 'হ.' লেখা হইত, তাহা হইলে একটা নিয়মানুবর্তিতা পালিত হইত। ذ ز ض ظ, এগুলি আরবীতে যথাক্রমে *z*, *dh*, *dw*, *dhw* (অর্থাৎ জ., ধ., দ্ব, ধ্ব.) রূপে উচ্চারিত হয়। তদ্রূপ س ث ص, এই তিনটির উচ্চারণ যথাক্রমে s, *th*, *sw* (অর্থাৎ স, থ., স্ব)। সুখের বিষয়, এই জটিলতা বাঙ্গালা প্রত্যক্ষরীকরণ হইতে বাদ দিয়া কেবল য = z এবং স = s লিখিয়া, উর্দুর উচ্চারণের স্বরূপ বজায় রাখা

হইয়াছে। (আমি নিজে কিন্তু z-ধ্বনির জন্য বাঙ্গালায় বিশেষ-রূপে চিহ্নিত 'জ'-ব্যবহারের পক্ষপাতী, 'জ.' বা 'জ' বা অন্য কিছু, কিন্তু 'য' নহে।) s-ধ্বনির স্থলে স-এর বদলে যে 'ছ' লিখা হয় নাই, তজ্জন্য আমি সাধুবাদ দিতেছি। ٹ = ত এবং ط = ত্ব (ত.), এই দুইয়ের পার্থক্যও দেখাইতে পারা যাইত, তবে না-দেখানোতে উচ্চাবণ-নির্দেশে কোনও ক্ষতি হয় না।

বাঙ্গালা ভাষাব এই স্বল্লায়তন অভিধানখানি একক এবং অদ্বিতীয়। পশ্চিম-বঙ্গে যাঁহারা হিন্দী পড়িবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বই বিশেষ কার্য্যকর হইবে, এবং পূর্ব-বঙ্গের উর্দূ-পাঠী ছাত্র-ছাত্রীর কাছে তো এই বই অপরিহার্য্য হইবে। বইখানির বাহ্য সৌষ্ঠব ইহার আভ্যন্তর গুণাবলীর সহিত তাল বাখিয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের মাতৃভাষায় ভারতের আর একটি নামী ও সাহিত্য-সমৃদ্ধ ভাষাব আলোচনার ও পাঠের সহায়ক এই সাধন পাইয়া আমি ব্যক্তিগত-ভাবে, এবং হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে বঙ্গ-ভাষী জাতির পক্ষ হইতে এই অভিধানের সংকলয়িতাদের ও প্রকাশককে ধন্যবাদ দিতেছি। আমার কোনও সন্দেহ নাই যে, এই বই উভয় বাঙ্গালায় ইহার যোগ্য সমাদর লাভ করিবে। ইতি ১০ই শ্রাবণ বাঙ্গালা সন ১৩৫৯ সাল, বিক্রম-সংবৎ ২০০৯॥

রব্বানী পাব্লিকেশনস্, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত (১৯৫২।১৩৫৯), খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতিগণের সহযোগিতায় সিরাজ রব্বানী কর্তৃক সংকলিত উর্দূ-বাঙ্গালা অভিধান 'ফ.রহঙ্গ-ই-রব্বানী'-র ভূমিকা।

শব্দ-প্রসঙ্গ

গত ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে [১৩২৩, ফাল্গুন, 'শব্দপ্রসঙ্গ' পৃঃ ৪৮৪-৮৫] শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যে কতকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

১। সংস্কৃত 'শম্' ধাতুর সহিত বাঙ্গালা 'থাম্' ধাতুর কোনও সংযোগ থাকিতে পারে না। বাঙ্গালা 'থাম্' সংস্কৃত 'স্তম্ভ' শব্দ হইতে জাত। হিন্দীতে এই প্রাকৃত ধাতুকে 'থম্ভ্না', 'থম্ব্না', 'থম্না', এবং 'থাম্ভনা', 'থাম্না' রূপে পাওয়া যায়; পাঞ্জাবীতে ইহার রূপ 'থম্ম্ণা'; গুজরাটীতে 'থম্ভবু', এবং 'থাম্ভলো', 'থাম্বলো', এবং মারাঠীতে 'থাম্বণেঁ'। 'স্তম্ভ'—'থম্ভ' শব্দের সহিত যোগ স্পষ্ট। অবেস্তার 'থ.ম্' (থে.ম্?) ধাতু হইতে বাঙ্গালা প্রাকৃত 'থাম্' ধাতুর উদ্ভব একেবারে অসম্ভব। অবেস্তার ভাষায় এমন কতকগুলি ধ্বনি আছে যেগুলি ভারতীয় ভাষায় আসা সম্ভবপর ছিল না; এই ধ্বনিগুলি প্রাচীন ভারতের ভাষার পক্ষে নিতান্ত বিদেশী ও 'ম্লেচ্ছ'। অবেস্তার 'থ.'-ধ্বনি তাহাদের মধ্যে একটি; ইহা আমাদের মহাপ্রাণ অঘোষ দন্ত্য 'থ', অর্থাৎ **t+h** নয়, ইহা হইতেছে ইংরেজি **think, thin, thought** পদের দন্ত্য-স-ঘেঁষা উষ্ম 'থ.'—আরবীর 'থ.া', বর্মীর **th**; এই ধ্বনি সহজেই 'স'-য়ে পরিণত হয়, আবার দন্ত্য স-ও অনেক স্থলে এই ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়; যেমন **loveth—loves**, আরবী 'হ.দিথ.'—ফার্সী ও উর্দূ 'হদিস', 'থ.ানী'—'সানী', ইত্যাদি; এবং সংস্কৃত 'বারাণসী'—বর্মী 'বা-য়া-ন-থ.ী'; পালি 'সম্মাসম্বুদ্ধ'—বর্মী উচ্চারণে 'থ.ম্মা থ.াম্বুদ্দা'। আমাদের সংস্কৃত ও সংস্কৃত-জ ভাষায় এই 'থ.' নাই, ভারতে এই উচ্চারণ অজ্ঞাত। সুতরাং বাঙ্গালা 'থাম্' ধাতু পারস্য হইতে আমদানি হইয়াছে, এইরূপ অনুমান না করিলে, √শম্—থ.ম্—থম্-থাম্—এইরূপ ব্যুৎপত্তি দাঁড়াইতে পারে না। সেরূপ অনুমানের পক্ষে কোনও যুক্তি দেখি না।

সংস্কৃত ও অবেস্তা (এবং প্রাচীন পারসীক) উচ্চারণ-তত্ত্বের একটি সূত্র এই যে, সংস্কৃতের তালব্য 'শ'-কে অবেস্তার শব্দে দন্ত্য 'স' রূপে পাওয়া যায়; যেমন—'শতম্'—'সতেম্'; 'শংস্'—'সঙ্হ্'; 'ত্রিশ'—'থ্রিস'; 'শূর'—'সূর'। এই সূত্রের উপর একটি প্রতিষেধ আছে যে আদ্য 'স' স্বরবর্ণের পূর্বে থাকিলে, এবং পদমধ্যবর্তী 'স' দুই স্বরের মধ্যে থাকিলে, অবেস্তার ভাষায় কোনও-কোনও

স্থলে এবং বাণমুখ লিপির প্রাচীন পারসীক ভাষায় বহু স্থলে, বিকল্পে উষ্ম 'থ.' রূপ গ্রহণ করে। যেমন—

সংস্কৃত	অবেস্তা	প্রাচীন পারসীক
শম্	থে.ম্, থ.ম্	...
শূর	স্থূর	...
অভিশ্বর	অইব্রি-থূ.র	...
বিশ	বিস	বিথ.
শুক্র	সুখ্.র	থু.খ্.র
শংসতি	সঙ্হইতে	থ.াতী (<থ.হতি)

এই সূত্রটি পারসীক ভাষার উচ্চারণের সূত্র। যে নিয়ম একটি ভাষায় খাটে, সেটি সকল ভাষায় খাটে না, এমন কি এক ভাষায়ও বিভিন্ন যুগে এক-ই নিয়ম খাটে না। ইহা মনে রাখা উচিত। প্রাচীন প্রাকৃতে পারসীকের ছাপ পড়িবার সম্ভাবনা তাদৃশ ছিল না। 'ক্ষত্রপ, দীনার, পহ্লব' প্রভৃতি কতকগুলি কথা সংস্কৃতে পারসীক হইতে লওয়া হইয়াছিল মাত্র। মুসলমান যুগে যখন বিশেষ করিয়া পারসীকের প্রভাব উত্তর-ভারতের ভাষাগুলিতে আসিয়া পড়িল, তখন পারসীক আর প্রাচীন অবস্থায় নাই, আধুনিক ফার্সী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফার্সীতে প্রাচীন পারসীকের উষ্ম 'থ.' ধ্বনি নাই; প্রাচীন কালের 'থ.' আধুনিক ফার্সীতে হয় দন্ত্য 'স'-তে, না হয় 'হ'-তে রূপান্তরিত হইয়াছে; যেমন,

প্রাচীন পারসীক খ্.ষ থ্.র, যথ্.র (= সংস্কৃত ক্ষত্র)—ফার্সী শহ্.র্।

" চিথ্.র (= সংস্কৃত চিত্র) " চিহ্.র্, চিহ্.রহ্ (চেহারা)।

" মিথ্.র (= সংস্কৃত চিত্র) " মিহ্.র্।

" পুথ্.র (= সংস্কৃত পুত্র) " পুসর্, পিসর্, পুস্।

" থ্.য় (= সংস্কৃত ত্রি, ত্রয়) " সেহ্, সি।

" থু.খ্.র (= সংস্কৃত শুক্র) " সুর্খ্. (বাঙ্গালা সুরকী)।

তদ্ভিন্ন, **Bartholomae**-র মতে অবেস্তার 'থ.' অক্ষর দন্ত্য 'স'-র ধ্বনি জানাইবার আর একটি উপায় মাত্র।

২। শাস্ত্রী মহাশয় ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন— √শ্বিত্ শ্‌পিত, স্পিত—ফিট্।
সংস্কৃতের 'শ্ব'-কে অবেস্তায় ও প্রাচীন পারসীকে 'স্প', 'শ্‌প' রূপে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতগুলিতে 'শ্ব'-এর রূপ 'স্স' বা 'শ্‌শ' (মাগধীতে); প্রাকৃত 'শ্ব'-এর 'শ্‌প' বা 'স্প' রূপ পাওয়া যায় না,—প্রাকৃতের **phonetics**-এ

পারসীকের এই নিয়ম খাটে না। মহারাজ অশোকের শাহ্বাজ্-গঢ়ী লিপিতে এক স্থানে সংস্কৃত 'স্ব'-এর জায়গায় 'স্প' আছে ('সব্রেষু ওরোধনেষু ভ্রতুণং চ মে স্পসুনং চ = সর্বেষু অবরোধনেষু ভ্রাতৃণাং চ মে স্বসৃণাং চ'—পঞ্চম অনুশাসন); পারসীকের মতো প্রাকৃতে 'স্ব'-এর 'স্প' রূপের উদাহরণ বোধ হয় এইটি ছাড়া আর নাই। কিন্তু অশোক-অনুশাসনের এই পদটিকে পারসীক-প্রভাব-জাত বলা চলে; শাহ্বাজ-গঢ়ী পেশাওরের কাছের জায়গা, North-Western Frontier Province-এর অন্তর্গত; সম্রাট্ দারয়বযের (Darius-এর) কাল হইতে এই স্থানের ভাষায় ও রীতিনীতিতে পারসীক প্রভাব কিছু কিছু ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া '√শ্বিত্—স্পিত—ফিট্' ব্যুৎপত্তি সমীচীন মনে হয় না। 'ফিট্' কথাটি-ই যে বাঙ্গালায় মূল শব্দ, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 'ফিট্-ফাট্', 'ফিট্-বাবু', 'ফিট্-গৌর', 'ফিট্-সাদা'—এই কয়েকটি কথাতেই ইহার বেশি প্রয়োগ। যোগেশ বাবুর মতে সংস্কৃত √স্ফিট্ (√স্ফিট্ আবরণে) হইতে 'ফিট্' শব্দের উৎপত্তি। তাহা হইলে 'গৌর' বা 'সাদা' শব্দের সহিত যে প্রয়োগ তাহা পরবর্তী কালের; 'ফিট্' শব্দ 'বস্ত্রাবৃত' বা 'লম্ব-শাঠাবৃত' অর্থে ভাষায় বহু প্রচলিত হইবার পরে 'পরিচ্ছন্ন বা শ্বেতবস্ত্রাবৃত' অর্থে 'ফিট্‌বাবু', তৎপরে এই শব্দ 'গৌর' ও 'সাদা' পদের পূর্বে বসিয়া ইহাদের সাহচর্য্য করিতেছে। কেহ কেহ 'ফিট্-ফাট্' 'ফিট্-বাবু' কথার 'ফিট্'কে ইংরেজি fit শব্দ হইতে জাত বলেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, বাঙ্গালা 'ফুট্‌ফুটে'র (√স্ফুট্ বিকসনে) 'ফুট্' শব্দের পরিবর্তনে 'ফিট্', 'ফিট্‌ফাট্'। 'ফুট্‌ফুটে' বলিলে যে সৌকুমার্য্য ও লালিত্যের ভাব মনে হয়, 'গৌর' বা 'সাদা' কথার আগে 'ফিট্' (= 'ফুট্') শব্দ ব্যবহার করিয়া সেই ভাব প্রকাশের চেষ্টায় এই প্রয়োগ। বাঙ্গালায় এই প্রকার স্বরবর্ণের-পরিবর্তনে-জাত তির্য্যক্ রূপের অভাব নাই।

ফার্সীর 'সপেদ্, সফে.দ্, সফ.ীদ্' শব্দের এক প্রাচীন রূপ অবেস্তার 'শ্পএত' (= সংস্কৃত শ্বেত)। আদি আর্য্যভাষায় * kweitos, * kweitnos ; * kweitos হইতে ভারত-ঈরানীয় (Indo-Iranian) যুগের * śwaitas ; *kweitnos হইতে প্রাচীন টিউটনীয় * xwīdnaz, * xwīddaz, * xwīttaz (x = খ.), * hwītaz ; * śwaitas হইতে সংস্কৃত śwetas, śvetah, অবেস্তার spaeta ; এবং * hwītax হইতে গথ ভাষার hweits, অ্যাঙ্গ্লো-স্যাক্সনের hwīt, ইংরেজি white (= hwait), জর্মানের weiss (= vais)। বৈদিক হইতে

অ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্‌সন নহে; এবং অ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্‌সনের **hwit-an** ধাতু বিশেষণ **hwit** হইতে উৎপন্ন নাম-ধাতু।[১]

৩। বাঙ্গালার 'খন্‌খন্‌' অনুকার-শব্দ ভিন্ন আর কিছু-ই নহে, অবেস্তার '*খ্ব.ন্‌' (xvan—x = খ.) হইতে আসা সম্ভব নহে। সংস্কৃত 'স্বন্‌' অবেস্তা 'খ্ব.ন্‌', 'খ্ব.ন্‌' হইতে ফার্সীর 'খ্ব.ান্‌-দন্‌' = পাঠ করা। অনুকার-শব্দ উদ্ভব করা এবং ব্যবহার করা ভাষার প্রাণের লক্ষণ; সংস্কৃত ও অবেস্তার মিল দেখিয়া ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, বাঙ্গালা ভাষা একটি জীবন্ত ভাষা। [এই যুক্তি অনুসারে ব্যুৎপত্তি করিলে বাঙ্গালার 'ঠং ঠং' বা 'ঠন্‌ঠন্‌'কে বৈদিক 'স্তন্‌'-ধাতুর সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া কঠিন হইবে না। সংস্কৃত স্বন্‌ ধাতুর সহিত বাঙ্গালা কথার যোগ যদি খুঁজিতে হয়, তাহা হইলেই 'সন্‌সন্‌' শব্দে তাহা পাওয়া সম্ভব, 'খন্‌খন্‌'-এ নহে।]

৪। 'হালা' শব্দ ('হিত্বা হালাম্‌ অভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাম্‌'—মেঘদূত, পূর্বমেঘ) অবেস্তার 'হুরা' হইতে আসা সম্ভব নহে। সংস্কৃত শব্দের মধ্যস্থিত 'স' প্রাকৃতে 'হ' রূপে পাওয়া যায় বটে (যেমন 'একাদশ' = 'এগাডহ' = 'এগারহ', 'দিবস' = 'দিঅহ'), কিন্তু আদ্য 'স' কোথায়ও 'হ' হইয়া যায় না; অবেস্তার এ নিয়ম প্রাকৃতে খাটে না। তা' ছাড়া, সংস্কৃতের 'উ' প্রাকৃতে 'আ'-কার হইয়া যাওয়ার উদাহরণ কোথাও পাই নাই। ব্যঞ্জন-ধ্বনির সম্বন্ধে যেরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে, স্বর-ধ্বনির পক্ষেও সেইরূপ। শাস্ত্রী মহাশয় বামনের যে মত তুলিয়া দিয়াছেন, বোধ হয়, তাহা-ই ঠিক; শব্দটি 'দেশী' অর্থাৎ অনার্য্য। আমার ধারণা এই যে, ইহা মুণ্ডা ভাষার শব্দ; মুণ্ডারী এবং হো 'হাঁড়িয়া', 'হাঁরিয়া', সাঁওতালী 'হেঁড়ে', এবং হিন্দী 'কল্‌বার, কলাল, কলার' (শুঁড়ী, মদ্যবিক্রেতা অর্থে) শব্দের 'কল্‌' এবং সংস্কৃত 'হালা'—প্রাচীন মুণ্ডা কোনও শব্দ হইতে উৎপন্ন। অবশ্য এর সপক্ষে আমার সুদৃঢ় যুক্তি নাই। যে দুই তিনটি মুণ্ডা শব্দ আর্য্যভাষায় পাওয়া যায়, তাহাতে 'হ' এবং 'ক'-এর অদল-বদল দেখা যায়; মুণ্ডা—'হোড়ো' = মানুষ, সংস্কৃতে 'কোল্ল' ('কোল') জাতি-ব্যঞ্জক; 'দাক্‌' = জল, বাঙ্গালা—'দহ' (সংস্কৃত 'হ্রদ' হইতে উৎপন্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন); 'হাঁড়া' = বলদ, মানভূমের বাঙ্গালায় 'কাঁড়া' = মহিষ। এই প্রকারে 'হাঁরিয়া'র প্রাচীন রূপ

১ তারা-চিহ্নিত পদগুলি লুপ্ত-মূল আর্য্যভাষার সম্ভাব্য রূপ। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিচারের দ্বারা আদিম আর্য্যভাষার শব্দগুলির রূপ পুনরায় গড়িয়া তুলা হয়, সেই সম্ভাব্য পুনর্গঠিত রূপগুলি (theoretical reconstructed forms) তারা চিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।

হইতে 'হালা' ও আধুনিক 'কল্‌-(ৱার)' আসা একেবারে অসম্ভব নহে। 'হাঁড়িয়া' শব্দ 'হাঁড়ী', 'হাণ্ডী'র (সংস্কৃত 'ভাণ্ড'-শব্দজ) সহিত সম্পৃক্ত কিনা জানি না; খুব সম্ভব নহে; সাঁওতাল, হো, মুণ্ডারী এবং দ্রাবিড়ী ওরাওঁ জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ছোটনাগপুর প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র এই শব্দের প্রচলন আছে কি? 'কল্‌ৱার' শব্দ 'কল' (=machine) পদের সহিত যুক্ত শুনিয়াছি; কিন্তু ধান্যুয়া মদ চোয়াইতে কি কলের বা যন্ত্রপাতির দরকার? অপিচ এই ধান্যুয়া মদ মুণ্ডাজাতির পক্ষে ভাতের মতো নিত্যব্যবহার্য্য। মুণ্ডা ভাষায় 'ইলি' বলিয়া আর একটি শব্দ আছে, ইহাও ধান্যুয়া মদ অর্থে ব্যবহৃত হয়; 'ইলি' ও 'হাঁরিয়া', 'হালা', 'কল'—ইহাদের পরস্পর যোগ আছে কি? [সাঁওতালী বাইবেলে মদ্য অর্থে 'দাক্‌রাসা' পদ দেখিয়াছি; ইহা কি সংস্কৃত 'দ্রাক্ষারস' হইতে জাত, না, সাঁওতালী 'দাক্‌' (=জল, জলীয়) পদের সহিত অন্য পদের যোগে সিদ্ধ? তামিলে মদ অর্থে 'তিরাট্‌শারশম্‌'=দ্রাক্ষারসঃ; খাঁটি দ্রাবিড় পদ কী তাহা জানিতে পারি নাই।]

৫। 'উর্ব্বরা' শব্দ 'তরুবরা' শব্দের 'ত'-এর লোপে সম্ভাব্য *'তরুব্বরা' হইতে নহে। 'তরু' শব্দটি পরবর্ত্তী যুগে, সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিমের পৈশাচী প্রাকৃতের প্রভাবে, 'দ্রু' হইতে জাত। 'উর্ব্বরা' শব্দ ৱৃ-ধাতু (ৱৃণোতি, ঊর্ণোতি, ৱরতে—আচ্ছাদন করে) হইতে জাত। 'উর্ব্বরা' আচ্ছাদিত বা শস্যাদির দ্বারা আবৃত ভূমি। অবেস্তার 'উর্ৱর' শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায় (বৃক্ষ, বৃক্ষশ্রেণী), তাহা গৌণ অর্থ। 'উর্ব্বরা', 'উর্ৱর' শব্দের সহিত সমজাত ও সমার্থক শব্দ অন্যান্য আর্য্যভাষায় আছে; গ্রীকে **aroura**=কৃষিক্ষেত্র, **olura**=গোধূম; লাতীনে **arvum** ('আর্ৱুম্‌'=কৃষিক্ষেত্র); আর্মানিতে **haravunkh**।

৬। 'স্থা' ধাতুর অভ্যস্ত রূপ 'তিষ্ঠ', বৈদিকের পূর্ব্বাবস্থায় *'স্থিস্থ' বা *'স্তিস্থ'—এইরূপ ছিল; সংস্কৃতে আদ্য 'স' লুপ্ত হইয়াছে, ও মধ্যস্থিত 'স্থ' মূর্দ্ধন্য হইয়া গিয়াছে; তুলনীয়—গ্রীকে **hi-sta-men**=***si-sta-men**, লাতীন **si-sti-mus**='তিষ্ঠামঃ'; এখানে গ্রীক ও লাতীনে অভ্যস্ত অক্ষরের (**syllable**-এর) 'স্ত' নাই, কিন্তু লাতীন **ste-ti**='ত-স্থৌ', এখানে অভ্যাস অবিকৃত আছে, কিন্তু মূল ধাতুর 'স' লুপ্ত হইয়াছে।

৭। **Paul Horn** তাঁহার *Neupersische Schriftsprache* পুস্তকে (*Grundriss der Inanischen Philologie* গ্রন্থের অন্তর্গত) ফার্সী 'জ.বান' শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতেছেন: অবেস্তা 'হিজ্‌.ৱা' [**hizvā**],

প্রাচীন পারসীক 'হিজ.াবম্' (h)izāvam = সংস্কৃত 'জিহ্বা'; প্রাচীন পারসীক হইতে পহ্লবী zuvān, zavān, zubān, uzvān, এবং পহ্লবী হইতে ফার্সী zubān, zabān; 'জিহ্বা' এবং 'জ.বান'—এক মূল হইতে জাত। সংস্কৃত 'জুহূ' ও 'জিহ্বা', এক পর্য্যায়ের শব্দ। Fick তাহার *Vergleichendes Woerterbuch der Indogermanischen Sprachen* বইয়ে সংস্কৃত 'জুহু, জিহ্বা', অবেস্তার 'হিজ্.বা', লাতীনের dingua, lingua, ইংরেজির tongue, জর্মানের zunge, লিথুআনীয় lezuvis—লেহনার্থক এক-ই ধাতু হইতে জাত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; মূল আর্য্য রূপ তাঁহার মতে *dnghwa; ইন্দো-ঈরানীয় যুগে *dizhwā বা jizhwā, তাহা হইতে সংস্কৃত jihvā ও অবেস্তার hizvā.

৮। গ্রীকের helios ও সংস্কৃত 'স্বর্' সমধাতুক, কিন্তু এক-ই আর্য্য শব্দের ভিন্ন রূপ নহে। helios-এর প্রাচীন রূপ ডোরিক গ্রীক aelios শব্দে; aelios আদিম আর্য্য *sāwelios হইতে, 'স্বর্' বা 'সুবর' শব্দের আদিম রূপ কিন্তু *suwar (*suwel); আদিম আর্য্যভাষার 'ল'-ধ্বনি অবেস্তায় ও বৈদিকে সর্বত্রই 'র'-কারে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

৯। 'হুঁকা' শব্দটি আরবী, ফার্সী নহে। আরবী 'হু.ক্.কৎ' অর্থে (১) কৌটা বা পেটিকা, (২) দোয়াত, (৩) পাত্র, (৪) তামাক খাইবার হুঁকা। এই শব্দটি 'হ.ক্.ক্' ধাতু হইতে, এই ধাতুর অর্থ দৃঢ় করিয়া রাখা, বাঁধা। সত্য অর্থে 'হক্.' শব্দ এই ধাতু হইতে জাত।

১০। 'যুবন্' = লাতীন. juvenis (য়ুরেনিস্)। আদিম আর্য্য রূপ *yuwnkos—ইহা হইতে সংস্কৃত yuvaśas যুবশঃ, লাতীন iuvencus, আদিম টিউটনিক *yuwungaz, এবং টিউটনিক হইতে ইংরেজি young (য়ঙ্গ্, য়ঙ্), জর্মান jung (য়ুঙ্); 'যুবন্' ও 'যুবশঃ' দুই-ই সংস্কৃতে আছে; ঙ্গান্ত ইংরেজি পদটি 'যুবশ' শব্দের সহিত সমজাত, 'যুবন্'-এর সহিত নহে। অবেস্তায় 'যুবন্' রূপও পাওয়া যায়, 'য়বন্, য়ূন্, যুবন্'। 'যবন' শব্দের সহিত 'যুবন্' এর কোনও সম্বন্ধ নাই। গ্রীক জাতির একটি শাখার নাম Iōnes (= Ionian); এই শাখা Attica প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে, আথেন্স্ নগরীর পত্তন ইহাদের দ্বারা; এশিয়া-মাইনরে ইহাদের বিশেষ প্রসার ছিল। Miletos, Magnesia, Ephesos, Kolophon, Klazomenai প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগর এই জাতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার জাতিগণ প্রাচীন যুগে গ্রীকদের এই শাখার সহিতই বিশেষভাবে পরিচিত হয়; সেইজন্য এই

শাখার নাম গ্রীকজাতি-বাচক নাম হিসাবে পশ্চিম এশিয়ার জাতিবৃন্দের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। Iōnes নামের প্রচীন রূপ Iavones, Iaones ; ইহা হইতে হিব্রুর Yawan, আরবীর Yūnān য়ুনান, প্রাচীন পারসীক অনুশাসনের Yaunā। অশোক-অনুশাসনের 'য়োন' ও সংস্কৃত 'য়বন' শব্দ Iavones-এর পারসীক রূপ হইতে গৃহীত, কারণ গ্রীকের সহিত ভারতবাসীর প্রথম পরিচয় পারস্যের মধ্য দিয়া। এই Iōnes, Iavones নাম এই শাখার আদি-পুরুষ Iavon, Iaon, Iōn-এর নাম হইতে ; যেমন 'মনু' হইতে 'মানব', 'আদম্' হইতে 'আদমী'। Prellwitz স্বীয় গ্রীক অভিধানে Iōn শব্দকে ণিজন্ত ধাতু iao হইতে উদ্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। √iao-র প্রাচীনতম গ্রীক রূপ √isa-yo, ইহার অর্থ 'রোগমুক্ত করা', এই ধাতু সংস্কৃত প্রেষণার্থক ধাতু 'ইষ্'-এর সহিত সম্পৃক্ত। সুতবাং 'য়ুবন'-এর সহিত 'য়বন'-এর সম্বন্ধ নাই, 'ইষ্'-ধাতুর সহিত বরং সম্বন্ধ বাহির করা যাইতে পারে।

১১। জর্মান wurm (ভুর্ম্) ও ইংরেজি worm (বর্ম্)-এর সহিত সংস্কৃত 'কৃমি' শব্দের সম্বন্ধ নাই, 'কৃমি' শব্দের সহিত সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য *'এরেমা' শব্দের কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। সংস্কৃত শব্দের আদ্য 'ক', 'চ' বা 'শ' = টিউটনিক ভাষায় (ইংরেজিতে, জর্মানে) 'হ্', 'হ্ব', এই সূত্রের ব্যতিক্রম হয় না। 'কৃমি' = অবেস্তা 'কেরেমা', ফার্সী 'কিরম্', স্লাভ 'চৃৰ্বি', লিথুআনীয় 'কিরমিস্', আইরীশ 'ক্রুইম্'।

Wurm, worm পদের আদিতে w আছে, এই w শব্দটির স্বাঙ্গীভূত, পরে আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই। তুলনীয় লাতীন uermis (বের্মিস্), গ্রীক varmikhos (বার্মিখোস্), স্লাভ্ vermies (ৱের্ম্যেস্), অর্থ—কীট ; এগুলি worm-এর সমজাত শব্দ, 'কৃমি' শব্দের সহিত ইহাদের কোনও যোগ নাই।

১২। যোগেশবাবুর অভিধানে 'জাব' শব্দ সংস্কৃত 'য়বস্, জবস্' (= ঘাস) শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া লেখা হইয়াছে। অন্যান্য দেশী ভাষায় এহ শব্দটি আছে কি ? 'জব্ধ' = যাহা খাওয়া হইয়াছে, এই অর্থ হইতে 'জাব্‌র'-কাটা বাক্যের উৎপত্তি হইতে পারে ; কিন্তু 'জাবর' (রোমন্থ) ও 'জাব' (খইল ও ভুসি মিশানো কুচা বিচালি)—এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি মূল শব্দ ? 'জাবর' যদি মূল শব্দ হয়, অর্থাৎ যদি 'জব্ধ' হইতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে 'র' আসিল কী করিয়া ? আমার বোধ হয়, √জম্ভ, 'জব্‌ভ'—ইহাদের সহিত 'জাব' কথার

সম্বন্ধ নাই। তামিলে √'শাপ্পডু' বা চাপ্পডু' = খাওয়া; তুলনীয়—বাঙ্গালায় 'ভাত শাপ্‌ড়ানো'; ইহার সহিত 'জাবর' শব্দের যোগ থাকা সম্ভব; তামিলের 'চ (= শ)' অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষায় 'জ' রূপে মিলে। 'জাবড়া, জোবড়া, সাপটা, সাপ্‌টান, সাবড়ান, সাবাড়' (উচ্চারণে 'শ')—এই পদগুলির সহিত 'জাবর', 'জাব' এবং 'চাপ্পডু'র সম্বন্ধ আছে কি?

১৩। অবেস্তা 'জে.ম্' বা 'জ.ম্', = সংস্কৃত 'জ্‌মা', অবেস্তা 'জে.ম্‌অএনি', পহ্লবী 'জ.মীন্' = ভূ-সম্বন্ধীয়, ঈন্-প্রত্যয়-সিদ্ধ বিশেষণ পদ। আধুনিক ফার্সী 'জ.মীন্' কিন্তু বিশেষ্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহা হইতে বাঙ্গালা 'জমী'।

১৪। [সংস্কৃত 'ৱাট' শব্দ প্রাকৃত হইতে, √ৱৃ (আচ্ছাদনে) হইতে জাত; 'ৱৃত—*ৱর্ত—*ৱট্ট—ৱাট'—এইরূপ উৎপত্তি সম্ভব। 'ৱাটিকা—ৱাডিআ—বাড়ী'; বাঙ্গালা 'বাড়ী' ও ইংরেজ wall এক-ই ধাতু হইতে (√ৱৃ, আদিম আর্য্যভাষায় কিন্তু *ৱৡ ধাতু)। ইংরেজির wall কথাটি লাতীন vallum বা uallum হইতে গৃহীত।]

১৫। 'জেদ, জিদ'—আরবী শব্দ; আরবী 'দি.দ্‌দ্'-ধাতু, অর্থ 'পরাজয় করা, বিরোধী হওয়া'; এই ধাতুতে 'দ.াদ্' (জে.াআদ) অক্ষর আসে; ফার্সী ও উর্দূতে এই অক্ষরের উচ্চারণ 'জ.'; আরবী বিশেষ্যপদ 'দি.দ্দ্' উর্দূতে 'জি দ্দ্', 'জি.দ্'; Fallon-এর হিন্দুস্থানী অভিধানে এই পদের অর্থ—(১) opposition, opposite, the contrary, contrareity; (২) reverse, obverse, antithesis, (৩) insistence, persistence (sinazori). Fallon প্রয়োগ দেখাইয়াছেন :—'জি.দাবদী' = ঝগড়া, 'জি.দ্‌পর' = বিরোধবুদ্ধিতে; 'জি.দ্ চঢ়না, জি.দ্ আনা' = ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করা; 'জি.দ্ রখ্‌না, জি.দ্ হোনা' = হিংসা পোষণ করা; ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করা।।

১৬। অবেস্তার 'ৱরেমি'তে অন্তঃস্থ (ৱ) আছে, বর্গীয় 'ব' নহে, সংস্কৃত 'ভ্রমি' = 'ৱরেমি', এরূপ হইতে পারে না; কারণ সংস্কৃত আদ্য 'ভ'-এর স্থানে অবেস্তার ভাষায় অন্তস্থ 'ৱ' পাই না। 'ঊর্মি' = *'ৱৃর্মি', *'ৱৃর্মি' (তুলনীয়—সংস্কৃত 'ঊর্ণা' = গথ ভাষায় wulls; 'ৱৃণোতি, ঊর্ণোতি'; √ৱস্—উবাস, √ৱচ্—উবাচ; অবেস্তা 'ৱদ্'—সংস্কৃত 'উদ্'; 'ৱহ্'—'ঊঢ়', *'ৱঘ্‌দ' হইতে); *'ৱৃর্মি' শব্দের অনুরূপ সমজাত শব্দ অ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্সনে wielm, স্লাভ্ vluna, লিথুআনীয় vilnis—ইহাদের অর্থ বিক্ষোভ, প্রবাহ। এই শব্দগুলি অ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন well (= প্রস্রবণ) পদের সহিত সম্পৃক্ত। ইংরেজি

well, wal-k, সংস্কৃত 'বল্' ('বল্ল') ধাতুর—সঞ্চালন অর্থে, 'বলয়তি, বালয়তি'—সহিত সমজাত। সংস্কৃত 'বল্' ধাতুর আদিম আর্য্যরূপ*'বৃ' বা *'বৄ' বা '*বঃ'; তাহা ইহতে * 'বৃর্মি'; পরে 'উর্মি', এবং অবেস্তার 'ব্ররেমি'।

সংস্কৃত 'ভ্রম্'-ধাতু-নিষ্পন্ন 'ভ্রমি' শব্দের সহিত অ্যাঙ্গ্লো-স্যাক্সন brim শব্দের যোগ আছে; brim অর্থে (প্রবহমান) সাগর।

১৭। Wet—সংস্কৃত ত-প্রত্যয়ান্ত 'উক্ত' শব্দের ইংরেজি রূপ নহে। wet, water, স্কাণ্ডিনেভীয় vatn, সংস্কৃত 'উদ্, উদন্' শব্দের সহিত সমধাতুক মাত্র॥

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২৪।

বাঙ্গালা বানান-সমস্যা

(১) বিদেশী ভাষার কথা বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব।

বাঙ্গালা অ-কারের হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই রকম উচ্চারণ আছে; আ-কারের এক হ্রস্ব উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে। এ-কার দিয়া তিন রকম ধ্বনি জানানো হয়। এই তিনের হ্রস্ব দীর্ঘ ধরিলে ছয়ে দাঁড়ায়। ও-কারেরও এক হ্রস্ব ধ্বনি আছে। ব্যঞ্জন বর্ণগুলির নূতন নূতন ধ্বনি আসিয়াছে। সাধারণ পাঠকদের জন্য বাঙ্গালায় যে সকল বই ও প্রবন্ধ লেখা হয়, তাহাতে বাঙ্গালা কথায় এই স্বর- ও ব্যঞ্জন-ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘ ও অন্যপ্রকার পার্থক্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়া কোনও বিশেষ লাভ নাই, বরং তাহাতে নূতন করিয়া গোলমাল উঠিবাব সম্ভাবনা। ভাষাতত্ত্ব বা উচ্চাবণতত্ত্ব লইয়া কোনও বিশেষ বই লেখা হইলে, তাহাতে স্বরবর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব ও উচ্চারণেব অন্য খুঁটিনাটি বিষয় জানাইবার জন্য আবশ্যক-মতো বিশেষ চিহ্ন দেওয়া বা নূতন করিয়া উদ্ভাবিত অক্ষব ব্যবহার করিতে পারা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে আমার নিজের মত এই যে, বিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে লেখা ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক বইয়ে উচ্চারণ বা ধ্বনি জানাইতে হইলে বাঙ্গালা অক্ষরের উপর উৎপীডন না করিয়া রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিলে ভালো হয়। ইউরোপে উচ্চারণ বা ধ্বনি নির্দেশ করিবার জন্য রোমান বর্ণমালার অক্ষরগুলি লইয়া ও বিশেষ চিহ্ন দেওয়া কতকগুলি নূতন অক্ষর যোগ করিয়া যে সকল phonetic alphabet তৈয়ারী হইয়াছে, যাহার সাহায্যে সকল প্রকারের স্বর- ও ব্যঞ্জন-ধ্বনি সহজেই জানানো যাইতে পারে (যেমন প্যারিসের Association Phonetique Internationale-এর বর্ণমালা), সেইরূপ একটি বর্ণমালার সাহায্য লওয়া উচিত। রসায়ন শাস্ত্রের (Chemistry-র) মূল উপাদানের নামের সংকেত বা নির্দেশক চিহ্নগুলি (symbols) যেমন আন্তর্জাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—H_2SO_4-কে বাঙ্গালা রসায়নের বইতে যেমন 'হ$_2$সও$_4$' বা H_2O-কে 'উ$_2$অ' লেখা চলে না—ভাষাতত্ত্বের মূল উপাদান ধ্বনিগুলির আন্তর্জাতিক symbol হিসাবে, সহজ-বোধ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত, এবং ইউরোপে ও আমেরিকায় লিখিত ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক বইতে বিশেষ রূপে প্রচলিত a b c d, ɔ, ə x প্রভৃতি অক্ষরগুলিকে নূতনভাবে সাজাইয়া লইয়া ও বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি নির্দেশের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিলে আমাদের জাতীয় সম্মানে আঘাত লাগিবার কোনও কারণ হইবে না।

কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা নিজেদের ও সাধারণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বাঙ্গালায় ধ্বনিতত্ত্ব (phonetics) বিষয়ে গবেষণা করুন, বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি লইয়া চুল-চেরা বিচার করুন, ঠিক ধ্বনিটি নিখুঁত ভাবে নির্দেশ করিবার উপযোগী symbol উদ্ভাবন করিতে থাকুন; কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বড়ো ধার ধারেন না এমন সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তাহাব বড়ো একটা মূল্য নাই। বাঙ্গালা ভাষার অক্ষরগুলি এক বা একাধিক বিশেষ বিশেষ ধ্বনির মূর্তি হিসাবে বাঙ্গালা-ভাষীর কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই সকল ধ্বনির একটু-আধটু তফাৎ যাহা আছে তাহা বাঙ্গালা বর্ণমালায় দেখানো সহজ নহে; এবং খাঁটি বাঙ্গালা কথায় উচ্চারণের খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর দিবার আবশ্যকও নাই। আমাদের মাতৃভাষার কথা আমরা ঠিক-মতো পড়ি, বানানের অসামঞ্জস্যে বড়ো একটা আসিয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ধ্বনি নাই, বিদেশী নামে বা শব্দে যদি সেই সকল ধ্বনি আসে, এবং বাঙ্গালায় যদি সেই সকল নাম বা শব্দ লিখিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা অক্ষর দিযা তাহাদের ধরিতে গেলে মুস্কিলে পড়িতে হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে এই সকল বিদেশী ধ্বনি উচ্চারণ করা অনেক স্থলে মোটেই কঠিন নয়, একটু নির্দেশ থাকিলে বাঙ্গালী পাঠক বিদেশী শব্দটিকে ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন। কিন্তু নির্দেশক চিহ্নের অভাবে অনভিজ্ঞ থাকিলে উচ্চশিক্ষিত পাঠকেরাও বহু স্থলে যথাজ্ঞান পড়িয়া যাইতে বাধ্য হন। ফলে, বিদেশী কথা অনেক সময়ে বড়োই বিকৃত শোনায়। ঠিকমতো যাহাতে পড়িতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে গেলেই, বাঙ্গালা হরফে ফুট্‌কি বা অন্য কোনও চিহ্ন দেওয়া ছাড়া গতি নাই। ইহাতে নূতন হরফ তৈয়ারী করিতে হয়, হরফের সংখ্যা বাড়িয়া যায়, ছাপাখানা-ওয়ালারা রাজী হন না। এইজন্য ইচ্ছা থাকিলেও লেখকরা এ বিষয়ে কিছু করিতে পারেন না।

বিদেশী ধ্বনির মধ্যে স্বর-ধ্বনি লইয়া বড়ো বেশি ঝঞ্ঝাট নাই। বাঙ্গালা অক্ষরের যে আধুনিক উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দুইটি ছাড়া আর সব সাধারণ বিদেশী স্বরধ্বনি মোটামুটি ভাবে জানাইতে পারা যায়। অবশ্য হ্রস্ব দীর্ঘ জানাইবার কোনও ব্যবস্থা কতকগুলি ধ্বনির পক্ষে নাই। বিদেশী স্বরধ্বনি একেবারে ঠিকটি যদি ধরিতে না পারা যায়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই, বাঙ্গালা অক্ষরকে না বদলাইয়া একটা কাছাকাছি দাঁড় করাইতে পারিলে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এখন যে দুইটি বিদেশী স্বর বাঙ্গালা অক্ষরে জানানো মুস্কিল, সে দুটি হইতেছে এই :—

(১) ইংরেজি but, her, sir, son-এর হ্রস্ব আ-কারের মতো ধ্বনি জর্মান, ফরাসি ও অন্যান্য অনেক ভাষায় আছে। এই ধ্বনি ইউরোপীয় কথায় থাকিলে 'অ', 'আ' ও হালের 'অ্য'—এই তিন উপায়ে বাঙ্গালায় লেখা হয়; যেমন 'সর্', 'সার্', 'স্যর্' (কখনও কখনও 'স্যার্')। এখন এই ধ্বনি ঠিক 'অ' বা 'আ' নয়, ইহা হিন্দী মারাঠী তামিল তেলুগুর 'অ'-কারের মতো। ইহাকে বাঙ্গালায় 'অ্য' রূপে লিখিলে বোধ হয় ভালো হয়; যেমন, Burns ব্যর্ন্স্, Douglas ড্যগ্লাস্, Balfour ব্যাল্ফ্যর্, Milton মিল্ট্যন্, Sainte-Beve স্যাঁৎ-ব্যভ্., Brieux ব্রিয়্য, Königsberg ক্যনিগ্জ্. ব্যর্গ্, Goethe গ্যোটে (ঠিক মতো 'গ্য-ট্য', কিন্তু এ সম্বন্ধে বেশি উৎসাহী হইয়া 'গেটে', 'গয়টে' প্রভৃতি প্রচলিত এ-কারান্ত রূপকে একেবারে নির্বাসিত করিবার চেষ্টা করিলে কেহ শুনিবে না)। পদের মাঝে স্বরধ্বনির পর য-ফলা যুক্ত হইলে ব্যঞ্জন বর্ণকে দ্বিত্ব করিয়া পড়িবার সম্ভাবনা, কিন্তু হাইফেন্ ব্যবহার করিলে সে সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যায়; যেমন Chatterton চ্যা-ট্যর্ট্যন্, Plymouth প্লি-ম্যথ্.। পদের মধ্যে য-ফলার ব্যবহারে হয়তো আপত্তি উঠিতে পারে, এবং আমারও বোধ হয় চোখে যেন কেমন লাগে। কিন্তু কথার গোড়ায় এই 'অ্য' ধ্বনি আসিলে, এবং কথার শেষে বা মাঝে দুই ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরে আসিলে (যেমন Milton মিল্ট্যন্, Jonson জন্স্যন্), বোধ হয় অ-কারে য-ফলা যুক্ত করিয়া লিখিতে আপত্তি হইবে না। (২) দ্বিতীয় ধ্বনিটি ফরাসির u এবং জর্মানের ü বা oe-র ধ্বনি, ইহা 'ই' ও 'উ'-র মাঝামাঝি গোছের এক প্রকার ধ্বনি; ভারতীয় বর্ণমালায় এইটিকে জানানো কঠিন। ইহার উচ্চারণও অভ্যাস না করিলে সাধারণ বাঙ্গালীর মুখ দিয়া বাহির হওয়া সহজ নহে। বাঙ্গালায় ইহাকে লিখিতে গেলে 'য়ু' রূপে লেখা ছাড়া আর উপায় দেখি না। 'য়ু' লিখিলে ইহার উচ্চারণের কতকটা আন্দাজ করিতে পারা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে 'য়ু'-কে 'উ' না পড়িয়া 'yu' পড়িতে হইবে। মধ্য-যুগে জর্মানে iu দ্বারা এই ধ্বনি বহুস্থলে নির্দিষ্ট হইত। রুষ অক্ষরে ফরাসি ও জর্মান নাম লেখা হইলে এই ধ্বনি yu রূপে লিখিত হয়; যেমন Müller, Grün, Dubois, রুষ বানানে Myuller, Gryun, Dyubva। ফরাসি কথা ইংরেজিতে আসিলে ফরাসির u ইংরেজিতে yu রূপে উচ্চারণ করা হইত ও হয়; যেমন ফরাসি peculier, ইংরেজের মুখে pikyuliar; cube—kyub; nature (নাত্যুর)—nei-tyur, পরে ty এর চ-য়ে পরিবর্তন হয়, এবং স্বরবর্ণের উচ্চারণ ও ঝোঁক অন্যপ্রকার হইয়া যায়; তদ্রূপ attitude—ætityud (ty = চ),

rondure—rɔndyur (ɔ = অ, dy = জ); verdure—vərdyur (ə = অ্য)। অতএব এই ধ্বনির সহিত অপরিচিত বিদেশীর কাছে yu-রূপ ইহার সদৃশ ধ্বনি দেখা যাইতেছে; এই হিসাবে নূতন অক্ষর উদ্ভাবন না করিয়া 'য়ু' দ্বারা বাঙ্গালায় কাজ সারিতে পারা যায়; যেমন Hugo = য়ুগো, Murat = ম্যুরা, de Musset = দ্য-ম্যুসে, du Chatelet = দ্যু-শাতলে, Müller = ম্যুলের (ম্যু-ল্যর), Brühl = ব্র্যুল্, Bühler = ব্যুলের (ব্যু-লর)।

ব্যঞ্জন-ধ্বনি লইয়া কিন্তু বেশি গোলমালে পড়িতে হয়। যতদিন না বাঙ্গালা হরফের সেটে জ় খ় ব প্রভৃতি হরফ সকল ছাপাখানায় পাওয়া যাইতেছে, ততদিন যেন ইংরেজি z, w, জর্মান ch প্রভৃতির ধ্বনি বাঙ্গালা লেখায় নির্দেশ করা ঘটিয়া উঠিতেছে না। কিন্তু আমি বলি যে নূতন করিয়া জ় খ় হরফ বানাইবার আবশ্যক নাই, ইংরেজি ফুল-স্টপের সাহায্যে অনায়াসে কাজ চলিতে পারে এবং লেখকেরা z, ফরাসির j প্রভৃতির ধ্বনি লিখিতে চাহিলে ছাপাখানা-ওয়ালাকে প্রমাদ গণিতে হইবে না। লেখকেরা যদি এবিষয়ে একটু অবহিত হন, তাহা হইলে নূতন অক্ষর বাড়াইয়া ছাপাখানা-ওয়ালাদের ও কম্পোজিটর বেচারিদের বিব্রত না করিয়া এই জিনিসটা সহজেই বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে নীচে-লেখা উপায়-মতো বিদেশী ব্যঞ্জন-ধ্বনি বাঙ্গালায় লেখা চলিতে পারে। যিনি ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিবেন, ভালো, যিনি না পারিবেন, তিনি বাঙ্গালার চলিত উচ্চারণ ধরিয়া পড়িলেই, মূলের অনেকটা কাছাকাছি উচ্চারণ পাওয়া যাইবে।

ক.—আরবীর 'বড়ী ক.াফ.' = q : কু.ত্.বু-দ্দীন, মীর-তকী., য়া'কূ.ব।

খ.—আরবীর ও ফার্সীর 'খে.', জর্মানের ch : খু.স্রৌ, খ.ল্জী, খি.লাৎ; Richter রিখ্.ট্যর্, Fichte ফি.খ্.টে, Bach বাখ্.।

ঘ.—আরবী, তুর্কী ও ফার্সীর 'ঘ.াইন' অক্ষরের ধ্বনি : ঘু.লাম, মোঘ.ল্, তোঘ.লক্, চিরাঘ.।

জ.—ইংরেজি s ও z, জর্মান s, আরবী ও ফার্সী 'জে.', এবং আরবীর 'ধ.াল্, দাদ্, জে.া' অক্ষরের ফার্সী ও উর্দু উচ্চারণ (জ.) : Bridges ব্রিজেজ., Geddes গেডিজ., Rosalind রোজ.ালিন্ড্, Breslau ব্রেজ.লাউ; রজ.ীয়া, জ.ফ.র্, মুইজ.জু.-দ্দীন, খি.জ্.র্, হজ.রৎ, আওরঙ্গজে.ব্।

ঝ.—zh, ফরাসির j, ge, gi : Jean ঝাঁ.া, Joffre ঝো.াফ্.র্ (প্রচলিত রূপ 'জফরী, জোফার'), Eugenie অ্যঝে.নী। ফার্সী ژ ঝে. অক্ষরের ধ্বনি—অঝ্.দহা।

ত.—আরবীর 'তে.' বর্ণ—সুলত.ান্, কু.ত্.ব, ত.াহির্. লুত.ফ্.-ন্নিসা।

থ.—দন্ত্য-স-ঘেঁষা উষ্ম থ., ইংরেজি thin, thick-এর th, স্পেনীশের ce, ci, আরবীর 'থ.া' (ফার্সী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে 'সে'); যেমন Thoburn থে.াব্যর্ন্, Thorpe থ.র্প্; Ciudad থি.উধ.াদ্, থি.উদাদ্, Barcelona বার্থে.লোনা; হ.দীথ. (=হদীস্), ঘি.য়াথ্.-দ্দীন (=ঘি.য়াসুদ্দীন)। এই থ. আমাদের 'ত্+হ=ৎহ', থ নহে।

দ.—আরবী 'দ.াদ্' (=ফার্সী ও উর্দুর 'জে.াআদ্')।

ধ.—জ.(z)-ঘেঁষা উষ্ম ধ., ইংরেজি then, that-এর th, স্পেনীশের d (দুই স্বরের মাঝে থাকিলে); আধুনিক গ্রীকের d, আরবীর 'ধ.াল্' অক্ষরের ধ্বনি (ফার্সী ও উর্দুর 'জ.াল্')।

ফ.—f, ইংরেজির ph বা f, ফার্সীর 'ফে.'। [ভারতীয় ফ=ph, প্‌হ; বাঙ্গালায় কিন্তু মহাপ্রাণ p+h-এর জায়গায় উষ্ম বা উপধ্মানীয় f খুব শুনা যায়।]

ব.—'ৱ' পাওয়া না গেলে w-এর ধ্বনি জানাইবার জন্য ব.-এর ব্যবহার চলিতে পারে; যেমন Wordsworth ব.র্ড্জ.ব.র্থ্। [বাঙ্গালায় wa-র জন্য ওআ, ওয়া, (ওা) চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু আরবী ও ফার্সী কথায় মূলানুসারী লিপ্যন্তরণে ব. ব্যবহার করিতে পারা যায়]।

ভ.—উষ্ম 'ভ'=ইংরেজির v, জর্মানের w: Victoria ভি.ক্টোরিয়া, Viceroy ভ.াইস্রয়্; Wagner ভ.াগ্নর্, Weimar ভ.াইমার্; মৌলভ.ী, ভ.ক.ীল্। [ভ. কেবল ইউরোপীয় শব্দে ব্যবহার করিলেই ভালো হয়; ভারতীয় শব্দে v=ব; যেমন Tinevelly=তিরুবল্লী, তিনেবেলী, Venkata=বেঙ্কট, Nigliva=নিগ্লীব]।

ল.—বৈদিক ळ। ইতালীয় gl, স্পেনীশ ll, পোর্তুগীস lh-এর 'তালব্য ল'কেও ল.-রূপে লিখিতে পারা যায়; llama=ল.ামা, Magelhaes (=Magellan) মাঝে.ল.াইশ্ (মাজেল্লান্)।

হ.—আরবীর 'বড়ী হে': মুহ.ম্মদ, মহ্.মূদ, হ.সন্।

স.—আরবীর 'স.াদ্'. নসি.র, স.াহব।

'=আরবীর 'আইন্ অক্ষর: 'ওস্মান, 'ইশ্ক্, 'আলী, শা'ইর, 'আরব।

যাঁহাদের বিদেশী ভাষার সহিত পরিচয় আছে তাঁহারা এ বিষয়ে পথ দেখাইলে ভালো হয়, বাঙ্গলায় বিদেশী ভাষার নামের বানানের একটা গতি হইয়া যায়। যতদূর জানি, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক

সম্প্রদায়' বইয়ে এ বিষয়ে প্রথম পথ দেখান। তারপর পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ছোটো ছেলেদের জন্য একখানি ইংরেজি Word Book লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে ইংরেজি উচ্চারণ জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা এই ছোটো বইখানি আগেকার মতো এখন একেবারেই প্রচলিত নাই, কিন্তু ইহার ভূমিকায় তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে, এবং তাঁহার বিজ্ঞানসম্মত বর্ণান্তরীকরণ-পদ্ধতিতে শিখিবার অনেক আছে। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, পাঠক সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় এখন এক বিরাট বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিতেছেন। ইহার বই বৈশাখের প্রারম্ভেই বাহির হইবে।* ইহাতে তিনি বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিবার সময় আরবী ফার্সী প্রভৃতি মূল যেখানে দিয়াছেন, সেখানে এইরূপ বিন্দুযুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিয়া তাঁহার অমূল্য বইয়ের উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার অভিধানের পরিশেষে বাঙ্গালায় বিদেশী নাম লেখা সম্বন্ধে একটি অধ্যায় ছাপা হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালা 'লিপ্যন্তরের' একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম (উপরে লেখা প্রণালী মতো) প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছে, এবং অনেকগুলি বিদেশী নামের যথাযথ বাঙ্গালা বানান নির্দেশ করা হইয়াছে।

২। বাঙ্গালা ভাষায় V, W

আধুনিক বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে অন্তঃস্থ ব-কারের v, w দুই উচ্চারণ-ই শুনা যায়। তবে দক্ষিণী পণ্ডিতেরা w-র যেন একটু পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়, মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের মুখে 'বামন, বঙ্গ, বিশ্ব, বিচার, অনুবাদ' প্রভৃতি শব্দ wāmana, wanga, wiśwa, wicāra (c = চ), anuwāda ; মারাঠীদের কাছে অন্তঃস্থ ব-কার w-র সামিল হইয়া দাঁড়ানোর দরুন মারাঠীতে व्ह (= wh) দ্বারা ইংরেজি w-র ধ্বনি জানায় ; যেমন व्हाइसराय, गव्हर्नमेंट (হিন্দীতে ও গুজরাটীতে কিন্তু वाइसराय বা वाइसरॉय, गवर्नमेंट) ; v-এর জন্য সাধারণতঃ व (ব) ব্যবহার করে না। উত্তর-ভারতের (আর্য্যাবর্তের) উচ্চারণে কিন্তু v বেশি শুনি ; পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের মুখে vāmana, vanga, viśwa, vicāra, anuvāda বেশি শুনিয়াছি ; কিন্তু 'ত্বম্', 'দ্বিত্ব' প্রভৃতিকে twam,

---

* জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-সংকলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' ইংরেজি ১৯১৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত (দ্বিতীয়) সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে।

dwitwa রূপে উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি, উত্তর-ভারতেও tvam, dvitva উচ্চারণ বিরল বলিয়া মনে হয়। আরবী ও ফার্সীর 'ৱাৱ' অক্ষর, আরবী-ভাষীর মুখে w (waw), তুর্কী- ও ফার্সী-ভাষীর মুখে v (vav), উত্তর-ভারতে w, v দুই-ই শুনা যায়।

পাণিনির শিক্ষা অনুসারে অন্তঃস্থ ৱ-কারের উচ্চারণ দন্ত্যোষ্ঠ্য (labio-dental বা denti-labial); অর্থাৎ উপরের পাটীর দাঁত নীচের ঠোঁটে চাপিয়া উচ্চারণ করিলে যে ধ্বনি বাহির হয় তাহা-ই পাণিনির মতে ৱ-এর ধ্বনি; এই ধ্বনি হইতেছে ইংরেজি v-র ধ্বনি। কিন্তু সামবেদের প্রাতিশাখ্য ঋক্‌তন্ত্র ব্যাকরণের মতে 'ৱ' ওষ্ঠ্য বর্ণ। [ওষ্ঠ্যো ৱোঃ পূ ॥৯॥ ওষ্ঠ্যস্থানা ৱকার ওকার-ঔকার-উপধ্মানীয়-পকার-উকার-ঊকারাঃ।] অর্থাৎ এই উচ্চারণে দাঁতের যোগ নাই, ইহা bilabial (দুই ঠোঁটের সাহায্যে উৎপন্ন) w-র উচ্চারণ। ইউরোপীয় শিক্ষা (phonetics)-এর মতে v = denti-labial spirant, voiced (অর্থাৎ ঘোষ উষ্ম দন্ত্যোষ্ঠ, বা উষ্ম ভ.) এবং w = semivowel।* সংস্কৃত সন্ধির 'উঅ'তে 'ৱ', ও ঋগ্বেদের ছন্দের জন্য পাঠকালে 'ৱ'কে দুই অক্ষর 'উ অ'তে বিশ্লেষ (ত্বং = তুঅম্,) এবং গথিক, অ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্‌সন, গ্রীক, লাতীন প্রভৃতি ভাষার নজির দেখিয়া অনুমান হয় যে প্রাচীন কালে আদি আর্য্য ভাষায় ৱ-কারের উচ্চারণ semivowel bilabial w ছিল। পরে দন্ত্যোষ্ঠ্য v ধ্বনি আসিয়া পড়ে, এবং প্রাচীন ভারতে বোধ হয় দেশভেদে v বা w-র প্রসার ছিল, কিংবা উচ্চারণের সুবিধা বুঝিয়া আজকালকার মতো v বা w দুই-ই উচ্চারিত হইত। গ্রীকেরা ভারতীয় নাম যেরূপে লিখিতেন তাহা হইতে এই কথাই সমর্থিত হয়; দেৱপল্লী = Deopalli, সুৱাস্তু = Soastes, ইরাৱতী = Hudraotis, ৱিন্ধ্য = Oundion বানানে ৱ = w-স্থানীয়; কিন্তু ৱিপাশা = Huphasis, ৱিতস্তা = Hudaspes, কাৱেরী = Khaberis-এর hu (= hw, wh, = oহ্ = v) এবং b = v হইতে দন্ত্যোষ্ঠ্য ধ্বনির নির্দেশ বুঝা যায়।

'আওআস', 'আওটান', 'সোয়ামী', 'সোয়াস্তি' প্রভৃতি কথায় দেখা যায় যে যেখানে ৱ বাঙ্গালায় বর্গীয় ব (b) হইয়া যায় নাই, বা লোপ পায় নাই,

---

* প্রকৃতপক্ষে ৱ-জাতীয় ধ্বনি তিন প্রকারের—(১) bilabial semivowel = w, বৈদিক 'ৱ', (২) bilabial spirant = w. বা v., (দাঁতের সাহায্য না লইয়া কেবল দুই ঠোঁটে v উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিলে যে ধ্বনি দাঁড়ায়—ভ.); পাঞ্জাবীতে বা ফরাসি ও জর্মানে এই ধ্বনি আছে, (৩) denti-labial spirant = v—লৌকিক সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে 'ৱ'।

সেখানে w রূপেই বিদ্যমান আছে। বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ ব (w বা v)-এর ধ্বনি সাধারণতঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,—হয় পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল (যেমন—নবদ্বীপক—নবদীঅঅ—নওদীআ—নোদীয়া—নোদে ; রব—রঅ—রা), না হয় বর্গীয় ব-য়ে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হালের বাঙ্গালায় w, v ধ্বনির নূতন করিয়া উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু ব অক্ষর দ্বারা ইহাদের জানাইবার চেষ্টা হয় নাই। খাঁটি বাঙ্গালা কথায় w-ধ্বনি সাধারণতঃ আ-কারের পূর্বে পাওয়া যায়, এবং পুরাতন পুঁথিতে এই wa 'ওআ, ওা, ওয়া' রূপে লিখিত দেখা যায়। 'পাওয়া' শব্দের 'পাআ' রূপ থাকিতে পারে, কিন্তু 'পাওয়া'র উচ্চারণ pā-wā, ঠিক pīoa (pā-o a) নয়। w, o, u—সবগুলিই ওষ্ঠ্য ধ্বনি, এক-ই পর্য্যায়ের ; w-র জন্য অক্ষর না মিলিলে o (ও) বা u (উ) ব্যবহার স্বাভাবিক। সেই কারণে wi বাঙ্গালায় ui (উই) লেখা হয়,—উইলিয়াম, উইল William, will—হিন্দীতে বিলিয়ম, বিল ; কুইন queen ইংরেজি উচ্চারণে kuīn নয়, kwīn ; ইতালীয় ভাষায় v আছে, w নাই ; ইংরেজি নাম Edward ইতালীয়ে Edoardo (আমাদের এড্‌ওয়ার্ড, এডোয়ার্ড = Edoard, জর্মানে Eduard, ফরাসিতে Edouard) ; সেইরূপ Baldwin = Balduino (বা Baldovino)। তদ্রূপ এক-ই চীনা কথা বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণে Hua, Hwa ; Kuo, Kwo , Hui, Hwi , Hwen, Hiuen—দুই রকম মূর্তিতে ইংরেজি বইয়ে পাওয়া যায়। w এবং o, u-র এই ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব হেতু ইহাদের অদল-বদল দেখা যায়। নূতন করিয়া ব-কে আমদানি না করিয়া বাঙ্গালায় wa-র ধ্বনি 'ওআ' দ্বারা বেশ চলিতেছে ; ব—এই হরফ বাঙ্গালা বর্ণমালায় b-র ধ্বনির মূর্তি মাত্র ; Weber, Venice, Edwardকে 'বেবর, বেনীস, এডবার্ড' লিখিলে, ইউরোপীয় নামগুলির সহিত যাহার পরিচয় নাই এমন বাঙ্গালী bebɔr, beniś, edbardɔ পড়িবেন। জোর করিয়া w-র জন্য 'ব' লিখিলে, সংস্কৃত উচ্চারণের প্রেতাত্মাকে বাঙ্গালার ঘাড়ে চাপানো হয়। 'ওয়া' চলিতেছে ; 'ওয়া'র 'য়া'কে যাঁহারা দেখিতে পারেন না, তাঁহারা 'ওআ' লিখুন। 'ওা' যদি বাঙ্গালায় চলে, তাহা হইলে খুব-ই সুবিধা হয়, তাড়াতাড়ি লেখা চলে, অথচ ধ্বনি নির্দেশে কোনও বাধা হয় না। খাঁটি বাঙ্গালা কথায় wi, wu, wɔ (ɔ = অ), wo-র ধ্বনি আসে না ; এবং বিদেশী কথায়ও বাঙ্গালী সহজে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করিতে পারে না ; সুতরাং 'ওা' চলিলেও প্রয়োগের অভাব হেতু 'ওি ওু ওো' আসিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। wā ছাড়া এক we পাওয়া যায়, কিন্তু 'ওয়ে' [= oye]

দ্বারা ইহা বেশ লেখা চলে, এখানকার তালব্য 'য়'(y)-টা কণ্ঠ-তালব্য 'এ'-র জ্ঞাতি, জ্ঞাতির আশ্রয়েই রহিয়াছে, 'ওয়া'-র মতো ওষ্ঠ্য 'ও' এবং কণ্ঠ্য 'আ'-র মাঝে অনধিকাব প্রবেশ করে নাই। যাঁহাবা বিভীষিকা দেখেন 'ওা'-কে আস্কারা দিলে ও-কার নেই পাইয়া we-র জন্য 'ওে' মূর্তি ধবিযা ব৺বে, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে এ পক্ষে তিনটি অন্তরায় আছে : (১) 'ওয়ে' খাঁটি বাঙ্গালা syllable নহে, মাত্র কতকগুলি বিদেশী শব্দে আসে, (২) আগে w (ও), পরে এ (য়ে), লোকে সহজেই ব্যঞ্জন ধ্বনিটাকে আগে লিখিবে, ও অনুগামী স্বরটাকে পরে বসাইবে, তাড়াতাড়ি লিখিতে গেলে 'ওয়ে' আগে বাহির হইবে, 'ওে' লিখিতে গেলে হাত কস্ত করিতে হইবে, এবং হাত দুরস্ত হইলেও চোখে 'ওে' যেন eo, ew গোছ দেখাইবে, (৩) 'ওা'-র জন্য পুরাণো নজীর আছে, 'ওে'-র পক্ষে সেরূপ কিছু-ই নাই। 'ওা'-র জন্য আপত্তির কারণ কী বুঝিতে পারি না, 'অ্যা' বাঙ্গালা বানানে জাতে উঠিয়াছে, 'অ্যাকৃওয়ার্থ্', 'অ্যাট্‌কিন্স্', 'অ্যাঙ্গ্‌লো-ইণ্ডিয়ান' প্রভৃতি বানান কাহাবও চোখে লাগে না, কিন্তু এই 'অ্যা' 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র আগে ছিল কি না জানি না, আর 'ওা' প্রাচীন পুঁথিপত্রে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া, বাঙ্গালা যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের মধ্যে সংখ্যায় অর্ধেকের বেশি যাহারা, সেই বাঙ্গালী মুসলমানদেব 'মুসলমানি বাঙ্গালা' সাহিত্যে 'ওা'-ব অবিসংবাদিত রাজত্ব।

বাঙ্গালায় w-র জন্য অসমিয়া ৱ-র ব্যবহার চলিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণ-পরিচয়ের প্রথম ভাগে যতদিন না এই ইলেক-দেওয়া ৱ স্থান পাইতেছে, ততদিন সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে ইহা গোলমেলে ঠেকিবে। w-র জন্য ৱ, ব়, তদভাবে ব.—চালাইতে পারিলে তো ভালোই হয়। অন্ততঃ বিদেশী শব্দের উচ্চারণ কতকটা ঠিক করিয়া জানাইবার জন্য ৱ (ব়, ব.) ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু ব (= b), এই জন্য কিছুতেই চলিবে না।

ৱ-কারের দন্ত্যোষ্ঠ্য ধ্বনি, v, বাঙ্গালায় আজকাল শুনা যায়। আধুনিক বাঙ্গালায় এই ধ্বনিটি মহাপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য ধ্বনি 'ভ'-এর বিকারে জাত। অন্যান্য প্রদেশের লোকের মুখে যেমন বেশ স্পষ্ট, জোর দিয়া উচ্চারিত bh শুনিয়াছি, বাঙ্গালায় 'ভ' শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বয়স্থ ও অল্পবয়স্ক দুই প্রকারের লোকের মুখে সেরূপটি শুনা যায় না, এবং দুই স্বরের মধ্যস্থ 'ভ' বহু স্থলে অলস-ভাবে উচ্চারিত উষ্ম (v) রূপেই বেশি শুনা যায়; যেমন, 'অভিভাবক, সভ্য, প্রতিভা' = ovivābok, śobvo, [পূর্ববঙ্গের śɔⁱbb'ɔ, śɔⁱbbhɔ, śɔⁱbvɔ], protiva।

'ভ'-এর এই উষ্ম উচ্চারণ অতি আধুনিক, বোধ হয় পঞ্চাশ বছর আগে এই উচ্চারণ ছিল না। আগে ইংরেজি কথায় v থাকিলে লোকে 'ব' দিয়াই লিখিত, 'ভ'-কে আজকালকার মতো v-র সামিল মনে করিত না। যেমন 'বিক্‌টোরিয়া, ডুবাল, বার্ণিশ, বর্ষেল = Versailles, বাইস্‌মান। এখন 'ভ' v-র অনুরূপ হইয়া পড়ায় 'ভারডুন, ভাইসরয়, ভোট' প্রভৃতি বানান। এইরূপ প্রয়োগ হইতে 'ভ'-কে সরাইতে পারা যাইবে না। 'ভ'-এর এই নতুন উচ্চারণ (v, ভ.) মানিয়া লইয়া ইউরোপীয় v-ব ধ্বনিকে, বাঙ্গালায় যাহা স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া 'ভ'-দ্বারা লেখা উচিত। কিন্তু 'ভ'-এর মহাপ্রাণ bh ও অন্তঃস্থ v উচ্চারণের পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্য বিদেশী শব্দে v = ভ., এইরূপ বিন্দু-যুক্ত ভ. ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না॥

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২৪

বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজি নাম ও শব্দ

বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা। লোকসংখ্যার হিসাবে বাঙ্গলা পৃথিবীর অষ্টম ভাষা—ইংরেজি, উত্তর-চীনা, হিন্দুস্থানী, রুষ, স্পানীয় জরমান, জাপানী—এগুলির পরেই বাঙ্গলার স্থান। প্রায় সাড়ে-নয় কোটি [দশ কোটিরও অধিক—১৯৬১] মানুষের ভাষা—পাকিস্থানের পূর্ব-বঙ্গ [বর্তমানে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলা দেশ'—১৯৬১] এবং আমাদের ভারতের পশ্চিম-বঙ্গ—এই দুই অঞ্চলের যথাক্রমে ছয় কোটি বিশ লাখ [বর্তমানে সাত কোটি], আর তিন কোটি চল্লিশ লাখ, আর বাকী ভারতের কয়েক লাখ—এই-সমস্ত মিলাইয়া বাঙ্গলা-ভাষীর সংখ্যা। ১৯৬১ সালের লোক-গণনা অনুসারে, হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর মগহিয়া লোকসংখ্যা তেরো কোটির কিছু উপর, তাও আবার ইহাদের মধ্যে কয়েক কোটি ভোজপুরী ছত্তিশগড়ী আওধী রাজস্থানী পাহাড়ী মানুষ আছে যাহারা ঘরে নিজ-নিজ ভাষা বলে, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী তাহাদের ইস্কুলে শেখা পোশাকী ভাষা, মাতৃভাষা নহে।

বাক্‌তত্ত্ব আমার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। পৃথিবীর ছোটো বড়ো নানা ভাষার প্রকৃতি অর্ধ শতকের অধিক কাল ধরিয়া আমার জীবনের মুখ্য আলোচ্য বস্তু হইয়া আছে। পৃথিবীর প্রাচীন ও নবীন শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য এবং শক্তির সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় করিবার সুযোগ আমি লাভ করিয়াছি। তুলনাত্মক বিচার এই পরিচয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাঙ্গলাকে নিঃসংকোচে একটি অতি সুন্দর ও শক্তিশালী ভাষা বলা যায়। ভারতীয় বা বিদেশীয় অন্য কোনও ভাষাকে উপেক্ষা করিয়া বা তাহার অমর্য্যাদা করিয়া বলিতেছি না। বাঙ্গলার শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বিচার করিয়া একজন ইংরেজ বলিয়াছিলেন, ইতালীয় ভাষার মাধুর্য্য আর গ্রীক ভাষার শব্দ-গঠন-শক্তি, এ দুই-ই বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যমান। আধুনিক সাহিত্যের কথা ধরিলে, বাঙ্গলার বিশেষ মহত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়। বাঙ্গলা ভাষার অনুরাগী আর একজন ইংরেজ বলিয়াছিলেন, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সাহিত্য-গৌরবে দুইটি প্রথম শ্রেণীর ভাষা আছে—একটি ইংরেজি, অন্যটি বাঙ্গলা। বাঙ্গলা সাহিত্য, প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালীর এবং পরোক্ষভাবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের মনকে আধুনিক জগতের চিন্তাধারার উপযোগী করিতে সাহায্য করিয়াছে।

মাতৃভাষা বলিয়া তো বটেই, সুন্দর সুমধুর শক্তিশালী ভাবব্যঞ্জক ভাষা বলিয়া ইহার সম্বন্ধে বঙ্গভাষী আমাদের সকলের মনে ভালোবাসা আছে, গৌরব-বোধ আছে। বাঙ্গলা যাহাতে আরও উন্নত হয় তাহা অহরহঃ কামনা করিতেছি, প্রার্থনা করিতেছি। আধুনিক ভারতেব জনগণের মননের গভীরতা এবং চিত্তের প্রসার আনিবার জন্য এক সঙ্গেই সংস্কৃত এবং ইংরেজির চর্চা, ইস্কুলে ও কলেজে মাতৃভাষার সঙ্গে-সঙ্গে এই দুই ভাষার পঠন-পাঠনের আবশ্যিকতার উপলব্ধি করিয়া সেই বিষয়ে সুব্যবস্থা করা আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর অন্যতম অপরিহার্য্য নীতি বলিয়া মনে করি। বাঙ্গলা ভাষাকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি,—সেই জন্য ইহার চর্চায়, ইহার পঠন-পাঠনে, ইহার লিখনে, বার্তালাপে শালীনতার সহিত ইহার ব্যবহারে আমরা যাহাতে অবহিত হই, সুযুক্তি ও ভাবশুদ্ধিব দ্বাবা পরিচালিত হই, ইহা সকলেরই কাম্য।

জগতে বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে উদ্ভূত কোনও কিছু পরিপূর্ণ বা নির্দোষ নহে। অন্যান্য বস্তুর মতো কোনও ভাষাও ভাবপ্রকাশে এবং উচ্চারণ লিখন ও বর্ণবিন্যাস বিষয়ে পূর্ণভাবে নিয়মানুবর্তিতায় ত্রুটিহীন নহে। প্রত্যেক ভাষারই তাহার দোষ গুণ মিলাইয়া একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্বকীয় প্রকৃতি বা ধর্ম আছে। যুগধর্ম অনুসারে, সেই ভাষা যাহাবা বলে, তাহাদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক গতি অবলম্বনে, ভাষার প্রকৃতিতে বা ধর্মে পরিবর্তন আসিয়া যায়। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জীবন্ত ভাষা হইতেছে গতিশীল 'বহতী নদী'—বদ্ধ 'কূপ-জল' নহে; ভাষা একটি dynamic বা গতিশীল ব্যাপার, static বা স্থিতিশীল নহে। সেই হেতু ভাষার নানা অঙ্গে নানা প্রকাশ-ভঙ্গীতে পরিবর্তন অহরহঃ ঘটিতেছে, এবং সেই পরিবর্তন আমাদের মানিয়া লইতে হয়। সেই পরিবর্তন কিন্তু সাধারণতঃ স্বাভাবিক গতিতেই চলে, তাহা evolutionary অর্থাৎ বিবর্তন-মূলক, revolutionary অর্থাৎ বিপ্লবাত্মক নহে। ভাষার প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি যাহা মোটামুটি দাঁড়াইয়া গিযাছে এবং একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করিয়াছে, যে রীতি-পদ্ধতি এবং যে রূপ এখনও জীবিত আছে এবং বিলুপ্ত হয় নাই, তাহাকে উল্টাইয়া দিয়া বা নাকচ করিয়া দিয়া এই পরিবর্তন যদি আনা যায়, তাহা হইলে তাহা সকলের নিকটে স্বীকৃত হয় না; এবং বিশেষ আবশ্যকতা দেখা না দিলে, বাহিরের কোনও ভাষার চাপে বা নকলে বা অনুকরণে এইরূপ পরিবর্তন আনিবার ও ভাষায় তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, একটি অনুচিত ও কৃত্রিম ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়; এবং ইহার দ্বারা ভাষার বহুদিনের ইতিহাসের ফল-স্বরূপ যে

নিয়মানুবর্তিতা যে পরিপাটী গঠিত হইয়া গিয়াছে তাহার বিরোধ করা হয় মাত্র, এবং ভাষার স্বচ্ছন্দ গতির ও বিকাশের উপর অযথা আক্রমণ করা হয়। ইহার অন্যতম নৈতিক পরিণতি—ভাষা-বিষয়ে যে discipline, যে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে তাহাতে ভাঙ্গন ধরানো হয়, ভাষার প্রয়োগে অরাজকতা ও দুর্বোধ্যতা আসে ;—একটি প্রৌঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষার প্রকাশের মাধ্যমে সহজেই আমরা যে সচ্চিন্তা ও সুযুক্তির অধিকারী হইয়া থাকি, তাহা হইতে আমাদের বিচ্যুত করিয়া দেওয়া হয়।

এই কথাগুলি বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে, কয়েক মাস ধরিয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে ইংরেজি নামের বাঙ্গলা প্রতিবর্ণীকরণে যে রীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহা দেখিয়া। বাঙ্গালীর উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া সহজভাবে কয়েক শত বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাঙ্গলা বর্ণবিন্যাস-পদ্ধতি বা বাঙ্গলা অক্ষরে লিখন-রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে অনুসৃত নূতন এই রীতি কতকগুলি বিষয়ে তাহার বিরোধী এবং পরিপন্থী বলিয়া মনে হইতেছে, এবং ইহার প্রভাবে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের মনে তাহার মাতৃভাষার পঠনে অনুচিত এবং অনাবশ্যক বিভ্রান্তি আসিয়া যাইতেছে মাত্র—সাধারণ পাঠক ইহাতে দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন, মাতৃভাষার লিখন-শৈলী বা পরিপাটীর উপরে আঘাত পড়িয়া, বাঙ্গালী জাতির মনন ও চিন্তনের পক্ষে ইহা হানিকারক হইতেছে। এই নূতন পদ্ধতির সমালোচনায় আমার বিনীত প্রতিবাদ এই প্রবন্ধে নিবেদন করিতেছি।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাঙ্গলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য, এবং বহু বৎসর ধরিয়া 'আনন্দবাজার' পত্রকারিতার মাধ্যমে বাঙ্গলা ভাষার অতন্দ্র সেবা করিয়া আসিয়াছে, সে সেবা বাঙ্গালী ভুলিবে না। বাঙ্গলা গদ্যের এ যুগের উপযোগী বিবর্তনে, 'আনন্দবাজার'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও সংবাদ-পরিবেশন বিশেষ লক্ষণীয় শক্তি সৌন্দর্য্য ও শালীনতা আনিয়া দিয়াছে। যে কোনও আধুনিক চিন্তাধারা ও তথ্য এবং তত্ত্ব, সহজে সাবলীল ও সুন্দরভাবে আমরা বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি বলিয়া মনে-মনে যে গর্ব পোষণ করি, তাহার পিছনে আছে 'আনন্দবাজার' ও অন্যান্য বাঙ্গলা পত্র-পত্রিকার পরিচালকদের মাতৃভাষার প্রতি অতুলনীয় প্রীতি ও শ্রদ্ধা এবং মাতৃভাষার চর্চা সম্বন্ধে তাঁহাদের ধীর, স্থির এবং বিচার- ও যুক্তি-পূর্ণ নিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, ভূদেব, চন্দ্রোদয়, কালীপ্রসন্ন, ব্রহ্মবান্ধব, পাঁচকড়ি প্রমুখ বাঙ্গলা পত্রকার-জগতের নমস্য পথিকৃৎদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এ যুগের 'আনন্দবাজার'-এর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও

প্রফুল্লকুমার সরকার এবং ইঁহাদের সহকর্মীরা, বিচার আলোচনা তথ্যজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষাকে কতটা না শক্তিশালী করিয়া গিয়াছেন! বিদেশী বহু বহু শব্দের কত সুন্দর সহজবোধ্য বাঙ্গলা অনুবাদ দিনের পর দিন ইঁহারা বাঙ্গলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে আনিয়া দিয়াছেন, সেই-সব শব্দ আবার বহুশঃ সহজেই বাঙ্গালী গ্রহণ করিয়াছে, এবং লিখিত সাহিত্যের বাহিরে কথায়-বার্তায়ও ব্যবহার করিতেছে। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পারিভাষিক, সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় ও সহযোগিতায় আমাদের মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হইতেছে। বাঙ্গলার লিখন-পদ্ধতিতে—ইহার বানানে—আধুনিক বাঙ্গলার পক্ষে আবশ্যক এ-কালের উপযোগী নানা পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গলা বর্ণমালায় বিন্দুযুক্ত 'ড় ঢ় য়' বর্ণত্রয় স্থান পাইয়াছে, বাঙ্গলা ছাপার হরফের দেখাদেখি হিন্দীর জন্য নাগরীতে-ও 'ড় ঢ়' গৃহীত হইয়াছে (কিন্তু মারাঠী গুজরাটীতে ও দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে এইরূপ বিন্দুযুক্ত 'ড় ঢ়' স্বীকৃত হয় নাই)। রেফের নীচে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব, অনাবশ্যক বিধায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনে, এখন প্রায় সর্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে—আমরা শত বৎসর পূর্বের মতো আর 'র্ক্ক, র্চ্চ, র্চ্ছ, র্জ্জ, র্ত্ত, র্দ্দ, র্দ্ধ, র্ব্ব, র্ত্ত, র্ম্ম' প্রভৃতি লিখিতেছি না, ছাপাখানাতে এই রেফযুক্ত দ্বিত্ব ক্রমে বিরল হইয়া পড়িতেছে—আমরা 'র্ক, র্খ, র্গ, র্ঘ, র্চ, র্ছ, র্জ, র্ঝ, র্ত, র্দ, র্ধ, র্ব, র্ভ, র্ম' ইত্যাদি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইতেছি। 'যদিও আমার মতে আমরা ভুল করিয়াই 'র্য্য' স্থলে 'র্য' গ্রহণ করিতেছি—সমগ্র বাঙ্গলার উচ্চারণ বিচার করিলে 'র্য্য' লেখাই ঠিক, কারণ বাঙ্গলা 'র্য্য' উচ্চারণে ঠিক রেফের নীচে 'য' (বা 'য়')-র দ্বিত্ব নহে, ইহা হইতেছে 'র্জ্য'—অর্থাৎ রেফ-যুক্ত 'জ'-এ য-ফলা, এই য-ফলা কার্য্যতঃ দ্বিত্ব 'য়'-নহে, ইহা বাঙ্গলায় কোনও-না-কোনও প্রকারে রক্ষিত হইয়া থাকে; বাঙ্গলায় 'ধর্ম, তর্ক, অর্থ, পার্থ' ইত্যাদির উচ্চারণ 'ধর্-ম, তর্-ক, অর্-থ, পার্-থ', কিন্তু 'কার্য্য, আর্য্য' = 'কার্জ্য, আর্জ্য' বহুশঃ উচ্চারণে 'কাইর্জ, আইর্জ'; সেই রূপ 'বাধ্য, মান্য' = 'বাইদ্ধ, মাইন্ন'—য-ফলার এই বিশেষ উচ্চারণ পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রক্ষিত হইয়া আছে।) ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ বাঙ্গলা বানানে বজায় রাখিবার জন্য নূতন সংযুক্ত বর্ণ 'স্ট' বাঙ্গলা হরফে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে (যদিও ভুল করিয়া বহু স্থলে 'ষ্ট'-এর বদলে 'স্ট' লিখিয়া থাকি—খাঁটি বাঙ্গালীত্ব পাইয়া বসিয়াছে এমন বিদেশী শব্দেও—যেমন 'মাস্টার, খৃস্ট, ইস্টিসন'—শুদ্ধ বাঙ্গলা রূপ 'মাষ্টার, খ্রীষ্ট, ইষ্টিশন' স্থলে)। ইংরেজি z-এর ধ্বনির

জন্য বাঙ্গলা বর্ণমালায় বিন্দুযুক্ত 'জ' (বা রেখাযুক্ত 'জ'), এইরূপ আবশ্যক-চিহ্ন-দেওয়া নূতন হরফের ব্যবস্থাও কোনও-কোনও ছাপাখানায় করা হইতেছে; এবং ভাষাতাত্ত্বিক ও অন্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বিন্দুযুক্ত 'খ, ঘ., ঝ, ফ., ভ., থ., ধ.' প্রভৃতির কথাও আমরা ভাবিতেছি।

'আনন্দবাজার পত্রিকার'-র মারফৎ বাঙ্গলা ছাপার কাজে ও সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গলা বানানে এক অতি আবশ্যক নূতন পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে—বাঙ্গলা লিনো-টাইপ। ইহার প্রসাদে বাঙ্গলার অনেকগুলি সংযুক্ত-বর্ণ নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে বাঙ্গলা বর্ণবিন্যাসের প্রকৃতির কোনও বিপর্যয় বা হানি হয় নাই বরং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে এই নবীনতা সহজ-বোধ্যতা আনিয়া দিয়াছে—যেমন 'স্থ'-স্থানে 'স্থ', 'ঞ্চ(ঞ্‌চ)'-স্থলে 'ঞ্চ', 'ঙ্ক'-স্থলে 'ঙ্‌ক'। কিন্তু বাঙ্গলায় 'ক্ষ'-র উচ্চারণ 'খ্য', সেইজন্য এখানে পরিবর্তনের চেষ্টা হয় নাই। —'ক্‌ষ' লিখিলে সংস্কৃত উচ্চারণ অনুসারে শুদ্ধ বানান হইত বটে, কিন্তু বাঙ্গলা উচ্চারণে তাহা চলিত না।

এখন যে ভাবে বাঙ্গলা বানানে ইংরেজি নাম ও শব্দ লিখিবার চেষ্টা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে চলিতেছে, সেটি, নানা দিক্ হইতে, বাঙ্গলা লিপি এবং বর্ণবিন্যাসের ও তৎসঙ্গে বাঙ্গলা উচ্চারণ-রীতির পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া হইতেছে না।

[১] প্রথম কথা—বাঙ্গলা লিপির পৃথক্ 'বর্ণ'গুলির প্রত্যেকটি-ই মূলতঃ একটিমাত্র ধ্বনির নির্দেশক, কিন্তু কার্য্যতঃ বাঙ্গলা বর্ণবিন্যাসে আবার প্রত্যেকটি 'অক্ষর' সাধারণতঃ একাধিক ধ্বনির সমাবেশ দ্যোতনা করে। অর্থাৎ মূলে ইহা alphabetic অর্থাৎ পৃথক-পৃথক ধ্বনির প্রকাশক সরল বর্ণের সমবায়ে বা বর্ণমালাতে আধারিত; কিন্তু প্রয়োগে ইহা syllabic অর্থাৎ একাধিক ধ্বনির পাশাপাশি অবস্থানের সূচনা করে এমন কতকগুলি জটিল অক্ষর লইয়া গঠিত। রোমান লিপি মূলে alphabetic, প্রয়োগেও alphabetic; অর্থাৎ কোনও শব্দের ধ্বনিমূলক বিশ্লেষণে পর-পর যে ভাবে ধ্বনিগুলিকে পাই, সেগুলির প্রকাশক বর্ণগুলিকে পর-পর লিখিয়া গেলেই শব্দটির বানান দাঁড়াইয়া গেল। যেমন 'স্নিগ্ধেন্দু', এই শব্দটি, ইহাতে পর-পর এই কয়টি ব্যঞ্জন ও স্বর পাইতেছি—'স্+ন্+ই+গ্+ধ্+এ+ন্+দ্+উ'—এই প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি পৃথক ধ্বনির নির্দেশক। রোমান লিপিতে s+n+i+g+dh+e+n+d+u, এবং রোমান লিপিতে বানানে পর-পর ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণগুলিকে বসাইয়া দিলেই

হইল—snigdhendu, কিন্তু বাঙ্গলায় অন্য রীতি—দুইটি ব্যঞ্জনের মধ্যে কোনও স্বরধ্বনি না আসিলে, সেই ব্যঞ্জনের বর্ণ দুইটিকে একসঙ্গে পিণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়; এবং উপরন্তু স্বরধ্বনির বর্ণগুলি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করিয়া, উচ্চারণে যে ব্যঞ্জনের পরে এই স্বরধ্বনি আসে, তাহার গায়ে পাশে মাথায় পায়ে স্থান পায়। ইংরেজির strength-এর মতো শব্দকে বাঙ্গলা বর্ণমালায় 'স ট র এ ঙগ থ' লিখিতে চাহিলে, বা sergeant-কে 'স এ (বা অ) র জ এ ন ট' লিখিতে চাহিলে, বাঙ্গলা বানানের পিছনে (ব্রাহ্মী লিপি হইতে শুরু করিয়া) যে ৩।৪ হাজার বছরের একটা পরম্পরা আছে, যে পরম্পরা সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজনমান্য, তাহাকে অস্বীকার কবা হয়। তেমনি বোমান লিপিতে পূর্ণরূপ ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ দিয়া s-t-r-i = stri, বাঙ্গলায় 'সতরঈ' বা 'স্‌ত্‌র্‌ঈ' অচল, আমরা লিখি 'স্ত্রী'। রোমান লিপিতে u-r-dh-v-a, urdhva, বাঙ্গলায় 'উ-র্‌-ধ-ব-অ' নহে, 'ঊর্ধ্ব'।

এইভাবে বাঙ্গলা বানানকে বোমান পদ্ধতির নকলে ঢালিয়া সাজিবার প্রয়াস দুই একবার যে না হইয়াছে তাহা নয়—বাঙ্গলা 'বর্ণ-পবিচয়, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ' এইভাবে লিখিত ও মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব একাধিকবার হইয়াছিল, যথা—'ব অ র ণ অ প অ র ই চ অ য় অ, প র অ থ অ ম অ ও দ ব ই ত ঈ য় অ ভ আ গ অ' এই রূপে। দেখা গেল, ইহা চলিবে না, জটিল বাঙ্গলা বর্ণগুলির সঙ্গে সবল রোমান হরফ সাজাইবার কায়দার গাঁঠ-ছড়া বাঁধা—ইহা হইল 'ধোবী-কা কুত্তা, ন ঘর-কা ন ঘাট-কা'। ইহার চেয়ে সোজা রোমান লিপি গ্রহণ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

বাঙ্গলায় এবং অন্য ভারতীয় লিপিতে এগুলির আদিরূপ ব্রাহ্মী-লিপির সময় হইতেই যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলির একটা বিশেষ সার্থকতা বা উপযোগিতা আছে। দুই বা দুইয়ের অধিক ব্যঞ্জন-ধ্বনির মাঝখানে যদি স্বর-ধ্বনির ব্যবধান না থাকে, তাহা হইলে ব্যঞ্জন-ধ্বনির-প্রকাশক বর্ণগুলিকে একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। ভারতীয় লিপিতে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রাবস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ একা থাকে না, তাহার সঙ্গে তাহার গায়ে মিশাইয়া থাকে 'অ' এই স্বরধ্বনিটি। রোমান s, t হইতেছে 'স্‌, ত্‌', কিন্তু বাঙ্গলা 'স, ত' হইতেছে 'স্‌+অ=স্‌অ, ত্‌+অ=ত্‌অ'। এই অ-কারের ধ্বনির অনুপস্থিতি জানানো হয় দুই উপায়ে—ব্যঞ্জন-বর্ণের নিচে '্' চিহ্ন—'বিরাম'-চিহ্ন (বাঙ্গলায় বলে 'হস্‌-চিহ্ন') বসাইয়া, অথবা, দুইটি বা তদধিক ব্যঞ্জন-ধ্বনি এইভাবে মাঝে স্বর-ধ্বনির ব্যবধান না লইয়া

পাশাপাশি আসিলে, দুইটি ব্যঞ্জন-বর্ণকে জুড়িয়া দিয়া—যেমন 'স্ত'=st, 'প্ত'=pt। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে এইরূপ মিলিত বা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের রূপ, বহু শতাব্দী ধরিয়া বিবর্তনের ফলে, একেবারে অন্য রকমের হইয়া গিয়াছে; যেমন 'ক্+ষ্=ক্ষ=ক্ষ' (বাঙ্গলায় আবার উচ্চারণ বদলাইয়াছে—'খ্য'), 'জ্+ঞ=জ্ঞ' (বাঙ্গলা উচ্চারণে 'গ্যঁ'), 'হ্+ম=হ্ম' (বাঙ্গলায় 'ম্হ')। ব্যঞ্জন-ধ্বনি 'র্' অন্য কোনও ব্যঞ্জনের পূর্বে আসিলে, তাহার রূপ হয় '´' ('রেফ'), পরে আসিলে '্র' (র-ফলা), যেমন 'র্+ব=র্ব, র্+ম=র্ম', কিন্তু 'ব্র=ব্র, ম্র=ম্র'। অন্য ব্যঞ্জনের পরে 'য়' তেমনি '্য' (য-ফলা) হইয়া দাঁড়ায়—'ক্য়=ক্য, ব্য়=ব্য'। এইরূপ সংযুক্ত-বর্ণের মধ্যে রেফ, র-ফলা, য-ফলা—প্রথম হইতেই বাঙ্গলা লিপির একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া আছে। 'আনন্দবাজার'-এর এই নূতন বানানে দেখিতেছি, রেফ-এর সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিতৃষ্ণা। আমরা তো বাঙ্গলা বানান হইতে সংযুক্ত-বর্ণ তাড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। সংযুক্ত-বর্ণের পরিবর্তে কেবল হস্-চিহ্ন দিয়া লিখিবার চেষ্টা কি হাস্যকর এবং হৃদয়বিদারক বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা এক শ্রেণীর বাঙ্গলা টাইপ্‌রাইটারে লেখা (বা ছাপা) চিঠি-পত্র দেখিলেই বুঝা যায়। রেফ বর্জন করিলে, বা সংযুক্ত-বর্ণ তুলিয়া দিলে, উচ্চাবণেব সুবিধার জন্য বাঙ্গলা রীতি অনুসারে হস্-চিহ্ন বেশি ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে লিখিতে অনেক বেশি স্থান লাগিয়া যায়, এবং রেফ-যুক্ত সংযুক্ত-বর্ণ স্থলে পুরা 'র' লিখিলে কোন্ দিক্ হইতে বানানের উন্নতি হইল তাহা বুঝা যাইতেছে না, 'মোছ কামাইয়া মডা হাল্‌কা কবণ'-এর মতো তাহা নিরর্থক এবং কষ্টদায়ক। শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী গত ২রা পৌষ ১৩৭৩-এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে লিখিয়াছেন—'যোয়ান অব আরক ও যোয়ানের আরক এক জিনিস নয়'—অতি সত্য কথা; কিন্তু 'যোয়ান অব আর্ক' লিখিলেই সন্দেহ থাকে না, কোন্‌টা ফরাসী নাম, আর কোন্‌টা বাঙ্গলা শব্দ।

[২] রেফ-যুক্ত ও অন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্জন করিয়া এবং হস্-চিহ্নের প্রয়োগ না করিয়া, এই বানানে, বাঙ্গলা উচ্চারণ-রীতি ও বাঙ্গলা বানানের মধ্যে যে একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ বিদ্যমান, তাহাকে ছিন্ন করিবার নিষ্কারণ অপচেষ্টা হইতেছে মাত্র। বাঙ্গালীর মুখে শব্দের অন্তে দুইটি ব্যঞ্জন-ধ্বনি পর-পর আসে না, আসা কঠিন। বাঙ্গলায় আগত সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য অ-কার বর্জনের দিকে বাঙ্গলা ভাষার (হিন্দী মারাঠী গুজ্‌রাটীর মতো) একটা প্রবণতা আছে। কিন্তু শেষের অক্ষরে দুইটি ব্যঞ্জন পর-পর আসিলে, বাঙ্গলায় অন্ত্য অ-কার লুপ্ত হয় না, হিন্দী প্রভৃতিতে হয়। হিন্দী উচ্চারণে 'নন্দ=নন্দ্, চন্দ্র=চন্দ্র্, ধর্ম=ধর্ম্, বজ্র=বজ্র্, ভক্ত=

ভক্‌ৎ, কষ্ট = কষ্‌ট্‌, অর্ক = অরক্‌, কর্ম = করম্‌, গৃহস্থ = গৃহস্‌থ্‌, সহ্য = সহ্‌য়্‌, ন্যায্য = ন্যায়্‌য়্‌, বন্দ্য = বন্‌দ্য়্‌, পক্ষ = পক্‌ষ্‌, লক্ষ্য = লক্‌ষ্‌য়্‌', ইত্যাদি। বাঙ্গালীর মুখে এইরূপ উচ্চারণ আদৌ হয় না। বিদেশী শব্দে যদি শেষে পর-পর দুইটি ব্যঞ্জন-ধ্বনি থাকে, শব্দটি বাঙ্গলায় আসিয়া গেলে, সেই শব্দের অন্ত্য দুইটি ব্যঞ্জনের পরে, তাহাদের যেন বসিবার আসন রূপে, একটি স্বরধ্বনি আনিয়া দিতে হয়, অথবা সংযুক্ত ব্যঞ্জন দুইটিকে ভাঙ্গিয়া মাঝখানে একটি নূতন স্বরধ্বনি বসাইয়া দিতে হয়। যেমন ফার্সী 'ganj গন্‌জ্‌' = বাঙ্গলায় 'গঞ্জ = গন্‌জো'; lafz লফ্‌.জ্‌. = লফ্‌জো, লব্জো; fard ফ.দ্‌' = ফর্দ (ফর্দো), khusk খুস্‌ক্‌ = খুস্কি; chust চুস্ত্‌ = চোস্ত (চোস্‌তো); shinakht শিনাখ্‌ৎ = সনাক্ত, শনাক্ত; waqt ব্‌ক্‌ৎ = ওক্ত (ওক্‌তো); shahr শহ্‌র্‌ = শ-হর্‌ (shohor); hazm হজ্‌.ম্‌ = হজম্‌ (hojom), narm নর্ম্‌' = নরম্‌ (norom); sharm শর্ম্‌' = সরম্‌, শরম্‌ (shorom), nazr নজ্‌.র্‌ = নজর্‌ (nojor); qufl কুফ্‌.ল্‌ = কুলফ্‌ = কুলুপ্‌; gharz ঘর্‌জ্‌. = গরজ্‌; 'aql' 'অক্‌ল্‌ = আ-কল, আক্কেল (akkel); mard মর্‌দ্‌ = মর্দ, মদ্দ, মরদ (marda, madda, morod), hadd হদ্‌দ্‌ = হদ্দ (hadda), barf বর্ফ্‌. = বরফ্‌ (boroph); hast-nest হস্ত্‌-নেস্ত্‌ = বাঙ্গলায় অ-কারান্ত 'হেস্ত-নেস্ত'—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইংরেজি নাম ও শব্দের বেলায়ও ঠিক তাই : desk বাঙ্গালীর মুখে 'ডেস্‌ক, ডেক্‌স = desko, dekso'; box = বাক্স (bakso), mutton (= matn) = মটন (matan), cotton (= kotn) = কটন (koton); cycle (= saikl) = সাইকেল (saikel), inch = ইঞ্চি (inchi); bench = বেঞ্চি (benchi), marble (mar-bl) = মার্বেল (marbel), table (= tei-bl) = টেবিল (tebil), guard = গারদ (garod); mark = মার্কা (marka); gilt = গিল্‌টি (gilti); kettle (= ketl) = কেট্‌লি, কাত্‌লি, bottle = বোতল (bo-tol : পোর্তু'গীস botelha-র প্রভাব থাকিতে পারে); film = ফিলিম (স্বরের আগম), lamp = ল্যাম্প, লম্প (ল্যাম্‌পো, লম্‌পো), bolt = বোল্‌টু (boltu); ইত্যাদি।

এখানে একটা কথা লক্ষণীয়। যে-কোনও সংস্কৃত শব্দকে (তাহা কোনও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেই হউক অথবা কোনও সংস্কৃত অভিধান হইতেই হউক) সরাসরি বাঙ্গলা ভাষায় গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করা যায়—বাঙ্গলার প্রকৃতি-ই এই, ইতিহাসও এই। বাঙ্গলার সঙ্গে সংস্কৃতের একটি নাড়ীর টান বাঙ্গলা ভাষার বিকাশের পূর্ব হইতেই আছে, সেইজন্য ইহা সহজ ও সম্ভব হইয়াছে। তেমনি খ্রীষ্টীয় পনেরোর

শতকের শেষ হইতে, মুসলমান দরবারের ও বিদেশী মুসলমান রাজার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা বলিয়া, বাঙ্গালী যত্ন করিয়া ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিয়া যায়, এবং আবশ্যক ও গ্রহণযোগ্য হইলে ফার্সী ভাষার শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহার করিতে বাঙ্গালীর (বিশেষতঃ ফার্সীর সঙ্গে যাহার পরিচয় ছিল—এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীর) আটকাইত না। তদ্রূপ আজকাল ইংরেজির সঙ্গে অতি-পরিচয়ের ফলে এবং ভারতের জীবনেব প্রতি স্তরে ইংরেজির ক্রম-বর্ধমান প্রভাবের ফলে, আমরা এখন অবলীলাক্রমে যে-কোনও ইংরেজি শব্দকে আমাদের মাতৃভাষায় ব্যবহার করিতে পারি, এবং করিয়া থাকি। যাহারা ইংরেজি শিখে নাই বা জানে না, তাহারা এই সকল নবাগত ইংরেজি শব্দকে, বাঙ্গালীর উচ্চারণ-মোতাবেক বদলাইয়া সেগুলিকে বাঙ্গলা শব্দ বানাইয়া লইয়া ব্যবহার করিবে। কিন্তু ইংরেজি ইস্কুলের মাধ্যমে ইংরেজি সর্বত্রই পড়া হয়, সকলেই ইংরেজি শিখিবার জন্য ও বলিবার জন্য আগ্রহান্বিত। এই ইংরেজি শিক্ষাব প্রভাবে, মাতৃভাষায় আগত ইংরেজি শব্দগুলি যে ভোল ফিরাইয়া বাঙ্গলা বনিয়া যাইবে, তাহার বিরুদ্ধে একটি মনোভাব এখন সদা-জাগ্রত ও সর্বদা কার্য্যকর হইয়া আছে। বাঙ্গালীর অভ্যস্ত উচ্চারণ অনুসারে এই-সব ইংরেজি শব্দে পরিবর্তন আনিলে, বিদেশী শব্দগুলি আজও 'গাঁউয়া' বা গেঁয়ো অর্থাৎ অশিক্ষিত গ্রামীণ শব্দ হইয়া দাঁড়াইবে—শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী তাহা সুনজরে দেখিবে না, ইংরেজি শব্দকে যথাশক্তি ইংরেজি ধরনে বলিয়া বা লিখিয়া নিজ শিক্ষার—অর্থাৎ ইংরেজি-জ্ঞানের—পরিচয় দিবে। তাহা হইলেও, যেভাবেই হউক বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজি শব্দ মূল ভাষার উচ্চারণের অনুগামী করিয়া লিখিবার চেষ্টা আমরা করি না কেন, অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মতো, বক্তার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখের উচ্চারণে বাঙ্গালীপনা না আসিয়া থাকিতে পারে না। নানাভাবে ইহা প্রকট হয়। কতকগুলি পুরাতন ইংরেজি শব্দ কোট-পাতলুন ছাড়িয়া বাঙ্গালী ধুতি-চাদর পরিয়া ভোল ফিরাইয়া বসিয়াছে। যেমন round = রোঁদ; pauper = পাঁপর; doctor = ডাক্তার; hundred (weight) = হন্দর; captain = কাপ্তেন; madam, ma'am = মেম; lord = লাড, লাট; general = gen'ral = jandral = জাঁদরেল; cord = কার; attorney = টুর্নী; biscuit = বিস্কুট; engine = ইঞ্জিন; school = ইস্কুল; station = ইষ্টিশন; lanthorn (lantern-এর পুরাতন রূপ) = লণ্ঠন (হিন্দুস্থানীতে 'লালটেন'); diamond = ডায়মন; platoon = পল্টন'; ইত্যাদি। ইংরেজি-না-জানা লোকের মুখে আমরা শুনি: first = 'ফাস্টো' বা 'ফাস্', last =

'লাষ্টো' বা 'লাস' (এখানে অন্ত্য সংযুক্ত-ব্যঞ্জনকে স্বরবর্ণের আশ্রয়ে আনা, অথবা সংযুক্ত-বর্ণের একটি বা দুটিকে লোপ করিয়া দেওয়া—যেমন second last = 'সেকেন্ লাস্', এবং 'ফাস্, সেকেন, থাড, ফোর্থ' ইত্যাদি 'গ্রাম্য' উচ্চারণে যাহা দেখা যায়)। অনেক ইংরেজি-জানা ব্যক্তি মনে করেন, তিনি গ্রাম্যতা-দোষ পরিহার করিয়া শুদ্ধভাবে বাঙ্গলায় আগত ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, কিন্তু অনেক সময়েই যে তিনি বাঙ্গালীর সাধারণ উচ্চারণের ধারা অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না, তাহা ধরিতে পারেন না, 'হয়, Zান্তি পারো না।'

শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন-বর্ণকে ভাঙ্গিয়া বা বাড়াইয়া স্বরবর্ণের আশ্রয়ে আনিয়া যে বাঙ্গলা উচ্চারণের রীতি আছে, তাহার পরিপন্থী হইতেছে ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ-রীতি, যে রীতিতে শব্দের শেষে একাধিক ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে বাধা নাই। এই রীতি অনুসারে, উচ্চারণকে বাঙ্গলা লিপিতে দেখাইবার আবশ্যকতা হইলে, সহজ উপায় আছে—বাঙ্গলা লিখন-রীতিতেই তাহা বিদ্যমান। সেটি হইতেছে, সংযুক্ত বা মিলিত ব্যঞ্জনের, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক-মতো বিরাম বা হস্-চিহ্নের প্রয়োগ। বাঙ্গলা বর্ণমালা ও বর্ণবিন্যাস-রীতি ব্রাহ্মী লিপি হইতে বাঙ্গলা ভাষা জন্মগত-অধিকার-সূত্রে পাইয়াছে। ইহা আমাদের নিজেদের ঘরের বস্তু। বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে ইহার অচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগ আছে। খামখা ইহাকে আংশিকভাবে বর্জন করিয়া আমরা ধাঁধার সৃষ্টি করি কেন? ইংরেজির **first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, park, post card, Christ, part, and** প্রভৃতি শব্দ আমরা সুষ্ঠুভাবেই লিখিয়া আসিতেছি—"ফার্স্ট্, সেক্ণ্ড্ বা সেকণ্ড্, থার্ড্, ফোর্থ্, ফিফ্থ্ (ফ্+থ—সংযুক্ত-বর্ণ নাই), সিক্স্থ্, সেভেন্থ্, এইট্থ্ (ট্+থ—সংযুক্ত-বর্ণ নাই), পার্ক্, পোস্ট্-কার্ড্, ক্রাইস্ট্ (খ্রীষ্ট—পোর্তুগীজ, গ্রীক ও বাঙ্গলার সংমিশ্রণ-জাত—খাঁটি বাঙ্গলা রূপ; পোর্তুগীস Jesu Cristo + গ্রীক Iēsous Khristos = বাঙ্গলা 'যীশু খ্রীষ্ট'; ইংরেজি Jesus Christ = জিসস্ বা জিজ.স্ ক্রাইস্ট্), পার্ট্, অ্যাণ্ড্" রূপে। তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধার জন্য আবশ্যক-মতো আমরা হস্-চিহ্ন বর্জন করিতে পারি এবং সাধারণতঃ করিয়া থাকিও। কিন্তু যতক্ষণ অন্য সাধারণ সংস্কৃত ও সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত বাঙ্গলা শব্দে সংযুক্ত-বর্ণকে বিদায় দিতে পারিতেছি না, তখন কেবল বাছিয়া বাছিয়া ইংরেজি শব্দের বেলায় এই সম্পূর্ণরূপে অ-বাঙ্গালী পদ্ধতি আনিয়া অযথা বিভ্রাট ঘটাই কেন?

[৩] এই নূতন পদ্ধতি আর একটি কারণে আপত্তিজনক। ইহা চলতি

মৌখিক বাঙ্গলার কতকগুলি অত্যন্ত বিশিষ্ট উচ্চারণ-পদ্ধতিকে অস্বীকার করিয়া, বানানের প্রারম্ভিক উদ্দেশ্যকে নষ্ট করিতেছে। প্রথম কথা আগেই বলিয়াছি। বাঙ্গালীর মুখে শব্দের শেষে সংযুক্ত-ব্যঞ্জনেব ধ্বনি আসে না। যেখানে এইরূপ অ-বাঙ্গালী উচ্চারণ দেখাইবার আবশ্যকতা, সেখানে সংযুক্ত-ব্যঞ্জনের জন্য যে-সব সম্মিলিত বর্ণ আমাদের বাঙ্গলা-লিপিতে আছে, সেইগুলি-ই ব্যবহার করিতে হইবে। গায়ের জোর এখানে চলে না। ইংরেজি east শব্দকে যদি ইংরেজি উচ্চারণের প্রকাশক করিয়া বাঙ্গলা হরফে লিখিতে হয়, তাহা হইলে 'ঈস্ট্, ঈস্ট (ইস্ট্, ইস্ট)' লেখা ছাড়া গতি নাই ; 'ঈস্‌ট্' বা 'ইস্‌ট্'ও লিখিতে পারি। কিন্তু 'ঈসট' (বা 'ইসট' লিখিলে) বাঙ্গালী ইহাকে 'ঈ-শট' ('ই-শট') রূপেই পড়িবে, কদাচ সহজভাবে 'ঈস্ট্' পড়িবে না। রসবোধ-যুক্ত শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন, বাঙ্গলা লেখায় 'আরক' (আ-র-ক) হইতেছে উচ্চারণে 'আ-রক্' (a-rok)', কখনই 'আর্ক্' বা 'আর্‌ক্' (ark, Arc) নহে। তদ্রূপ 'নারদ, গারদ, বালক, চালক, কারক, রাসভ, পালক' প্রভৃতির দল ছাড়িয়া 'পারক' কখনও বাঙ্গালীর মুখে 'পার্ক্' বা 'পার্‌ক্' হইবে না। উপরন্তু বাঙ্গলায় 'পারক' (= পা-রক্) শব্দও আছে। বাঙ্গালী 'লিফট, পারট,এনড, থানট, চারজ, একস-রে, স্টারট, রেকরড, ডিসক, সিমেনট, আগসট' প্রভৃতি বানান দেখিয়া, এইরূপ শব্দকে (ইংরেজির সঙ্গে পরিচয় সত্বেও) 'li-fot লি-ফট্, pa-rot পা-রট্, e-nod এ-নড্, Tha-not থা-নট, cha-roj চা-রজ্ (তুলনীয় 'জারজ'), ekas-re একস্-রে (বা Ek-so-re এক-শ'-রে !), sta-rot স্টারট্, rek-rod রেক্-রড্, di sok ডি-সক্, si-men ot সি-মেন্-অট্, ag-sot আগ্-সট্' রূপে পড়িবে ; বিশেষ করিয়া বহুকাল ধরিয়া তাহার কানে মোচড় দিয়া না শিখাইলে, সে এইরূপ বানান দেখিয়া মূল শব্দগুলি যে ইংরেজির lift, part, end, Thant, charge, X-ray, start, record, disk, cement, August প্রভৃতি—তাহা সে বুঝিতে পারিবে না। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় Guntur 'গুণ্টুর'-কে 'গুণতুর' বানানে পাইয়া একজন শিক্ষিত বাঙালী পড়িলেন 'গুনো-তুরো' ! এইরূপ বানানে এখন, 'হরেক রকম বাজী ও বারুদের কারখানা', এই বাক্যকে 'হরে—করকম্‌বা—জীওবা—রুদে—রকা—রখানা' রূপে পরিবর্তন করার মতো অবস্থায় আমরা পড়িয়া যাইতেছি।

কোন্ অধিকারে বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণ- ও বানান-রীতিকে আমরা এইভাবে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া, তাহাকে ইংরেজি বানানের পায়ের তলায় আনিতে চাহিতেছি ? ইংরেজি p-a-r-k = park, উচ্চারণে 'পার্ক্' ইংরেজিতে ঠিক ;

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে থাকিয়া, টীকা-টিপ্পনী বা ব্যাখ্যা করিয়া না দিলে, 'পারক' বাঙ্গলাতে কিছুতেই 'পার্ক্' হইবে না, হিন্দী বানানেও নহে—ইহা 'পা-রক' রূপে-ই পড়া হইবে, যদিও হিন্দুস্থানী বা হিন্দীতে দুই ব্যঞ্জন-ধ্বনি পর-পর শব্দের শেষে আসিয়া থাকে। হিন্দীতে 'নন্দ'-এর উচ্চারণ 'নন্দ্', 'বন্ধ'-এর উচ্চারণ 'বন্ধ্', কিন্তু ঐ ভাষায় কেহ 'ননদ, বনধ' লিখিবেন না। উর্দুর বানানে k-r-n দ্বারা 'কর্ন্, কির্ন্, কুর্ন্, করন্, কিরন্, কুরন্, করিন্, কিরুন্, কুরিন্' ইত্যাদি ইত্যাদি এতগুলি বিভিন্ন প্রকারের শব্দ লিখা যায়—কিন্তু বাঙ্গলা বানানে 'পারক' দ্বারা সহজভাবে 'পার্ক্' পাঠ করা ভাষার প্রকৃতির বিরুদ্ধেই হইবে।

আরব্ধ এইরূপ বানানের পিছনে আছে—অযথা রেফ-ভীতি। আমরা 'অর্জুন' লিখিব (এখনও 'অরজুন' দেখি নাই), কিন্তু 'আরজি, মরজি' লিখিলেই কি বাঙ্গলা বানানে 'প্রগতি' আমদানি করা যাইবে? 'ইন্দোনেশিয়া'কে 'ইনদোনেসিয়া' (যাহা 'ই-ন-দোনেসিয়া' রূপে বাঙ্গালী পড়িয়া ফেলিবে) লিখিয়া, বা 'তুর্ক' স্থলে 'তুরক' লিখিয়া, কী সুবিধা করিলাম? এদিকে 'ট্র্যাক্ট' স্থলে 'ট্র্যাকট' লিখিতেছি, 'ট্রেনিং, প্রফেসর, ব্রিটিশ, ব্রাইট' প্রভৃতি শব্দের র-ফলা বর্জন করিয়া, 'টর্যাকট, টরেনিং, পরফেসর, বরিটিশ, বরাইট' লিখিবার দুঃসাহস করিতেছি না। শুধু 'রেফ' বর্জন করিলেই, তাহার গণ্ডা-গণ্ডা অপরিহার্য্য সংযুক্ত-বর্ণ-সমেত বাঙ্গলা লিখন-পদ্ধতিতে কী উন্নতি হইল—বিশেষতঃ যখন সহজ-বোধ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হইল? 'ণ্ড, ষ্ঠ, হ্ম, স্থ, স্ম, শ্ন' প্রভৃতি তো বাদ দিতে পারিতেছি না। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গলা বানানে কতকগুলি সংশোধন আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলির একটি ছাড়া আর কোনওটি গৃহীত হয় নাই। নাগরী (হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী) বানানের নকলে অনুস্বার 'ং'-এর সাহায্যে সমস্ত বর্গীয় নাসিক্য-ধ্বনি জানাইবার প্রস্তাব তিনি করিয়াছিলেন—'শংকা, সংখ্যা, বংগ, সংঘ, অংচল (=অঞ্চল, অঞ্‌চল), উংছ (উঞ্ছ=উঞ্‌ছ), অংজন (=অঞ্জন, অঞ্‌জন), ঝংঝা (=ঝঞ্ঝা, ঝঞ্‌ঝা), কংটক (=কণ্টক), কংঠ (=কণ্ঠ), অংড (=অণ্‌ড, অণ্ড), মেংঢক (=মেণ্ঢক), কাংত (=কান্ত), পংথা (=পন্থা), চংদন (=চন্দন), সংধ্যা (=সন্ধ্যা), চংপা (=চম্পা), লংফ (=লম্ফ), তাংবুল (=তাম্বুল), সংভার (=সম্ভার)'—এইভাবে লেখা। কিন্তু 'ং'-এর উচ্চারণ বাঙ্গলায় 'ঙ্' হইয়া গিয়াছে, সে উচ্চারণ বাঙ্গলা ভাষার বানান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আর সম্ভবপর নহে—লোকে যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয়ের বানান পড়িতে লাগিল—"পংডিতে করে গংডগোল, চংদ্রে আছে কলংক"। একমাত্র ক-বর্গের

পূর্বেই অনুস্বার বিকল্পে মাত্র গৃহীত হইল, কারণ, 'ং' হইয়া দাঁড়াইয়াছে কণ্ঠনাসিক্য 'ঙ' মাত্র।

এইরূপ বহু ব্যাপার হইতে দেখা যাইবে, হাজার বা দুই হাজার বছর বা তাহারও অধিক কাল ধরিয়া যে লিখন-ধারা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা হেলা-ফেলা করিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নহে। বাঙ্গলায় আমরা যে 'ধর্ম, কর্ম, ভক্ত, গ্রাহ্য, লিপ্ত, বর্ধন' প্রভৃতি সংযুক্ত-বর্ণময় বানান লিখি, সেগুলি উচ্চারণ করি 'ধর্‌-ম, কর্‌-ম, ভক্‌-ত, গ্রাজ্‌-ঝ (মূল উচ্চারণ ছিল গ্রাহ্‌-য়), লিপ্‌-ত, বর্‌ধ্‌-অন্‌' ইত্যাদি। (বেশ দেখা যাইতেছে যে, 'ধৃ-ধর্‌, কৃ-কর্‌, ভজ্‌-ভক্‌, গ্রহ্‌-গ্রাহ্‌, লিপ্‌, বৃধ্‌-বর্‌ধ্‌'—এগুলি ধাতু, শব্দের মূল অংশ, এবং শেষ অংশটুকু হইতেছে প্রত্যয়। ধাতু (অবিকৃত বা পরিবর্তিত রূপ)+প্রত্যয়—এই বিশ্লেষণ অনুসারে উচ্চারণ 'ধর্‌+ম, লিপ্‌+ত', ইত্যাদি।) রোমান লিপির সাহায্যে এই অসামঞ্জস্য সহজে দেখানো যায়—dhar—ma, kar—ma, bhak—ta, grāh—ya, lip—ta প্রভৃতির পরিবর্তে dha—rma, ka—rma, bha—kta, grā—hya, li—pta রূপে যদি লিখি, তাহা হইলে যেন ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ, উভয় দিকেই ভুল হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—বানানে এই ভুল বা বিপরীত রীতি কেন—'ধ—র্ম, লি—প্ত, ব—র্ধন, গ্রা—হ্য'—এইভাবে লিখন কেন? 'ধৃ বা ধর্‌, বৃধ্‌ বা বর্‌ধ্‌, গ্রহ্‌ বা গ্রাহ্‌'—ধাতুর অর্ধেকটা রহিয়া গেল প্রথম syllable বা অক্ষরে, এবং বাকিটা গিয়া চড়িল প্রত্যয়ের মাথায়। অর্থাৎ বৈয়াকরণ বিশ্লেষে পাইতেছি 'ধর্‌+ম, ভক্‌+ত, গ্রাহ্‌+য়' ইত্যাদি, কিন্তু লিখন-রীতিতে পাইতেছি 'ধ+র্‌ম (র্ম), ভ+ক্‌ত (ক্ত), গ্রা+হ্‌য় (হ্য=জ্‌ঝ)'। অক্ষর-বিভাজনে এই অসংগতি বা অসামঞ্জস্যের কারণ কী, তাহা আমি আমার বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্ববিষয়ক বড়ো বইয়ে ৪০ বৎসর পূর্বে আলোচনা করিয়াছি (Origin and Development of the Bengali Language, 1926, Vol. I, pp. 251 ff.[১])। মূল কারণ হইতেছে, আমার জ্ঞান-গোচর মতো, ভারতীয় আদি-আর্য্য-ভাষা (বা বৈদিক) যুগের অবসান ও প্রাকৃত বা মধ্যকালীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষার যুগের আরম্ভের সময়ে, আর্য্য-ভাষার উচ্চারণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য। এখানে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

১ সম্প্রতি (১৯৭) এই গ্রন্থের দুই খণ্ড George Allen & Unwin Ltd. কর্তৃক লণ্ডন হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। সংশোধন ও সংযোজন সহ ইহার তৃতীয় খণ্ডও (আগস্ট, ১৯৭২) প্রকাশিত হইয়াছে।

তেমনি, আধুনিক বাঙ্গলাতে কতকগুলি নূতন উচ্চারণ-রীতি আসিয়া গিয়াছে। একটির নাম দিয়াছি—আধুনিক বাঙ্গলা ভাষার 'দ্বিমাত্রিকতা' (Dimetrism বা Bimorism)। আমরা বাঙ্গলায় এখন দুই মাত্রার বা দুই অক্ষরের শব্দই বেশি পছন্দ করি এবং ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন, 'করে = ক-রে, চলুক = চল্‌-উক্‌, দেখলে = দেখ্‌-লে, যাবো = যা-বো, অমর = অ-মর্‌, জঙ্গল = জং-গল্‌, নর্তক = নর্‌-তক্‌, গায়ক = গায়্‌-অক্‌, কার্য্য = কার্‌-জ্য' ইত্যাদি। মধ্যযুগের বাঙ্গলায় ত্রিমাত্রিক বা ত্র্যক্ষর শব্দই বেশি ছিল—আধুনিক ওড়িয়ার মতো। 'ক-রি-ব = ক'র্‌বো, দেখিবে = দেখ্‌-বে, হ-ই-ল = হ'লো, ব-সি-তে = ব'স্‌তে, রা-খি-তাম = রাইখ্‌-তাম, রাখ্‌তাম', ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্যযুগের বাঙ্গলা, নব্য বা আধুনিক কথ্য বাঙ্গলাতে পরিণত হইবার অন্যতম কারণ-রূপে, ইহার পিছনে আছে এই আধুনিক দ্বিমাত্রিকতা। অবশ্য, একাক্ষর শব্দ প্রচুর আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র অবস্থিত একাক্ষর শব্দ বাঙ্গলায় দীর্ঘ করিয়া তাহাকে দ্বিমাত্রিক করিয়া লইয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি—যেমন, 'জল = জ -ল্‌, আজ = আ—জ্‌, রাম = রা—ম্‌, হাত = হা—ত্‌, পা = পা—, তিন = তী—ন্‌, দেশ = দে—শ্‌', ইত্যাদি।

তিন-মাত্রা বা তিন অক্ষরের শব্দ এখনও বাঙ্গলায় প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে দুই মাত্রার দিকে। তিন মাত্রার 'ভারতী, পূরবী, তপতী, নির্মলা, চঞ্চলা, ছলনা, বন্দনা, বঞ্চনা' প্রভৃতি প্রচুর শব্দ (বিশেষতঃ সংস্কৃত শব্দ) আছে, কিন্তু আবার 'কম্‌লা, বস্‌তি, অম্‌লা', 'রু-দ-গী'-স্থলে-'রূদ্‌গী' (ফার্সী নামে) শোনা যায়। এ বিষয়ে হিন্দীর প্রভাবও কিছু পরিমাণে আসিতেছে—'জন্‌তা, মম্‌তা, ভার্‌তী', ইত্যাদি।

চারি মাত্রা বা চারি অক্ষরের শব্দ বা পদকেও আধুনিক চলিত বাঙ্গলায় আমরা বিভাগ করিয়া বা ভাঙ্গিয়া লইয়া দুইটি করিয়া দুই মাত্রার শব্দাংশে বদলাইয়া লই। যেমন 'অপরাজিতা = অপ্‌রা-জিতা' বা 'অপ্‌রা-জিতে', 'পারি-তোষিক, অবৈ-তনিক,আনু-মানিক, অপ-দার্থ, অপ-রাধী, নিয়-মিত', ইত্যাদি। তিন মাত্রার পদকে এখনও আমরা দুই মাত্রায় পরিবর্তিত করিয়া থাকি; যথা—'চাকর (= চা-কর) + ঈ, ই = চাকরী, চাক্‌রি; পা-গল + আ = পা-গ-লা/পাগ্‌-লা; বাঙ্গাল + আ—বাঙ্‌লা; গলৎ (গলদ) + ঈ = গল্‌তী; মাকড় + ঈ = মাক্‌-ড়ী; মহেশ + আ = ময়শা; নরেশ + আ = নর্‌-শা (তুচ্ছার্থে); কালিয়া = কাই-ল্যা, কেলে'; অদ্ধ-ইল্ল-আ/আধেলা/আধ্‌লা; করেলা/করলা, কর্‌লা'; ইত্যাদি। দ্বিমাত্রিকতা বজায় রাখিবার চেষ্টায়, প্রত্যয়যোগের পর তিন অক্ষরের শব্দটির মাঝের অক্ষরের

স্বরধ্বনি লুপ্ত হইল ; ইহার ফলে দুইটি ব্যঞ্জন-ধ্বনি বাঙ্গলায় নূতন বা পরিবর্তিত শব্দের মধ্যে এখন পর-পর আসিয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহা শব্দের অভ্যন্তরে, অন্তে নহে।

দ্বিমাত্রিকতার প্রতি বাঙ্গলাভাষীর এখন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের একটি উদাহরণের কথা ধরা যাউক।—ফার্সী শব্দ 'খ্‌বাব্‌গাহ্‌', অর্থ 'শুইবার গৃহ, নিদ্রামন্দির' (=সংস্কৃত 'স্বাপ-গাতু'), বাঙ্গলায় লেখা হয় 'খোয়াবগা'—বাঙ্গালী পাঠক ইহাকে পড়িলেন 'খোয়া-বগা', যেন দুই অক্ষরের দুইটি খণ্ড শব্দ। বিশেষরূপে চেনা শব্দ Communistকে 'কমিউনিসট' এইরূপ বানানে পাইয়া, অনবধানতাবশতঃ 'ক-মিউ-নি-সট্‌' পড়িয়া ফেলিতে শুনিয়াছি। তেমনি 'অরডন্যানস' (ordnance) অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর মুখে 'অ-রড্‌-ন্যান্‌-অস্‌ (o-rod-nan-os)', 'অ্যানেকস' (annexe) হইয়া দাঁড়ায় 'অ্যা-নে-কস্‌' (a-ne-kos), 'বুরুনডি' (Burundi) হয় ('বু-রু-ন-ডি' (Bu-ru-no-di), 'উগানডা' (Uganda) হইয়া যায় 'উ-গা-ন-ডা' (U-ga-no-da), ইত্যাদি।

পাঞ্জাবীর গুরুমুখী বর্ণমালা নাগরী বাঙ্গলার তুলনায় একটি অসম্পূর্ণ লিপি, তাই গুরুমুখীতে সংস্কৃত শব্দের পাঞ্জাবী বিকৃতি ধরিয়া উহারা বানান সহজ করিয়া লইয়াছে—'দরোপ্‌দী' = 'দ্রৌপদী', 'চংদরগুপত' = 'চন্দ্রগুপ্ত', 'পরাপত' = 'প্রাপ্ত', 'অতিয়াশচরজ' = 'অত্যাশ্চর্য্য', 'পদারথ' (উচ্চারণে কিন্তু 'পদার্থ্‌ = পদার্থ'), ইত্যাদি। বাঙ্গলা বানানকে এই দিকে টানিয়া আনিবার কী আবশ্যকতা ?

কোনও ভাষার বানানে একেবারে পুরাপুরি নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায় না। d-o = ডু, s-o = সো—এরূপ বানানের বিভ্রাট কেবল ইংরেজিরই একচেটিয়া নহে। সুতরাং সংযুক্তবর্ণ-বর্জিত 'তরকারি' বানান লিখি বলিয়াই যে 'তর্ক' স্থানে 'তরক' লিখিতে হইবে, অথবা 'তর্ক'-র দেখাদেখি 'তর্কারি' লিখিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। 'তরকারী, দরকারী, আবকারী, খোদকারি, মাসকাবারি, পিচকারী, ঘুমপাড়ানী, ছিটকিনি, ঝিকমিক, ফটকারি বা ফটকিরি, ঝিলমিলি, খিলখিল' প্রভৃতি শব্দের বানানে বাঙ্গলা উচ্চারণের রীতি অনুসারে শব্দের মধ্যে পরের অক্ষরে আ-কার বা অন্ত স্বর থাকায়, আগের অ-কার স্বতঃ লুপ্ত হয়, হসন্তের বা সংযুক্ত-বর্ণের অপেক্ষায় থাকে না। শব্দের বানানেরও একটা ইতিহাস আছে। অবশ্য ভাষা শিখিবার কালে বা ভাষা প্রয়োগ করিবার কালে এই ইতিহাস টানিয়া আনিবার আবশ্যকতা হয় না বলিয়াই, এই ইতিহাসের অমর্য্যাদা করিতে পারি না।

আধুনিক বাঙ্গলায় 'করিতে' হইতে 'ক'র্‌তে', 'করিছে' হইতে 'ক'র্‌ছে', 'বলিত' হইতে 'ব'ল্‌তো', 'দেখিতে' হইতে 'দেখ্‌তে' (বা কচিৎ 'দেক্‌তে', 'দেক্তে' !)। সংযুক্ত-বর্ণের প্রতি বিরাগ বা বিতৃষ্ণা নাই বলিয়া আমি দ্বিজেন্দ্রলালের অনুমোদিত বানান 'কর্ত্তে, কর্চ্ছে' লিখি না—'কর্' ধাতুর 'র'-কে চোখের সামনে পূর্ণভাবে রাখিতে চাই বলিয়া—রেফের আকারে ইহাকে গায়েব বা লুপ্তপ্রায় করিতে চাহি না। তদ্রূপ, 'ন্ত' সংযুক্ত-বর্ণ পাওয়া গেলেও, 'ব'ন্‌ত' স্থলে 'ব'ন্ত' লিখিব না, বা 'দেখ্‌তে' স্থলে 'দেক্তে' লিখিব না।

শিশুদের এবং বর্ণজ্ঞানহীন বয়স্কদের দোহাই পাড়িয়া সব দেশেই ভাষা-লিখনের জটিলতা বা হেবফের দূর করিবার কথা শুনা যায়, কিন্তু এদিকে কোনও প্রচেষ্টাই কার্য্যকর হয় না। সব জিনিস অতি-সোজা বা অতি-সহজ করিতে যাওয়া কাজের কথা নহে। দুরূহ বা কঠিন বস্তু কিছু-না-কিছু থাকিবেই—শিশু ও বয়স্কদের ভাষা-শিক্ষার কালে সেগুলি শ্রম করিয়া আয়ত্ত করাইতে হইবে। ভাষা সমগ্র সমাজের জন্য, ইহাতে নিহিত উচ্চাবচকে সমভূম করিবার প্রয়াস বিফল হইবেই। শিশু ও বর্ণজ্ঞানহীন বয়স্কদের প্রতি সহানুভূতির আতিশয্যে ভাষাকে নীচে নামাইয়া আনিবার চেষ্টার সার্থকতা দেখি না, বরঞ্চ শিশু ও অনুরূপ বয়স্কদেরই মনের পবিপূর্ণতা সম্পাদনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। ভাষা পাঠকালে—এমন কি মাতৃভাষা পাঠ কালেও—কতকগুলি বাধা দেখা যাইবেই। সেগুলিকে জয় করিতে হইবে, অতিক্রম করিতে হইবে—তাহার ফলে, নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আসিবে ; শিক্ষার ক্ষেত্রে ও জীবনের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মূল্য অপরিসীম। যখন শিশুকালে আমরা শিখিলাম, "ঊর্ধ্ব" শব্দের শুদ্ধ বানানে দীর্ঘ-ঊ আছে, র-এর পর ধ-এ ব-ফলা আছে ; 'বসিষ্ঠ' শব্দ বিকল্পে তালব্য শ দিয়া 'বশিষ্ঠ' রূপেও দেখা যায় ; 'লক্ষ' ও 'লক্ষ্য' এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে, 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অবিমৃষ্যকারিতা, প্রাগল্‌ভ্য, বিচিত্রবীর্য্য, কার্তবীর্য্যার্জুন' প্রভৃতি দাঁত-ভাঙ্গা কঠিন শব্দ ঠিকমতো উচ্চারণ করিতে ও বানান করিয়া যাইতে সমর্থ হইলাম, তখন আমাদের মনে সাফল্যের ও নূতন শক্তি অর্জনের জন্য একটা আনন্দ, একটা আত্মবিশ্বাস আসিয়া গিয়াছিল, তাহার আধিমানসিক মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। একজন ইংরেজ লেখক-ও এইভাবে কোথায় লিখিয়াছিলেন পড়িয়াছি—**When I first came to know that the word** *committee* **had two** *m*-**s, two** *t*-**s and two** *e*-**s, then** *I* **had a feeling of power and mastery over difficulties of writing and**

reading my mother-tongue, which was not one of the least helps in acquiring a sense of self-assurance.

দেখিতেছি, 'আনন্দবাজার'-এ Bombay 'বোম্বাই' স্থলে 'বোমবাই', Panjab 'পাঞ্জাব' স্থলে 'পানজাব', Madras 'মাদ্রাজ' স্থলে 'মাদরাজ' ছাপা হইতেছে। দুই একবার Andhra 'অন্ধ্র' স্থলে 'অনধ্র' (অর্থাৎ A-na dhra) পাইয়াছি, 'অনধর' এখনও পাই নাই। হয়তো শীঘ্রই 'মহারাষ্ট্র'র পরিবর্তে 'মহারাষটর' পাইব। 'বন্ধ্'-স্থলে 'বনধ' (banadh) বোধ হয় দেখিয়াছি, তবে এখনও Sindh 'সিন্ধ'-এর জায়গায় 'সিনধ' (=Sinadh) দেখি নাই। 'ইনদোনেসিয়া'-র অনুকরণে 'হি·দু' স্থলে হযতো 'হি-ন-দু'-ও দেখা দিবে। ইতিমধ্যেই সংস্কৃত শব্দ 'সম্পৎ' স্থলে 'আনন্দবাজার'-এ 'সমপত' বানান স্থান পাইয়াছে, 'সম্পত্তি'-তে হাত লাগিয়া 'সমপততি' রূপের আবির্ভাবও অপেক্ষিত। 'চাটারজি, মুখারজি' আসিয়াছে। হিন্দীতে 'নন্দকিশোর' কখনও 'ননদকিশোর' রূপে লেখা হইবে না, যদিও 'নন্দ'-শব্দের উচ্চারণ হিন্দীতে 'নন্দ্ 'বা' নন্‌দ্'। এইরূপ বিচাব না করিয়া বিদেশী নামের বেলায় বাঙ্গলাব উচ্চারণের বিবোধী এই-সব বানান চালাইলে, 'নন্দ' বাঙ্গলা বানানে 'ননদ' হইয়া যাইবে। সংস্কৃত শব্দ, নিখিল-ভারতের সহিত বাঙ্গলাব যোগসূত্র বলিয়া যে বোধ আমাদের মনে আছে, তাহা ভুলিয়া যাইব—'চন্দ্রগুপ্ত' বাঙ্গলায় এই অভিনব বানানে 'চনদরগুপত' হইয়া যাইবে। কিন্তু বাঙ্গলাতে যে সূক্ষ্ম অর্থ-বিভেদ সমেত তিনটি পৃথক্ শব্দ আছে,—তদ্ভব 'চাঁদ', তৎসম 'চন্দ্র', এবং অর্ধ-তৎসম 'চন্দর'—তাহা ভুলিয়া গিয়া বাঙ্গলা ভাষার প্রকাশ-ভঙ্গীর বিনাশ করিব কেন? তদ্রূপ বাঙ্গলায় তিনটি বিশিষ্ট শব্দ—তদ্ভব 'কাম', তৎসম 'কর্ম', অর্ধ-তৎসম 'করম', অর্ধ-তৎসম 'ধরম', তৎসম 'ধর্ম'। রেফ তাড়াইবার আকাঙ্ক্ষায়, অর্থের সূক্ষ্ম-পার্থক্য-যুক্ত তৎসম 'কর্ম'-কে, 'ধর্ম'-কে অর্ধ-তৎসম 'করম, ধরম'-এর সঙ্গে সমভূম করিয়া দিব?

আর একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে, সেটি সূক্ষ্ম হইলেও বাঙ্গলা ভাষার দ্যোতনা-শক্তির পক্ষে তাহার একটি বিশেষ মূল্য আছে। শিশুসুলভ মনোভাব লইয়া আমরা হয়তো বলিব—'বোম্বাই' আর 'বোমবাই', 'পাঞ্জাব' আর 'পানজাব'—উচ্চারণে তো এক, 'বোমবাই, পানজাব' লিখিলেই বা ক্ষতি কী? কিন্তু বাঙ্গলা উচ্চারণে 'বোম্বাই' ও 'বোমবাই', 'পাঞ্জাব' ও 'পানজাব'—এক নহে। 'ম্ব, ঞ্জ', এইরূপ সংযুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিলে, ব্যঞ্জন দুইটির মধ্যে কোনও ফাঁকের আমেজ একেবারেই থাকে না—কোনও hiatus বা উদ্‌বৃত্ত বিরামের স্থান ইহাতে নাই।

কিন্তু সংযুক্ত-বর্ণ ভাঙ্গিয়া পৃথক্ 'বোম/বাই, পান/জাব' লিখিলে, অজ্ঞাতসারে বঙ্গভাষীর অবচেতনায় একটা অস্পষ্ট বা অস্ফুট ধারণা আসিয়া যায়—বুঝি বা 'ম' ও 'ন'-কে পূর্বের syllable বা অক্ষরেরই অংশ বলিয়া ধরিতে হইবে, এবং আপনা হইতেই 'ম' ও 'ব' এবং 'ন' ও 'জ'-এর মধ্যে একটু যতির আভাস দেখা দিবে। এই হেতু উচ্চারণ-তত্ত্বের দিক হইতে 'বোম্বাই' (Bo-mb-ai) ও 'পাঞ্জাব' (Pa-nj-ab) বানান, 'বোমবাই' ও 'পানজাব' (Bom/bai, Pan/jab) হইতে পৃথক্। তদ্রূপ 'মাদ্রাজ' হইতেছে Ma-dr-aj, ও 'মাদরাজ' হইতেছে (Mad-raj)। 'আনন্দবাজার' পত্রিকাতেই পাইলাম (২৮।১২।৬৬, পৃঃ ৮) 'তালুকদার কোমপানি।' 'তালুকদার' বানানে আপত্তি নাই, ইহা বাঙ্গলার উচ্চারণেব প্রকৃতি অনুযায়ী, 'তালুক্'-এর 'ক'-য়ের পরে অতি সূক্ষ্ম বিরামভাব বিদ্যমান আছে। তেমনি 'বাজনদার, চন্ডনদাব'—ঠিক 'বাজন্দাব, চড়ন্দাব' নহে। কিন্তু 'কোম্পানি'র বেলায়? বাঙ্গালীর কাছে শব্দটি তো মোটেই 'কোম্পানি' নহে—'কোম্পানি'। বাঙ্গলায় 'পূর্ণ-উচ্চারিত' এবং 'অর্ধ-উচ্চারিত' অথবা 'নিপীড়িত' বা 'সন্নতর' নাসিক্য ধ্বনি আছে, তেমনি অন্য স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনও আছে (আধুনিক ভারতীয়-ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় নূতন ইংরেজি পরিভাষা অনুসারে এগুলিকে বলা হয়—Reduced Nasals, Under-articulated or Unexploded Stops)। এইগুলির আধারে ধীবে-ধীরে আমাদের বানান-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কী করিয়া One fine morning—একদিনেই এই-সমস্তকে 'নস্যাৎ' করিয়া দিই?

কতকগুলি শব্দের বানানে নিশ্চয়ই সংশোধন বা পরিবর্তনের আবশ্যকতা আছে। যেমন—'লক্ষ্ণৌ' স্থলে 'লখনৌ' (হিন্দীতে 'লখনঊ'—'খ' স্থলে 'ক্ষ' নিতান্ত অনাবশ্যক পরিবর্তন), 'চ্যবন' স্থলে 'চৌহান' বা 'চওহান' (মারাঠীতে 'চৱ্হাণ'), 'ন্যাটিসান' স্থলে 'নটেশন', 'পারদ্যুমান' স্থলে 'প্রদ্যুম্ন' বা 'পদ্যুর্মন', 'আজমীঢ়' স্থলে 'অজমের' (সংস্কৃত 'অজয়মেরু' হইতে), 'চিতোর' স্থলে 'চিতোড়', 'কির্কী' স্থলে 'খিড়কী', 'আল্লাহ-আবাদ' স্থলে 'এলাহাবাদ', 'ভেনকাটা' স্থলে 'বেঙ্কট', ইত্যাদি

আবার দুই-একটি শব্দের বানানে পরিবর্তন আনিবার চেষ্টা করা সংগত হইবে না; যেমন, 'শ্রী' শব্দে—ইহাকে 'শ্‌রী' বা 'শ্রী' লিখিয়া বানান সহজ করিবার চেষ্টা করিলে আমাদের বাঙ্গলা calligraphy অর্থাৎ লিপিসৌন্দর্য্য যেন শ্রী-হীন হইয়া যাইবে—'শ্রী' বাঙ্গলা লিখনে যেন একটি কল্যাণ- ও মাঙ্গল্য-বাচক পৃথক অক্ষর (ideogram) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'শ্রী'-কে দূর করিয়া দিলে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ যেন ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে, লেখায়

একটা মস্ত aesthetic বা নন্দনরসাত্মক হানি ঘটিবে। 'শ্রী'—এই বর্ণটি একটি রেখা-সুষমাময় শ্রী ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক, ইহা কেবল একটি ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণবিন্যাস নহে।

এইবার প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম হইলেও, পরিবর্তন আনিবার কালে পুনর্বিচার ও যুক্তিযুক্ততা অপেক্ষিত। স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের অজ্ঞাতে নানাপ্রকারের পরিবর্তন অহরহঃ ঘটিতেছে। কিন্তু যখন সজ্ঞানে আমরা কোনও সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে বসিব, তখন এই তিনটি প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া কাজে নামিলে, সব দিক দিয়া সুগ্রাহ্য হয় :—

[১] প্রথম প্রশ্ন—পরিবর্তনের আবশ্যকতা আদৌ আছে কিনা, [২] দ্বিতীয়—পরিবর্তনের মধ্যে যৌক্তিকতা আছে কিনা; এবং [৩] তৃতীয়—সব কিছু বিচার করিয়া দেখিয়া, ইহার উপযোগিতা এবং উপকারিতা কোথায় তাহার নির্দেশ। কেবল বদলাইতে হইবে বলিয়াই বদলানো, ইহার কোনও অর্থ হয় না।

প্রশ্ন তিনটির উত্তর আমার কাছে যেমন প্রতিভাত হইয়াছে তাহা জ্ঞাপন করিতেছি।

[১] সমস্ত মানবিক ব্যাপারই অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্জস, absolutely logical আত্যন্তিকভাবে যুক্তির অনুসারী নয়। বাঙ্গালা বানানেও দোষ ত্রুটী অসম্পূর্ণতা আছে। Evolutionary process বা বিবর্তনের পথে সেগুলির যথাশক্তি সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে—Revolutionary বা বৈপ্লবিক কিছু করা এক্ষেত্রে কঠিন। এক পারা যায়, সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত লিপির বর্জন, নূতন কোনও লিপির স্থাপনা। কিন্তু এ বিষয়ে নানা বাধা আছে, সেই সব বাধা দূরীভূত হইতে অনেক দেরি। সুতরাং সমগ্রভাবে পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না।

[২] যে সমস্ত পরিবর্তন জোর করিয়া ভাষার উপর চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে, সেগুলির মধ্যে কোনও জ্ঞান বা সুযুক্তি বা সুবিচার দেখিতেছি না। উপরে এ বিষয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এই দিক দিয়া পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখি না।

[৩] প্রস্তাবিত পরিবর্তনে কোনও লাভ হইবে না—কাহারও উপকার হইবে না। অপিচ এই পরিবর্তন অযৌক্তিক হওয়ায়, বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষায়

নানা সমস্যা দেখা দিবে; ইহার লিখনে একটা যে নিয়মানুবর্তিতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার উপর আঘাত পড়িবে। আমার মনে হয়, এই রকম নূতন ভাবে সৃষ্টি করা বানানের ধাঁধায় আমরা যে পড়িয়া যাইতেছি, তাহার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী সরস প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহার নিজের নামে বইয়ের দোকানের এইরূপ বিজ্ঞাপনে—'শিব্রাম চকরবরতির বইয়ের দোকান।'

জীবনের নানা অঙ্গে আমাদের discipline বা সংহতি-শক্তি আমরা হারাইতেছি। আমরা সকলেই মহাউৎসাহে ভাঙ্গনের কাজেই লাগিয়া গিয়াছি, গড়নের দিকে কোথায় আমাদের সচেতন চেষ্টা? এই সংহতিবোধ নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তা ও কর্মের দৃঢ়তাও নষ্ট হইতেছে। এখন আবশ্যক, কী করিয়া বাঙ্গালীকে নিয়মানুবর্তিতার সাধনার দ্বারা শক্তিশালী করিতে পারা যায়। এই ভাঙ্গনের দশায় তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ এখনও হইতেছে—তাহার ভাষা তাহার সাহিত্য। এই দুইয়ের সংরক্ষণ বাঙ্গালীর পক্ষে বাঁচিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই হেতু বাঙ্গালা ভাষা লিখনের প্রকৃতিকে বিনষ্ট করিবার অবশ্যম্ভাবী ফল—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটা অরাজকতা আসিতেছে বলিয়া, এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সময় আসিয়াছে॥

দেশ, ২১এ মাঘ, ১৩৭৩

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'*

পাদ্রি মানোএল-দা-আস্‌সুম্প্‌সাওঁ-বিরচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইখানি কতকগুলি কারণে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয় পুস্তক। (১) ইহা বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ; (২) কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্বে রচিত বাঙ্গালা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন ইহাতে রক্ষিত হইয়া আছে—বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইহা অন্যতম আদি পুস্তক; (৩) ইউরোপীয়দের মধ্যে বঙ্গভাষা চর্চার প্রথম যুগে ইহা রচিত—বিদেশীর হাতে বাঙ্গালা রচনার সম্ভবতঃ ইহা প্রাচীনতম নিদর্শন; (৪) বঙ্গভাষায় খ্রীষ্টান-ধর্ম-বিষয়ক সাহিত্যের ইহা এক আদি গ্রন্থ; (৫) দুই শত বৎসব পূর্বেকার পূর্ববঙ্গের (ঢাকা ভাওয়াল অঞ্চলের) প্রাদেশিক ভাষার সহিত অল্পাধিক মিশ্রিত বাঙ্গালা সাধু-ভাষার ইহা সুন্দর নিদর্শন; এবং (৬) রোমান বর্ণমালায় পোর্তুগীস ভাষার উচ্চারণ ধরিয়া লেখা বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক রূপভেদের (তথা পোর্তুগীস ভাষার) উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনায় এই বই অমূল্য।

পাদ্রি মানোএল্‌-দা-আস্‌সুম্প্‌সাওঁ দুই শত বৎসর পূর্বেকার লোক। এখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য লইয়া আলোচনা করেন এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীকে পাদ্রি মানোএল্‌ ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাব কৃতিত্ব বিষয়ে খবর রাখিতে হয়; এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত বাঙ্গালী জন-সাধারণের পরিচয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রি মানোএল্‌-এর নামও সাধারণ্যে প্রচারিত হইবে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সমাজে পাদ্রি মানোএল্‌-এর বইয়ের কিছু প্রচার ছিল, এবং তাঁহার নাম অন্ততঃ খ্রীষ্টান সমাজে অনেকে জানিত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দের চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত পাদ্রি মানোএল্‌-এর নাম কতকটা সুপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা ১৮৩৬ সালে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ হইতে বুঝা যায়। তারপরে এই লেখক ও তাঁহার পুস্তকের কথা বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে ধীবে ধীরে চাপা পড়িয়া গেল। পাদ্রি মানোএল্‌ দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, একখানি হইতেছে খ্রীষ্টান ধর্মের

*বর্তমান লেখকের লেখা "প্রবেশক'-শীর্ষক একটি বিশেষ প্রবন্ধ ও 'টীকা" সহিত, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তকের একটি সংস্করণ, সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সম্পাদনায় বাঙ্গালা ১৩৪৬ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। "প্রবেশক"-শীর্ষক বিশেষ প্রবন্ধটি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' শিরোনামে এখানে পুনর্মুদ্রিত হইল।

ব্যাখান বিষয়ক 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', ও অন্যখানি হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সমেত বাঙ্গালা ও পোর্তুগীস এবং পোর্তুগীস ও বাঙ্গালা শব্দ-সংগ্রহ। বই দুইখানি-ই এখন দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য হইয়া গিয়াছে বলিতে পারা যায়। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর দুইখানি মাত্র প্রতির অস্তিত্বের কথা জানা গিয়াছে—একখানি খণ্ডিত প্রতি কলিকাতায় রয়াল-এশিয়াটিক-সোসাইটি অভ বেঙ্গল-এর পুস্তকাগারে আছে, আর একখানি আছে পোর্তুগালে লিস্‌বন শহরের জাতীয় গ্রন্থাগারে। পাদ্রি মানোএল্-এর অভিধান বা শব্দ-সংগ্রহের একখানি প্রতি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে আছে, অন্যখানি আছে লিস্‌বনের জাতীয় গ্রন্থশালায়। এতদ্ভিন্ন, পোর্তুগালের এভোরা-নগরীর প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রহে পাদ্রি মানোএল্-এর দুইখানি বইয়েরই কিয়দংশ করিয়া হস্তলিখিত পুঁথির আকারে মিলিতেছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন আমাদেব জানাইয়াছেন যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে "গোয়ার সন্নিহিত মারগাঁও শহবে ক্রেপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ তৃতীয় বার মুদ্রিত হয়" (পৃঃ ১॥/০, প্রস্তাবনা, 'ব্রাহ্মন-বোমান-কাথলিক-সংবাদ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭)। এই তৃতীয় সংস্করণ তিনি দেখেন নাই—ইহা রোমান অক্ষরে কি বাঙ্গালা অক্ষরে তাহা আমরা জানি না; এই তৃতীয় সংস্করণের একখানি মাত্র প্রতি লিস্‌বনের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। গোয়ায় ছাপা—অতএব রোমান অক্ষরে হইবারই সম্ভাবনা; এবং এই কাবণে এই তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ প্রচার লাভ করে নাই।

ধীরে ধীরে বাঙ্গালী পাঠক পাদ্রি মানোএল্-এর এই দুইখানি বইয়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। ১৯০৩ সালে স্যর জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন তাঁহার নব-আরব্ধ *Linguistic Survey of India*-র বাঙ্গালা-ভাষা-বিষয়ক খণ্ডে পাদ্রি মানোএল্-এর অভিধান সম্বন্ধে উল্লেখ করেন (Vol v, Part I, পৃঃ ২৩)। তৎপরে জেসুইট-সম্প্রদায়ের পণ্ডিত, কলিকাতা সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক Father Hosten পাদ্রি হস্টেন, বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৯১৪-১৯১৫ সালে) পাদ্রি মানোএল্-এর বই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া, বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসানুসন্ধিৎসু পাঠক-সমাজের সমক্ষে বই দুইখানিকে পুনঃপরিচিত করিয়া দেন। কলিকাতার এশিয়াটিক-সোসাইটির পুস্তকাগারে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থখানির খণ্ডিত প্রতিটির অবস্থানের কথা পাদ্রি হস্টেন সাহেব আমাদের প্রথম জানাইয়া দেন। তদনন্তর দুই একজন বাঙ্গালী সাহিত্যালোচকের দৃষ্টি এদিকে

আকৃষ্ট হয়—ঢাকার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এবং বর্তমান লেখক কর্তৃক ১৩২৩ সালের (১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় [৩য় সংখ্যা] এই বই সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিখানি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এই বইয়ের একটি সাহিত্যিক পরিচয় দেন, এবং আমি এই বইয়ের ভাষা ও ইহার রোমান বর্ণবিন্যাস ধরিয়া এই ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করি [পৃঃ ১৯৭-২১৭—" 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্ব"*]। ১৯২৯ সালে আমি লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়মে পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা-পোর্তুগীস শব্দকোষ ও ব্যাকরণ দেখি, এবং ১৯২২ সালে এই বইযের ব্যাকরণ অংশের একটা পূরা অনুলিখন ও শব্দ-সংগ্রহের আংশিক অনুলিখন করিযা আনি। এই অনুলিখন, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়-কৃত বঙ্গানুবাদেব সহিত এবং আমাব লিখিত প্রবেশকের সহিত ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমবা প্রকাশিত করি। ১৯১৯ সালে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমাব দে তাঁহার *Bengali Literature in the Nineteenth Century* বইয়ে পাদ্রি মানোএল্-এর সাহিত্য-চেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত কেদাবনাথ মজুমদার ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' গ্রন্থে পাদ্রি মানোএল্-এব শব্দ-সংগ্রহের নামপত্রের একটি চিত্র দেন (প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৭)। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত মৎপ্রণীত *Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে আমি বাঙ্গালা ধ্বনি-তত্ত্ব ও ব্যাকরণের আলোচনা সম্পর্কে আবশ্যক মতো পাদ্রি মানোএল্-এর বই দুইখানির উল্লেখ করি। এইভাবে বলিতে পারা যায় যে, কুড়ির শতকের প্রথম পাদে পাদ্রি মানোএল্ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন।

পাদ্রি মানোএল্-এর আগমন ঘটিয়াছিল বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীস বণিক্ এবং সঙ্গে-সঙ্গে পোর্তুগীস-জাতীয় রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রতিষ্ঠার ফলে। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে পোর্তুগীসেরা প্রথম ভারতে পদার্পণ করে—আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া, মালাবার বা কেরল দেশে কালিকট নগরে তাহারা জাহাজে করিয়া উপস্থিত হয়। ১৫১০ সালে তাহারা গোয়া দখল করিয়া সেই স্থানে ভারতে নিজেদের প্রধান কেন্দ্র গঠন করে।

*এই সংকলনে পরবর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাহারা প্রথম দক্ষিণ-ভারত হইতে বাঙ্গালায় আগমন করে। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহারা লিপ্ত হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত পোর্তুগীসেরা বঙ্গদেশে ও বঙ্গোপসাগরে বিশেষ দুর্ধর্ষতার সঙ্গে অবস্থান করিত—এবং ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতেই পোর্তুগীস ক্ষমতার বৃদ্ধি হইলে পরে, পোর্তুগীস পাদ্রিরা ধর্মপ্রচারের চেষ্টায় এ দেশে আসিতে আরম্ভ করেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পোর্তুগীস পাদ্রিরা বাঙ্গালা শিখিয়া পোর্তুগীস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রোমান-কাথলিক ধর্ম সংক্রান্ত বই অনুবাদ করিতে লাগিয়া যান। এই অনুবাদ-গ্রন্থগুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টান সাহিত্যের ভিত্তি স্বরূপ বলা যায়—কিন্তু এগুলি এখন অপ্রাপ্য, বোধ হয় চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সপ্তদশ শতক পোর্তুগীস ধর্ম-প্রচারকদের বিশেষ প্রতিষ্ঠার যুগ ছিল। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে হুগলী ও ঢাকায় পোর্তুগীস পাদ্রিদের বড়ো বড়ো কেন্দ্র গঠিত হয়। ঢাকায় ভাওয়ালে বহু দেশীয় ও মিশ্র খ্রীষ্টানের বসতি হয়। যেখানে যেখানে সম্ভব হইয়াছে, পাদ্রিরা বড়ো বড়ো গির্জা তুলিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতকে এই পাদ্রিদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারের যে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়।

উপস্থিত ক্ষেত্রে বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীস বণিক্ সৈনিক ও পাদ্রিদের ক্রিয়াকলাপ লইয়া আলোচনার আবশ্যকতা নাই। পাদ্রি হস্টেন সাহেবের প্রবন্ধে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রবন্ধে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন ও আমার সম্পাদিত পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রবেশকে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-কাথলিক-সংবাদ'-এর প্রস্তাবনায়, এবং **J. J. A. Campos** কর্তৃক লিখিত *History of the Portuguese in Bengal* (Calcutta 1919) গ্রন্থে ও এতদ্বিষয়-সম্পৃক্ত প্রবন্ধ ও গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

দোমিনিক-দে-সুজা Dominic de Souza নামে একজন পোর্তুগীস পাদ্রি ১৫৯৯ সালের পূর্বে দুই একখানি খ্রীষ্টানী বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। তাঁহার পূর্বে অন্য কোনও অনুবাদক বা পাদ্রি লেখকের কথা আমরা জানি না। তাহার পরের খবর যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে এই যে, দোম্ আন্তোনিও Dom Antonio নামে একজন দেশী (বাঙ্গালী) খ্রীষ্টান হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে 'ব্রাহ্মণ-রোমান-কাথলিক-সংবাদ' নামে একখানি বই রচনা

করেন। এই দোম্ আন্তোনিও ভূষণার রাজকুমার ছিলেন, ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আরাকানে লইয়া যায়, কিন্তু জনৈক পোর্তুগীস পাদ্রি টাকা দিয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনেন, ও পরে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে খ্রীষ্টান ধর্মগুরুদের নির্দেশ অনুসারে বইখানি লিখিয়া থাকিবেন। দোম্ আন্তোনিও-র সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য জানা যায়, তাহা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের প্রস্তাবনায় পাওয়া যাইবে। দোম্ আন্তোনিও-র বই বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীস পাদ্রিদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৬৯৫ সালে ভূষণার অন্তঃপাতী কোষাভাঙ্গা হইতে ঢাকার ভাওয়াল পরগণার নাগরী গ্রামে পোর্তুগীস পাদ্রিদের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময়ে দোম্ আন্তোনিও-র বইও ভাওয়ালে নীত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ ১৭২৬ সালের পরে, দোম্ আন্তোনিও-র বই মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য পোর্তুগালে পাঠানো হইয়াছিল, মুদ্রণের উদ্দেশ্যে রোমান লিপিতে ঐ বইয়ের অক্ষরান্তর করা হইয়াছিল, পাদ্রি মানোএল্ তাহার আশয়ও পোর্তুগীস ভাষায় লিখেন, কিন্তু কোনও কারণে ঐ বই এতাবৎ মুদ্রিত হয় নাই, বইয়ের পাণ্ডুলিপি পোর্তুগালের এভোরা-নগরীর পুস্তকাগারে পড়িয়াছিল,—অবশেষে ১৯৩৭ সালে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই বইয়ের মূল বাঙ্গালার অধিকাংশ রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা অক্ষরান্তরীকরণ সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পোর্তুগীস রোমান কাথলিক পাদ্রিদের দৃষ্টান্তে ও অনুপ্রাণনায় সৃষ্ট সাহিত্য-পরম্পরামধ্যে দোম্ আন্তোনিও-র এই বইয়ের পরে আমরা পাই পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্প্সাওঁ-এর পুস্তকদ্বয়। তাঁহার ব্যাকরণ ও শব্দ-সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ ধরিয়া ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে (ব্যাকরণখানি সম্পূর্ণ, শব্দ-সংগ্রহ আংশিকভাবে)। এক্ষণে তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তক, মূল প্রথম সংস্করণ অবলম্বন করিয়া, রোমান লিপিতে ও বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণে, এবং টীকা-টিপ্পনী সমেত, পুনঃপ্রকাশিত হইল।

পাদ্রি মানোএল্ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই কথা বলিয়া বইখানির অল্প-স্বল্প আলোচনা করিব। ইহার জীবনের কথা বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কোথায়, কবে, কোন্ বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, কবে, কিভাবে তিনি ভারতে আসেন, এ-সব খবর কোথাও উল্লিখিত পাওয়া যায় নাই। ১৭৩৪ সালে তিনি ভাওয়ালে বসিয়া তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন; তখন তিনি (পূর্ব

ভারতের মণ্ডলীভুক্ত) অগস্তীনীয় সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন (Religioso Eremita de santo Agostinho da Congregacao [da India Oriental]), এবং বাঙ্গালা দেশে সিদ্ধা নিকোলাস-দে-তোলেন্তিনো-র নামের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রচাব-কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন (Reitor da Missao de S. Nicolao de Tolentino em Bengalla)। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল নগরে অবস্থিত অগস্তীনীয মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৭৩৪-১৭৫৭ এই দুই তারিখের পূর্বের ও পরের কোনও সংবাদ তাঁহার সম্বন্ধে পাওয়া যায় নাই। তাঁহার জীবনের এইটুকু মাত্র আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর বাঙ্গালা দেখিয়া, ও তাঁহার শব্দ-সংগ্রহের ভূমিকা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, তিনি বিদেশ হইতে—পোর্তুগাল হইতে—বাঙ্গালা দেশে আসিয়া থাকিবেন।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর এই সংস্করণ, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল-এ রক্ষিত খণ্ডিত পুস্তকের আধারে মুদ্রিত হইল। সোসাইটির এই পুস্তকে নিম্নলিখিত পত্রগুলি নাই—পৃঃ ৩৩-৩৪, ৩৫-৩৬, ৩৭-৩৮, ৩৯-৪০, ৪১-৪২, ৪৩-৪৪, ৪৫-৪৬, ৪৭-৪৮; পৃঃ ১৫৫-১৫৬, ১৫৭-১৫৮; পৃঃ ৩২১-৩২২, ৩২৩-৩২৪, ৩২৫-৩২৬, ৩২৭-৩২৮, ৩২৯-৩৩০, ৩৩১-৩৩২, ৩৩৩-৩৩৪, ৩৩৫-৩৩৬; পৃঃ ৩৭১-৩৭২, ৩৭৩-৩৭৪; ৩৮০ পৃষ্ঠায় সোসাইটির অসম্পূর্ণ পুস্তক সমাপ্ত। ইহার অতিরিক্ত মূল পুস্তকে আছে, পৃঃ ৩৮১-৩৮২, পৃঃ ৩৮৩ (এই পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে বিজোড় সংখ্যার পৃষ্ঠায় আছে পোতুর্গীস, জোড় সংখ্যার পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা); ৩৮৩ পৃষ্ঠায় বইখানির সমাপ্তি। তদনন্তর পৃঃ ৩৮৪টি খালি পৃষ্ঠা; পৃঃ ৩৮৫-৩৯১-এ, কেবল পোতুর্গীস ভাষায় বইয়ের মধ্যে যে ৬১টি উপাখ্যান আছে, সেই উপাখ্যানগুলির সূচীপত্র মুদ্রিত হইয়াছে, সূচীতে এই উপাখ্যানগুলির পোর্তুগীস মূলের পৃষ্ঠা-সংখ্যার উল্লেখ আছে। সোসাইটির পুস্তকে যে পত্রগুলির অভাব আছে, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় বিশেষ অর্থব্যয় করিয়া এভোরার পুস্তকাগারে রক্ষিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিটি হইতে সেগুলিকে নকল করাইয়া আনান; এই নকল হইতে পূরণ করিয়া, সম্পূর্ণ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (কেবল বাঙ্গালা) অংশ মুদ্রিত হইল।

মূল বইখানি ছোটো আকারের—পৃষ্ঠাগুলির মুদ্রিত অংশের পরিমাপ ৫ ইঞ্চি × ৩ ইঞ্চি। ৩৮৩ বা ৩৮৪ পৃষ্ঠায় মূল বইখানি সমাপ্ত; ইহার অর্ধেক

লইয়া বাঙ্গালা—১৯২ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা অংশ। বইখানি দুই 'পুঁথি' বা দুই খণ্ডে বিভক্ত: 'পুথি' ১—পৃঃ ৩১২ পর্য্যন্ত, 'পুথি' ২—বাকি অংশ লইয়া। প্রত্যেক 'পুথি' আবাঃ কতকগুলি 'তাজেল' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। 'পুথি' ও 'তাজেল'-এর বিষয়বস্তু নিম্নে নির্দিষ্ট হইল:

পুথি ১—সকল (পড়)নের অর্থ, এবং পৃথক্ পৃথক্ বুঝান।

তাজেল ১—সিদ্ধি ক্রুশের অর্থভেদ।

তাজেল ২—'পিতার পড়ন', এবং তাহার অর্থ।

তাজেল ৩—'প্রণাম মারিয়া' আর তাহার অর্থ, আর 'নিস্তার রাণী'।

তাজেল ৪—'মানি সত্য নিরঞ্জন', আস্থার চৌদ্দ ভেদ এবং তাহাদিগের অর্থ।

তাজেল ৫—দশ আজ্ঞা, এবং তাহাদিগের অর্থ।

তাজেল ৬—পাঁচ আজ্ঞা, এবং তাহাদিগের অর্থ।

তাজেল—৭ সাত সাক্রামেন্তোস্, এবং তাহাদিগের অর্থ।

পুথি ২—পড়নশাস্ত্র সকল আর যে উচিত জানিতে, স্বর্গে যাইবার।

তাজেল ১—আস্থার ভেদ বিচার, সত্য করিয়া শিখিবার, শিখাইবার, উপায় তরিবার।

তাজেল ২—পড়ন-শাস্ত্র নিরালা।

এই বইয়ে মোটামুটি রোমান-কাথলিক ধর্মের ধর্মবীজ, মূল বিশ্বাস-সমূহ এবং অনুষ্ঠান-সমূহের ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাকে বিশদ করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি (৬১টি) ধর্মমূলক উপাখ্যানও বইয়ে দেওয়া হইয়াছে।

বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা এক্ষেত্রে অবান্তর। তবে এইটুকু বলা যায় যে, একটি বিশেষ ধর্মমত বা অনুষ্ঠানের সত্যতা বা ঔচিত্য সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে যে উপাখ্যানগুলি দেওয়া হইয়াছে, বহু স্থলে সেগুলিতে বিশ্বাস করা শিশুজনোচিত সরল মনোভাব না হইলে সম্ভব হয় না। বিশ্বাসী জনের উচিত জোর ভাষায় নিজ বিশ্বাস প্রকট করা ছাড়া বিচার বা যুক্তির বিশেষ কিছু এইরূপ বইতে আশা করা যায় না। যাহারা খ্রীষ্টান পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বাস করে, তাহাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বইখানি লিখিত।

আমাদের কাছে এখন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তকের উপযোগিতা হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার পুরাতন গদ্যের নিদর্শন হিসাবে এবং রোমান অক্ষরে

X. Podarthoná zanilé.
C. Xú rupé manité que moté zanibeq?
X. Zanilé o manilé, o buzhilé axthar bhed xocol.
G. Carzió punió corite que moté zanibeq?
X. Dox Agguia, o pans Agguia zanilé; e bong tahandiguer palon corile, zemot uchit.
G. Ar qui zanibeq?
X. Muctir mulier tingun: *Axthá* manité; *Axá* manguité: *Corunó*, carzió punió corité.
G. Zanó ni podar thoná?
X. Hoé, zaní.
G. Cohó, deqhi;

Podar Thoná.

X. Pitá amardiguer,
Poromo xorgué asló;
Tomar xidhi nameré
Xeba houq:
Aixuq amardigueré
Tomar raizot:
Tomar zé icha,
Xei houq:
Zemon porthibité,
Temon xorgué:

Amar-

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

লিখিত বলিয়া পুরাতন বাঙ্গালাব উচ্চারণ-নির্দেশক পুস্তক হিসাবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রবন্ধে (১৩২৩ সাল, তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১৯ -২১১) এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি ; এবং আমাদের সম্পাদিত পাদ্রি মানোএল্-এর ব্যাকরণে ও ব্যাকরণের ভূমিকাতেও আলোচনা পাওয়া যাইবে। সে বিষয়ে পুনরবতারণা করিব না, জিজ্ঞাসু পাঠকগণকে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধ এবং এই বইয়ের টীকাটিপ্পনী অংশ দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা যে বিদেশীব রচিত বাঙ্গালা, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহার রচনাশৈলীর মধ্যেই বিদ্যমান। চারিটি কারণে তাঁহার বাঙ্গালা রচনা খুব ভালো হইতে পারে নাই : (১) তিনি বিদেশী, খুব ভালো করিয়া বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার দখল হয় নাই, মনে হয় তিনি মৌখিক ভাষা-ই বলিতে বেশি অভ্যস্ত ছিলেন, সাধু-ভাষা বা সাহিত্যের ভাষায় তাঁহার অধিকার তেমন ছিল না। (২) তখনকার দিনে সাধু গদ্যের পুঁথি ছিল না বলিলেই হয়, সুতরাং গদ্য রচনায় পাদ্রি মানোএল্কে অনেকটা নিজেই পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছিল। গদ্যের ভালো আদর্শ তাঁহার সমক্ষে না থাকায়, তাঁহাকে লাতীন ও পোর্তুগীসের (বিশেষতঃ মূল গ্রন্থেব ভাষা পোর্তুগীসের) আদর্শ বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার ভাষায় বহু স্থলে ফিবিঙ্গিয়ানা আসিয়া গিয়াছে—বিশেষ করিয়া বাক্যরীতিতে। (৩) তখন সাধু গদ্যে বেশি পুঁথি লেখা না হইলেও, পত্রাদিতে এক রকম সাধু বাঙ্গালা গদ্যের শৈলী দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাদ্রি মানোএল্ ঢাকা ভাওয়াল অঞ্চলের কথ্য ভাষা নিশ্চয় ভালো করিয়া জানিতেন, সেইজন্য তাঁহার রচনায় কথ্য ভাষার প্রভাব এত বেশি পড়িয়াছে যে তাঁহার ব্যবহৃত বাঙ্গালাকে ঢাকার কথ্য ভাষার সহিত মিশ্রিত সাধু গদ্য বলিতে হয়। ভূষণার রাজপুত্র দোম্ আন্তোনিও-র ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। (৪) বহু স্থলে সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন বলিয়া, পাদ্রি মানোএল্কে রোমান-কাথলিক ধর্মমত ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে উপযুক্ত পরিভাষার জন্য বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি সাধু-ভাষা ও আনুষঙ্গিক ভাবে সংস্কৃতের শব্দাবলীর ও ধাতু-প্রত্যয়াদির সহিত তেমন পরিচিত ছিলেন না বলিয়া, পারিভাষিক শব্দের জন্য চল্তি বাঙ্গালা শব্দের সাহায্যই তাঁহাকে বেশির ভাগ লইতে হইয়াছিল। Sancta Mater Ecclesia—সমস্ত খ্রীষ্টান সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান জনগণের আধ্যাত্মিক জীবনের রক্ষয়িত্রী মাতা রূপে কল্পিত হইয়া, লাতীনে এই নামে অভিহিত হয়—ইংরাজিতে Holy Mother Church,

পোর্তুগীসে Santa Madre Igreja। পাদ্রি মানোএল্ (অথবা তাঁহার পূর্বগামী অন্য কোনও পাদ্রি ?) ইহার বাঙ্গালা করিলেন—"সিদ্ধী মাতা ধর্মঘর" ('সিদ্ধা' পুংলিঙ্গ শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গে 'সিদ্ধী")। এইরূপ অনুবাদের চেষ্টা লক্ষণীয়; ভাষার পুঁজি যেটুকু তাঁহাদের হাতে আসিয়াছিল, তাহা লইয়া এই পাদ্রিরা যতটা সম্ভব খ্রীষ্টান ধর্মমত বাঙ্গালায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান পরিভাষার পত্তন করিযা গিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের পরিশ্রম সাধুবাদের যোগ্য। বাধ্য হইয়া, উপযুক্ত শব্দ না জানায় বা না পাওয়ায়, তাঁহারা দুই চারি স্থানে লাতীন বা পোর্তুগীস শব্দ রাখিয়াছেন; যেমন "ইস্পিরিতো সান্তো, কন্‌ফেসার, ক্রুশ, বিস্‌পো", প্রভৃতি। কিন্তু মোটের উপর, বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের ধর্মকার্য্যে তাহার মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার কালে, সেই ভাষাকে যথাসাধ্য 'স্বদেশী' রাখিবার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল।

বাক্যরীতির অসংগতি পাদ্রি মানোএল্-এর ভাষার প্রধান দোষ; ইহা পদে পদে পাওয়া যাইবে। পোর্তুগীস পাদ্রিদের বাঙ্গালায় গোয়ার কোঙ্কণী ভাষার প্রভাবের কথা আমি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-তে ১৩২৩ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু পুস্তকে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ বিষয়ে, পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালায় যে তখনকার দিনের ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একটা সত্যকার প্রতিচ্ছায়া মিলিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমান শাসনের যুগে যাহা হওয়া স্বাভাবিক—আরবী-ফার্সী শব্দও বেশ আছে। সংস্কৃত সাধু-ভাষার প্রভাব কথ্য ভাষায় ততটা পড়ে নাই, সেই জন্য প্রচলিত খাঁটি বাঙ্গালা ও অর্ধতৎসম শব্দ এবং সমাস যথেষ্ট আছে।

পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা সবচেয়ে বেশি স্ফূর্ত হইয়াছে তাঁহার উপাখ্যান-গুলিতে। এই উপাখ্যানগুলির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, মোটের উপরে বেশ প্রাঞ্জল প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সহজ-বোধ্য বাঙ্গালা তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাক্য-রীতিতে স্থলে স্থলে স্খলন হইলেও, এবং পোর্তুগীসের প্রভাব দেখা দিলেও, তিনি যে বেশ সাবলীল ভঙ্গীতে তাঁহার উপাখ্যানগুলি শুনাইয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কতকগুলি উপাখ্যান সরল বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা হিসাবে ধরা যাইতে পারে—অবশ্য তখনকার দিনের শব্দাবলী সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হইতে হইবে।

বাঙ্গালা ভাষার গদ্য-সাহিত্যের এক প্রধান ও লক্ষণীয় পুরাতন নিদর্শন বলিয়া, এই বই হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর আদরের বস্তু হওয়া

উচিত। বাঙ্গালা গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ চর্চা করিতে গেলে, পাদ্রি মানোএল্-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'কে বাদ দিতে পারা যায় না; এবং, বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গদ্য-লেখকগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাওঁ সমস্ত বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র।

এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গাক্ষরে ফরাসি পাদ্রি "জাকবছ্ ফ্রাঁছিসকস্ মারিয়া গেরেঁ" (Jacobus Franciscus Maria Guerin) ১৮৩৬ সালে শ্রীরামপুরে ছাপাইয়া চন্দননগর হইতে প্রকাশিত করেন। ফরাসিতে এই দ্বিতীয় সংস্করণের নামপত্র এইরূপ: CATÉ-CHISME/SUIVI/DE TROIS DIALOGUES/ ET DE LA LISTE / DES ÉCLIPSES DE SOLEIL ET DE LUNE / CALCULÉES POUR LE BANGALE / A PARTIR DE 1836 JUSQU'EN 1940 INCLUSIVEMENT. / NOUVELLE ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE / কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ। / সূর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ বৎসরের / আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি / সহর চন্দননগর / এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশের নিমিত্তে।/ করিয়াছেন জাকবছ্ ফ্রাঁছিসকস্ মারিয়া গেরেঁ / চন্দননগরের সর্ব গ্রাহ্যের পাদরী / নিয়োজিত প্রেরিতসম্পর্কীয় এবং ধর্মাত্মার সভাস্থ।/ দ্বিতীয় বার এবং শুদ্ধরূপে / শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল।/ সন ১৮৩৬।/

এই সংস্করণের নামপত্রেই ইহার ভাষার নমুনা দেখা যায়। ইহার লাতীন ভূমিকায় পাদ্রি মানোএল্ যে এই বই প্রথম ১৭৩৫ সালে রচনা করেন এবং লিস্‌বন হইতে এই বই যে প্রথম প্রকাশিত হয়—ভূমিকায় ভ্রম-ক্রমে ছাপার তারিখ ১৭৪৩ স্থলে ১৭৬৩ দেওয়া হইয়াছে—তাহার উল্লেখ আছে। কোনও কোনও স্থানে এই নূতন সংস্করণে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা আছে; লাতীন Sanctus, Sancta Sanctum, পোর্তুগীস Santo, Santa এবং ইংরেজি Saint-এর অনুবাদ পাদ্রি মানোএল্-এর বইয়ে আছে "সিদ্ধা, সিদ্ধী"; পাদ্রি গের্‌ঁয়া তাহা কাটিয়া করিয়া দিয়াছেন "শুদ্ধ"। "অর্থভেদ" Orth, bhed শব্দ শুদ্ধ করিয়া এই সংস্করণে "অর্থবেদ" করা হইয়াছে; "অর্থবেদ" মানে কী হয় জানি না, "অর্থভেদ" কিন্তু সার্থক শব্দ, "অর্থের ব্যাখ্যা" অর্থে। ১ হইতে ৫৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ"; মাত্র এই অংশকে পাদ্রি মানোএল্-এর বইয়ের সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যায়। উপাখ্যানগুলির প্রায় সব কয়টি ইহা

হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। তদনন্তর ৫৮ হইতে ৬২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুসলমান মত খণ্ডন, ৬২ পৃষ্ঠা হইতে ৬৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত হিন্দু মত খণ্ডন, ৬৬ পৃষ্ঠা হইতে ৯৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান গুরু-কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মান্তরিত মুসলমান ও হিন্দু শিষ্যদ্বয়কে খ্রীষ্টান জগতের ইতিহাস কথন ও রোমান-কাথলিক ধর্মের প্রাধান্য ও মহিমা কীর্তন; পৃঃ ৯৮-৯৯-তে এক হিন্দু দৈবজ্ঞের সহিত এই গুরুর বাদ, এবং ৯৯-১২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের গণনা। পাদ্রি গের্যাঁ ৫৮ হইতে ৯৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে অংশ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিযাছেন, ভাষা ও ভাব উভয় দিক্ দিয়া সেই অংশ সম্বন্ধে এক কথায় সমালোচনা করা যায়—'বর্বর'। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর তৃতীয় সংস্করণের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আমরা কেহ দেখি নাই—এতৎসম্পর্কে কিছু বলা গেল না॥

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'
ও
বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্ব*

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকদের কাছে বাঙ্গালা ভাষার সকলের চাইতে পুরানো ছাপা বই, রোমান অক্ষরে লেখা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে একখানি বইয়েব পবিচয় দিয়াছেন ['ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৭৭-১৯৫]। ঐ বইখানি খ্রীষ্টান বোমান কাথলিক ধর্মসংক্রান্ত এবং উহা বাঙ্গালা গদ্যের এক প্রাচীন ও মূল্যবান্ নমুনা। সুশীল বাবুব অনুরোধে এই বইযের রোমান অক্ষরে বানানেব বীতি ও ইহাব ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

এই অভিনব বইয়ের সন্ধান সুশীলবাবুর কাছে আমি প্রথম পাই। ইহা এখন কলিকাতা এশিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তকাগারে আছে। শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুগ্রহে সোসাইটির পুস্তকালয়ে আমি এই বই দেখি এবং ইহা হইতে কতকটা অংশ যেমনটি আছে, তেমনি নকল করিয়া আনি। সেই নকল অংশটুকুর উপব নির্ভর করিয়া দুই চার কথা বলিব।

বাঙ্গালা ভাষা জন্মকাল হইতেই ভারতীয় লিপির সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ। বাঙ্গালা বর্ণমালা মহারাজ অশোকেব কালের ব্রাহ্মী লিপি হইতে উৎপন্ন, ব্রাহ্মী লিপির কন্যাস্থানীয় গুপ্তলিপির বংশজাত 'কুটিল' বর্ণমালাগুলির মধ্যে অন্যতম। কাশ্মীরী, সিন্ধী এবং মুসলমানী হিন্দী (অর্থাৎ উর্দু) প্রভৃতি কয়েকটি এদেশী ভাষা যেমন মুসলমান প্রভাবেব ফলে ভারতীয় বর্ণমালা পরিত্যাগ করিয়া আরবী লিপির আশ্রয় লইয়াছে, এবং পোর্তুগীসদের চেষ্টায় গোয়া প্রদেশের দেশী খ্রীষ্টানদের ভাষা কোঙ্কণী-মারাঠী যেমন বহু দিন হইতেই রোমান অক্ষরে লিখিত হইয়া আসিতেছে, বাঙ্গালা ভাষাকে সেরূপ নিজ লিপি ছাড়িয়া অন্য বিদেশীয় লিপি ধরাইবার কোনও বিশেষ চেষ্টা কখনও হয় নাই। ইংরেজ আমলের পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের পড়িবার সুবিধার জন্য বাঙ্গালা কাব্য

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বৎসরের ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আরবী (বা ফার্সী) অক্ষরে লিখিতেন এবং পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে 'সিলেট নাগরী'[১] নামে এক রকম ভাঙ্গা ভাঙ্গা নাগরী অক্ষরে বাঙ্গালা লেখা হয়, তাহা দেখা যায় বটে, কিন্তু কাশ্মীরী বা উর্দুর মতো বাঙ্গালায় ফার্সী অক্ষর চালাইবার চেষ্টা বঙ্গদেশের মুসলমান শাসকদের মনে আসে নাই। বাঙ্গালা যে কখনও আরবী অক্ষরে লেখা হইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালা ভালো জানে না—এমন পাদ্রিরা যাহাতে সহজে পড়িতে পারে, সেই চেষ্টায় দুই চারখানা খ্রীষ্টানী বই রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছে এবং 'দুর্গেশনন্দিনী' বইখানিরও রোমান অক্ষরে ছাপা একটি সংস্করণ কলিকাতায় সাহেব বইওয়ালাদের দোকানে পাওয়া যায়; কিন্তু বাঙ্গালা যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। বছর সত্তর আশী পূর্বে একবার এ দেশে কতকগুলি ইংরেজ দেশী ভাষাগুলিতে রোমান লিপি চালাইবার জন্য খবরের কাগজে আন্দোলন করিয়াছিলেন, এবং এ বিষয়ে স্যর্ চার্ল্‌স্ ট্রেভীলিয়ান ও ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার ইয়েট্‌স্ প্রভৃতি জন কয়েক মিশনারী অগ্রণী ও উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ প্রিন্সেপ্ ও আরবীতে পণ্ডিত টাইট্‌লার, ইঁহাদের ঘোর আপত্তি ছিল। ইহার পরে টোলবর্ট্ প্রভৃতি দুই একজন সিভিলিয়ান্ উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ-দেশী কোনও ভাষায় রোমান লিপি না চলিলেও, ইউরোপে ও আমেরিকায় অনেক সংস্কৃত ও পালি বই রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছে ও হইতেছে।

রোমান বর্ণমালা অর্থাৎ a, b, c, d প্রভৃতি ছাব্বিশটি অক্ষর গ্রীক বর্ণমালার রূপভেদ মাত্র, যেমন বাঙ্গালা ও দেবনাগরী। ফিনীশিয়ানদের নিকটে গ্রীকেরা লিপিবিদ্যা শেখে এবং গ্রীকদের নিকট হইতে রোমানেরা। এই রোমান লিপিতে আগে ২৩টি অক্ষর ছিল[২] এবং কেবল লাতীন ভাষার ধ্বনি (sound) জানাইবার উপযোগী ছিল। লাতীনে মোটে ১৭টি ব্যঞ্জনধ্বনি ও ৬টি স্বরধ্বনি ছিল। গ্রীকে গুটিকতক বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। এই অল্পসংখ্যক-অক্ষর-যুক্ত লাতীন

১ মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সংকলিত, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ' ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় ৮৭, ৯৯, ১২৪, ২১১, ২০৮ নম্বরের পুঁথির বিবরণ দ্রষ্টব্য। 'সিলেট নাগরী' সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৫ সালের ৪র্থ সংখ্যাতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দেবশর্মার লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ A (=আ), B, C (=ক), D, E, F, G, H, I (=ই, য়), K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V (=উ, ব,), X, Y, Z.

বা রোমান বর্ণমালার দ্বারা সকল ভাষার ধ্বনি জানানো সম্ভব নয়, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষাগুলির। লাতীনে ও গ্রীকে তালব্য ধ্বনি নাই, তাই ভারতীয় নামে 'চ' বা 'জ' থাকিলে গ্রীক ও লাতীন লেখকেরা s বা ti (ত্য) এবং z বা di (দ্য) দ্বারা ঐ দুই ধ্বনি নির্দেশ করিতেন। যেমন, চন্দ্রগুপ্ত = Sandrakoptos, চষ্টন = Tiastenes ও উজ্জয়িনী (উজ্জেনী) = Ozene, যমুনা (জমুনা) = Diamouna। লাতীন ভাষা ভাঙ্গিয়া যখন ফরাসি, ইতালীয় প্রভৃতি 'রোমান্স্' ভাষাগুলির উদ্ভব হইল, তখন সেই ভাষাগুলিতে তালব্য ধ্বনি নূতন করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া পড়িল, তখন নূতন কোনও অক্ষর উদ্ভাবনা না করিয়া পুরাতন রোমান অক্ষরের দ্বারাই নানা উপায়ে এই সকল ধ্বনি জানাইবার চেষ্টা হইল; যেমন ইতালীয় ভাষায়, cia, cio, ciu, ce, ci = 'চ'; gia, gio, giu, ge, gi = 'জ', scia, scio, ইত্যাদি = 'শ', পুরানো ফরাসিতে ch-এ 'চ', j-তে 'জ' ও sch, sh = 'শ'; এবং পুরানো ফরাসির বানানের অনুকরণ করিয়া ইংরেজিতেও ch, j, sh-এ 'চ, জ, শ'। রোমান অক্ষর ব্যবহার করে, এমন অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় এখন নানা জটিল উপায়ে এই ধ্বনিগুলি জানানো হইয়া থাকে। যেমন, জর্মানে tsch, dsch, sch, ওলন্দাজে tj, dj, sh; পোলাণ্ডের ভাষায় cz, gz, sz; মাজ্যার বা হঙ্গেরি দেশের ভাষায় cs, ds, s; নরওয়ের ভাষায় kj, gj, skj। এই সকল ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টায় সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভিন্ন বর্ণমালার ভাষার বই বা কথা রোমান অক্ষরে অনূদিত হইলে c = চ, j = জ, ś বা ç = শ, ṣ = ষ—এইরূপ সরল উপায়ে উক্ত বর্ণগুলি জানানো হয়। যে সকল ধ্বনির উপযুক্ত বর্ণ লাতীন বর্ণমালায় মিলে না, সেগুলি ফুট্‌কি-দেওয়া বা অপর কোনও বিশেষ চিহ্ন-দেওয়া হরফের দ্বারা জানানো হয়। এই রূপে একটি বিস্তারিত রোমান বর্ণমালার সাহায্যে সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি, নাগরী ও আরবী লিপিতে যেমনটি লিখিত হয়, ঠিক তেমনি লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া গড়া একটি রোমান বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়, এ কথা বলিতে হইবে।

আবার সাধারণ সাধারণ স্বর- ও ব্যঞ্জন-ধ্বনি (sound) জানাইবার জন্য, রোমান অক্ষর ব্যবহার করে, এমন দুইটি ইউরোপীয় ভাষায় মিল নাই। k, l, p, q প্রভৃতি তিন চারটি বর্ণ ছাড়া আর বর্ণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় একটু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, কোথাও বা একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারিত হয়। ভাষাতত্ত্বের শাখা উচ্চারণ-তত্ত্ব (Phonetics) নামক নবীন বিদ্যার পক্ষে, মানব-ভাষার সমস্ত

প্রচলিত ও সম্ভাব্য স্বর- ও ব্যঞ্জন-ধ্বনি যথাযথ নির্দেশ করে, এমন একটি মান- বা sound-value-যুক্ত অক্ষরমালার সাহায্য ভিন্ন একটুকুও চলা অসম্ভব। যেমন ইংরেজি Henry-র উচ্চারণ 'হেন্‌রি', ফরাসিতে কিন্তু Henri-র উচ্চারণ 'আঁরি'; রোমান অক্ষরে দুইটিই লেখা হইয়াছে, কিন্তু উচ্চারণে কত তফাৎ। উচ্চারণ-তত্ত্বের অনুযায়ী বানান রোমান অক্ষরে করিতে হইলে ইংরেজি Henry = [hen-ri], ফরাসি Henri = [ɑ̃ri]। Siege—ইংরেজিতে [siid$_z$] (সীজ্‌—dz = ইংরেজি জ), কিন্তু জর্মানে [zi = gə] (জী-গ্য—উল্টা ə = her-এর e-র মতো ধ্বনি); man—ইংরেজিতে [mæn] (ম্যান,—æ = অ্যা), জর্মানে [man] (মান্‌), ফরাসিতে [mɑ̃ (মাঁ)। উচ্চারণ ঠিক জানাইতে গেলে দেখা যায় যে, প্রচলিত রোমান অক্ষর একটু আধটু বদলাইয়া বাড়াইয়া না লইলে চলে না, কারণ, ইউরোপে এক অক্ষরের হরেক ধ্বনি বা উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য একটি Phonetic Alphabet অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই Phonetic Alphabet তৈরী করার মূল মন্ত্র হইতেছে one symbol, one sound : একটি অক্ষরে মাত্র একটি ধ্বনি, d—o = ডু, s-o = সো, এরূপ চলিবে না; (মেনেজার = ম্যানেজার, ইহাও এই নিয়মে unphonetic বানান), s + h-তে 'শ' বা c + h-তে 'চ'—এইরূপ দুই অক্ষর জুড়িয়া এক ধ্বনি—তাহাও চলিবে না। এইরূপ Phonetic Alphabet উদ্ভাবন ও প্রচলনের জন্য ইউরোপে অনেকে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিছু কাল হইল, পারিসের 'আসোসিআসিওঁ ফ.নেতিক্‌ অ্যাঁন্তার্‌নাসিওনাল্‌' (Association Phonetique Internationale)-নামক সমিতি ইউরোপের ও অন্য দেশের ভাষার উচ্চারণ ঠিক ধরিবার জন্য রোমান বর্ণমালার অক্ষর লইয়া ও তাহার দরে নূতন অক্ষর উদ্ভাবন করিয়া বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত এক বর্ণমালার প্রচার করিতেছেন। তাহার দ্বারা পৃথিবীর যে কোনও ভাষার শব্দের কথিত (বা লিখিত) রূপ সেই ভাষার নিজের বর্ণমালার চাইতেও সুন্দররূপে ধরিতে পারা যায়। ইউরোপে Phonetics সম্বন্ধে ও কোনও ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল বই আজকাল লেখা হইতেছে, সেগুলিতে সাধারণতঃ এই বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়।

বাঙ্গালা নাম আজকাল যখন ইংরেজি অক্ষরে লেখা হয়, তখন দেখা যায় যে, ইংরেজি ভাষার চলিত উচ্চারণ ও বানানের রীতি ধরিয়া লেখা হয় না। কিন্তু কিছু পূর্বের ইংরেজি বইয়ে ও পুরাতন ইংরেজি কাগজপত্রে এদেশী নামের যে ইংরেজি বানান পাওয়া যায়, তাহা এখন আমাদের চোখে বড়ই অদ্ভুত লাগে।

Bridgenarran, Colly Kishto, Tuttobodheeney, Nana Furnvese, Hurrish, Chytun, Awlley Cawn, Sooraj Dowla প্রভৃতি বানানে 'ব্রজনারায়ণ, কালীকৃষ্ণ, তত্ত্ববোধিনী, নানা ফড়নবীস্, হরিশ, চৈতন্য, আলী খাঁ, সিরাজুদ্দৌলা' ইত্যাদি দেশী নাম পুরাতন ইংরেজি বই ও কাগজে পাওয়া যায়। Dacca, Burdwan, Chittagong, Cawnpore, Tagore, Law, Dawn প্রভৃতি বানান সে যুগের চিহ্নাবশেষ। আগেকার কালে ইংরেজ যখন নিজ অক্ষরে বিদেশী নাম লিখিতেন, তখন নিজের ভাষায় সেই অক্ষরের যেরূপ প্রয়োগ হইত ও নিজের কানে বিদেশী কথা যেমন শুনাইত, এবং নিজে যতটা তাহার ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিতেন, সেই অনুসারে চলিতেন। সেইরূপ ফরাসি ও পোর্তুগীসও এ বিষয়ে নিজ নিজ ভাষার রীতি অবলম্বন করিতেন। কিন্তু আজকাল ভাষাতত্ত্বের ও উচ্চারণ-তত্ত্বের চর্চার ফলে, কোনও বিদেশীয় নাম বা শব্দ যখন ইউরোপীয় কোনও বইতে আসিয়া পড়ে, তখন ইংরেজি বা ফরাসি বা জর্মান বা অন্য কোনও ভাষা অনুযায়ী বানানে লিখিত হয় না, প্রায়ই একটি মোটামুটি চলিত মান বা Standard ধরিয়া চলা যায় এবং সেই Standardটি বেশির ভাগ বইয়ে এই— Vowels as in Italian, consonants as in English, অর্থাৎ a, e, i, o, u-এর ইতালীয় উচ্চারণ, (আ, এ, ই, ও, উ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মোটামুটি ইংরেজি উচ্চারণ—এই অনুসারেই চলা হয়।

আলোচ্য বইখানি খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪ সালে বা তাহার কিছু পরে লিসবনে ছাপা, পোর্তুগীস পাদ্রীর লেখা। সে কালে কোথাও বাঙ্গালা ছাপার হরফ তৈরী হয় নাই, বাঙ্গালা বই ছাপাইতে গেলে রোমান অক্ষরের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। রোমান কাথলিক পাদ্রীর কাছে হয়তো ইহা খুব সুখেরই কথা ছিল; কারণ, ইহার কিছু পূর্বে গোয়ায় গোঁড়া খ্রীষ্টান শাসনকর্তারা দেশী বর্ণমালার প্রচলন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, এমন কি, দেশী ভাষা উঠাইয়া দিয়া তাহার জায়গায় পোর্তুগীস চালাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তখন ইউরোপে ভাষাতত্ত্ব-বিজ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই, উচ্চারণ-তত্ত্বের কথা দূরে থাক্; Phonetic Alphabet-এর কথা কেহ ধারণাও করিতে পারিত না। পাদ্রী মানোএল্-দা-আস্সুম্প্সাওঁ পোর্তুগীস ভাষায় প্রচলিত বানান অনুসারে, বাঙ্গালা শব্দ তাঁহার কানে যেমন লাগিত, সেই রকম লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, যে কেহ রোমান অক্ষরে লেখা বই, অর্থাৎ পোর্তুগীস বই পড়িতে পারে, (সে কালে

ইংরেজি বা ফরাসির কোনও প্রভাব এ দেশে ছিল না), সে এই বইও পড়িতে পারিবে। কোনও বাঙ্গালী এই বাঙ্গালা বই আন্দাজে আন্দাজে পড়িয়া যাইতে পারেন ; বানানের রীতির সঙ্গে পরিচয়ের অভাব তাঁহার ভাষাজ্ঞান দ্বারা কতকটা দূর হইবে বটে, কিন্তু পোর্তুগীস বানানের রীতি জানা থাকিলে রোমান অক্ষরে লেখা এই বাঙ্গালা বই পড়িয়া একটি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ে আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। এই বই যদি বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইত, তাহা হইলে সেই বিষয়টিতে ইহা আমাদের তেমন কাজে আসিত না। বিষয়টি হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব (Phonetics)।

বাঙ্গালা ভাষাব 'ব্যাকবণ', অর্থাৎ ইহার বিভক্তি প্রত্যয় প্রভৃতি প্রাচীন যুগে কী ছিল, তাহা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য পড়িয়া জানা যায়। কেমন করিয়া বৈদিক সুপ্-তিঙ্ প্রাকৃতে বিকৃত ও বহু স্থানে লুপ্ত হইয়া পড়িল এবং কেমন করিয়া আধুনিক ভাষাগুলিতে নূতন নূতন বিভক্তি আদি উদ্ভাবিত হইল, সে কথা বৈদিক ও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ও পুরাতন যুগেব বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি চর্চা করিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভাষার উচ্চারণ তাহার ব্যাকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। মুখে মুখে ঠিক যেমনটি উচ্চারিত হয়, সেইটি-ই হইতেছে জীবন্ত, প্রাণযুক্ত শব্দ, এবং উহার লিখিত 'সাধু' বা 'শুদ্ধ' রূপ উহাব প্রাণহীন প্রতিকৃতি মাত্র। অন্ততঃ যে সকল ভাষা ধ্বনিব্যঞ্জক বর্ণমালার সাহায্যে লেখা হয়, সেইগুলির সম্বন্ধে এ কথা খাটে ; চীনা, প্রাচীন মিসরীয় প্রভৃতি ভাষা, যেগুলি বস্তুচিত্র (pictogram) বা ভাবচিত্র (ideogram) দ্বারা মুখ্যতঃ লিখিত হয়, সেগুলি সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণরূপে না খাটিতে পারে। উচ্চারণের ভেদ বা স্বাভাবিক পরিবর্তনকে উচ্চারণ-শাস্ত্র সম্বন্ধে উদাসীন পণ্ডিতেরা হয়তো উচ্চারণের 'বিকৃতি' বলিবেন ; কিন্তু এই 'বিকৃতি-ই ভাষার ব্যাকরণ বদলাইয়া দেয়। উচ্চারণের উপরই ভাষার ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত উচ্চারণের সঙ্গে সংস্কৃতের সন্ধি-পর্য্যায় জড়িত। তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Philology) চর্চা করিলে দেখা যায় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক জটিল বিষয়, আদি আর্য্য-মাতৃভাষার অতি প্রাচীন অবস্থার উচ্চারণের আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট হইয়া যায়। বৈদিক যুগের চলিত কথাবার্তার ভাষার উচ্চারণের পরিবর্তনেই প্রাকৃতের উদ্ভব। উচ্চারণের বৈষম্যের জন্য পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙ্গালার কথিত ভাষার ব্যাকরণ পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে ও আরও পড়িতেছে। এই কারণে যাঁহারা বাঙ্গালা বা অপর কোনও ভাষার ব্যাকরণ অনুশীলন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই

ভাষার প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত তাহার উচ্চারণ-প্রণালীর, তাহার historical phonetics বা phonology-র সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন অবস্থায় কী কী ধ্বনি (sound) ছিল, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই, অন্ততঃ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না। সংস্কৃতের বা বৈদিক ভাষাব উচ্চারণ কী ছিল, নানা উপায়ে সে বিষয়ে একটা মোটামুটি স্থিরসিদ্ধান্ত হইযা গিয়াছে। কিন্তু দুএকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদেব সন্দেহ একেবারে দূর হয নাই। পাণিনির সময়ে সংস্কৃত 'অ'-এর উচ্চাবণ পূর্ণরূপে জিহ্বামূলীয় বা 'কণ্ঠ্য' এবং open বা 'বিবৃত' উচ্চাবণ ছিল না—অর্থাৎ আদিম যুগের ভাষায 'অ' ইংরেজি 'father'-এর 'আ'-এর মতো ছিল, তবে এই হ্রস্ব ঌ দীর্ঘ 'আ'-কারেব চাইতে বিশেষ হ্রস্ব রূপে উচ্চারিত হইত। পরে পাণিনিব সময়ে লৌকিক বা কথ্যভাষায এই open বা 'বিবৃত' উচ্চাবণ closed বা 'সংবৃত' উচ্চারণ হইয়া দাঁড়ায, এই 'সংবৃত' উচ্চাবণ ইংরেজি 'hut', 'her', 'china' প্রভৃতি পদেব u, e, a-র মতো; এই উচ্চারণ এখনও হিন্দী, পঞ্জাবী, মারাঠী ও দ্রাবিড ভাষাগুলিতে আছে। (পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের শেষ সূত্র 'অ অ' [এই সূত্রটিতে প্রথম 'অ-'টি হইতেছে বিবৃত, পবের অ'-টি সংবৃত] এই কথাই বলিতেছে—ব্যাকবণে, প্রাচীন বৈদিক ভাষায় যাহা ছিল 'বিবৃত,' তাহা-ই লৌকিক ভাষায় দাঁডাইযা গিয়াছে 'সংবৃত', পরে বাঙ্গালায় 'বর্তুল' বা rounded।) বাঙ্গালায় 'অ'-এর চলিত উচ্চারণ 'hot'-এর o-র মতো,—আবাব অনেক স্থলে, বিশেষতঃ সমতটে (দক্ষিণবঙ্গে), একেবারে ও-কারের মতো। কত দিন হইল, বাঙ্গালায় এই উচ্চারণ আসিয়াছে? বাঙ্গালায় সংস্কৃত অন্তঃস্থ 'ব' লোপ পাইয়াছে; 'অ'-কারের এই ও-ঘেঁষা উচ্চারণের সঙ্গে অকারান্ত অন্তঃস্থ 'ব'-এর অন্তর্ধানের কোনও সম্বন্ধ আছে কি? এবং বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ 'ব'-এর লোপ কত দিন হইতে হইয়াছে? 'এ'-কারের (= e), অ্যা (= æ) বা অ্যা-কার-ঘেঁষা উচ্চারণই বা কত দিন হইল আসিয়াছে? 'র'-ফলার পূর্বে 'শ'-এর দন্ত্য উচ্চারণ (= s) কত দিনের? বাঙ্গালা উচ্চারণ-পর্য্যায়ে এইরূপ শত শত প্রশ্নের সমাধান হয় নাই, এবং এই সকল বিষয়ের মধ্যেই বাঙ্গালা ব্যাকরণের যাহা কিছু গোলমেলে' বিষয় সব-ই নিহিত আছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব, বাঙ্গালীর পক্ষে ঐ বই ও উঁহার বাঙ্গালা শব্দকোষ গৌরবের

বস্তু। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ লিখিতে গেলে এ বিষয়ে যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হইবে। আজকাল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে,—ভাষা দখলেব জন্য নয়, ভাষাব ইতিহাসের জ্ঞানের জন্য—ইউরোপে ও আমেবিকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায যে সকল ব্যাকরণ লেখা হইতেছে, সেগুলিতে দেখা যায় যে, Morphology বা শব্দ- ও ধাতু-রূপ প্রভৃতি লইয়া যতটা আলোচনা কবা হয, Phonology বা সেই ভাষাব উচ্চারণের ইতিহাস এবং সেই কাবণে তাহাব ব্যাকবণেব পবিবর্তন লইযা তাহার চাইতে কম আলোচনা হয় না। অনেক স্থলে দেখা যায যে, উচ্চারণ-তত্ত্ব লইয়া-ই বেশি মাথা ঘামানো হইয়াছে, ৪০০ পাতার একখানি বইযে হযতো ২৫০ পাতা Phonology লইযা, বাকিটুকু Morphology ও Syntax লইযা। কাবণ, ভাষায় ব্যাকরণের ও পদবিন্যাসের সমস্ত গুপ্ত রহস্য তাহাব উচ্চারণের ইতিহাসের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

বিষযটি বিশেষ জটিল ও দুরূহ, এবং ইহার যথাযোগ্য আলোচনা ও সমাধান শিক্ষা- ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ। ঠিক মতো ধরিতে গেলে আমাদের দেশে তো একটি ভাষা নয়,—রাঢ়, বাগড়ী, বরেন্দ্র, বঙ্গ, চট্টল, সকল স্থানেরই চলিত ভাষা স্ব স্ব প্রধান, উচ্চারণে, ব্যাকরণে স্ব স্ব মতাবলম্বী, ভিন্ন অক্ষবে লেখা হইলে হয়তো ওড়িয়া, মৈথিল, ভোজপুরী, অসমিয়ার মতো ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন ভাষা হইয়া দাঁড়াইত। বাঙ্গালা সাধুভাষার অপভ্রংশে বাঙ্গালা দেশের প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি হয় নাই, বরংচ বাঙ্গালা সাধুভাষার অর্থাৎ আধুনিক গদ্য সাহিত্যের ভাষারই উদ্ভব ইহাদের হইতে। বাঙ্গালা দেশের ভাষার ইতিহাস চর্চা করিতে হইলে এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির ব্যাকরণ আলোচনা করা যত আবশ্যক, ইহাদের উচ্চারণ-রীতিরও আলোচনা সেইরূপ আবশ্যক। বাঙ্গালা উচ্চারণ বদলাইয়াছে; এখনও আমাদের চোখের সামনে আরও বদলাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে এই পরিবর্তন ধরিবার উপায় নাই। বাঙ্গালা অক্ষরগুলি প্রাচীন কালে বাঙ্গালা ভাষার কী কী ধ্বনি জানাইত এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন যুগে সেই সকল ধ্বনি কতটাই বা পরিবর্তিত হইয়া পড়ে, তাহা ভালো করিয়া জানিবার ও বুঝিবার পথ নাই। বৈদিক ও সংস্কৃতের বানান উচ্চারণ অনুযায়ী ছিল, এবং 'প্রাকৃত' ও 'অপভ্রংশ' সম্বন্ধে সে কথা অনেকটা খাটে। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষা বানান বিষয়ে যেন নিরঙ্কুশ; এ বিষয়ে মৈথিল, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা বরাবর বাঙ্গালার চেয়ে সংযত। বৈদিক

ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া, মাগধী অপভ্রংশ পর্য্যন্ত কোনও একটি পদ কেমন করিয়া রূপ বদলাইয়া আসিতেছে, তাহা বেশ ধরিতে পারা যায় ; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সেই পদটির 'খাঁটি বাঙ্গালী ভাবে' যে গতি চলিল, তাহা ভালো করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সেই পদটির ইতিহাস পর্য্যালোচনা আবশ্যক। যেমন 'লক্ষ্মী' এই পদটি ; প্রাকৃত হইয়া যাইবার পূর্ব অবস্থায় ইহার উচ্চাবণ ছিল 'ল-কৃষ্‌মী', মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত ভাষাগুলির মধ্যে এক আধুনিক বাঙ্গালায় 'লোক্‌খি', এইরূপ 'ম'-কারহীন রূপ পাই, অসমিয়াতে 'লখিমী' মৈথিলে 'লখিমী', ওড়িয়াতেও ম-কার আছে। বাঙ্গালায় এই 'ম'-এর লোপ কত দিন হইল হইয়াছে ?[৩] পুরাতন বাঙ্গালা বইয়ে 'লখিন্দর', 'লখাই' নাম দেখিয়া বুঝা যায় যে, পুঁথি লেখার কালে আজ-কালের মতো 'ম'-লুপ্ত উচ্চারণই ছিল। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালায় কোন্ সময়ে অসমিয়া ও মৈথিলের মতো এই 'ম' চলিত ছিল ? ইহার উত্তর বাঙ্গালার পুরাতন পুথিতে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাইরের কাহারও সাক্ষ্য এ বিষয়ে বডোই কাজ দিবে, সকল সন্দেহ দূর করিবে। ফার্সী বইয়ে এই প্রাচীন যুগের দুই চারিটি নাম লেখার ধরন হইতে এই সাক্ষ্য আমরা পাইতে পারি। 'তবকৎ-ই-নাসিরী'র মতো প্রাচীন ফার্সী ইতিহাসে যখন رای لکھمنیه 'রায় লখ্‌মনিয়হ্' এইরূপ বানানে লাক্ষ্মণেয় সেনের নাম পাই, তখন আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পাবি যে, খ্রীষ্টীয় তেরর শতে বাঙ্গালা ভাষায় 'ক্ষ্ম'-এর 'ম' একেবারে লোপ পায় নাই। আবার لکھنوتی লখনৱতী বানান দেখিয়া বোঝা যায় যে, 'ম' এই যুগে সব জায়গায় উচ্চারিত হইত না ; ইহার লোপ এই যুগে আরম্ভ হইয়াছিল, ধরিয়া লইতে পারা যায়। আবার এই لکھنوتی লখনৱতী, دیو کوت দেৱকোট, نودیه নৱদীঅহ্ বা نودیه নোৱদীঅহ্ (ইংরেজরা আধুনিক ফার্সী উচ্চারণ ধরিয়া লেখেন Nūdiah অর্থাৎ 'নূদিঅহ্') প্রভৃতি বানানে জানা যায় যে, তখন বাঙ্গালা দেশ হইতে অন্তঃস্থ ৱ

৩ এরূপ যুক্ত বর্ণে বাঙ্গালায় 'ম' লোপ পায় এবং অনেক স্থলে অনুনাসিক হইয়া যায়। প্রাকৃতে 'ম' লোপ পায় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বিপ্রকর্ষণ হয়, যেমন 'স্ম'—'স্মরণ = সরণ, সুমরণ'। বাঙ্গালায় লোপ-ই স্বাভাবিক, তবে সাধাবণতঃ নূতন করিয়া আমদানি পণ্ডিতি শব্দের প্রভাবের ফলে চন্দ্রবিন্দু করিয়াই পড়া হয়। 'পদ্ম' = পদ্দো, পদ্দোঁ, 'সূক্ষ্ম' = সুখুম, (আধুনিক) শুক্‌খঁ'। প্রাকৃত উচ্চারণের সঙ্গে পণ্ডিতি বানানের একটা আপস হইয়াছে। ভাষার ইতিহাসের পক্ষে এই আপসটুকুরও বিচার আবশ্যক।

নির্বাসিত হয় নাই, এখন যাহা 'লখ্‌নাবতী' বা 'লক্‌থনাবতী' 'দেবকোট' ও 'নদীয়া' উচ্চারিত হয়, তখন সেগুলির উচ্চারণে মুসলমান বিজেতাদের কানে ব-এর ধ্বনি আসিত, তাই তাঁহারা ফার্সী و (= w, v) অক্ষর দিয়া লিখিয়াছেন।[৪]

এইরূপ দুই চারিটি কথা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এদেশী শব্দের ফার্সী বানান পুরানো উচ্চারণ ধরিবার জন্য কতকটা সাহায্য করে। এইরকম বিষয়ে যেখানে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা বইয়েব সাহায্যে মীমাংসা হওয়া শক্ত, সেখানে যদি বিদেশী বর্ণমালার সাহায্য পাই, তবে বড়ো কাজের হয়। ভিন্ন ধরনে তৈরী ফার্সী কি আর কোনও বিদেশী বর্ণমালার অক্ষরে, বাঙ্গালা শব্দের তখনকার চলিত উচ্চারণ ধরিয়া লেখা রূপ যদি পাই, তাহা হইলে এ সকল সন্দেহের অনেকটা খণ্ডন হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আবার সেই কালে সেই বিদেশী ভাষার অক্ষরগুলির কী ধ্বনি (sound) ছিল, তাহা জানা দরকার। ঈরান দেশের ফার্সীতে আজকাল 'এ' 'ও', অর্থাৎ যাহাকে 'মজ্‌হূল্‌' উচ্চারণ বলে, তাহা অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তাহার স্থানে 'ঈ' 'ঊ' ('ম' 'রূফ়্‌', উচ্চারণ) চলে; 'আ' সাধারণতঃ 'আও', 'আউ' বা 'উ'-রূপে উচ্চারিত হয়; ব (w) সর্বত্র v হইয়া গিয়াছে। ফার্সী চার পাঁচ শ' বছর আগে কেমন করিয়া পড়া হইত, সে দিকে নজর না রাখিয়া বাঙ্গালা কথার ফার্সী রূপ আলোচনা করিলে কোনও ফল হইবে না। মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয় যে সকল আরবী (ফার্সী) অক্ষরে লেখা বাঙ্গালা পুঁথির কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি যদি খুব পুরাতন হয়, তাহা হইলে সেগুলি বড়োই উপকারে লাগিবে। কিন্তু আরবী লিপির অসম্পূর্ণতা অনেক, ইহাতে স্বরবর্ণ ভালো করিয়া জানাইবার বন্দোবস্ত নাই, অনেক সময়ে স্বরবর্ণের রেওয়াজ থাকেই না, আন্দাজে আন্দাজে বুঝিতে হয়। এ বিষয়ে রোমান অক্ষরগুলি জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, আমাদের দেশী বর্ণমালার

৪ এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। মুসলমান যুগের বাঙ্গালার ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত থাকার দরুন ইঁহাকে পুরানো ফার্সী পুঁথি দেখিতে হইতেছে। ফার্সী বইয়ে যে সকল এদেশী নাম পাওয়া যায়, সেগুলির যথার্থ আদিম ফার্সী রূপ আমরা পাই কি না, সে বিষয়ে রাখাল বাবু বিশেষ সন্দিহান। পুরানো ফার্সী 'তোঘ্‌রা' ছাঁদে লিখিত হইত, বিশেষতঃ নামগুলি, এবং পুঁথি নকল করিবার সময় নকলনবীশেরা অনেক সময়ে বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বসিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়টি ধরিলেও, অল্পস্বল্প সে সাহায্য ফার্সী বই হইতে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের উপেক্ষণীয় নহে।

চাইতেও; কারণ, রোমান লিপিতে শব্দের প্রাণ স্বরবর্ণগুলি স্পষ্ট ও পৃথক্ করিয়া লেখা হয়, ব্যঞ্জনবর্ণের পায়ের তলায়, পাশে, মাথায়, গায়ে লুকাইয়া থাকে না। এখন, রোমান অক্ষর ব্যবহার করেন, এমন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও ব্যবসায়ী মার্কো পোলোর সময় হইতে এ দেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এশিয়ার ও অন্যান্য মহাদেশের যেখানে যেখানে তাঁহাদের গতিবিধি হইত, তাঁহারা সেখানকার সম্বন্ধে বই লিখিয়া, নক্শা আঁকিয়া নিজেদের দেশের লোকের জ্ঞান বাড়াইতে চেষ্টা করিতেন। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বইয়ে এবং খ্রীষ্টীয় সতেরর শতে ভারতবর্ষের যে কতকগুলি ম্যাপ্ ইতালি ও হলাণ্ডে ছাপা হইয়াছিল তাহাতে এ দেশী নাম যাহা পাওয়া যায়, তাহাও আমাদের কাজে আসিবে।[৫] রোমান অক্ষরে লেখা প্রাচীন বাঙ্গালার কোনও বই যদি আমরা পাই এবং সেই বইয়ে যদি বাঙ্গালা উচ্চারণের—বাঙ্গালা বানানের নয়,—একটা মোটামুটি অনুকরণের চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইখানি ঠিক এই প্রকারের; তবে ইহা খুব বেশি পুরাতন নয়। খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪ সাল, এখন হইতে ১৮২ এক শ' বিরাশী বছর, মোটামুটি ইহাকে শ' দুই বছরের আগেকার সময়ের ভাষার নমুনা হিসাবে ধরিতে পারা যায়। বইখানির মুখপত্র নাই; পোর্তুগীস ভাষায় একটি ছোটো ভূমিকা আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, বইখানি ভাওয়ালে (Ba-[va]l) লেখা হইয়াছিল। ভাওয়ালের কাছে 'নাগরী'[৬] বলিয়া একটি জায়গার বিষয় উল্লেখ আছে।

৫ গ্রীকদের যুগে যখন ভারতীয় নাম গ্রীক ও লাতীন লেখকেরা লিখিতেন, তখনকার সেই বিদেশী রূপ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ভারতে তখন চ-বর্গীয় বর্ণগুলির দুই রকম উচ্চারণ ছিল। এ বিষয়ে কতকগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণকার যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় নামের গ্রীক বানানে সে কথা কতকটা সমর্থিত হয়। গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রবন্ধ The Pronunciation of the Prakrit Palatals. JRAS, 1913, ৩৯ পৃষ্ঠা ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ লিখিত প্রবন্ধ ('চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ'—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২০, তৃতীয় সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

৬ এই 'নাগরী' সম্বন্ধে কলিকাতা, ধর্মতলা ষ্ট্রীটের রোমান কাথলিক গির্জার পাত্রী ওঅটর্স্ সাহেব (the Rev Father L. Wauters, S. J.) আমায় বলিয়াছেন যে, নাগরী ভাওয়ালের ১৭।১৮ মাইল দূরের একটি জায়গা, সেখানে একটি পুরাতন গির্জা আছে ও ঐ স্থান এ দেশে কাথলিক খ্রীষ্টানদের একটি পুরাতন কেন্দ্র ছিল।

সুশীল বাবু বইযের যে অংশটুকু পত্রিকায় তুলিয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কথা পাওয়া যাইবে। বইখানিতে পোর্তুগীস ভাষায রচিত একটি গুরু-শিষ্যের আলাপ অর্থাৎ খ্রীষ্টানধর্ম ও অনুষ্ঠান-বিষযক প্রশ্নোত্তরমালা ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ আছে। অনুবাদক পাদ্রী আস্‌সুম্প্‌সাওঁ ঢাকা অঞ্চলের চলিত ভাষা অবলম্বন করিয়া লিখিযাছেন, তাঁহাব ভাষা পূর্ববঙ্গে দুই শ' বৎসর পূর্বে চলিত ভাষার সুন্দব নিদর্শন। উচ্চারণে, ব্যাকরণে, কথার ঢঙে এ ভাষা একেবারে পূর্ববঙ্গেব, এবং বইখানি বাঙ্গালা উচ্চাবণের আলোচনাব পক্ষে সহায়ক বলিয়া অমূল্য।

বাঙ্গালা কথাগুলি পোর্তুগীস রীতি অনুসারে লেখা হইয়াছে। পোর্তুগীস উচ্চারণ ও বানানেব নিযম ইংবেজি হইতে অনেকটা আলাদা, সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। পোর্তুগালেব বাজধানী লিস্‌বনের আধুনিক উচ্চারণ পাইযাছি, দু শ' বছর আগেকার উচ্চাবণটি সব জায়গায ঠিক কেমন ছিল, জানিতে পাবি নাই, তবে একটু আধটু তফাৎ হইলেও মূলে আজকালকার মতোই ছিল, ধরিযা লইতে পারা যায। এই দুশ' বছরে উচ্চারণ বিষযে এক ইংরেজি ও ফবাসিব যা কিছু বিশেষ পবিবর্তন ঘটিয়াছে, ইউরোপের অন্য ভাষাগুলি এ বিষযে বেশ বক্ষণশীল।

১। a, e, i, o, u—accent বা ঝোঁক দিয়া উচ্চারিত হইলে, যথাক্রমে—আ, এ, ই, ও, উ।

২। a, e, o—মৃদু উচ্চারিত হইলে যথাক্রমে 'অ্যা' (অর্থাৎ ইংরেজি 'her'-এর e-র মতো), ই, উ। যেমন chuva = chúva = শু—ভ্য (বৃষ্টি), padre = পাদ্রি (পাদ্রি), vento = ভে.ন্তু (বাতাস), amamos = অ্যা-ম্যা-মুশ্‌ (ভালোবাসি), amámos = অ্যা—মা-মুশ্‌ (ভালবাসিযাছি), desejóso = দি-জি-ঝো—জ. (ইচ্ছুক)।

৩। ai = আই, ahe ((পদান্তস্থ) = আই, ei = এই, eu = এউ, ou = ওউ, উ, oi = ওই, ao (পদান্তস্থিত) = আউ: pão = পাঁউ (রুটী)।

৪। ca, co, cu = কা, কো, কু, ce, ci = সে, সি (s), ç = স (s)।

৫। ch = শ, ষ (লিসবনের ভাষায়)। প্রাচীন উচ্চারণ ছিল 'চ'[৭], এই উচ্চারণ উত্তর পোর্তুগালের ত্রাস্‌-ওশ্‌-মন্তিশ্‌ (Tras-os-montes) প্রদেশে

৭ F. Diez—Grammaire des Langues romanes, Vol I. পৃঃ ৩২৮।

এখনও প্রচল আছে। ২০০ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ যখন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' লেখা হইয়াছিল, তখন 'চ' ছিল, কি 'শ' হইয়া গিয়াছিল, জানিতে পারি নাই; তবে বাঙ্গালা 'চ' জানাইবার জন্য ch-এর যেমন প্রয়োগ দেখা যায়, s-ও তেমনি পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে তালব্য ও দন্ত্য উচ্চারণ দুই-ই বোধ হয় তখন চলিত ছিল এবং হয়তো তখনও দন্ত্য ts- বা s-জাতীয় উচ্চারণ তালব্য 'চ'কে একেবারে অপ্রচলন করিতে পারে নাই। এই সময়ে ch-এর উচ্চারণ 'চ'-ই ছিল ধরিয়া লইতে পারা যায়।

৬। d = দ; f = ফ. (= ফার্সী ف)।

৭। ga, go, gu = গ; gue, gui = গে, গি; gua, guo = গ্‌বা, গ্‌বো।
ge, gi = ঝে., ঝি. = ফরাসি j, ইংরেজি zh বা ফার্সী ژ।

৮। h প্রায় সর্বত্রই অনুচ্চারিত।

৯। j ফরাসির মতো = ঝ, zh,—z নয়। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে', বাঙ্গালা জ—z, ইংরেজির মতো j এর ব্যবহার নাই।

১০। বিদেশী শব্দ ভিন্ন অন্যত্র k-এর ব্যবহার নাই।

১১। l = ল; lh = ল্য, কতকটা ল-এর মতো; = স্পেনীয় ll, ইতালীয় gl.

১২। m = ম, যখন পদের আগে বা দুইটি স্বরের মাঝে থাকে। পদান্তস্থিত m = ঁ; bom = বোঁ (ভালো), um = উঁ (এক)।

১৩। n = ন, ইহার প্রয়োগ m-এর মতো, তবে পদান্তস্থিত n, যখন অনুনাসিক উচ্চারিত হয়, তখন ইহার রূপ ~ হইয়া যায়, ও চন্দ্রবিন্দুর মতো এই চিহ্ন স্বরের মাথায় বসে। ~ চিহ্নের পোর্তুগীস নাম 'তিল্' (til)। যেমন cão (= cano) = কাউঁ (কুকুর), Camoẽs (Camoens) কামোইঁশ্ (পোর্তুগালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির নাম)। pão = পাউঁ (অর্থে রুটি, বাঙ্গালায় পাউরুটি); botão = বোতাউঁ = বোতাঙ, বোতাম [ইংরেজি button 'ব্যা-ট্‌ন্' হইতে বাঙ্গালা শব্দ আসে নাই]। nh = ঞ, স্পেনীয় ñ, ইতালীয় ও ফরাসি gn; senhor = সেঞোর (মহাশয়)।

১৪। p = প।

১৫। q = ক; qua, quo = ক্বা, ক্বো; que, qui = কে, কি।

১৬। r = র (বাঙ্গালার মতো, ইংরেজির মতো ড়-ঘেঁষা 'র' নহে)।

১৭। s = স; দুই স্বরের মধ্যে থাকিলে জ় (z)-এর মতো উচ্চারিত হয়। পদান্তস্থিত ও অক্ষরের (সিলেব্‌লের) শেষে s 'শ', এবং এই অবস্থায় ঘোষবর্ণ

(b, d, g) ও m-এর পূর্বে থাকিলে ঝ. (zh)-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন gostos = গোশ্‌তুশ্‌ (সুখ), esta = এশ্‌তা (আছে), pasmo = পাঝ্‌.মু (আশ্চর্য্য); dezde = দেঝ্‌.দি (তৎপর)।

১৮। t = ত ('ট' নহে), v = ভ., ব (ওঅ), w নাই।

১৯। x = সাধারণতঃ শ, কিন্তু ক্স্‌, স (s), জ (z) উচ্চারণও দেখা যায়।

২০। y বিরল, যেখানে মিলে, সেখানে = ই।

২১। z = জ, কিন্তু luz = লুশ্‌ (আলো), cruz = ক্রুশ্‌।

এই বইতে রোমান অক্ষরে উপরে লেখা উচ্চারণ-মতো বাঙ্গালা লেখা হইয়াছে। এখনও গোয়াতে ওই রকমের বানানে রোমান হরফে কোঙ্কণী ভাষা লেখে। এই ভাষায় ইহাদের খবরের কাগজ প্রভৃতিও বাহির হয়।

বাঙ্গালা বর্ণমালার অক্ষরগুলি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' এইরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে। এই বানানের নিয়ম বেশ বাঁধা-বাঁধিব সঙ্গে সব জায়গায় পালিত হইয়াছে।

স্বরবর্ণ

১। অ। (ক) অ = প্রায় সর্বত্রই o: যেমন debota (দেবতা), proloe (প্রলয়), orth (অর্থ), xotontro (স্বতন্ত্র, 'শতন্ত্র'), odibax (অধিবাস), poromexor (পরমেশ্বব)। ইহার কিছু কাল পূর্ব ইউরোপে প্রকাশিত বাঙ্গালার ম্যাপে—Sirote (সিরটে = শ্রীহট্ট), Sornagam (স্বর্ণগ্রাম), Cospetir (গজপতি), Gouro (গৌড), Mog-en (= মগ-দেশ) প্রভৃতি নাম দেখিয়া জানা যায় যে, বাঙ্গালা 'অ' ২৫০ বছর আগেও ইউরোপীয়দের কানে 'o'-র মতো লাগিত। কিন্তু বাঙ্গালা 'অ'-কারের এই o-ব মতো উচ্চাবণ আরও পূর্বে ছিল; পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথিতে 'ও'-কার 'আ'-কারের অদল-বদল দেখা যায়।

অ-কারের 'অ' উচ্চারণ এ দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে এক গোয়ানীজেই দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয়। যেমন গোয়ানীজ sorop = সরপ (সর্প), chicol (চিকল, প্রাকৃতে 'চিখিল্ল') = পাঁক; udoc = উদক = জল, vinot = বিনতি, patoc = পাতক।

(খ) কিন্তু দুই চার জায়গায় 'অ'-র প্রতিরূপ a-ও পাওয়া যায়; এরূপ উদাহরণ কিন্তু খুব বিরল; habilax (অভিলাষ), naroq (নরক), ziantá, zianta (জীয়ন্ত), raqhia (রক্ষা), tomara (তোমরা), laxcor (লস্কর)।

(গ) আবার পূর্ববঙ্গসুলভ 'অ'-কারের স্থানে 'উ'-কারের প্রয়োগও দুএক স্থানে পাওয়া যায়; অ-কার হইতে ও কার, এবং ও-কার হইতে উ। xuhor (শুহর = শহর); bidhuba (বিধুবা = বিধবা); puxu (= পশু); munixie (মুনিষ্যিয়ে = মনুষ্যে; 'মুনিস' পশ্চিমবঙ্গে আছে বটে, কিন্তু এখানে এই কথাটি কলিকাতার 'মনিষ্যি'র রূপভেদ); xubhaie xubhai que doea core (সুভায়ে সুভাইকে দয়া করে = সবাই সবাইকে দয়া করে)। এ স্থলে পূর্ববঙ্গের 'মুশয়', বঙ্গের অন্যত্র 'মোশাই, মশাই, মশায়', বুন্ = বহিন্, বইন্, বোন্ প্রভৃতি পদ তুলিত হইতে পারে। [সংস্কৃত বক্ষঃ = চলিত বাঙ্গালা 'বুক'; হলদ—হলুদ; 'আগণি' হইতে 'আগুন', 'ছাঅনী' হইতে 'ছাউনী' 'গণ' 'হইতে' 'গুলা' প্রভৃতি অনেক কথায় 'অ'-স্থানে আধুনিক বাঙ্গালায় 'উ' পাওয়া যায়]। 'ও'-কার দ্রষ্টব্য।

(ঘ) দুই চারি স্থলে যুক্তবর্ণের পর বাঙ্গালায় যেখানে অকার উচ্চারিত হয়, তাহা নির্দেশ করা হয় নাই; orth (অর্থ), xingh (সিংহ)।

২। **আ** = a, পদের অন্তে অনেক স্থলে `a; bhat ( ভাত ), capor ( কাপড় ), noiracar ( নৈরাকার, নিরাকার ), paibe (পাইবে), taron`a (তাড়না), coril`a ( করিলা ), doe`a (দয়া), doth`a (কথা), buzhil`am (বুঝিলাম)। এই মাত্রা (accent) চিহ্ন দেওয়া `a লিখিবার কারণ পোর্তুগীস বানান (২)-এর সূত্রে পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে।

৩। **ই, ঈ**। (ক) i : bocti (= ভক্তি), bettibar (ভেটিবার), xidhi (সিদ্ধি), bari (বাড়ী)। দুই এক জায়গায় কথার শেষে í পাওয়া যায়—deqhí (দেখি) ইত্যাদি।

(খ) e, é; খুব কম। (পোর্তুগীস উচ্চারণ (২) দ্রষ্টব্য)। padre (পাদ্রি), ehate (ইহাতে)।

(গ) tthay (ঠাই)—এই শব্দে ই = y।

৪। **উ, ঊ**। (ক) = u : buzhila (বুঝিলা), crux (ক্রুশ), rup (রূপ), nirupon (নিরূপণ), du (দু)।

(খ) = o (পোর্তুগীস উচ্চারণ (২) অনুসারে): tomi (তুমি), xori, chori (চুরি, চোরী ?), boicontte (বৈকুণ্ঠে), gopto (গুপ্ত), bhoq (ভুখ), xoibar (শুইবার), xonia (শুনিয়া), boxto (বস্তু), xonilam (শুনিলাম), xondor (সুন্দর; কলিকাতায় ছোটো ছেলেরা 'শোন্দোর্' বলে)।

৫। **ঋ**। বাঙ্গালায় অক্ষরটির নাম 'রি' হইলেও ইহার নানা উচ্চারণ

আছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' ঋ-স্থানে re, ri, er, ir, or, ro এবং e— এতগুলি পাওয়া যায়। পাদ্রী সাহেব যে বাঙ্গালার উচ্চারণ কানে যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনি লিখিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। crepa (কৃপা), obretha (অবৃথা = বৃথা), ('ব্রেত' বানানের মতো), xrixtti (সৃষ্টি), omerto (অমৃত—কলিকাতায় 'অমের্তো' শুনা যায়), birdho (বৃদ্ধ), ghirna (ঘৃণা—ঘিরনা হইতে ঘিন্না, কলিকাতায় 'ঘেন্না') mirtica (মৃত্তিকা) porthibi (পৃথিবী), prothoqhie ('প্রথক্যে'—পৃথকে; 'প্রথক্যে' ১৮০০ সালের বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা বাইবেলে আছে); tetio (তৃতীয়)। গোয়ানীজে 'ঋ'-র জন্য ur, ru ব্যবহার করে, ইহা মারাঠী উচ্চারণের অনুরূপ—curpa (কৃপা), druxtti (দৃষ্টি)।

৬। এ = e, é, ẻ (মাত্রা দেওয়া) ব্যবহারের কারণ পোর্তুগীস উচ্চারণ (২) দ্রষ্টব্য। পোর্তুগীসে e = এ, এবং কতকটা 'অ্যা'-ঘেঁষা এ, ঠিক 'অ্যা' নয়—দুই-ই আছে। বাঙ্গালায় 'এ'-কারের তিন প্রকার ধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু এই বইতে কোনও পার্থক্য করিবার চেষ্টা হয় নাই। zeno (যেন), etobar (এতবার), xorirer (শরীরের), cale (কালে), ebong (এবং), ehi (এই), lengra (লেঙ্গড়া)। বাঁকা 'এ'-র উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত ভাবে জানিবার উপায় নাই; তবে বাঁকা 'এ' ছিল, যেমন beca (বেঁকা = ব্যাঁকা = বাঁকা)। 'খেদাইয়া' লিখিবার জন্য এক স্থানে cadaia লেখা হইয়াছে; এখানে বোধ হয়, বাঁকা 'এ' a দ্বারা জানানো হইয়াছে।

৭। ঐ = oi: boicontte (বৈকুণ্ঠে), noiracar (নৈরাকার), hoilo (হৈল, হইল)।

৮। ও। (ক) = o, ó: ghoxanio (গোসাঞি), xonó (শোনো), golam (গোলাম), tomare (তোমারে), ইত্যাদি।

(খ) = u: 'অ'-কার দ্রষ্টব্য; nuq dia cazuaite (নুক [নখ] দিয়া খাজোয়াইতে) (খাওজাইতে = চুলকাইতে); xudhon (শোধন), zut (জ্যোৎ, জ্যোতি), xuag (সোহাগ), muta (মোটা)। ও-কারের স্থলে 'উ' বাঙ্গালা পুঁথিতেও পাওয়া যায়।

৯। ঔ = ou: houq (হৌক), choudo (চৌদ্দ); choqui (চৌকী—এই শব্দে ঔ = o; হয়তো তখন 'চোকী' বলিত)।

ব্যঞ্জনবর্ণ

১০। ক। পদের আদিতে ও মধ্যে 'আ'-কার, 'ও'-কার, 'উ'-কারের পূর্বে থাকিলে ক = c ; অন্তে থাকিলে q ; que, qui = কে, কি। k নাই। এক Christ, Christiaõ (ক্রিস্তাঙ, ক্রিস্তান) শব্দে 'ক'-এর স্থানে ch-এর ব্যবহার ; এটি লাতীন বানানের অনুকরণে। crepa (কৃপা), coina (কন্না, কন্যা), xocol (সকল), tthacur (ঠাকুর), cotha (কথা) ; houq (হৌক্), eq (এক), noroq (নরক), thacuq (থাকুক্) ; queno (কেন), thaquia (থাকিয়া)। ohonqhar (অহঙ্কার) ; buq (বুক), কিন্তু buqhe (বুকে), দুই এক স্থলে এইরূপ ক = qh-ও দেখা যায় ; 'বুখে' উচ্চারণ হইত কি ? অর্থাৎ বক্ষঃ (বৃক্ষস্) শব্দের প্রাকৃত রূপ (বক্‌খ) তখন পুরাপুরি বাঙ্গালা (বুক) হইয়া যায় নাই কি ?[৮] 'ক'-স্থানে 'গ' এই এক জায়গায় মেলে ; pag-porox (পাগ পরশ = পাকস্পর্শ)। পূর্ববঙ্গের 'হগল' (সকল), ও বাঙ্গালা 'কাগ', 'বগ' তুলনীয়।

১১। খ = qh : zoqhon (যখন), qhoda (খোদা), qhaibar (খাইবার), xeqhane (সেখানে)। দুই এক স্থানে c, q : coraq (খোরাক), calax (খালাস), cadaia (খেদাইয়া), cazuaite (খাজোয়াইতে, খাওজাইতে), racoal, roqoal, আবার raqhoal, rahoal (রাখোয়াল— 'রাখাল' শব্দের পুরানো রূপ) ; rahoal বানান পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালায় দুই স্বরের মধ্যস্থিত 'ক' বা 'খ'-এর 'হ'-এর মতো উচ্চারণের অনুসারে।

১২। গ = g, কথার আগে ; gu—'এ'-কার ও 'ই'-কারের আগে, এবং কদাচিৎ gh। guru (গুরু), golam (গোলাম), onugroho (অনুগ্রহ), goroz (গরজ) ; guelen (গেলেন), amardiguere (আমারদিগেরে), xorgue (স্বর্গে), xongue (সঙ্গে), aghe (আগে), ghoxanio (গোসাঞি)।

১৩। ঘ = gh ; ক্বচিৎ g ; gouchauq (ঘুচাউক্), ghirna (ঘৃণা), ghor (ঘর) ; gori (ঘড়ি)।

৮ সংস্কৃত 'বক্ষঃ' প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালাতে 'বুক' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, এই অনুমান ঠিক নহে। বাঙ্গালা 'বুক'-এর উদ্ভব হইয়াছে সংস্কৃত 'বৃক্ক' হইতে (প্রাকৃতে 'বুক্ক')। মূলে ইহাতে Kidney বুঝাইত, বাঙ্গালাতে রূপান্তরের সঙ্গে অর্থান্তরও ঘটিয়াছে।

১৪। ঙ—ng ; (ঙ=ঙ্গ); ngh ; ngu ; xingh (সিংহ), angul (আঙ্গুল), gori tauguibar (ঘড়ি টাঙ্গিবার=টাঙ্গাইবার)। ওঅটস্ সাহেবের কাছে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইয়ে cristiaõ (=ক্রিস্তান) শব্দটি বাঙ্গালা হরফে 'কৃস্তাঙ' ছাপা দেখিয়াছি। o=ওঁ=ঙ ; পুরানো বাঙ্গালায় 'ঙ'-র উচ্চারণ 'ঁব' (=ওঁঅ, উঁঅ) ছিল।

১৫। চ। (ক)=ch : uchit (উচিত), cholo (চল), totacho (তথাচ), ghuchilo (ঘুচিল), prachit (প্রাচিৎ=প্রায়শ্চিত্ত), chinia (চিনিয়া)।

(খ) s : sinio (চিহ্ন, 'চিন্ন'), sair (চাইর=চারি, chairও পাওয়া যায়), xansa (সাঁচা), panse (পাঁচে), setona (চেতনা), sinta (চিন্তা)।

(গ) x (অর্থাৎ 'শ' : দুই এক জায়গায় মাত্র, অতি বিরল। xacri (চাকরি), xori (চুরি), banxilo (বাঁচিল)।

পূর্ববঙ্গে 'চ'-কারের উচ্চারণ ২০০ বছর আগে কী ছিল—তালব্য অর্থাৎ ইংরেজি ch-র মতো, না দন্ত্য অর্থাৎ ts-এর মতো, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। দুই উপায়ে 'চ' নির্দেশের চেষ্টা হইতে বুঝা যায় যে, দুই উচ্চারণ-ই ছিল, তবে পোর্তুগীসে ch-এর উচ্চারণ এই সময়ে কী ছিল, তাহা জানিতে পারিলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইত। s অপেক্ষা ch-এর প্রয়োগ বেশি দেখা যায়, আবার এক-ই কথা (যেমন 'চার') ch, s দুই দিয়াই লেখা পাওয়া যায়। 'চ'-এর জন্য x বোধ হয় ভুল করিয়া s-এর বদলে লেখা হইয়াছিল। ফার্সী چاٹگام 'চাত্গাম্' (চাটগাঁ), چاندرای 'চান্দ্রায়' প্রভৃতি বানানে পূর্ববঙ্গের নামে আর্থাৎ তালব্য 'চ'-ই পাওয়া যায়।

১৬। ছ=s, ss, সর্বত্রই। পশ্চিমবঙ্গেও এই উচ্চারণ পাওয়া যায়, তবে সাধারণ নহে। হিন্দী শব্দের স s) জানাইবার জন্য পুরানো বাঙ্গালায়ও 'ছ' ব্যবহার হইত ; 'ঐছন', 'জৈছন', 'আল্গোছে' প্রভৃতি পদ দেখিয়া হইা বুঝা যায়। কিন্তু musalman এই পদের বাঙ্গালা রূপ 'মোছলমান' লেখার ফলে, কলিকাতা অঞ্চলে 'ছ'-এর s উচ্চারণ-রীতি প্রবল না থাকায়, 'মোচোরমান্' এইরূপ শুনা যায়, ইহাকে 'সাধু' করিবার চেষ্টায় 'মুষল্-মান্'। saoal (ছাওয়াল), saria (ছাড়িয়া), assilo (আছিল), paiassilo (পাইয়াছিল), soee (ছয়ে), asse (আছে), casse (কাছে), bossor (বছর), xoiasso (সহিয়াছ)। কথার আদিতে s, মধ্যে ss।

১৭। চ্ছ = ch, cch, icha iccha (ইচ্ছা)। 'ছ'-এর দন্ত্য উচ্চারণ কখনও হয় না। শ্রীযুক্ত মদনমোহন চৌধুরী, বি-এল মহাশয় পুরুলিয়া হইতে যে বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত বাঙ্গালা অক্ষরে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে হিন্দী ছ পাছে বাঙ্গালায় s হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে তিনি 'চ্ছ' ছাপাইয়াছেন।

১৮। জ, য = z : zaoa (যাওয়া), zigguiaxa (জিজ্ঞাসা), xurzier zut (সূর্য্যের জুৎ = জ্যোতি), carzio (কার্য্য), axchorzio (আশ্চর্য্য), zorom (জরম = জন্ম)। পোর্তুগীসে 'জ' ছিল না, j-র ধ্বনি ছিল zh, এই জন্য কখনও j দিয়া 'জ' জানানো হয় নাই। কেবল পোর্তুগীস নাম João (ঝো.াআউ = যোহন্‌, জন্‌) বাঙ্গালা অংশে j দিয়া লিখিত হইয়াছে।

১৯। ঝ = zh : buzhan (বুঝান)।

২০। ঞ = খুব কম, ni-, nio দ্বারা জানানো হইয়াছে, ghoxanio (গোসাঞি)।

২১। ট = tt, t, বোধ হয়, যেখানে লেখক অনবধান হইয়াছিলেন, সেইখানেই কেবল একটি t লিখিয়াছেন। গোয়ানীজ ভাষায়ও সর্বত্রই ট = tt, তদ্রূপ ড = dd। drixtti (দৃষ্টি), bettibar (ভেটিবার), chattilo (চাটিল), noxtto (নষ্ট), muta (মোটা), tanguibar (টাঙ্গিবার = টাঙ্গাইবার)।

২২। ঠ = tth, tthacur (ঠাকুর), tthay (ঠাঁই), utthibar (উঠিবার)। 'ঠ' বেশি পাওয়া যায় না।

২৩। ড = dd ; ddaquite (ডাকিতে), ddacait (ডাকাইত), monddob (মণ্ডব, মণ্ডপ)।

২৪। ঢ পাই নাই ; ণ-এর বাঙ্গালায় বর্ণমালা ছাড়া অন্যত্র অস্তিত্বই নাই। যেখানে বানানে আছে, সেখানে রোমান অক্ষরে n দ্বারা দেখানো হইয়াছে। ইউরোপে আজকাল মূর্ধন্য বর্ণগুলি ফুটকি দেওয়া অক্ষরের সাহায্যে লেখা হয়; ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ, ṣ।

২৫। ত = t, hoite (হৈতে, হইতে), proti (প্রতি), tini (তিনি), hat (হাত), কচিৎ বোধ হয় ভুলক্রমে tt লেখা হইয়াছে।

২৬। থ = th, t ; এবং tt : axtha (আস্থা), thaquilen (থাকিলেন), zothartho (যথার্থ), ath (হাথ, হাত) ; totacho (তথাচ), onat (অনাথ) ; axtta (আস্থা)।

২৭। দ = d, dunia (দুনিয়া), drixtti (দৃষ্টি), amardiguer (আমারদিগের), কিন্তু xadha phul (সাদা ফুল), monddo (মন্দ)—এইরূপ দুই এক স্থানে dh ও dd লেখা হইয়াছে, বোধ হয় অনবধানতার জন্য।

২৮। ধ = dh, d, bidhuba (বিধবা), xudhon (শোধন), xudhu (শুধু), moidhe (মধ্যে, ম'ধ্যে), badit (বাধিত), xondhe (সন্ধে, 'ন্দ'-এর সঙ্গে 'হ'-যোগে—তুং বিভা = বিবাহ), odibax (অধিবাস)।

২৯। দ্ধ = dh, d, xidhi (সিদ্ধি), xudha (শুদ্ধা), moidhe (= মদ্ধে, ম'দ্ধে)।

৩০। ন = n, সর্বত্র। Nagori (নাগরী), sinta (চিন্তা), setona (চেতনা)।

৩১। প = p, proti (প্রতি), zope (জপে), কিন্তু ophrad, oprad (অপরাধ), দুই-ই পাওয়া যায়, এবং 'মণ্ডপ' স্থলে monddob।

৩২। ফ = ph, nophor (নফর), phol (ফল)। 'ফ'কে f দিয়া কোথাও জানানো হয় নাই। আজকাল কিন্তু বাঙ্গালায় ফ (ph)-এর f উচ্চারণ খুব শোনা যায়, এবং তাই Fani, Profullo, Fotik প্রভৃতি বানান অনেকে লেখেন। এই বইয়ে কেবল দুই একটি বিদেশী নামে f পাইয়াছি, যেমন Francisco।

৩৩। ব = b, ক্বচিৎ bh, bine (বিনে), dibà (দিবা), bhanaite (বানাইতে), xorbo (সর্ব), xubhaie (সবাইয়ে—পুরানো বাঙ্গালায় 'সভে'), bibhao (বিবাহ, 'বিভাও')।

৩৪। ভ = bh, b-ও পাওয়া যায়, bhoq (ভুখ), bhaguio (ভাগ্য), bhalo (ভাল), bhut (ভূত), labh (লাভ), bhozona (ভজনা), bhocti, bocti (ভক্তি), bettibar (ভেটিবার), Baval (ভাওয়াল)। 'ভ'-এর জন্য v ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু আজকাল Protiva (প্রতিভা), shova, sova (সভা), Vromor (ভ্রমর), Visma (ভীষ্ম), shulov (সুলভ), Vandar (ভাণ্ডার) প্রভৃতি বানানের কারণ এই যে, ভাষায় মহাপ্রাণ (aspirate) 'ভ' (= bh)-এর spirant বা উষ্ম উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে, ভ = bh-কে (যেমন সভা = 'সব্‌হা') আমরা বহু স্থলে (অন্ততঃ দক্ষিণবঙ্গে) ইংরেজির v-এর সঙ্গে এক-ই মনে করি। Government, Viceroy, Victoria প্রভৃতি হিন্দী ও গুজরাটীতে গবর্নমেণ্ট, ৱাইসরায়, বিক্টোরিয়া রূপে লেখে; মারাঠীতে অন্তঃস্থ ব-এ হ-কার যোগ

করে ; অর্থাৎ মারাঠীতে ০হ্ (wh) = দন্ত্যৌষ্ঠ্য v ; কিন্তু বাঙ্গালায় 'ভ' লেখা হয়। এইরূপ 'ফ'-এর f ও 'ভ'-এর v উচ্চারণ এ দেশে খুবই সম্প্রতি আসিয়াছে, এবং 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর ছেলেপিলেদের মুখেই বেশি শুনা যায়। অনেকে bh ভালো করিয়া জোর দিয়া বলিতেই পারে না, একটি ছেলেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইবার সময় 'সুধীভ্যাম্' কিছুতেই ঠিক উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না ; যত বলি—[sud-hib-hyɑm], সে বলে, [śu-dhiv væm]—(æ = অ্যা)। বৃদ্ধ লোকেদের মধ্যে কেহ কেহ কিন্তু বাঙ্গালায় যে 'ভ' (= bh)-এর v উচ্চারণ আসিয়াছে, তাহা স্বীকার করেন না। (দ্রষ্টব্য—'চৌহান = চওহান, চ্বহ্বান, মারাঠীর রীতি অনুসারে রোমান লিপিতে Chawhan, -wh-কে v-তে পরিবর্তিত করিয়া Chavan—বাঙ্গালা বিকারে 'চ্যবন', উচ্চারণে 'চব্বন্')।

৩৫। ম = m ; poromo nirmol (পরম নির্মল), dhorm (ধর্ম), dibam (দিবাম্)।

৩৬। য় = e ; xomoe (সময়), hoe (হয়, হএ), soee (ছয়্এ, ছয়ে), hoen (হয়েন), doea (দয়া)। আগেকার বাঙ্গালায় প্রকৃতপক্ষে 'য়' [y] ছিল না ; syllable-এর শেষে থাকিলে, এ-কারের মতোই শুনাইত ; পুরাতন পুঁথিতে ও ছাপা বইয়ে 'হএ, লএ, হএন, সমএ' পাওয়া যায়। এখন কেবল 'অ' ও 'আ' এবং 'এ' ও 'অ্যা' র পরেই 'য়'-কারের অস্তিত্ব আছে ; যেমন 'হয়্, আয়্, মায়া, নীচেয়্, দেয়্' ; অন্যত্র যে স্বরকে আশ্রয় করে, সেই স্বরেই লোপ পায়। 'য়ি', 'য়া' = 'ই', 'আ'। বাঙ্গালায় যার [yɑr] [= বন্ধু] ইআর [iɑr] হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জর্মান নাম Jacobi (য়াকোবি) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভাষার প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই 'ইয়াকোবি' লিখিয়াছেন। 'য়ু' [yu] উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী ছাড়া অপরের মুখে 'উ'। এইজন্য 'ইওরোপ, ইউরোপ,' 'য়ুরোপ' অপেক্ষা শুদ্ধতর বাঙ্গালা বানান। loya —এই কথাটিতে যে y পাই, তাহা i-এর বদলে ব্যবহৃত হইয়াছে ; = loia (লইয়া, লয়্যা)।

৩৭। র = r ; rup (রূপ), tor (তোর), ghore (ঘরে)। দুই চারিটি পণ্ডিতি কথায় 'শুর্ধ উচ্চারণ' করিবার জন্য বাঙ্গালায় যেমন অনাবশ্যক 'র' আসিয়া পড়ে (যেমন 'সাহার্য্য', চিন্তার্নিত'), সেইরূপ রোমান বানানেও দুই এক স্থলে 'র'-এর আগম আসিয়া গিয়াছে ; যেমন zirbha (জির্ভা = জিহ্বা), zormo, zormilen (জন্ম, জন্মিলেন)। 'জর্ম' রূপটি, 'ধর্ম, কর্ম, চর্ম' প্রভৃতির

সাদৃশ্যে। 'ধম্ম, কম্ম, চম্ম' প্রভৃতি প্রাকৃত রূপের মূল যদি রেফযুক্ত হয়, তাহা হইলে 'জন্ম, জম্ম'-রও হইবে না কেন ? 'জবম' = জনম, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনেও আছে; এই শব্দটি নূতন করিয়া তৈরী বর্ণচোবা 'জর্ম' শব্দের বিপ্রকর্ষণে জাত।

৩৮। **ল** = l ; labh (লাভ), xocol (সকল), guelo (গেল)।

৩৯। **ব** (= ওঅ, ওয) = oa, v, raqhoal (রাখোয়াল), Baval (ভাওয়াল)।

৪০। **শ, ষ, স**—তিনটির উচ্চারণ শ = x , xocol (সকল), xotro (শত্রু), xidhi (সিদ্ধি), xudha (শুদ্ধা), ‹ex (শেষ)। পোর্তুগীস বানান অনুযায়ী crucer (= ক্রুসের) কথায় ce = 'সে' পাই। বাঙ্গালায় 'স্ত, স্থ, স্ন, শ্র, স্র, স্ব' প্রভৃতি স্থানে s উচ্চাবণ আসে। কিন্তু সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয নাই। মাগধী প্রাকৃতে সর্বত্রই 'শ' ; 'স্ত, স্থ, স্র' সব-ই 'শ্‌ত, শ্‌থ, শ্‌র', হয়তো 'স্ত স্থ' প্রভৃতিব s-যুক্ত উচ্চাবণ হ্ইলেব। boxto (বস্তু), axtha (আস্থা), xtob (স্তব), xtan (স্থান), xirzon (সৃজন), xrixtti (সৃষ্টি), xaxtro (শাস্ত্র ; কিন্তু xastor—s দিয়া বানানও এক জায়গায় দেখিয়াছি)।

'চ'-এর জন্য ch, s না হইয়া দুই তিন স্থানে যেমন x (শ) পাইয়াছি, সেই প্রকাবে 'শ'-এর জন্য x-এর বদলে ch লেখাও এক আধ জাযগায় পাইয়াছি ; যেমন tamacha (তামাসা)।

৪১। **হ** = h , hoe (হয়), cohila (কহিলা), hate (হাতে), chahix (চাহিস্‌), taha (তাহা), ohonqhar (অহঙ্কার ; অংখারে 'খ' আসে, সেই জন্য বোধ হয় দুই রূপের মধ্যে পডিয়া 'অহংকাব' qh দিয়া)। পোর্তুগীসে h উচ্চারিত হয় না, তাই খালি পোর্তুগীস ধরনে বানান mahia, maiha (মাইয়া = মেয়ে), habilax(অভিলাষ)-এ h আসিয়াছে। এইরূপ অনাবশ্যক 'h' দেওয়া বানান গোয়ানীজেও দুই একটি কথায় দেখিয়াছি : haz (হাজ = আজ), hostori (অস্তরী = স্ত্রী)। পূর্ববঙ্গে আবার 'হ'-এব উচ্চারণ অতি মৃদু, অনেক স্থলে লুপ্তও হয় ; সেই কারণে ath (= হাত), anxite (হাঁসিতে, হাসিতে), xuag (সোহাগ) বানানও পাইয়াছি।

৪২। **ড়** = r, rr ; porrite (পড়িতে), tarona (তাড়না), boro (বড়), bari (বাড়ি), caporr (কাপড়), eria (এড়িয়া)। 'ড়' এখন পূর্ববঙ্গে শুনা যায় না। কিন্তু rr দিয়া 'ড়' লিখিবার চেষ্টায় বুঝা যায় যে, 'ড়' তখন একেবারে সব জায়গায় 'র' হইয়া যায় নাই। 'ড়'-এর ধ্বনি বিশেষ কোনও চিহ্ন না দিলে

রোমান r অক্ষরের দ্বারা জানাইতে পারা যায় না; ইংরেজি 'hard', 'arduous'-এর 'rd' ছাড়া ইউরোপীয় কোনও ভাষায় 'ড়'-এর কাছাকাছি ধ্বনি নাই।

৪৩। ং; ইহার প্রয়োগ পাই নাই। ँ (চন্দ্রবিন্দু)-র জায়গায় n ব্যবহার হইয়াছে: xansa (সাঁচা), panse (পাঁচে)। এই সকল শব্দে n দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ববঙ্গে তখন অনুনাসিক উচ্চারণ বিরল হয় নাই। ঃ (বিসর্গ) পাই নাই।

৪৪। জ্ঞ = ggui; agguia (আজ্ঞা = আগ্‌গেআ), zigguiaxa (জিজ্ঞাসা = জিগ্‌গেয়াসা)। জ্ঞ (= জ্‌ঞ)-র পুরানো উচ্চারণে অনুনাসিক আসিত না, যেমন চলিত বাঙ্গালায় 'গেয়ান', হিন্দীতে গ্যান; 'যজ্ঞ' (= য়জ্‌ঞ) বাঙ্গালায় মেয়েলি উচ্চারণে 'জোগ্‌গি', কোথাও বা 'জোগ্‌গিঁ'। সংযুক্ত বর্ণ 'জ্ঞ' এক তৎসম শব্দেই পাওয়া যায়, এবং এই 'গেয়া' বা 'গি' উচ্চারণ সাবেক কালের পণ্ডিতি বা 'তৎসম-সদৃশ' উচ্চারণ, আধুনিক শিক্ষিত উচ্চারণেই চন্দ্রবিন্দু আসে, 'গ্যাঁন্', 'জোগ্‌গোঁ' শুনিতে পাওয়া যায়। খাঁটি প্রাকৃত বা বাঙ্গালা (তদ্ভব) পদে জ্ঞ (গঁ, গেঁয়া) আসে না। প্রাকৃতে 'জ্ঞ'-র রূপ হইতেছে 'ঞ্‌ঞ' বা 'ণ্ণ', বাঙ্গালায় তাহা 'য়' ও 'ন' হইয়া যায়। যেমন—'সজ্ঞানক' (সজ্‌ঞানক)—সঞ্‌ঞানঅ—সয়ানা, সেয়ানা, 'অজ্ঞানিক'—অণ্ণাণিঅ—আনাড়ী, 'রাজ্ঞী'—রণ্ণী—রাণী। 'জ্ঞ' যেখানে ভাষায় পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃতের প্রভাবে, এবং হালের সংস্কৃত উচ্চারণের গতি অনুসরণ করিয়া 'গঁ'-র ধ্বনি লইয়াছে।

৪৫। য-ফলা = i; ক্ষ ('খিয়')তেও বাঙ্গালায় য-ফলা আসে বলিয়া 'ক্ষ' = qhi: xixio (শিষ্য), munixio (মুনিষ্য, মনুষ্য), punio (পুণ্য), carzio (কার্য্য); roqhia (রক্ষা)।

'য'-ফলা- বা 'ক্ষ'-যুক্ত পদে যে 'য়' বা 'ই' আসে, তাহা, এবং ইকারান্ত অনেক খাঁটি বাঙ্গালা পদের 'ই', পশ্চিম বঙ্গে লুপ্ত হয়, কিন্তু নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরধ্বনিকে বদলাইয়া দিয়া জানাইয়া যায়; পূর্ববঙ্গে এই 'ই' লুপ্ত হয় না, কিন্তু স্থান ত্যাগ করিয়া আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে আসে ও মৃদুভাবে উচ্চারিত হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় এই মৃদু 'ই'-কারকে [ি] এবং [ী] চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত এই চিহ্ন বাঙ্গালা বর্ণমালার পক্ষে চমৎকার হইয়াছে। যেমন 'কন্যা'—[kanyā = কন্‌য়া], পশ্চিমের ভাষায় 'কোন্নে' [konné], পূর্বে 'কইন্না' [kᵒinna], 'রাজ্য' = 'রাজ্‌য়,' যথাক্রমে 'রাজ্জি, রাজ্জো' [rājjo] ও 'রাইজ্জ' [rāizzo]; 'রাত্রি'—'রত্তি'—'রাতি'—'রাৎ' [rāt], 'রাইৎ' [rait]; 'হইল'—'হোলো', 'হ'ল'; 'মধ্য',

'মধ্য়'—'মোদ্ধো' [moddho], 'ম'দ্ধ' [mɔːddɔ] , 'কল্য'—'কল্লিং' (প্রাকৃত), 'কল্লি'—'কালি'—'কাল', 'কাল্'। 'অদ্য'—'অজ্জি'—'আজি'—'আজ্' [aj], 'আজ্' [a z] , 'রক্ষা'—'রক্‌খ্যা'—'রোক্‌খে' [rokkhe], 'র'ক্‌খা' [rɔːkkhʌ], 'লক্ষ'—'লক্‌খ্য'—'লোক্‌খো', 'ল'ক্‌খ'। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এও পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ বিষয়ে এই বিশেষত্ব পাই। যেমন coina (কন্যা = ক'ন্না), rait (রাত্তি—রাৎ), moidhe (মধ্যে—ম'দ্ধে), raızzo (রাজ্য—রাজ্‌জ), roiqha (রক্ষা—র'ক্‌খা), baix bia (বাসি বিযা), obhaiguia ('আভাগ্যিযা') প্রভৃতি। এই প্রকার বানানে দেখা যায় যে, দুশ' বছর পূর্বেও পূর্ববঙ্গে এই উচ্চারণ বিদ্যমান ছিল।

'কৃপাব শাস্ত্রেব অর্থভেদ'-এ বানান লইযা কিছু আলোচনা কবা গেল। পাঠকেরা দেখিবেন যে, ইহা হইতে বাঙ্গালা উচ্চাবণের ইতিহাস উদ্ধার বিষয়ে আমবা কতটা সাহায্য পাইতে পাবি। সমস্ত বইখানি বেশ ভালো করিয়া না পডিয়া ইহার ভাষা, ব্যাকরণ ও শব্দাবলী (vocabulary) সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, সে জন্য এ বিষযে হাত দিব না। তবে দু একটি জিনিস, যাহা চোখে পডিয়াছে, তাহার উল্লেখ কবিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

পূর্ববঙ্গের ভাষার বিশেষত্বগুলি বানানে দেখিতে পাইলাম। বাক্যের (sentence) ঢঙেও 'বাঙ্গাল্যে ভাষা'র অনেক লক্ষণ পাওযা যায়, যেমন— **aıxo pola, tomi quetta ?** (আইস পোলা, তুমি কেটা ?), **tomi ni axthar nirupon zano ?** (তুমি নি আস্থার নিরূপণ জান ?)। পূর্ববঙ্গের প্রচলিত শব্দের ও রূপভেদের ব্যবহাবও আছে, **saoal** (ছাওয়াল), **maia** (মাইয়া = মেযে), **hoe** (= হয, হ' = হাঁ), **dibar lagui** (দিবার লাগি = দিবার জন্য), **xuhor** (শুহর = শহর), **cazuaite** (খাওজাইতে = চুলকাইতে), ইত্যাদি। শব্দরূপে ও ক্রিযাপদ-সাধনেও পূর্ববঙ্গের ভাষার বিশেষত্ব পাওয়া যায়। কর্তৃকারকের বিভক্তিতে 'এ'-র ব্যবহার খুব সাধারণ ; **mahiae punorbar zia utthilo** (মাইয়াযে পুনর্বার জীয়া উঠিল), **saoaler matae proti raite saoaler upore xidhi crux coriassilo** (ছাওয়ালের মাতাএ [মায়ে] প্রতি রাতে ছাওয়ালের উপরে সিদ্ধি ক্রুশ করিয়াছিল), **xadhue eq crux bhanaia boner moidhe raqhilen** (সাধুয়ে এক ক্রুশ বানাইয়া বনের মধ্যে রাখিলেন), **chintit deqhia tahare xtrie zigguiaxilo**

(চিন্তিত দেখিয়া তাহাবে স্ত্রীযে জিজ্ঞাসিল)। এই 'এ' বিভক্তি বাঙ্গালায় এখন সাধারণতঃ আকারান্ত শব্দের পবে বসে ও 'য়'-রূপে লিখিত হয়, যেমন 'ঘোড়ায় ঘাস খায়', 'মায়ে ছেলেকে আদব কবে', 'মাযে ঝীয়ে'। অন্যত্র বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে, অনেক স্থলে অধিকবণেব 'এ' ও 'তে' মিশিয়া গিয়াছে, কর্তৃকারকে 'তে' আসিয়া পডিযাছে। (অধিকবণেব 'এ' = অপভ্রংশে 'অই', হিঁ', প্রাকৃতে 'অম্মি, অমহি' ও সংস্কৃত = '-স্মিন্')। অসমিযাতে 'বাবুযে' = বাবুতে, অসমিয়ায় এই 'এ' বিভক্তি জোবেব সহিত এখনও চলিতেছে। কর্মকাবকে 'বে' এবং 'কে' দুই ব্যবহৃত হইয়াছে, tomare (তোমারে), bhutere (ভূতেরে), xocolque (সকলকে)। 'বে' ক্রমশঃ অপ্রচল হইযা পডিতেছে, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভাবতে খুব পাওযা যায়, কিন্তু আধুনিক গদ্যের ভাষায় 'কে'-ব চল বেশি। অপাদান জ্ঞাপক hoite (হইতে) ও thaquia (থাকিয়া = থেকে) দুই-ই আছে। ক্রিয়াপদে dibam (দিবাম), buzhibam (বুঝিবাম), zaiba (যাইবা), cohila (কহিলা), corila (করিলা) প্রভৃতি পদও সাধারণ, -bo (= -ব, উত্তম পুরুষে),-be (-বে—মধ্যম ও প্রথম পুরুষে), এবং -le (-লে—মধ্যম পুরুষে) প্রভৃতি রূপগুলিও আছে। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রমবাচক সংখ্যাব (ordinal number-এব) চল নাই বলিলেই হয়, হিন্দীতে যেমন 'পহিলা, দুসবা, তিস্‌বা, চৌথা, বীস্‌রী, তীস্‌রী, একতীসরী' প্রভৃতি সংখ্যাব চলন আছে, আজকালকাব বাঙ্গালায সেরূপ নাই। প্রতি পদেই বাঙ্গালাকে অসহায় অবস্থায় সংস্কৃতেব আশ্রয় লইতে হয়, 'অষ্টচত্বারিংশত্তম, চতুরশীতিতম' প্রভৃতি দাত-ভাঙ্গা কথা ব্যবহার না করিলে যেন উপায় নাই। পুরাতন বাঙ্গালায় 'পহিল, দোয়জ, তেয়জ' প্রভৃতি পদের চলন ছিল, এখনও কচিৎ দেখা যায়। 'প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয' প্রভৃতি সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। মাসের দিন গুণিতে 'পয়লা, দোসবা, তেসরা, চৌঠো' প্রভৃতি যে পদ ব্যবহার কবা হয়, তাহা হিন্দী হইতে লওয়া। এখন 'এক, দুই, তিন, চার' প্রভৃতি সংখ্যায় 'এর' বা 'এ' বিভক্তি যোগ কবিয়া খাঁটি বাঙ্গালা ক্রমসংখ্যা গডিতে পারা যায়, যেমন 'একের, দুয়ের', বা 'সাতে, একত্রিশে'। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এ সংস্কৃত সংখ্যার জায়গায় বাঙ্গালা eque (একে) [prothom ('প্রথম')ও পাওয়া যায়], duie (দুয়ে), tine (তিনে), saire (চারে), soee (ছয়ে) প্রভৃতি ক্রমসংখ্যাই সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের দু'চারখানি পুরাতন পুঁথিতে যেরূপ 'কুমারী'-স্থলে 'আকুমারী', 'বৃথা'-

স্থলে 'অব্রেথা', 'রঙ্গীন'-অর্থে 'অরঙ্গা' পদ পাওয়া যায়, এই বইতেও সেইরূপ ocumari, obretha কথা পাইয়াছি।

বইখানির ভাষা মোটের উপর বেশ সরল, ঝরঝরে বাঙ্গালা; যে যুগে বাঙ্গালায় সহজ গদ্যের বই ছিল না বলিলেই হয়, সে যুগে একজন বিদেশীর হাত দিয়া এমন বাঙ্গালা বাহির হওয়া খুবই বাহাদুরির কথা। গদ্যের ভালো বা মন্দ কোনও আদর্শ না পাওয়ায় ফিরিঙ্গি ফিরিঙ্গি ভাব অনেক জায়গায় ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা কানে ততটা লাগে না। পোর্তুগীসের মূলঘেঁসা অনুবাদের চেষ্টায় এরূপ ঘটিয়া থাকিবে; যেমন ami christao, poromexorer crepae (আমি ক্রিস্তান, পরমেশ্বরের কৃপায়); পোর্তুগীসে আছে, sou Christão, pela graça de Dios, zeno pitar putro xorgue thaquia axilen prothibite, Purux hoilen, ocumari Mariar udore; ar abar axiben mohaproloer din bichar corite zianta morar (যেন পিতার পুত্র স্বর্গে থাকিয়া আসিলেন পৃথিবীতে, পুরুষ হইলেন, অকুমারী মারিয়ার উদরে; আর আবার আসিবেন মহাপ্রলয়ের দিন, বিচার করিতে জীয়ন্ত মরার)। কতকগুলি কথার মানে বুঝিতে পারি নাই; সেগুলি পূর্ববাঙ্গালার ভাষার কথা হইতে পারে। পোর্তুগীস ভাষার কথাও আছে, espirito santo (এসপিরিতু সান্ত='পবিত্র আত্মা'), baptismo ('বাপ্তিস্ম')। 'গির্জা' (পোর্তুগীস egreja, মূল-লাতীন ecclesia) শব্দের জায়গায় কিন্তু dhormo-ghor (ধর্মঘর) পাইয়াছি। ফার্সী কথাও অনেক আছে। এই সকল অপ্রচলিত ও বিদেশী শব্দের তালিকা করিবার মতো ভালো করিয়া সমস্ত বইটি আমার পড়া হইয়া উঠে নাই।

গোয়ানীজ (কোঙ্কণী) ভাষা বাঙ্গালারই মতো আর্য্যভাষা, ও অনেক সংস্কৃত কথা ছুইয়েতেই পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচারের চেষ্টার পূর্বে পোর্তুগীসেরা গোয়ায় অনেক কাল ধরিয়া সেই কাজ করিতেছিলেন; গোয়ানীজেও বাইবেল এবং খ্রীষ্টানী উপাসনা-পদ্ধতিরও তর্জমা হইয়াছিল; গোয়ানীজের প্রভাবে যে খ্রীষ্টানী কথার সংস্কৃত রূপ বাঙ্গালায় না আসিয়াছিল, তাহা নহে। যেমন paradise অর্থে boicontto (বৈকুণ্ঠ), গোয়ানীজে bovoimcut; heaven-অর্থে বাঙ্গালায় xorgo (স্বর্গ), গোয়ানীজে sorg। এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে গোয়ানীজে একটু দখল চাই। কিন্তু এখন অত করিয়া এই বই পড়িবার দরকার নাই। বাঙ্গালা ভাষার গদ্যের পুরাতন নমুনা ও রোমান অক্ষরে লেখার দরুন বাঙ্গালা

উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনার পক্ষে সাহায্য করে বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষা যাঁহারা চর্চা করেন, তাঁহাদের নিকট এই বইয়ের আদর হওয়া উচিত। এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হওয়া উচিত, অন্ততঃ ইহার বাঙ্গালা অংশটুকু, রোমান অক্ষরে যেমন আছে, তেমনি ছাপাইতে পারিলে ভালো হয়। সাহিত্য-পরিষদের পরিচালকবর্গ এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখিবেন ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৩য় সংখ্যা, ১৩২৩

'আহুঠ', 'আউট' ও সার্ধ-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী*

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দান-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন,—

'হাথে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্ন।
আইস ল রাধা লেখা করি দান ॥ ১ ॥
আহুঠ হাথ কলেবর তোর।
দুই কোটি দান তাহাত মোর ॥ ২ ॥'

'আমি কানু হাতে খড়ী লইয়া বলিতেছি, ওলো রাধা, আয়, দান (শুল্ক) হিসাব করি। তোর শরীর "আহুঠ" হাত পরিমাণের ; তাহাতে আমার (প্রাপ্য) দান দুই কোটি।'

নৌকা-খণ্ডে এই শব্দ পুনরায় মিলে। রাধা খেয়ানিয়া-বেশী শ্রীকৃষ্ণের নৌকায় চড়িয়াছেন। ছোটো নৌকা ; তাঁহার মনে ভয় হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন,—

'আহুঠ হাথ নাঅ খানী তোর পাঁচ পাটে।
অনেক যতনে আনি চাপাইল ঘাটে ॥'

'তোমার নৌকা খানি "আহুঠ" হাতের, পাঁচখানি মাত্র পাটাতনে নির্মিত ; অনেক কষ্টে তুমি তাহাকে ঘাটে আনিয়া ভিড়াইয়াছ।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় উক্ত গ্রন্থের যে উৎকৃষ্ট 'ভাষা টীকা' দিয়াছেন, তাহাতে 'আহুঠ' শব্দের অর্থ 'আট' ধরিয়াছেন। 'রাধার শরীর আট হাত' ('আহুঠ হাথ কলেবর তোর')—এই অস্বাভাবিক উক্তির ব্যাখ্যার চেষ্টা বসন্ত বাবু এই বলিয়া করিয়াছেন,—' "হাথ" শব্দে পাণিতল (১০ অঙ্গুলি) ধরিলে, রাধার দেহের উচ্চতা ৩৷৷০ হাতের কিছু কম হয়।' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃঃ ৪৮৮)। এতদ্ভিন্ন, বসন্ত বাবু 'আহুঠ' শব্দের অবস্থান প্রাচীন বাঙ্গলা ও অসমিয়া পুস্তক হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন ; যথা,—

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ডে,—

'স্বর্গে রাজ্য করে "আউট" কোটি বৎসর।' (পৃঃ ৪৮৮)

গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

'"আউট" হাত প্রমাণ আমার কলেবরে।' (পৃঃ ৫৫৪)

মাধব কন্দলি কৃত সুন্দরাকাণ্ডে—

'"আউঠ" হাতের কেশ এক গোটা বেণী।' (পৃঃ ৫৫৪)

আপাত-দৃষ্টিতে, শরীরের পরিমাণ 'আট' হাত—এইরূপ উক্তি প্রাচীন বাঙ্গলায় একাধিক স্থানে মিলিতেছে। 'আহুঠ' শব্দকে আটের সহিত সংযুক্ত করায় কিন্তু শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশে একটু গোল ঠেকে। 'অষ্ট' হইতে 'আহুঠ—আউট' হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ অন্তরায় আছে; 'অষ্ট'>'অট্‌ঠ'>'আঠ'>'আঠ্‌', 'আট্‌', এই তদ্ভব রূপে বিনা কারণে 'হু' অক্ষরের আগমন সম্ভব নহে। 'আট হাত শরীর'—অর্থ-গত অসামঞ্জস্যও রহিয়াছে।

বহুকাল ধরিয়া 'আহুঠ' শব্দের কোনও সন্তোষ-জনক সমাধান পাই নাই। কিছুকাল হইল, ভারতীয় অন্যান্য আর্য্য ভাষায় এই শব্দটি পাইয়াছি, এবং তাহাতে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি। 'আহুঠ—আউট' শব্দের অর্থ 'সাড়ে তিন'; ইহার মূল-রূপ হইতেছে 'অর্ধ-চতুর্থ' শব্দ।

রাজস্থানের পদ্মনাভ কবি সংবৎ ১৫১২ (=খ্রীষ্টীয় ১৪৫৬) সালে 'কান্‌হড দে-প্রবন্ধ' নামে এক উৎকৃষ্ট বীর-রসাত্মক কাব্য-গ্রন্থ লেখেন। এই পুস্তকের ভাষাকে 'প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী' নাম দেওয়া হইয়াছে; এই ভাষা হইতে আধুনিক গুজরাটী ও মাড়োয়ারী ভাষা-দ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। (এ সম্বন্ধে ১৯১৪-১৬ সালের Indian Antiquary পত্রিকায় পরলোকগত L. P. Tessitori ডাক্তার এল্‌, পি, তেস্‌সিতোরী-কৃত Notes on the Grammar of old Western Rajasthani শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। 'কান্‌হড-দে-প্রবন্ধ' কাব্যে মুসলমান সুলতান 'অলাউ-দ্‌-দীন খল্‌যীর সেনাপতি অলফ খান কর্তৃক অণহিলপাটন ও গুজরাট জয়, সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস-সাধন ও তৎপরে মুসলমান-কর্তৃক ঝালোরের রাজা কান্‌হড-দের রাজ্যজয়ের সবিস্তর কথা, ও আনুষঙ্গিকভাবে রাজপুত-জাতির অসাধারণ শৌর্য্যের কথা বর্ণিত আছে। আমেদাবাদের ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত ডাহ্যাভাই পীতাম্বর দেরাসরী এই কাব্যের এক উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন (আমেদাবাদ, ইউনিয়ন প্রিণ্টিঙ্‌ কোম্পানি লিমিটেড, ১৯১৩ সাল)। এই কাব্য পাঠ করিতে করিতে এই চৌপাইটি পাইলাম—

বীরমদেৱি সংহাসণ কাজ উঠ দীহাড়া কীধু রাজ ॥২৯২॥ (পৃঃ ৯৯),

'বীরমদেবের সিংহাসন কাজ (হইয়াছিল এই, যে তিনি) 'উঠ' দিন রাজত্ব

করিয়াছিলেন।' শ্রীযুক্ত দেরাসরী 'বিবেচন' বা টীকায় 'উঠ দীহাডা' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'সাডাত্রণ দিবস' = 'সাড়ে তিন দিন'।

স্বতঃই প্রাচীন বাঙ্গলার 'আহুঠ' শব্দের কথা মনে হইল।

A. F. Rudolf Hoernle হোরনলে-কৃত Comparative Grammar of the Gaudian Languages (1880) পুস্তকে 'আহুঠ', 'উঠ' শব্দের পূর্ণ সমাধান আছে। 'আহুঠ, আউট' শব্দ আধুনিক বাঙ্গলায় নাই বলিয়া, বহু পূর্বে হোরনলের বই আলোচনা কালে এই শব্দগুলি আমার দৃষ্টিপথ এড়াইয়া যায়। ঐ বইয়ে §§ ৪১৩—৪১৬ প্যারায় (পৃঃ ২৬৮—২৭০) আধুনিক আর্য্য ভাষার ভগ্ন-সংখ্যা-বাচক শব্দ-সমূহের বিচার আছে। তদ্ভিন্ন Kellogg কেলগের হিন্দী ব্যাকরণে সংখ্যা-বাচক শব্দের পর্য্যায়টিও দর্শন-যোগ্য।

সংস্কৃতে সার্ধ-সংখ্যা বুঝাইতে গেলে, বিশেষ বিশেষ সংখ্যা-নামের, বা প্রায়শঃ তাহাদের ক্রম-বাচক রূপের, পূর্বে 'অর্ধ' শব্দ যোগ করিয়া নিষ্পন্ন পদের প্রয়োগ আছে। যে সংখ্যার সার্ধ-রূপ জানাইতে হইবে, 'অর্ধ' শব্দকে তদূর্ধ্ব সংখ্যার ক্রম-বাচক রূপের পূর্বে জুড়িয়া দিতে হয়; কেবল 'সার্ধ এক' জানাইবার জন্য এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায়; এখানে 'দ্বি' শব্দেরই প্রয়োগ হয়, ইহার ক্রম-বাচক 'দ্বিতীয়' পদের আগম নাই, এবং 'অর্ধ' শব্দ 'দ্বি'র পূর্বে না বসিয়া, পরে বসে। সার্ধ-সংখ্যা-বাচক পদ, সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন, টিউটনিক প্রভৃতির মাতৃ-স্থানীয় ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি-আর্য্য ভাষার এই রীতিতেই হইত, ইহা অনুমান করা যায়। টিউটনিক ভাষাগুলিতে এই রীতি; যেমন, জর্মান ভাষায়, anderthalb = দ্বিতীয়-অর্ধ = দ্ব্যর্ধ = ১½; drittehalb = তৃতীয়-অর্ধ = ২½, viertehalb = চতুর্থ-অর্ধ = ৩½, ইত্যাদি। আংগ্লো-সাক্‌সন বা প্রাচীন-ইংরেজিতেও এই রীতি। গ্রীকেও কচিৎ পাওয়া যায়, যেমন triton hemitálanton = তৃতীয় অর্ধ-তালান্ত = অর্ধ-তৃতীয় বা আড়াই টালেণ্ট অর্থ। 'অর্ধ-তৃতীয়' = যাহার (পূর্ণ এক ও দুইয়ের পর) তৃতীয় হইতেছে মাত্র অর্ধ; তদ্রূপ 'অর্ধ-চতুর্থ' = যাহার (এক, দুই ও তিনের পর) চতুর্থ হইতেছে অর্ধ; এইরূপ চিন্তা-প্রণালীতে এই প্রকারের পদের উদ্ভব।

আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত ভগ্ন বা সার্ধ-সংখ্যা-দ্যোতক পদগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা হইতেই গৃহীত। নিম্নে ভারতীয় আর্য্য (সংস্কৃত) সার্ধ-সংখ্যা-বাচক পদ ও তাহাদের ক্রম-বিকাশে উৎপন্ন আধুনিক রূপ প্রদর্শিত হইল।

½ = 'অর্ধ'>'অদ্ধ>'অদ্ধ'>আধ', সমাসে কুত্রচিৎ 'অধ' ; এই রূপটি প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই মেলে। বাঙ্গলা ভাষার মূল মাগধী-প্রাকৃতের বিশেষত্ব ছিল, র-যোগে দন্ত্যধ্বনির মূর্ধন্যীকরণ ; 'অর্ধ' হইতে 'অড্ঢ', 'আঢ', 'আড়' রূপ-ই বাঙ্গলার বিশিষ্ট, নিজস্ব রূপ হওয়া উচিত। 'আড়পাগ্লা' = 'আধ-পাগ্লা', 'আড়-মাদ্লা', 'আড়ে গেলা' = অর্ধচর্বিত করিয়া গেলা' প্রভৃতি শব্দে এই 'অড্ঢ'<'আড়' রূপ বিদ্যমান। (শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' দ্রষ্টব্য)। তদ্ভিন্ন 'দেড়', 'আড়াই' শব্দেও এই মূর্ধন্য-যুক্ত 'অড্ঢ' পদ বিদ্যমান। নিম্নে দ্রষ্টব্য)। গুজরাটীতে 'অড়ধো' = 'আড় + 'আধ' = এই পদে দুই ভিন্ন ভিন্ন আর্য্য-ভাষার মূর্ধন্য ও দন্ত্য রূপের মিশ্রণ দেখা যাইতেছে।

১½ = 'দ্ব্যর্ধ : (১) 'দ্বি-অর্ধ'> '* দি-অড্ঢ'>'* দিঅঢ়'>'দেঢ়' (হিন্দী, উড়িয়া), 'দেড়' (বাঙ্গলা), 'দীড়' (মারাঠী), (২) 'দ্বি-অর্ধ'> '* দি-অড্ঢ'>'* ড়ি-অড্ঢ'>'ডেরঢ়', 'ডেঢ়, ডেড়' (হিন্দী), 'ডেঢ়, ডেওঢ়া' (পাঞ্জাবী), 'ডেড়' (বাঙ্গলা কথ্য ভাষায়), 'ডেঢ়ু' বা 'ডেঢ়ে' (সিন্ধী) ; (৩) 'দ্বি-অর্ধ>'*দো-অড্ঢ' বা '*ডো-'>'ডোৱঢ়', 'ডোঢ়', 'দোঢ়', 'দোহোড়'(গুজরাটী), 'ডৌঢ়া, ডোঢ়া' (হিন্দী), 'দোঢ, 'ডূঢ়া, ডূঢ' (পাঞ্জাবী)। গুণন-কালে হিন্দীতে 'ডৌঢ়া, ডোঢ়া' পদের ব্যবহাব হয়।

২½ = 'অর্ধ-তৃতীয়' : (১) 'অড্ঢ-তিতীয়' >'অড্ঢতীয়, -তিয়' (উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থে haplology বা 'সকৃদবস্থান' দ্বারা একটি 'ত'-কারের লোপ ; অশোকের অনুশাসনে 'অঢতিয়' = 'অড্ঢতীয়')>'* অড্ঢঈয়'>'* অঢ়ঈ'> 'অঢ়ী', (গুজরাটী) 'অড়ী, হড়ী' ; (২) '* অড্ঢ-ততীয়'>'* অড্ঢ-অঈয়'> '* অড্ঢাঈয়', 'অড্ঢাইঅ'>'অঢ়াঈ' ; 'অঢ়াঈ', 'ঢাঈ' (হিন্দী), 'অঢ়াঈ' (সিন্ধী), 'ঢাঈ', 'টাঈ' (পাঞ্জাবী), 'আড়াই' (বাঙ্গলা) ; (৩) '* অড্ঢ-ততীয়>'*অড্ঢ-ততিয্য'>'* অড্ঢ-অইজ্জ'>'* অড্ঢইজ্জ'>'* অঢ়ীজ'>'অডীচ' (মারাঠী)।

৩½ = 'অর্ধ-চতুর্থ'>'* অড্ঢ-চতুট্ঠ'>'* অড্ঢ-যতুট্ঠ'>'*অড্ঢ-অউট্ঠ' '* অড্ঢউট্ঠ'>'* অড্টুট্ঠ' ; পরে, খুব সম্ভবতঃ অর্বাচীন প্রাকৃত বা অপভ্রংশে, '* অঢুট্ঠ' ; তদনন্তর উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ দুই মূর্ধন্য মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঢ' ও 'ট্ঠ'-এর একটিকে 'হ'-কারে আনীত করিয়া, '* অহুট্ঠ', 'আহুঠ'। কিংবা '* অদ্ধ-চতুট্ঠ', '* অদ্ধ-অউট্ঠ'>'অদ্ধুট্ঠ' (জৈন-প্রাকৃতে)। প্রাচীন বাঙ্গলায় আদ্য অক্ষর 'অ-কার'কে 'অ্যা-'তে রূপান্তরিত করিবার দিকে বিশেষ প্রবণতা দেখা যায় ;

তদনুসারে বাঙ্গলায় 'অহুট্‌ঠ'>'আহুঠ' রূপ, যাহা চতুর্দশ শতকের বাঙ্গলায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে) ও 'আউঠ' রূপে অসমিয়াতে পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের বাঙ্গলায় (পঞ্চদশ শতকের পরে) 'হ' লোপে ও মহাপ্রাণ 'ঠ'র প্রাণ বর্জনে এই শব্দের রূপ 'আউট'। আধুনিক বাঙ্গলায় এই শব্দ লুপ্ত। পাঞ্জাবীতে ও হিন্দীতে এই শব্দ মেলে—হিন্দী রূপ 'হূঁঠা', 'হোঁঠা', 'হূঁটা', 'হোঁটা', বা 'হোটা'; পাঞ্জাবী রূপ—'ঊঠা', 'ঊঁটা', 'ঊটা' (হোর্‌ন্‌লে-র পুস্তক দ্রষ্টব্য), পুরাতন রাজস্থানী 'কান্‌হড-দে প্রবন্ধ' কাব্যে—'ঊঠ', আধুনিক রাজস্থানীতে 'হূটা'। 'হূঁটা', 'হোঁটা', 'হোটা' প্রভৃতি হিন্দীতে ও অন্য ভাষায় গুণনকালে, বিশেষতঃ জরীপের সময় ব্যবহৃত হয় (Kellogg-কৃত হিন্দী ব্যাকরণ দ্রষ্টব্য)।

প্রাচীন মৈথিলীতেও এই শব্দ পাইয়াছি। মৈথিলী ভাষাব প্রাচীনতম পুস্তক, যাহার সম্বন্ধে আমরা কোনও খবব পাইয়াছি, তাহা হইতেছে, কবিশেখর জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের বচিত 'বর্ণ-বত্নাকব'। এই বই খ্রীষ্টীব চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদে (১৩০০-১৩২৫-এ) লেখা হয়।[১] 'বর্ণবত্নাকর'-এর মূল পুঁথির ২৮খ সংখ্যক পাতায় 'অহুঠ' শব্দ পাওয়া যায়। নায়কের শয়ন-বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শয্যার বিবরণ দিতেছেন :—'স্ফটিকক দণ্ডা, পদ্মরাগক দণ্ডিআ, অহুঠ হাথ দীর্ঘ, অঢ়াএ হাথ ফাণ্ড সেজ'—'স্ফটিকের দাঁড় (=পায়া), পদ্মরাগেব দাঁডী (=ছাপরের খুঁটি), সাডে তিন হাত দীর্ঘ, আড়াই হাত ফাঁড়ের শয্যা'। 'আট হাত লম্বা' বিছানার কথা শুনা যায় না; তদ্ভিন্ন বর্ণ-রত্নাকরে 'আট' অর্থে 'আঠ' শব্দের প্রয়োগ বহুবার আছে, কিন্তু এই স্থান ভিন্ন অন্যত্র 'অহুঠ' রূপ নাই। Kellogg-এর ব্যাকরণ অনুসারে, এই শব্দের রূপ আধুনিক মৈথিলে 'হূঁঠা, হূঁঠে, হুট্‌ঠা, হুঠা, হুট্‌ঠে', মগহীতে 'হুঁঠা, হুঠা', ভোজপুরীতে 'হুঁঠা, অংগুঠা, অংগ্ঢা'।

---

১ ইহার একমাত্র পুঁথি বেঙ্গল এশিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে, পুঁথিখানির লেখার তারিখ ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ। বইখানি গদ্যে লেখা, ইহা একখানি অভিধান বা শব্দ-সংগ্রহের মতো বই, নানা বিষয়ের বর্ণনা-ব্যপদেশে বহু মৈথিল ও সংস্কৃত শব্দ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেমন 'নগর-বর্ণনে' নগরস্থ সমস্ত জাতি ও ব্যবসায়ী প্রভৃতিব তালিকা, 'বাজসভা-বর্ণনে' রাজার অনুচর পার্শ্বচরাদির নামের তালিকা, 'নায়িকা-বর্ণনে' অলংকার প্রসাধনাদির বর্ণনা আছে, তদ্রূপ মৃগয়া অভিষেক ভোজনাদিরও বর্ণনা আছে। মৈথিলের প্রাচীন স্বরূপ ও ব্যাকরণ জানার পক্ষে এই বইয়ের সহায়তা অমূল্য। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র ভূমিকায় সিদ্ধাচার্য্যগণের নাম আলোচনা-কালে 'বর্ণ-রত্নাকর'-এর উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে প্রাপ্ত সিদ্ধাদের তালিকাও দিয়াছেন। এই বইয়ের মূল পুঁথিখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত

'অদ্ধুট্‌ঠ' শব্দ (জৈন) অর্ধ-মাগধীতে পাওয়া যায়। 'অর্ধ-চতুর্থ' শব্দের 'অদ্ধুট্‌ঠ'-তে পরিবর্তন, খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতকের পূর্বেকার নহে। সংস্কৃতে 'অদ্ধুট্‌ঠ'-র কী রূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে অর্বাচীন কালের পণ্ডিতেরা ঠিক করিতে না পারিয়া, প্রাকৃত শব্দের অনুকরণে সংস্কৃতে 'অধ্যুষ্ট' এই একটি কৃত্রিম শব্দের সৃষ্টি করেন। 'অধ্যুষ্ট' ক্বচিৎ সংস্কৃতে প্রযুক্ত দেখা যায়, যেমন 'অধ্যুষ্ট-বলয়' = 'সাড়ে তিন পাকের তাগা বা বালা, সাড়ে তিন পাকে জড়াইয়া সাপের অবস্থান' (Monier Williams-এর সংস্কৃত অভিধান দ্রষ্টব্য)।

৪½ = 'অর্ধপঞ্চ' বা 'অর্ধ পঞ্চম > '*অড্‌ঢপঞ্চম' > '*অড ঢবঞ্চৱঁ > '*অড্‌-ঢউঞ্চঅ' > 'ঢোঁচা' (পাঞ্জাবী), 'ঢোঁচা' (হিন্দী), 'ঢ্‌চা' (রাজস্থানী), 'ধোঁচা, ধোঁচে, ঢোচে, ঢোঁচহ, ঢোচা' (মৈথিলী), 'ধোঁচা' (মগহী), 'ধমূচা, ধঙ্গুচা' (ভোজপুরী)। 'হুঠা' প্রভৃতির ন্যায় এই শব্দ জরীপের কাজে ও গুণনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫½ = হিন্দী 'পোঁচা', মৈথিলী 'পহুঁচা, পহুঁচে, পোঁচা', মগহী, ভোজপুরী 'পহুঁচা'।

৬½ = হিন্দী 'খোঁচা', মৈথিলী 'খোঁচা, খোঁচে, খোঁচা', মগহী 'খোঁচা', ভোজপুরী 'বিছিয়া'।

৭½ = হিন্দী 'সতোঁচা', মৈথিলী 'সতোঁচা', মগহী'ত এই শব্দ নাই, ভোজপুরী 'চলোঁসা'।

৫½, ৬½, ও ৭½-এর জন্য শব্দগুলি আধুনিক, আদি আর্য্য-ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয় না। হোর্‌নলে ও কেলগ এর মতে এই পদগুলি 'ধোঁচা' = ৪½-এর অনুকরণে সৃষ্ট। সংস্কৃতে কিন্তু ৫½ = 'অর্ধষষ্ঠ', ৬½ = 'অর্ধ-সপ্তম' ইত্যাদি পদের প্রচলন ছিল। আমরা 'সাড়ে বার' অর্থে 'অর্ধ-ত্রয়োদশ'-এর প্রয়োগ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাই।

আড়াইয়ের ঊর্ধ্ব সার্ধ-সংখ্যা জানাইতে হইলে সাধারণতঃ 'সাড়ে, সাঢ়ে'

এক নকলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই পুস্তক প্রকাশ করিবার কথা হইতেছে।

(জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর রচিত 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থখানি ইংরেজি ১৯৪০ সালে শ্রীবাবুআ মিশ্রের সহযোগিতায় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

শব্দের প্রয়োগ হয়। এই 'সাড়ে, সাঢ়ে' শব্দের মূল, 'সার্ধ-ক' শব্দ, 'সার্ধ-ক' >'সড্ঢঅ' > * 'সাঢা', ইহার তির্য্যক্ রূপ, বহুবচনার্থে, 'সাঢ়ে', 'সাড়ে' = 'সড্ঢহ', এ-কার দ্বারা বহুবচন দ্যোতন—তুলনীয়, হিন্দী 'ঘোড়া'—বহুবচনে 'ঘোড়ে'। গুজরাটীতে আমাদের 'সাড়ে' শব্দের প্রতিশব্দ হইতেছে 'সাডা', এই আ-কারান্ত রূপ বহুবচনের, একবচনে '* সাডো' হইত।

বাঙ্গলা দেশে, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কোথাও না কোথাও, 'অর্ধ-চতুর্থ' > 'আহুঠ, আউট' = ৩½, ও 'অর্ধ-পঞ্চম' > 'অঢোচা, ঢোঁচা' = ৪½ শব্দের অনুরূপ শব্দ এখনও বিদ্যমান থাকা সম্ভব। এ সম্বন্ধে, আশা করি যিনি এইরূপ শব্দ পাইয়াছেন, বা যাঁহার জরীপ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকার দরুন পাইবার সম্ভাবনা আছে, তিনি আমাদের কৌতূহল দূর করিবেন॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৩য় সংখ্যা, ১৩৩০

বাঙ্গালা ভাষায় কর্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া*

[১] বাঙ্গালা ভাষায় প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম-বাচ্য।

§ ১। ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি আর্য্যভাষায় খুব সম্ভব কর্ম- ও ভাব বাচ্যের অস্তিত্ব ছিল না। ইন্দো-ঈরানীয় যুগে, অর্থাৎ বৈদিক যুগের পূর্ব অবস্থায়, ক্রিয়ার আত্মনেপদ-রূপ হইতে কর্মবাচ্যের উৎপত্তি হয়। এই কর্ম-বাচ্যের বিশিষ্ট রূপ বৈদিকে (বর্তমান কালে) 'লট', 'লোট্', 'লঙ্', 'লিঙ্', ও 'লেট্'-এ, ও সংস্কৃতে কেবলমাত্র 'লট্'-এ এবং 'লুঙ্' প্রথম পুরুষ একবচনে ও '-মান'-প্রত্যয়-সিদ্ধ পদে মিলে। বৈদিকে ও সংস্কৃতে অন্য সমস্ত তিঙন্ত রূপে আত্মনেপদের দ্বারাই কর্ম-বাচ্যের কাজ চলিত। কর্ম-বাচ্যের বিশেষ চিহ্ন হইতেছে '-য-' প্রত্যয়। এই '-য-' প্রত্যয় উদাত্ত উচ্চারিত হইত, ধাতুতে এই প্রত্যয় জুড়িয়া, তৎপরে ইহাতে পুরুষ- ও বচন-দ্যোতক প্রত্যয় সংযোজিত করা হইত। যেমন—

√কৃ পরস্মৈপদী লট—'করোতি, করোষি, করোমি'।

আত্মনেপদী—'কুরুতে, কুরুষে, কুর্বে'।

কর্ম-বাচ্য লট্—'ক্রিয়তে, ক্রিয়সে, ক্রিয়ে'।

কর্ম-বাচ্য লুঙ্ প্রথম পুরুষ একবচনে—'অকারি'।

ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য বা বিশেষণ (কৃদন্ত)—'ক্রিয়মাণ'।

[এতদ্ভিন্ন বৈদিক রূপ—

লেট্—'ক্রিয়ৈ' (উত্তম পুরুষ), 'ক্রিয়াতে, ক্রিয়াতৈ' (প্রথম পুরুষ)।

লিঙ্—'ক্রিয়েয়, ক্রিয়েথা, ক্রিয়েতাম্'।

লঙ্—'অক্রিয়ে', ইত্যাদি।

লোট—'ক্রিয়স্ব', ইত্যাদি।]

§ ২। ভারতে আর্য্যভাষার ইতিহাসের প্রথম যুগে, অর্থাৎ বৈদিক বা সংস্কৃত যুগে, উপর্যুক্ত কর্ম-বাচ্যীয় প্রত্যয়-সিদ্ধ ক্রিয়া-পদের ব্যবহার সাধারণ ছিল। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ প্রাকৃত-যুগে, লুঙ্-এর লোপ হয়, লট্-এর প্রয়োগ অব্যাহত থাকে, এবং কর্ম-বাচ্যে লট্, ও ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, এই দুই প্রকারের

*নৈহাটীতে অনুষ্ঠিত (আষাঢ় ১৩৩০) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনে পঠিত।

পদে প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম-বাচ্য নিজ স্থান অটুট রাখিতে সক্ষম হয়। প্রাকৃত যুগে আত্মনেপদী রূপের (তিঙ্-এর) লোপ ঘটে। সংস্কৃতের 'ক্রিয়তে' পদ, প্রাকৃতে 'করিয়তি, করীয়তি, করিয়্যতি; করিয়দি, করীয়দি, করিজ্জদি; করীঅই, করিঅই, করিজ্জই'—এই প্রকার রূপ ধারণ করে; এই রূপগুলির মধ্যে '-তি'-প্রত্যয়ান্ত রূপগুলি প্রাচীন প্রাকৃতের (অশোক-অনুশাসনের ও পালির যুগের প্রাকৃতের), '-দি'- ও '-ই'-প্রত্যয়ান্ত পদগুলি মধ্য ও অন্ত্য যুগের প্রাকৃতের (সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃতের, ও অপভ্রংশের)। সংস্কৃতের কর্ম-বাচ্যের বিশিষ্ট প্রত্যয় '-য-', প্রাকৃতে '-ইঅ-' বা '-ঈঅ-' অথবা '-ইজ্জ-' রূপ প্রাপ্ত হয়, দেখা যাইতেছে। তদ্ভিন্ন, সংস্কৃতে যেখানে '-য-' পূর্ব-গামী ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, প্রাকৃতে সেখানে সংস্কৃতের বিকৃত রূপই দৃষ্ট হয়; যেমন 'দৃশ্-য- তে, দৃশ্যতে' = প্রাকৃতে 'দিশ্শতি, দিস্সতি; দিশ্শদি, দিস্সদি; দিস্সই, দিশ্শই'। সংস্কৃতের অনুসরণে, প্রাকৃতে আবার অকর্মক ধাতুতে কর্ম-বাচ্যের প্রসার ঘটে; যেমন 'ভব্বীঅতি, হুবীঅদি' = '*ভব্যতে', সংস্কৃত 'ভূয়তে'।

§ ৩। ভারতে আর্য্যভাষায় প্রগতির তৃতীয় স্তর হইতেছে হিন্দী আওধী বাঙ্গালা মারহাট্টী (মারাঠী) সিন্ধী রাজস্থানী পাঞ্জাবী প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলি। এই-সকল আধুনিক ভাষাতে কর্ম-বাচ্য কী উপায়ে দ্যোতিত হইয়া থাকে? এ ক্ষেত্রে দুই প্রকার পদ্ধতির প্রয়োগ পাওয়া যায়।

এক প্রকার পদ্ধতি হইতেছে বাক্য-বিন্যাসাত্মক; ইহাতে অন্য কোনও ধাতুর সাহায্য লইয়া, বাক্যটিকে ফেনাইয়া, কর্ম-বাচ্যের দ্যোতনা হয়; যেমন, সংস্কৃতের প্রত্যয়-সিদ্ধ এক-পদাত্মক কর্ম-বাচ্যীয় রূপ 'ক্রিয়তে'-র স্থলে, বাঙ্গালার বা হিন্দীর বহু-পদ-সিদ্ধ বাক্য-বিন্যাস-ময় কর্ম-বাচ্যীয় বাক্য, 'ইহা করা যায়,' 'ইহা করা হয়', বা 'য়হ কিয়া জায়্', 'য়হ কিয়া জাতা হৈ'। এই বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম-বাচ্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে (§ ১৮ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে আর্য্যভাষার প্রাচীন পদ্ধতি—প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বৈদিক বা সংস্কৃতের যুগের কথিত ভাষা হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ, প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ্ধতি। প্রাকৃতের '-ইঅ-, -ঈঅ-' বা '-ইজ্জ-, -ঈজ-' আধুনিক যুগের আর্য্যভাষাগুলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সকল আর্য্যভাষায় ইহা রক্ষিত হইতে পারে নাই। বাক্য-বিন্যাসাত্মক পদ্ধতির উদ্ভব হওয়ায়, কতকগুলি আর্য্যভাষায় ইহাদের প্রয়োগ দ্রুত সংকুচিত হইয়া পড়ে।

ভৌগোলিক সংস্থান হিসাবে আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিকে পাঁচটি ভাগে ফেলা

যাইতে পারে; পশ্চিমা ভাষা—পূর্বী- ও পশ্চিমা-পাঞ্জাবী, সিন্ধী, রাজস্থানী-গুজরাটী; দখিনা—মারাঠী; মধ্য-দেশীয়--পশ্চিমা-হিন্দী (হিন্দী, উর্দু বা হিন্দুস্থানী ব্রজভাখা, প্রভৃতি); পূর্বী—পূর্বী-হিন্দী (আওধী, বাঘেলী, ছত্রিশ-গড়ী), তথা ভোজপুরী, মৈথিলী, মগহী, ও বাঙ্গালা-অসমিয়া এবং উড়িয়া; এবং উত্তরিয়া বা পাহাড়ী ভাষা—পাঞ্জাবের পাহাড়ী অঞ্চলের ভাষা-সমূহ, কুমায়ুনী ও গাড়োয়ালী (গঢ়ৱালী), এবং নেপালী বা খস্‌কুরা। এই-সকল আধুনিক আর্য্য-ভাষার মধ্যে, পশ্চিমা ও উত্তরিয়া ভাষাগুলিতে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম-বাচ্য এখনও পূরা জোরে বর্তমান; কিন্তু মধ্য-দেশীয়, পূর্বী, ও দখিনা ভাষাগুলিতে, হয় ইহার একেবারে লোপ ঘটিয়াছে, নয় ইহা লোপোন্মুখ হইয়া, অপ্রচলিত ও সাধারণ্যে অজ্ঞাত-প্রকৃতিক হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, পশ্চিমা-পাঞ্জাবী, সিন্ধী ও রাজস্থানীতে, '-ঈ-, -ঈ-' বা '-ইজ-, -ঈজ-' প্রত্যয়ের যোগে কর্ম-বাচ্য সংগঠিত হয়; যথা—পাঞ্জাবী 'মার্‌দা' = মারন্ত, মারয়ন্, প্রহার করিতে করিতে: 'মারিন্দা' = ম্রিয়মাণ, প্রহৃত হইতে হইতে; 'চাহ্‌দা' = চাহন্ত, প্রার্থয়ন্: 'চাহিদা' = প্রার্থ্যমান (বাঙ্গালায় এই পাঞ্জাবী শব্দ, ইংরেজি demand অর্থে বহুশঃ প্রযুক্ত হয়); 'পঢ়ে' = পঠতি, পড়ে: 'পঢ়ীএ' = পঠ্যতে, পঠিত হয়; সিন্ধী 'করীজে, পঢ়ীজে' = কৃত হয়, পঠিত হয়; মারোয়াড়ী (মারৱাড়ী) 'করণো' = করণ, 'করীজণো' = কৃত হওন; নেপালী 'গরুঁ-লা (গর্‌-উঁ-লা)' = আমি করিব, 'গরীউঁলা (গর্‌-ঈ-উঁ-লা)' = আমাকে করা হইবে। পশ্চিমা ভাষাগুলির মধ্যে, এক-মাত্র আধুনিক গুজরাটীতে '-যা' এই প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম-বাচ্যের প্রয়োগ সংকুচিত হইয়াছে; কেবল উত্তম পুরুষে বর্তমানের বহু-বচনে এই ভাষায় '-ঈ'-প্রত্যয়-যুক্ত ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; যেমন—'হুঁ করুঁ' = অহং করোমি, আমি করি: 'অমে করীএ' = আমরা করি,—এখানে 'বয়ং কুর্মঃ' ইহার বিকার না হইয়া, হইয়াছে 'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে'-বাক্যের, 'ক্রিয়তে = করিঅই = করীএ'[১]; আধুনিক গুজরাটীতে অন্যত্র আ-কারান্ত ণিজন্ত ক্রিয়াকেই কর্ম-বাচ্যে ব্যবহার করা হয় (§ ২৯ দ্রষ্টব্য)।

১। L. P. Tessitori, Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, §136, (Indian Antiquary, 1915) দ্রষ্টব্য। R. L. Turner কিন্তু Journal of the Royal Asiatic Society, 1916, p. 227-তে গুজরাটীর 'করীএ' প্রভৃতি বহু-বচন ক্রিয়া-পদের অন্য-রূপ ব্যাখ্যার প্রয়াসী হইয়াছেন: কুর্মঃ = করিমো = করিমু = করী = করী + প্রথম পুরুষ বহু-বচনের 'এ'-প্রত্যয় = করীএ।

§ ৪। দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমা ভাষাগুলি প্রাচীন ভারতীয় মূল আর্য্য-ভাষা হইতে লব্ধ প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম-বাচ্যের সংরক্ষণ বিষয়ে রক্ষণ-শীল। মধ্য-দেশীয় ভাষায় (হিন্দীতে) সাধারণতঃ প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম-বাচ্যীয় পদের আর বহুল প্রয়োগ নাই; কিন্তু ইহার পূরা লোপ এখনও ঘটে নাই, ইহা কচিৎ দৃষ্টও হয়। যেমন, ব্রজভাখা 'মারৈ' = মারে, মারয়তি; 'মারিয়ৈ' = মৃত বা প্রহৃত হয়, ম্রিয়তে। পূর্বী ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম আওধীতেও কচিৎ এই কর্ম-বাচ্য মেলে; কিন্তু আজকালকার ভাষায় নয়, তুলসীদাসের প্রাচীন ভাষায়; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ও তেস্‌সিতোরি মহাশয়-দ্বয় এইরূপ প্রয়োগ দেখাইয়াছেন[২]।

আধুনিক হিন্দী বা হিন্দুস্থানীতে যে সম্ভ্রমে অনুজ্ঞার প্রয়োগ আছে—যেমন 'কীজিএ' বা 'করিয়ে', তাহা, খুব সম্ভব, প্রাচীন প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়া হইতে জাত; অন্ততঃ পক্ষে, ইহা প্রাচীন বিধিলিঙের উপর কর্ম-বাচ্যের প্রভাবের ফলে সৃষ্ট পদ[৩]।

হিন্দীর 'কপড়া চাহিয়ে' = বাঙ্গালা 'কাপড় চাই', এই বাক্য-দ্বয়ে 'চাহিয়ে' বা 'চাই' শব্দ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়া; 'চাই' = 'চাহিয়ে' = প্রাকৃতে '* চাহিঅই, চাহিয়দি'; 'চাহ্' ধাতুর সংস্কৃত রূপ মেলে না; মিলিলে, সংস্কৃত রূপ '* চহ্যতে' বা '* চঘ্যতে' এই প্রকার হইত। বাঙ্গালায় 'কি চাই'-এর সঙ্গে, 'কি চাও' এই বাক্যের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, 'কি চাই' = কিং প্রার্থ্যতে, ও 'কি চাও' = কিং প্রার্থয়ধ্বে; 'তোমার আসা চাই' = তব আগমনং প্রার্থ্যতে। আধুনিক হিন্দীতে '-ই-, -ঈ-, -ঈজ-' -যুক্ত কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়া লুপ্ত-প্রায় হইলেও, প্রাচীন হিন্দীতে ইহার প্রয়োগ বিশেষ প্রবল ছিল। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' পুস্তকে যে-সকল কবিতার সংগ্রহ আছে, সেগুলির অধিকাংশের ভাষাকে এক রকম প্রাচীনতম যুগের হিন্দী (পশ্চিমা হিন্দী) বলা যাইতে পারে; এই ভাষায় প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম-বাচ্য বিশেষভাবে বর্তমান। রাজস্থানীর সঙ্গে তুলনা করিলে, আধুনিক হিন্দীতে এই কর্ম-বাচ্যের লোপ একটু বিশেষ করিয়াই দৃষ্টিতে

২। Wilson Philological Lectures (1877), Bombay, 1914, p. 227, Journal of the Royal Asiatic Society, 1914, p. 901 ff.

৩। এ-সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—A. R. Hoernle, Comparative Grammar of the Gaudian Languages, §§ 480, 481, 499.

লাগে। পুরাতন মারাঠীতে '-ইজ-' কর্ম-বাচ্য প্রচলিত ছিল[৪]। আধুনিক মারাঠীতে ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

§ ৫। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের[৫] বাঙ্গালায়, ও মাগধী-প্রাকৃত-সম্ভূত, বাঙ্গালার ভগিনী-স্থানীয় অন্যান্য আর্য্য ভাষায়, প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম-বাচ্য কত-দূর রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। বাঙ্গালা ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ব্বেকার যুগের বাঙ্গালা ভাষা বা সাহিত্য আলোচনা করিবার কোনও উপকরণই আমাদের হাতে ছিল না। কিন্তু ঐ সালে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক দুই-খানি বই প্রকাশিত হয়; ঐ দুই বইয়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্গালার আলোচনার জন্য কতকগুলি অতি মূল্যবান্ বস্তু বা উপকরণ বাঙ্গালা-ভাষানুশীলন-কারীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বই দুইখানি হইতেছে [১] মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'; এবং [২] শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্তৃক অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য।

§ ৬। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে নেপাল হইতে প্রাপ্ত এই কয়-খানি প্রাচীন পুঁথি প্রকাশিত হইয়াছে: [ক] 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়'; বৌদ্ধ সহজিয়া মতের কতকগুলি 'চর্য্যাপদ' বা গান; পুঁথিতে ৫০টি গান ছিল, কিন্তু কতকগুলি পাতা খণ্ডিত বলিয়া আমরা ৪৭টি মাত্র গান পাইয়াছি। এই গানগুলি প্রাকৃত-জ ভাষায় লিখিত; এবং এই ভাষাই হইতেছে প্রাচীনতম যুগের বাঙ্গালা, বা বাঙ্গালার প্রাচীনতম নিদর্শন। গানগুলির উপর একটি সংস্কৃত টীকা আছে।

৪। ভাণ্ডারকর-কৃত Wilson Philological Lectures, pp. 226-227.

৫। আলোচনার সুবিধার জন্য বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসকে তিন যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: [১] প্রাচীন যুগ: বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি (অর্থাৎ বাঙ্গালার বিশেষ রূপের বিকাশ ও ইহার স্বস্থ-স্থানীয় অন্য ভাষা হইতে পার্থক্যভাব) হইতে তাহার সাধারণ-রূপ-ধারণ পর্য্যন্ত, মোটামুটি ৯০০ বা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; [২] মধ্য যুগ: যে যুগে বাঙ্গালা ভাষা দাঁড়াইয়া যায়, ও উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত কতকগুলি নূতন রীতি ইহাতে আসিয়া পড়ে: মোটামুটি ১২০০ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত; এই ৬ শত বৎসরকে আবার সন্ধি-ক্ষণীয় (Transitional), আদিম, মধ্যম ও অন্ত্য, এই চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১২০০-১৩০০; ১৩০০-১৫০০; ১৫০০-১৭০০; ১৭০০-১৮০০) [৩] আধুনিক যুগ: ১৮০০র পরে। (এই যুগ-বিভাগ কিঞ্চিৎ আলোচনা- ও বিচার-সাপেক্ষ; এক্ষণে তাহার অবতারণা সম্ভবপর নহে)।

[খ] ও [গ] সরহ বা সরোজ-বজ্রের এবং কাহ্ন বা কৃষ্ণ-পাদের 'দোহাকোষ'; এই দুইখানি দোহাকোষে কোনও প্রাকৃত-জ ভাষায় কতকগুলি গান ও দোহা আছে; ইহাদের সংস্কৃত টীকাও আছে, গান ও দোহাগুলির বিষয়, চর্য্যাপদগুলিরই মতো, সহজিয়া বৌদ্ধ মতের সাধনার বিষয়। এই দুই দোহাকোষের ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকার পশ্চিমা অপভ্রংশ, এবং এই ভাষা বাঙ্গালা নহে। [ঘ] 'ডাকার্ণব' বা 'মহাযোগিনী-তন্ত্ররাজ্য'; এই বইখানি খণ্ডিত, ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক ও একটি প্রাকৃত-জ ভাষায় লিখিত বহু বাক্য আছে; সংস্কৃত ছায়া বা টীকা না থাকায়, এই প্রাকৃত-জ ভাষা দুর্বোধ্য হইয়া আছে; ইহাও মূলে কোনও পশ্চিমা অপভ্রংশ, বাঙ্গালা নহে।

চর্য্যাগুলির ভাষাই প্রাচীন বাঙ্গালা; শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহা ১০ম-১১শ শতকের ভাষা; আমার ধারণা, ইহাকে ১০ম হইতে ১৩শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত সময়ের প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার নমুনা হিসাবে নিঃসংকোচে গ্রহণ করা যাইতে পারে[৬]। দোহাকোষ-দ্বয়ের ভাষা পশ্চিমা অপভ্রংশ, চর্য্যাপদের ভাষা হইতে কিছু প্রাচীন; খ্রীষ্টীয় ৯ ১০ শতকের যুগে এই প্রকারের ভাষা মধ্য-দেশে ও

৬। চর্য্যাপদের ভাষা বাঙ্গালা কি না, এ-সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম আলোচনা-কারীদের মধ্যে এক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র চারিখানি বইয়ে যে একাধিক ভাষা বিদ্যমান আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। চর্য্যাপদের ৪৭টি গান আমরা পুঁথিতে যে আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে মূলের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হইয়াছে, পুঁথি লেখা হইয়াছিল নেপালে, নকলকার যে বাঙ্গালা বা গানের ভাষা জানিতেন না, তাহা বেশ বুঝা যায়, মূলের পাঠ যে বহু-স্থলে লিপিকর-প্রমাদ প্রসূত, তাহা টীকায় প্রদত্ত পাঠ দেখিলেই ধরা যায়। কিন্তু গানগুলির ভাষাতে যে বিশিষ্টরূপে বাঙ্গালার ছাঁচ বিদ্যমান, তাহা ধরিতে বিলম্ব হয় না। গানের ভাষার ব্যাকরণে এই কয়টি প্রধান বাঙ্গালা ভাব: কর্ত্তৃকারকে ও করণে '-এ, -এঁ' প্রত্যয়, সম্প্রদানে '-রে', অধিকরণে—'-এ, -ত, -তে, -তেঁ', সম্বন্ধ-পদে '-র, -এর', ক্রিয়াপদে অতীতে '-ইল' ভবিষ্যতে '-ইব' (বিহারীর মতো '-অল', '-অব' নহে—তবে '-অব' দুই-এক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে), অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে—'-ইআ', '-ই', কার্য্যান্তর-সাপেক্ষ অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে—'-ইলে', এবং '-অন'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যের বাহুল্য লক্ষণীয়। এইগুলি হইতেছে বাঙ্গালার বিশেষ রূপ। এতদ্ভিন্ন এই ভাষায় ব্যাকরণ-ঘটিত এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা সহজেই মধ্য যুগের বাঙ্গালার ও আধুনিক প্রাদেশিক বাঙ্গালার সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় গানগুলিতে ব্যবহৃত শব্দ-সমষ্টির বাঙ্গালা প্রকৃতি দেখাইয়াছেন। ইহার কতকগুলি বাক্য-রীতি বিশেষ ভাবে বাঙ্গালা, এবং গানের অনেক পদের বা কলির ছায়া মধ্য যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে

রাজস্থান এবং গুজরাট অঞ্চলে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। আধুনিক পশ্চিমা-হিন্দী, রাজস্থানী ও গুজরাটী, এই শৌরসেনী

বিদ্যমান, একটি দৃষ্টান্ত: ৬ সংখ্যক চর্য্যাপদে:—'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী': শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, ৭৮ পৃষ্ঠায়, 'চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল নিজ মাঁসে জগতের বৈরী', ৮৮ পৃষ্ঠায় 'আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥' কবিকঙ্কণে, 'হরিণ জগত-বৈরী আপনাব মাংসে' (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৫৪)।

চর্য্যার গানে যে সকল ছবি আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করে, সেগুলি বাঙ্গালা দেশের, নৌকা, গুণ টানা, নদী লইয়া এত উপমা তো বাঙ্গালা দেশের বাহিরে পাওয়া যায় না। ইহাতে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব বাঙ্গালার কথা আছে। সহজিয়া ধর্ম, ও সহজিয়া ঢঙের গান রচনা করা ধারাবাহিক রূপে বাঙ্গালা দেশেই প্রচলিত, বৈষ্ণব পদাবলী, দেহ-তত্ত্বের গান, বাউলের গান, শ্যামা-সংগীত, এ সবের আদিতে এই চর্য্যাপদ ও তজ্জাতীয় গান। বাঙ্গালা-ভাষী জাতির জাতীয়তার উন্মেষ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে, তাহার আগে বাঙ্গালা ভাষা গড়িয়া উঠে নাই, তাই বাঙ্গালা দেশের লোকে তখনকার যুগের একটা বড়ো সাহিত্যেব ভাষা, পশ্চিমা অপভ্রংশ, ব্যবহার করিত, এবং লুই, কাহ্ন, ভুসুক প্রভৃতি বাঙ্গালায় লিখিতে আরম্ভ করিলেও এই অপভ্রংশের রেওয়াজ অন্তর্হিত হয় নাই। কাহ্ন, সরহ প্রভৃতি, ইহাঁরা নিজ মাতৃ-ভাষা বাঙ্গালায় এবং পশ্চিমা অপভ্রংশে, এই দুইয়ে গান ও কবিতা রচিয়া গিয়াছেন: যেমন পরবর্তী যুগে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি, নিজ মাতৃ-ভাষা মৈথিলে, ও পশ্চিমা অবহট্‌ঠ বা অপভ্রষ্ট ভাষায়ও লিখিয়াছেন। পশ্চিমা ভাষার বহুল প্রচাব ও প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালা দেশে থাকার দরুন, চর্য্যাপদের বাঙ্গালায় কতকগুলি পশ্চিমা ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপ আসিয়া গিয়াছে, যেমন—'কিউ'=কৃত, করিল, প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ হইবে 'কৈল', 'চলিউ'= বাঙ্গালা 'চলিল', 'জো সো'=বাঙ্গালা 'জে সে', 'তসু'=তস্স=বাঙ্গালা 'তা', বা 'তাহ-র' ইত্যাদি, ইহা খুবই সম্ভব যে নেপালে বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ নকল-নবীশের হাতে পড়িয়া গানগুলিতে বাঙ্গালা রূপের পরিবর্তে পশ্চিমা অপভ্রংশের রূপ আসিয়া গিয়াছে। চর্য্যাপদের ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, ইহা প্রাচীন বাঙ্গালা, চর্য্যার ভাষা 'প্রাকৃত' বা 'অপভ্রংশ' নহে, কারণ ইহাতে প্রাকৃতের দুই ব্যঞ্জনকে সংক্ষেপ করা হইয়াছে: যেমন— বর্ত্ম>বট্ট>বাট, ধর্ম>ধম্ম>ধাম, আয়াত+ইল+ক>আয়িল্ল, আয়িল, আইল, শয্যিকা> সেজ্জিঅ>সেজি, ইত্যাদি। এই লক্ষণ আধুনিক আর্য্য ভাষার লক্ষণ। ইহা একটি মিশ্র বা 'খিচুড়ী' ভাষা নহে, কারণ (অপভ্রংশ-প্রভাবের ফলে আগত রূপগুলি ভিন্ন) ইহার সমস্ত রূপ বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ধরিয়া দেখিলে সহজেই ব্যাখ্যাত হয়।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কেবল চর্য্যাপদের ভাষাকেই বাঙ্গালা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২৫, পৃষ্ঠা ২১)। জরমানির বোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারমান য়াকোবি মহাশয় তৎ-সম্পাদিত 'সনৎকুমার-চরিত' নামক পশ্চিমা অপভ্রংশ কাব্যের ভূমিকায় চর্য্যাপদের ভাষা যে-'নিঃসন্দেহ-রূপে' বাঙ্গালা, এ-বিষয়ে আমার সহিত এক-মত হইয়াছেন।

অপভ্রংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত, এবং পশ্চিমা-হিন্দী (হিন্দুস্থানী, ব্রজভাখা প্রভৃতি) এই শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত। এই পশ্চিমা অপভ্রংশ সেই যুগের হিন্দীর মতো ছিল। পূর্ব-ভারতে কথাবার্তায় ব্যবহৃত না হইলেও, সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মতো ইহা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত।

§ ৭। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বাঙ্গালা ভাষার মধ্য যুগের প্রাচীনতম পুস্তক। চর্যাপদে বাঙ্গালা ভাষা তখনও তরল অবস্থায়, কিন্তু বাঙ্গালা মূর্তি ধরিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা একেবারে বিশিষ্ট, সুপরিজ্ঞাত বাঙ্গালা ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছে। যে পুঁথিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় প্রাচীন-লিপিবিৎ পণ্ডিতের অভিমত অনুসারে, খ্রীষ্টীয় ১৩৫০-১৪০০র মধ্যে লিখিত; পুঁথিখানি গ্রন্থকারের সমসাময়িক। সৌভাগ্য-ক্রমে, পুঁথিখানি প্রাচীন বলিয়াই আমরা ১৪শ শতকের বাঙ্গালার বিশুদ্ধ নিদর্শন পাইতে পারিয়াছি। অন্যথা, বাঙ্গালার অন্যান্য প্রাচীন কবির ভাষার মতো, পরবর্তী পুঁথি-পরম্পরায় পরিবর্তিত হইয়া আসিতে আসিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীন ভাষা আধুনিক বাঙ্গালার রূপ ধরিয়া বসিত।

চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা—ইহাদের ছন্দঃ, বর্ণ-বিন্যাস ও পদ-সাধন, সমস্তই ইহাদের প্রাচীনত্বের পরিপোষক[৭]। ইংরেজি ভাষার ইতিহাস আলোচনায়, লায়ামন, ওরম্ ও চসারের ভাষার তথা আংগ্লো-সাক্সনের যে স্থান, বাঙ্গালা-ভাষানুশীলনে যথা-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও চর্যাপদের ভাষারও ঠিক সেই স্থান।

§ ৮। সরহ ও কাহ্নের দোহাকোষের পশ্চিমা অপভ্রংশ ভাষায়, '-ই-, -ইজ্জ-, -ঈজ-'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার কতকগুলি উদাহরণ মেলে; যেমন—'পুরাণেঁ বক্‌খানিজ্জই' ('বৌদ্ধগান ও দোহা', পৃঃ ৮৯)=পুরাণে ব্যাখ্যাত হয়;

৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।) কিন্তু বঙ্গ ভাষানুশীলন-কারীদের অগ্রণী, বহুশাস্ত্র-বিৎ শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমরা এক-মত হইতে পারি না, নিরপেক্ষ বিচার করিলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। ২৬শ বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের ন্যায় প্রাচীন-সাহিত্যানুশীলক ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ে-অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে প্রামাণিক গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অনুকূল রায় দিয়াছেন।

'সো মাই কহিজে' (পৃঃ ১০৩; ='সো মই কহিজ্জই') = তাহা মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়; 'সো পরমেস্সুরু কাসু কহিজ্জই' (পৃঃ ১০৩) = সে পরমেশ্বর [-এর বিষয়] কাহাকে কহা যায়; 'বিসয় রমন্ত ণ বিসঅ বিলিপ্যাই (= বিলিপ্পই)' (পৃঃ ১০৫) = বিষয় ভোগ করিতে করিতে বিষয়ে লিপ্ত হয় না (বিলিপ্যতে); 'দেব পি (= বি) জ্জই (= জই) লক্ষ (= লক্‌খ) বি দীসই, অপ্যণু (= অপ্পণু) মারীঈ, স [কি] করিঅই' (পৃঃ ১০৬) = যদি (জই) দেবতাও সাক্ষাৎ (লক্ষ) দৃষ্ট হন (দীসই = দিস্‌সই = দিস্‌সদি = দৃশ্যতে), নিজে (অপ্পণু) সে মরে (মারীঈ = মারীঅদি = ম্রিয়তে), কিই বা করা হয় (করিঅই = ক্রিয়তে); 'কাসু কহিজ্জই' (পৃঃ ১০৯) = কাহাকে কহা হয়; 'অইসো সো নিব্বাণ ভণিজ্জই জহি মন মানস কিং পি ন কিজ্জই' (পৃঃ ১৩৯) = সেই নির্বাণকে এহেন বলা হয়, যেখানে মন কিংবা মন-জাত কিছুই করা হয় না; 'জই পবন-গমন-দুআরে দিত তালা বি ভিজ্জই, জই তসু ঘোরান্ধারে মন দিব হো কিজ্জই' (পৃঃ ১৩০)—যদি পবন-গমন-দুয়ারে দেওয়া তালাকে ভেদ করা হয় (ভিদ্যতে), যদি তার (সেই) ঘোর আঁধারে মনকে প্রদীপও করা হয়; ইত্যাদি।

§ ৯। দোহাকোষের পশ্চিমা অপভ্রংশে '-ই-' প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা গেলেও, '-ইজ্জ-' প্রত্যয়েরই প্রয়োগ বেশি পরিমাণে বর্তমান। চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালাতে প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার উদাহরণ আছে; এখানে কিন্তু '-ই-'র ব্যবহার মিলে, '-ইজ্জ-'র নহে; '-ই-' ভিন্ন, পূর্ব-ব্যঞ্জনের সহিত মিলিত '-য়'-কারের দুইটি নিদর্শন আছে। যেমন—'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই' (চর্য্যা ১) = সকল-সমাধ্যা কিং ক্রিয়তে; 'হরিণা হরিণির নিলয় না জানী' (চর্য্যা ৬) = হরিণস্য হরিণীকরঃ (= হরিণ্যাশ্চ) নিলয়ঃ ন জ্ঞায়তে; 'হরিণার খুর ন দীসঅ (দীসই)' (চর্য্যা ৬) = হরিণস্য-করং (হরিণস্য) ক্ষুরং ন দৃশ্যতে; 'পাবিঅই', 'ভাবিঅই' (চর্য্যা ২৬) = প্রাপ্যতে, ভাব্যতে; 'দুহিএ' (চর্য্যা ৩৩) = দুহ্যতে; 'ছিজ্জই' (চর্য্যা ৪৫) = ছিদ্যতে। চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালাতে বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম-বাচ্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হইলেও, প্রাচীন প্রত্যয়-মূলক রীতিরই বহুল প্রসার লক্ষিত হয়। বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম-বাচ্য চর্য্যাপদে অন-প্রত্যয়ান্ত নাম-শব্দের সহিত 'জা' বা 'যা' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন হয়; যেমন 'ধরণ ন জাই' (চর্য্যা ২) = ধরণ না যায়, ধরা যায় না।

'-ই-, -ইজ-'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম-বাচ্য পশ্চিমা শৌরসেনী অপভ্রংশে বিদ্যমান; খুব সম্ভব, মাগধী অপভ্রংশ, যাহা হইতে বাঙ্গালার উদ্ভব, তাহাতে '-ইজ্জ-'

প্রত্যয়ের প্রচলন ছিল না, মাত্র '-ইঅ-'-প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম-বাচ্যেরই ব্যবহার ছিল। মাগধী অপভ্রংশ হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা এই প্রত্যয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অতি শীঘ্রই বাঙ্গালা-ভাষীদের কাছে ইহার প্রকৃত স্বরূপ লুপ্ত হইয়া যাইতে থাকে। 'যা' ধাতুর সাহায্যে বিন্যস্ত বাক্য-মূলক কর্ম-বাচ্যের উদ্ভব ও প্রচারকে এই লোপের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে।

§ ১০। ৪৭টি চর্য্যাপদে '-ই-' কর্ম-বাচ্যের উদাহরণ নিতান্ত কম নয়, প্রায় ২০টি পাওয়া যায়। মধ্য যুগের বাঙ্গালায় এই প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম-বাচ্য প্রাচীন রীতির ধারা বজায় রাখিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছে, এই প্রত্যয় আর জীবিত নয়, ইহা প্রাচীনের মুমূর্ষু চিহ্নাবশেষ মাত্র। বাঙ্গালা-ভাষীদের ভাষাত্মবোধে আর এই প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম-বাচ্যের স্থান নাই; তাই এই বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলন-কারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। যতই বাঙ্গালা ভাষা আমাদের বর্তমান সময়ের দিকে আগাইয়া আসিতেছে, ততই এই প্রত্যয়ের সত্তা দুর্বল ও দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়িতেছে দেখা যায়। অবশেষে এই প্রত্যয়, বর্তমান উত্তম পুরুষের প্রত্যয়ে জড়িত হইয়া, সম্পূর্ণ-রূপে কর্তৃ-বাচ্যের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়।

§ ১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে '-ই-' প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম-বাচ্যের বহু নিদর্শন আছে। কতকগুলি উদ্ধৃত হইল :

পৃঃ ১৯—'যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাএ ॥ ৪ ॥
উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল—হেন কাম না করিএ।'

('করিএ' = করিঅই = ক্রিয়তে ; এরূপ করা হয় না, করা ঠিক নয়।)

পৃঃ ৫৭—'আইহন বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী।

(অভিমন্যুঃ বীর ইতি ত্রিভির্লোকৈঃ ভদ্রং জ্ঞায়তে = জাণিঅদি, জাণিঅই, 'জাণী'।)

পৃঃ ৫৯—'দাণ সাধিএ রতি পতিআশে।'

('সাধিএ'—তৎসম 'সাধ্' ধাতু কর্ম-বাচ্যে = দান সাধা হয়।)

পৃঃ ১১৮—'ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ দুঈ হাথে না খাইএ।'

('খাইএ' = খাইঅই, খাদিঅদি, (খাদ্যতে) ; দুই হাতে খাওয়া হয় না, দুই হাতে খাওয়া ঠিক নয়)।

পৃঃ ১৩৭—'আপণা রাখিএ আপণে।'

('রাখিএ' = রক্‌খিঅই = রক্ষ্যতে ; আত্মা রক্ষ্যতে আত্মনা।)

পৃঃ ১৪৫—'নাএর আন্তরে গেলী চন্দ্রাবলী রাহী।

তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী ॥
কথো দূর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ।
সত্বর হয়িআঁ রাহী তার পাস যাএ ॥'

('দেখিএ' = দেক্‌খিঅই = * দৃক্ষ্যতে = দেখা হয়, দৃষ্ট হয়)

পৃঃ ১৮৪—'বোলেঁ চালেঁ না পাইএ পরার রমণী।' ('পাইএ' = পারিঅই = প্রাপ্যতে।)

পৃঃ ১৮৫—'গোপত কাজত কাহ্নাঞিঁ ছয় আখি বারী।' ('বারী' = বারিঅই = বার্য্যতে।)

পৃঃ ২৮৯—'পুনমীর চান্দ তোহ্মার [তোম্হার] বদন ঘুসিএ জগতজনে ল।' ('ঘুসিএ' = ঘোসিঅই = ঘুষ্যতে, ঘোষিত হয়।)

পৃঃ ৩৬৭—'সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ, জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে জুড়িএ কাহার বাপে ॥'

('জুড়িএ' = জোড়া হয় ; তাপে, বাপে = করণে '-এ' বিভক্তি)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। পরবর্তী যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে এই প্রকারের '-ইএ-, -ইয়ে-'-প্রত্যয়-সিদ্ধ ক্রিয়া মিলিলে, সাধারণ বাঙ্গালী এই '-ইএ-'-কে বর্তমান উত্তম-পুরুষের '-ই-' প্রত্যয়-রূপেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, ও '-এ-'কে ছন্দোরক্ষার জন্য আনীত অক্ষর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'পাইএ', 'করিএ' প্রভৃতি পদ খাঁটি কর্ম-বাচ্যের পদ ; কর্ম-বাচ্যে ইহাদিগকে ধরিলে, উদ্ধৃত বাক্যগুলির যে সহজ ও সরল সমাধান হয়, উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া করিয়া ধরিলে তাহা হয় না। 'পাইএ, করিএ' প্রভৃতি আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গালা ভাষার পদ, চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালা 'পারিঅই, করিঅই'-এর পরিবর্তিত রূপ ;=প্রাকৃতে 'পারিঅই, করিঅই' <* 'পারিঅদি, করিঅদি < * পাপিঅতি, করিঅতি < * প্রাপ্যতি, * কর্য্যতি <প্রাপ্যতে, ক্রিয়তে।

প্রাচীন বাঙ্গালাতে কর্ম-বাচ্য মুমূর্ষু অবস্থায়। মধ্য-যুগের বাঙ্গালার কর্তৃবাচ্যের উত্তম-পুরুষের সহিত রূপ-সাদৃশ্যে দুইয়ে গোলমাল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ-ক্ষেত্রে গুজরাটীতে যাহা ঘটিয়াছিল—'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে'>'অমে করীএ', অর্থাৎ কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার ক্রমে কর্তৃবাচ্যে পরিণতি, তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে (§ ৩)।

§ ১২। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির যুগে (অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালার ও তাহার অব্যবহিত পূর্বের অবস্থায়), কর্তৃ-কারকের ও করণের মধ্যে গোলমাল

ঘটিয়াছিল। এই দুই সম্পর্কের সংমিশ্রণ আধুনিক বাঙ্গালায়ও বিরল নয়। সর্বনাম হইতে উদাহরণ লওয়া যাউক্; সংস্কৃত 'অহম্' শব্দে স্বার্থে 'ক' যোগ করিয়া প্রাচীন প্রাকৃতে 'অহকং' রূপ সৃষ্ট হইল; 'অহকং' অশোকের ধৌলি লিপিতে 'হকং' রূপে পাওয়া যায়। 'হকং' হইতে প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'হউঁ' (হকং >* হগং >* হঅং >*হঅং>হউঁ), 'হউঁ' চর্য্যাপদে 'হাউ' এই রূপে মেলে। যেমন, 'তু লো ডোম্বী হাউ কাপালী' (চর্য্যা ১০); 'এত কাল হাউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ' (চর্য্যা ৩৫)। প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'হাঁউ'-এর পাশাপাশি 'মই, মই' রূপও প্রচলিত ছিল; 'মই'<সংস্কৃত 'ময়া'+তৃতীয়ার '-এন'='*ময়েন'। আদিম-মধ্য যুগে বাঙ্গালায় এই 'হউঁ' লুপ্ত হয়, 'মই, মুই, মুঞি' তাহার স্থান লয়: প্রথমার 'হউঁ' ও তৃতীয়ায় 'মই' দুইয়ে মিলিয়া যায়, 'মই'-ই দাঁড়াইয়া যায়। ('আহ্মা' [আম্হা] 'আহ্মী' [আম্হী] মূলে বহু বচনের সর্বনাম; ইহা মধ্য যুগে বাঙ্গালায় এক বচনে ব্যবহৃত হইতে থাকে : আহ্মা [আম্হা] <অস্ম- ; আহ্মী [আম্হী]<অম্হেহি, অম্হহি<অস্মাভিঃ)। 'হউঁ' লোপ পাইল বটে, কিন্তু ভাষায় তাহার চিহ্ন রাখিয়া গেল; নিষ্ঠা '-ত'+'-ইল-'-প্রত্যয়-যুক্ত যে অতীত কালের ক্রিয়া মাগধী অপভ্রংশে উদ্ভূত হয়, যাহা হইতে বাঙ্গালার অতীতের '-ইল' প্রত্যয় ('চল্' ধাতু+'-ত'=চলিত; চলিত+-ইল=চলিঅ+-ইল্ল, চলিল্ল= চলিল, চলিলা), তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় উত্তম পুরুষে 'হউঁ' যুক্ত হইতে লাগিল : 'চলিল, চলিলা+হউঁ>চলিলহোঁ, চলিলাহোঁ>চলিলওঁ, চলিলাওঁ, চলিলোঁ>চলিলুঁ, চলিলুঙ, চলিলুম>চ'ললুম, চলিনু, চন্নু' ইত্যাদি। তদ্রূপ, '-তব্য'-প্রত্যয়-যুক্ত রূপ, যাহা বাঙ্গালা ও উড়িয়াতে '-ইব' প্রত্যয়ে দাঁড়াইয়া গেল, তাহাতেও 'হউঁ' যুক্ত হইতে লাগিল: 'চলিতব্য=চলিঅব্ব, চলিব; চলিব, চলিবা +হউঁ>চলিবহোঁ, চলিবাহোঁ>চলিবোঁ>চ'লবো,>চলিমু, চ'লমু'; ইত্যাদি। মধ্যম পুরুষেও তদ্রূপ 'ত্বং'>'তু', ক্রমে তৃতীয়ার 'ত্বয়া'+'-এন'> * 'ত্বয়েন' >'তই, তুই' কর্তৃক দূরীভূত হইল।

তদ্ভিন্ন, আধুনিক অন্যান্য আর্য্য ভাষার মতো, প্রাচীন বাঙ্গালাতেও সকর্মক ক্রিয়া বাস্তবিক পক্ষে '-ত'-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ, কর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিত; এবং কর্তা তৃতীয়া বিভক্তিতে (করণ কারকে) হইত : যেমন—'ময়া পুস্তিকা পঠিতা' = '*মই পোথী পঢ়িলী', পরে 'মই পুথী পঢ়িলা+হউঁ=পঢ়িলাহোঁ, পড়িলুম'। অকর্মক ক্রিয়ায় কিন্তু ক্রিয়া কর্তারই বিশেষণ-স্থানীয় ছিল, কর্তাকে আশ্রয় করিয়াই থাকিত; যেমন 'অহং চলিতঃ'='* হউ চলিল'; 'রাধিকা চলিতা'='চলিলী রাহী'।

'হউ চলিল'—এখানেও 'হউ' ক্রমে 'মই' কর্তৃক বিতাড়িত হইল; কর্তৃ-কারক ও করণ-কারকে ভেদ না করিবার অভ্যাস এই রীতি প্রবর্তিত হওয়ার অন্যতম কারণ[৮]। তদ্ভিন্ন, প্রাচীন বাঙ্গালায় ও মধ্য যুগের বাঙ্গালায় প্রথমা ও তৃতীয়ার রূপের পার্থক্য বড়ো একটা ছিল না; উভয়েরই প্রত্যয় ছিল '-এ'; তৃতীয়ার মূল প্রত্যয় হইতেছে সানুনাসিক '-এঁ' (= সংস্কৃত '-এন'), কিন্তু '-এঁ-' প্রথমাতে (কর্তৃ-কারকে)-ও যুক্ত হইত। এই সব কারণে প্রাচীন বাঙ্গালায় ক্রিয়া-পদের কর্ম-বাচ্য হইতে কর্তৃ-বাচ্যে আনয়ন সহজ হইয়াছিল। কর্তৃ-বাচ্য হইতেছে সরল, সহজ বাক্য-রীতি; কর্ম-বাচ্যে বিতর্কের স্থান আছে, কর্ম-বাচ্য ভাবের বিশ্লেষণের ও চিন্তার অপেক্ষা রাখে, সুতরাং সহজেই ইহা পরিত্যক্ত হইতে পারে; বিশেষ অকর্মক ক্রিয়ার কর্ম-বাচ্য সম্বন্ধে (অর্থাৎ ভাব-বাচ্য সম্বন্ধে) এই বিচারের কথা বেশি করিয়া খাটে। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও মধ্য যুগের বাঙ্গালাতে ভাব-বাচ্যের সূক্ষ্ম ধারাটুকু বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, সাধারণ বুদ্ধির লোকে সহজেই তাহাকে প্রথম পুরুষের কর্তৃ-বাচ্যে আনয়ন করিতে পারিলে খুশী হয়। যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, 'পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গ জাইএ, নানা উপভোগ পাইএ' (পৃঃ ৬৬।)—এখানে 'জাইএ, পাইএ' = গম্যতে, প্রাপ্যতে; গম্যতে = 'কোনও অনির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক গমন ক্রিয়া সাধিত হয়'—এইরূপ বিচার-মূলক ধারণার পরিবর্তে, 'লোকে যায়', মানুষে যায়', এইরূপ সরল ধারণাই সহজ; কাজেই ভাব-বাচ্যের ক্রিয়ার কতৃ-বাচ্যে আনয়ন শীঘ্র শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল।

§ ১৩। মধ্য যুগের বাঙ্গালায় প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপ সুপ্রচুর। আরও কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল; এগুলি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' হইতে উদ্ধৃত হইল।

ব-সা-প, ২য় খণ্ড—চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে—

'নীল মুকুতার হার মনোহর শোভিত দেখিএ গলে'। ('দেখিএ' = দেক্‌খিঅই = দৃশ্যতে)।

'অবলা পরাণে এত কি সহিএ'। ('সহিএ' = সহা হয়, সহা যায়)।

'ক্ষুরের উপর রাধার বসতি, নড়িতে কাটিয়ে দে'।

৮। এখানে অনেকে মাগধী অপভ্রংশের উপর ভোট-ব্রহ্ম ভাষার প্রভাব দেখেন। তিব্বতী প্রভৃতি ভোট-ব্রহ্ম শ্রেণীর ভাষায় কর্তা বরাবরই তৃতীয়ায়, অর্থাৎ করণ হইতে কর্তা অভিন্ন, এ সম্বন্ধে Jaeschke-কৃত Tibetan Grammar (1883), §30 দ্রষ্টব্য।

('কাটিয়ে দে'<কাটিঅই দেহ = কট্টিঅই, কট্টিঅদি, কৃত্যতে দেহঃ = দেহ কর্তিত হয়)।

'মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিএ।' ('শুনিএ' = শুনিঅদি, শ্রুত হয়)।

ব-সা-প—পৃঃ ১২২৩—

'সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হইতে॥……
হরি-ভক্তি-বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার॥'

('জানি' = জানিঅই = জ্ঞায়তে ; 'পাইয়ে' = প্রাপ্যতে)।

পৃঃ ৮৪৪—'যে অঙ্গ দেখিএ সেই অঙ্গে অলঙ্কার।' ('দেখিএ' = দৃষ্ট হয়)।

'বিনি না পুছিলে কারো না জানিএ জাতি।' ('জানিএ' = জ্ঞায়তে)।

§ ১৪। পুরাতন বাঙ্গালায় এইরূপ বহু বহু উদাহরণ আছে। মাগধী-অপভ্রংশ-সম্ভূত অন্য ভাষা-দ্বয়ে, মৈথিলী ও উড়িয়াতেও, এই প্রকার কর্ম-বাচ্য মিলে। যথা—

মৈথিলী (বিদ্যাপতির পদাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)—

৯—'লখই ন পারিঅ জেঠ কনেঠ।'

(জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, তাহা দেখিতে পারা যায় না)।

১৪—'জত দেখল তত কহহি ন পারিঅ।'

(যতটা দৃষ্ট হইল, ততটা বলিতে পারা যায় না)।

৩০—'পঢ়হি ন পারিঅ আখর পাতি।'

(অক্ষর-পংক্তি পড়িতে পারা যায় না)।

৩৩—'সে নহি দেখল জে দিয় উপামা।'

(তাহা দেখা গেল না, যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়)।

৪৮—'সব তহ স্থনিঅ ঐসন বেবহারা।'

(তার যে এহেন ব্যবহার, ইহা সবাইয়ের কাছে শুনা যায়)।

৬০—'মধুরিপু সম নহি দেখিঅ সোহাবন, জে দিঅ তহিক উপাম রে।'

(মধুরিপুর মতো শোভন এমন কিছু দেখা যায় না, যার সঙ্গে তাঁর উপমা দেওয়া যায়)।

৬১—'ন জানিয় কিয় করু মোহন চোর।'

(মোহন চোর যে কি করিল তাহা জানা যায় না)।

উড়িয়া (জগন্নাথ-দাঁসের ধ্রুব-চরিত্র, কাঁথী সংস্করণ)—

পৃঃ ৫—'কম্পিই তাহার নিজ দেহী।' ('কম্পিই' = কম্প্যতে, কম্পিত হয়)।

পৃঃ ৩৩—'দেহ-মান দিশই খর্জ্জুর-বৃক্ষ প্রায়।' ('দিশই' = দৃশ্যতে)।

পৃঃ ১১—'দশ দিশ অন্ধকার, কিছি হি ন দিশি।' (দিশি = দৃশ্যতে)।

ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত অসমিয়া ও বাঙ্গালায় বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না— বাঙ্গালা-অসমিয়া উড়িয়া, মৈথিল-মগধী, ভোজপুরী, এই কয় মাগধী-সম্ভূত ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মাগধী-অপভ্রংশে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম-বাচ্য বিশেষ-রূপে বিদ্যমান ছিল।

§ ১৫। আধুনিক বাঙ্গালার কর্ম-কর্তৃ-বাচ্য, যেখানে কর্তার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না, মূলে '-য়-' > '-ইঅ-'প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়া হইতে জাত বলিয়াই মনে হয়। যেমন, 'কাপড় ছিঁড়ে', 'বাঁশ ভাঙ্গে,' 'শাঁখ বাজে', 'হাঁড়ী ভরে' ইত্যাদি। এখানে 'ছিঁড়ে, ভাঙ্গে, বাজে, ভরে' প্রভৃতি ক্রিয়াকে মূলতঃ কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়া রূপেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রাকৃতে 'ছিণ্ডিঅই, ভঙ্গিঅই, বা ভঞ্জিঅই, রজ্জিঅই, ভরিঅই', আদিম মধ্য যুগের বাঙ্গালার 'ছিণ্ডিএ, ভাঙ্গিএ, বাজিএ, ভরিএ, ; পরে কর্তৃ-বাচ্যে রূপান্তরিত হইয়া, আধুনিক বাঙ্গালা বৈয়াকরণদের নিকট কর্ম-কর্তৃ-বাচ্য নামে পরিচিত। সংস্কৃতেও ঐরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়[১] ; যেমন 'যবঃ পচ্যতে' = যব পাকে ; 'লোষ্ট্রাঃ শীর্য্যন্তে' = মাটির ঢেলাগুলি ভাঙ্গে।

§ ১৬। আধুনিক বাঙ্গালার সাধারণ নিষেধার্থক অনুজ্ঞায় কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়া লুক্কায়িত আছে বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালার 'এ কাজ করে না,' 'জ্বর হ'লে নায় না', 'রবিবার দিন মাছ খায় না' প্রভৃতি বাক্যে, 'করে', 'নায়', 'খায়', আপাতদৃষ্টিতে কর্তৃ-বাচ্যে প্রথম পুরুষের বর্তমানের ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। মধ্য-যুগের বাঙ্গালায়ও এইরূপ প্রয়োগ আছে। যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—

পৃঃ ১৮৫—'লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ আরতি না করী।'

পৃঃ ২৩৬—'প্রভু হয়িআঁ হেন না করী।'

পৃঃ ২৫৭—'কেহ তার না কহিএ মরণে।'

মধ্য যুগের বাঙ্গালা উদাহরণগুলিতে '-ইঅ-' প্রত্যয় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ;

১। J. S. Speyer, Vedische und Sanskrit-syntax, p. 169.

এবং ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, আদৌ এই প্রয়োগ ছিল কর্ম-বাচ্যের প্রয়োগ। 'এ কাজ করে না'<'এ কাজ করিএ না'=প্রাকৃতে 'এঅং কজ্জং ণ করিঅই'='এতৎ কার্য্যং ন ক্রিয়তে'। যেমন অন্য অবস্থায় ঘটিয়াছে, কর্ম-বাচ্য ক্রমে কর্তৃ-বাচ্যে আনীত হইয়াছে। যেখানে বক্তব্য ক্রিয়া বা ঘটনা কোনও কর্তার অপেক্ষা রাখে না, বা কর্তার উপর নির্ভর করে না, সেখানেই এইরূপ কর্ম-বাচ্যের প্রয়োগ আইসে। বাঙ্গালা ভাষার বহু প্রবাদ-বাক্য নিঃসন্দেহ-রূপে এই প্রকার কর্ম-বাচ্য-ময়। যেমন—

'জামায়ের জন্যে মারে হাঁস। গুষ্ঠী শুদ্ধ খায় মাস॥'

('মারে হাঁস'=হাঁস মারিএ=হংস মারিঅই=হাঁস মারা হয় ;

'খায় মাস'=মাস খাইএ=মংস খাইঅই=মাংস খাওয়া হয়)।

'এক দেয় বর দেখে। আর দেয় ঘর দেখে॥' (=দীয়তে কন্যা)।

§ ১৭। মধ্য যুগের বাঙ্গালায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার, '-ইউ'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কতকগুলি ক্রিয়াপদ আছে। কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল :

পৃঃ ১৪০—'নাঅ বান্ধিতেঁ গিআঁ করিউ যতনে।'

পৃঃ ১৪১—'আনহ সকল সখিজন মেলী করিউ যুগতী।'

পৃঃ ১৪১—'পসার সাজিউ দধি দুধে, সেসি জীবার উপাএ।'

পৃঃ ২০৪—নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে।

তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে।'

পৃঃ ২৫৩—'যমুনাক যাইউ রাধা লয়িআঁ সখীগণে।'

পৃঃ ২৭০—'দধি বিকে জাইউ মথুরা।'

২৯২—'সত্বরে রাধা লইআঁ যাইউ ঘর।'

পৃঃ ৩১০—'বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে।'

পৃঃ ৩৪৫—'বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে।'

পৃঃ ৪৪৭—'কদম তলাক জাইউ চিত্তের হরিষে।'

এই '-ইউ' প্রত্যয়ের দ্বারা বিধিলিঙ্ ও অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশিত হইতেছে : 'বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে'—এই বাক্যে, 'করিউ যতনে'-কে কর্ম-বাচ্যের অনুজ্ঞা বলিয়া বোধ হয়=ক্রিয়তাম্ যত্নঃ। তদ্রূপ 'বারতা পুছিউ'=বার্তা পৃচ্ছ্যতাম্ ; 'যাইউ'=গম্যতাম্। মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় এই '-ইউ-' প্রত্যয়ের উদ্ভব খুব সম্ভব কর্ম-বাচ্যের '-ই-'তে অনুজ্ঞা প্রথম পুরুষের '-উ' (=সংস্কৃতের তু') যোগ করিয়া হইয়াছে। কর্ম-বাচ্যের উত্তম পুরুষ 'বর্তমান '-ওঁ' প্রত্যয়, ও

মধ্যম পুরুষের '-হু' প্রত্যয় (= সংস্কৃত -স্ব, আত্মনেপদী—'চলস্ব' = 'চলস্থ' > 'চলহু'), ইহাদের প্রভাবও কিছু পরিমাণে আসিয়া থাকিতে পারে।

[২] বাঙ্গালা ভাষায় বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম-বাচ্য

§ ১৮। প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়া-পদ বাঙ্গালায় আর জীবন্ত নাই। যে পদ্ধতিতে এখন বাঙ্গালায় কর্ম-বাচ্য সাধিত হয়, তাহা বিশ্লেষ- ও বাক্য-বিন্যাস-মূলক। যেমন—

[১] আমি দেখা যাই; [২] আমাকে, আমারে, আমায় দেখা যায়; [৩] আমাকে, আমারে, আমায় দেখন যায়, [৪] আমি দেখা পড়ি; [৫] আমাকে, আমারে, আমায় দেখা হয়; [৬] আমি দৃষ্ট হই।

উপরি লিখিত যে ছয় প্রকার উপায়ে কর্ম-বাচ্যের ভাব বাঙ্গালায় প্রকাশ করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে [১], [৪] ও [৬]-ই যথার্থ কর্ম-বাচ্য, যেরূপ কর্ম-বাচ্য ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় পাওয়া যায়; এবং [২] [৩] ও [৫]-এর রীতি ঠিক কর্ম-বাচ্যের প্রয়োগ নহে, বরং ভাব-বাচ্যের। ইহাদের অর্থ-ঘটিত সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

§ ১৯। [১] 'আমি দেখা যাই'। ইহার বাক্য-বিশ্লেষ এই প্রকার—'আমি' সর্বনাম কর্তৃ-কারক + 'দেখা' = '-আ'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ, + 'যা' ধাতু উত্তম পুরুষ। অতীতে 'দেখা গেলাম', ভবিষ্যতে 'দেখা যাইব', ইত্যাদি। 'আমি দেখা যাই'—এইরূপ কর্তৃ-কারকের প্রয়োগ বাঙ্গালার ঠিক ধাতুগত প্রয়োগ নয়। বিশেষতঃ যখন ক্রিয়ার যথার্থ কর্ম সুনির্দিষ্ট, তখন কর্ম পদকে কর্ম-বাচ্যীয় কর্তৃ-কারকে আনয়ন করা ঠিক বাঙ্গালার প্রকৃতি-সংগত নয়। 'আমি দেখা যাই' অপেক্ষা, 'আমাকে দেখা যায়' অধিকতর স্বাভাবিক বাক্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেখানে কর্ম অনির্দিষ্ট, সেখানে ধাতুর উত্তর '-আ' প্রত্যয়ের যোগে গঠিত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণের সহযোগে কর্ম-বাচ্যের প্রয়োগ সহজ ও সরল; যেমন 'দেখা যায়' (কর্তৃ-কারকে নীত কর্ম 'ইহা' উহ্য), 'যদি বলা যায়' (কর্তৃ-কারকে নীত কর্ম 'উহা' বা 'ইহা' বা 'কিছু' উহ্য); শোনা যাইতেছে' ('ইহা', 'উহা', 'কথা', 'শব্দ', 'আওয়াজ', 'গীত' ইত্যাদি উহ্য)।

কর্ম বা ক্রিয়া নির্দিষ্ট থাকিলে, ভাব-বাচ্যের প্রয়োগের দিকেই বক্তার বেশি প্রবণতা আসে। কর্ম-বাচ্যীয় 'আমি মারা যাই'—এখানে 'মারা যাওয়া'র কোনও বিশেষ অর্থ নাই,—অস্পষ্ট অর্থ যে, আমি কোনও বিপদে পতিত হই; কিন্তু

ভাব-বাচ্যীয় 'আমাকে মারা যায় (হয়)', এখানে 'মার্' ধাতুর প্রহার অর্থে বিশিষ্ট ব্যবহার। মোটের উপর, 'মারা যা', এই সংযোগমূলক ধাতুর দুই অর্থ, 'প্রাণত্যাগ করা' ও 'প্রহৃত হওয়া'; এবং বাঙ্গালায় ইহার ব্যবহার কতকটা স্বকীয় (idiomatic)।

এইরূপ প্রয়োগ (কর্তৃ-কারকে নীত কর্ম+কৃদন্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ+যা ধাতু) পুরাতন বাঙ্গালায়ও আছে; যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পৃঃ ৩৩—'তোহ্ম যাইবেঁ মার'=তুমি মারা যাইবে; পৃঃ ৭১—'বাঁন্ধিল জাই'=বাঁধা যায়। চর্য্যাপদের 'বেঙ্গ সংসার বড়্হিল জাঅ' (চর্য্যা ৩৩)=বিকলাঙ্গ সংসার বর্ধিত হইয়া যায়, তুলনীয় (এখানে অবশ্য অকর্মক ক্রিয়া, অতএব কর্ম-বাচ্য নহে)

§ ২০। [২] 'আমাকে, আমারে, আমায় দেখা যায়': এই প্রয়োগে ক্রিয়ার একটু শক্যতার ভাব বিদ্যমান আছে। এখানে 'দেখা' পদের ব্যাখ্যা একটু কঠিন। সাধারণতঃ ইহাকে '-আ'-কারান্ত কৃদন্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়; 'দেখা'=দেখন বা দর্শন; 'আমাকে দেখা যায়'=আমার বিষয়ে বা আমার সম্পর্কে দর্শন ঘটে। 'আমাকে দেখন যায়'—এই প্রয়োগের দ্বারা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। কিন্তু এখানে 'দেখা' পদ খুব সম্ভবতঃ কৃদন্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, এবং সমস্ত বাক্যটি ভাব-বাচ্যে প্রযুক্ত: আমার সম্পর্কে কিছু দৃষ্ট হয়='আমাকে দেখা যায়'। এইরূপ ভাব-বাচ্যে প্রয়োগ হিন্দীতে আছে; যেমন কর্তৃ-বাচ্যে—'লোগ মুঝে দেখতে হৈঁ'=লোকে আমায় দেখে; কর্ম-বাচ্যে, 'মৈঁ দেখা জাতা হূঁ'=আমি দৃষ্ট হই; ভাব-বাচ্যে, 'মুঝ্‌কো দেখা জাতা হৈ'=আমাকে দেখা যায়।

এই ধাতু-যোগে সৃষ্ট বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম-বাচ্যের মূল কী? যা-ধাতু-যুক্ত এইরূপ প্রয়োগ প্রাকৃতে পাওয়া যায় না। অথচ প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে 'করিজ্জই', 'খাইজ্জই', 'দিজ্জই' প্রভৃতি '-ইজ্জ'- প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, তথা 'করিঅই, খাইঅই, দিঅই' প্রভৃতি '-ইঅ'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপ বিদ্যমান। অপভ্রংশের পরেই আধুনিক ভাষার যুগ; অপভ্রংশ যুগের '-ইজ্জই' প্রত্যয়ই, আধুনিক আর্য্য ভাষায় 'জাই' বা যা-ধাতু-যুক্ত কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইয়াছে, এইরূপ বিচার অযৌক্তিক হইবে না। অপভ্রংশে 'মরিজ্জই' পদ, অর্থ-দ্যোতনায় 'মরই'='*মরতি, *মরতে' এইরূপ পদের সহিত অভিন্ন। এক্ষণে কর্ম-বাচ্যের কোনও ধারণা নাই। 'মরিজ্জই' পদের উৎপত্তি সাধারণ্যে 'মরি'+'জই' বা 'জাই'='মরিয়া যায়', এইরূপ দাঁড়াইয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। লোকের মনে,

এখানে যা-ধাতুর অস্তিত্ব আছে, এরূপ ধারণা একবার হইয়া গেলে, সহজেই অন্য অকর্মক ধাতুতেও যা-ধাতু-কে জুড়িয়া, ভাষায় নবীন উদ্ভূত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত সংযোগমূলক ধাতুর মতো প্রযুক্ত হওয়া আরম্ভ হইল। যেমন 'চলি জাই, পড়ি জাই, ভাঁগি জাই', ইত্যাদি। এখানে 'চলি, পড়ি' প্রভৃতিকে অসমাপিকা-ক্রিয়া রূপে দেখা সহজ হইল। প্রথম প্রথম এইরূপ প্রয়োগে কর্ম-পদ কর্তৃ-কারকেই ব্যবহৃত হইত, পরে কর্তৃ-কারকে নীত কর্ম-পদকে সম্প্রদানে আনিয়া, ভাব-বাচ্যে প্রয়োগের রীতি আসিয়া যায়; যেমন—'*হউঁ দেক্‌খিজ্জই' = '*মই দেখি জাই' = '*মুই দেখিআ জাই' = 'আমি দেখা যাই', পরে, 'আমাকে দেখা যায়'। উত্তম পুরুষে কর্ম-বাচ্যের প্রয়োগ প্রাচীন যুগে খুব কমই আছে, এ কথা এস্থলে বলা দরকার, ইহার কারণ এই যে, উত্তম পুরুষ হইতেছে সুনির্দিষ্ট সর্বনাম; এবং যেখানে বাক্যে কিছুমাত্র অনির্দিষ্ট-ভাব বিদ্যমান, সেইখানেই কর্ম-বাচ্য ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। প্রাকৃতের কর্ম-বাচ্যের '-ইজ্জ-' প্রত্যয়ের সহিত আধুনিক ভাষার কর্ম-বাচ্যে √যা ধাতুর যে যোগ আছে, তাহা Beames বীম্‌স্ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন[১০]। বাঙ্গালায় ক্রিয়ার যে শক্যতার ভাব √যা নিষ্পন্ন কর্ম-বাচ্যে বিদ্যমান, তাহাতে প্রাকৃতের বিধিলিঙের প্রত্যয় '-এজ্জ-'র কিছু প্রভাবও আছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

§ ৯-এর প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে যে, মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে 'সংস্কৃত' '-য-' প্রত্যয় (কর্ম-বাচ্যে) '-ইঅ'-তে রূপান্তরিত হয়; '-ইজ্জ-', পশ্চিমা প্রাকৃত ও পশ্চিমা-অপভ্রংশের রূপ। বাঙ্গালায় '-ইজ্জ-'>যা ধাতুর প্রয়োগ পশ্চিমা অপভ্রংশের প্রভাবের ফল বলিয়াই অনুমিত হয়।

§ ২১। [৩] 'আমাকে দেখন যায়'। এই প্রকার প্রয়োগ বাঙ্গালায় অতি প্রাচীন, এবং চর্য্যাপদের বাঙ্গালা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সর্বত্র মেলে। 'ধরণ ন জাই' (চর্য্যা ২), 'কহণ ন জাই' (৩৫), 'লেপন জায়' (৪); শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—পৃঃ ৩৮—'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ'; পৃঃ ৫৮—'প্রাণ ধরণ না জাএ।' মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় এইরূপ প্রয়োগ অজস্র। আধুনিক বাঙ্গালায়, পশ্চিম-বঙ্গের মৌখিক ভাষায় ইহার প্রয়োগ একটু বিরল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব-বঙ্গে এই প্রাচীন বাক্য-রীতি পূর্ণ-ভাবে বিদ্যমান। অন্যান্য আধুনিক মাগধী ভাষাগুলিতে '-অন'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদের সহিত

১০। Comparative Grammar of the Indo-Aryan Languages, III, pp. 73-74.

যা-ধাতু-যোগে নিষ্পন্ন এই বাক্য-রীতি আজ কাল তাদৃশ মিলে না ; ইহা বাঙ্গালা ভাষারই বিশেষত্ব ; মৈথিলী মগহী ভোজপুরীতে '-অল,-অব'-প্রত্যয়ান্ত নামের, ও উড়িয়াতে '-ইবা'-প্রত্যয়ান্ত রূপেরই প্রয়োগ বেশি।

'করণ জায়'—এইরূপ প্রয়োগের মূলে, 'সংস্কৃত যুগের' '-অনীয়-ক'-প্রত্যয়ান্ত পদের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। 'করণীয়ক>করণিজ্জঅ>করণি জাএ >করণ জায়' ; তদ্রূপ 'পঠনীয়ক>পঢনিজ্জঅ>পঢ়নি জায়>পঢ়ন, পড়ন যায়'। এই বিশ্লেষ-প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী অবস্থা—'ই'-কার যুক্ত রূপ—বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না ; কিন্তু তুলসীদাসের ভাষায় (মধ্য যুগের আওধীতে) ইহা বিদ্যমান আছে ; যেমন, তুলসীদাসের রামায়ণে 'বরনি জায়', 'কহনি জাই' ইত্যাদি। মধ্য যুগের বাঙ্গালায় 'না যায় কহনে'—এইরূপ বাক্য পাওয়া যায়, এখানে 'কহনে'-র এ-কার, সম্ভবতঃ পূর্বাবস্থার 'ই'-কারের চিহ্নাবশেষ হইতে পারে ('কহনিজ্জঅ>কহনি জাই >কহনে জায়')। '-অন'- প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য+ √যা—এইরূপ বিশ্লেষণ, বা বিশ্লিষ্ট বাক্য-রীতি, পশ্চিমা-প্রাকৃত হইতে পূর্ব-দেশের ভাষায় (মাগধী প্রাকৃতে) আসিয়া যায়, এরূপ অনুমান হয়। এইরূপ বিশ্লেষ একবার গৃহীত হইয়া গেলে, নঞ্-অর্থক নিপাত 'না'-এর যোগে 'কহন না জায়', এইরূপ পদ্ধতি সহজেই রীতি-সিদ্ধ হইয়া যায়। 'না জায় কহন'—এই প্রকার বাক্যের উদ্ভব ঘটে। 'না কহন যায়', এই প্রকার প্রয়োগ চলিতে পারে না, কিন্তু 'কহন যায় না' চলে ; ইহার কারণ এই যে, নাম-পদকে মধ্যে আনিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ 'না'-কে ক্রিয়া হইতে দূরে আনিয়া বিচ্ছিন্ন করা, বাঙ্গালার রীতি নয়।

মধ্য যুগের বাঙ্গালায় ক্বচিৎ '-অ'-কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদের প্রয়োগও দেখা যায় : 'নিবার না যায় রে' (বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ৯৮১), 'বোল না যায়', ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায় ইহার অনুরূপ প্রয়োগ নাই। খুব সম্ভব এখানে ন-কারের সকৃৎ লেখনে এইরূপ ঘটিয়াছে : 'নিবারণ না যায়'-স্থলে 'নিবার না যায়'।

§ ২২। [৪] 'আমি দেখা পড়ি'। এই প্রকার প্রয়োগ বাঙ্গালায় প্রাচীন, কিন্তু ইহা একেবারে বাঙ্গালার বিশিষ্ট idiomatic প্রয়োগ। ইহাতে একটু আকস্মিকতা ও পরিসমাপ্তির সূক্ষ্ম দ্যোতনা থাকে। এই প্রয়োগ পূরা কর্ম-বাচ্যের। 'দেখা' = 'দেখ্' ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় '-আ'-যোগে গঠিত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ। 'পড়্' ধাতুর এইরূপ কর্ম-বাচ্যের প্রয়োগ দ্রাবিড় ভাষায় পাওয়া যায় : ইহা আর্য্য ভাষার উপর দ্রাবিড়ের প্রভাবের ফল, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না ; আর্য্য ও

দ্রাবিড়, দুই শ্রেণীর ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ আধুনিক, এবং ইহাকে আর্য্যভাষী ও দ্রাবিড়-ভাষী উভয়েরই চিন্তা-প্রণালী এক-ই মার্গ ধরিয়া চলিবার ফল বলিয়া বিচার করাই অধিকতর সমীচীন হইবে।

'আমাকে দেখা পড়ে'—'পড়্'-ধাতু-যোগে এইরূপ ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ বাঙ্গালায় অজ্ঞাত।

§ ২৩। [৫] 'আমাকে দেখা হয়'। এখানে 'দেখা' পদ, '-আ'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক নামপদ বলিয়া অনুমিত হয়: 'আমার সম্পর্কে দেখা ক্রিয়া ঘটে'। 'দেখা' = দেখন, দর্শন, এই নাম-পদ এখানে 'হয়' ক্রিয়ার কর্তা। এই প্রয়োগে, ক্রিয়ার ভাবটিই বাক্যের মধ্যে সর্ব-প্রধান ভাব; ইহার সহিত 'দেখা যায়' বা 'দেখা পড়ে', এই বাক্যের যদি তুলনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে, 'দেখা পড়ে' বাক্যে 'দেখা' ক্রিয়ার উপর বেশি ঝোঁক দেওয়া হইতেছে না, কিন্তু 'দেখা হয়'—ইহাতে 'দেখা' ক্রিয়ার উপরেই বেশি জোর দেওয়া হইতেছে। তুলনীয়—'দেখা গেল, দেখা পড়িল' = মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল; কিন্তু 'দেখা হইল' = সাক্ষাৎ-ক্রিয়া বা দর্শন-ক্রিয়া ঘটিল।

এই প্রয়োগ আধুনিক আর্য্য ভাষাগুলিতে অর্বাচীন কালে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়।

§ ২৪। [৬] 'আমি দৃষ্ট হই'। সংস্কৃত '-ত'-প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ-সংযোগে গঠিত এইরূপ বাক্য-রীতি ভাষায় আধুনিক সৃষ্টি, এবং বইয়ের ভাষার বাহিরে এক রকম অপ্রাপ্ত,—কৃত্রিম, পণ্ডিতি সৃষ্টি। অবশ্য, মধ্য যুগের বাঙ্গালায় এইরূপ প্রয়োগ বিরল নহে, কারণ সংস্কৃত '-ত'-প্রত্যয়ান্ত পদ বাঙ্গালায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই শত শত আনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তবু-ও, ইংরেজির অনুকরণে, আজ কাল সাহিত্যের ভাষায় ইহার বহু প্রচার ঘটিয়াছে, অনুমান করা যায়।

§ ২৫। 'আছ্' ধাতুর সহিত '-আ'-কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ ব্যবহার করিয়া কর্ম-বাচ্য গঠিত হয়। অব্যবহিত পূর্বে কৃত ক্রিয়া, যাহার ফল এখনও বিদ্যমান, তাহাকে জানাইবার জন্য এই প্রয়োগ; সাধারণতঃ অচেতন বা নপুংসক নামের সহিত ইহার ব্যবহার, এবং এই নাম-শব্দ 'আছ্'-ধাতু-জ ক্রিয়ার কর্তা: যেমন—'এ বই আমার পড়া আছে' = আমা-কর্তৃক পঠিত হইয়াছে, ও তাহার ফল এখনও বিদ্যমান; 'মাছ ধরা আছে' = মাছ ধরা হইয়াছে ও এখনও ধৃত অবস্থায় বিদ্যমান; 'এ কথা সকলের জানা আছে' বা 'ছিল', ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এই প্রয়োগ নূতন বলিয়া মনে হয়।

§ ২৬। 'চল্' ও 'খা' ধাতু-দ্বয়ের যোগেও বাঙ্গালায় কর্ম-বাচ্য গঠিত হয়। এই প্রয়োগ অতি মাত্রায় idiomatic অর্থাৎ বাঙ্গালার স্বকীয়-প্রকৃতি-গত। 'দেখা চলে'—এখানে 'দেখা' আ-কারান্ত ক্রিয়াবাচক নামপদ; তদ্রূপ 'বলা চলে', ইত্যাদি। এই প্রয়োগ কতকটা ভাব-বাচ্যের মতন—কর্তা অজ্ঞাত, বা অনির্দিষ্ট, বা অপ্রধান।

'খা' ধাতুর প্রয়োগ 'সহা' অর্থে—'মার খাওয়া' = প্রহৃত হওয়া; খালি 'মার' শব্দের (নাম-শব্দের) সহিত ইহার প্রয়োগ। অন্য আর্য্য ভাষায় 'খা' ধাতুর ও দ্রাবিড়েও (দ্রাবিড়ে 'উণ' ধাতুর) এইরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়।

§ ২৭। আধুনিক বাঙ্গালায় কর্ম-বাচ্যের ও ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ মুখ্যতঃ অনির্দিষ্ট-কর্তৃক। যেখানে আলাপ করিবার সময়ে সাধারণ 'তুমি' কিংবা সম্মান-সূচক 'আপনি', কোন্‌টা প্রয়োগ করা উচিত সে বিষয়ে বক্তার মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, সেখানে কর্তৃ-বাচ্য ব্যবহার না করিয়া, কর্ম-বাচ্য বা ভাব-বাচ্য দ্বারা কাজ চালানো হয়; যেমন—'কী করা হয়', 'কোথা থাকা হয়', ইত্যাদি। 'ধরে নেওয়া যাক্'—প্রভৃতি অনির্দিষ্ট-কর্তৃক বাক্যেও এইরূপ প্রয়োগ।

তুলনীয়—'এখান দিয়ে যাওয়া যায় না' = কেহ যাইতে সক্ষম হয় না—শক্তি-জ্ঞাপক বাক্য 'যাওয়া যায়' = জাইজ্জই = গম্যতে; এ-ক্ষেত্রে বিশ্লিষ্ট-রূপ '-ইজ্জ'-প্রত্যয়ান্ত কর্ম-বাচ্য হইতে উদ্ভূত, এবং পশ্চিমের প্রাকৃতের প্রভাবে মাগধীতে আনীত; 'এখান দিয়ে যায় না' = সাধারণ নিষেধার্থক 'যায়' = জাইঅই—'-ইঅ'-প্রত্যয়-সহযোগে নিষ্পন্ন খাঁটি বাঙ্গালার পুরাতন কর্ম-বাচ্য।

[৩] বাঙ্গালা ভাষায় 'কর্মণি' ও 'ভাবে' প্রয়োগ।

§ ২৮। হিন্দী প্রভৃতি পশ্চিমা ভাষায় সকর্মক ধাতুর অতীত কালে কর্তরি প্রয়োগ অজ্ঞাত, কর্মণি বা ভাবে প্রয়োগই রীতি-সিদ্ধ। যেমন—

কর্তৃ-বাচ্যে অকর্মক-ক্রিয়া—'বহু গয়া' = অসৌ গতঃ।

কর্ম-বাচ্যে সকর্মক ক্রিয়া:
- 'উস্‌নে রাজা দেখা' = তেন রাজা দৃষ্টঃ।
- 'উস্‌নে রাজা দেখে' = তেন রাজানঃ দৃষ্টাঃ।
- 'উস্‌নে রানী দেখী' = তেন রাজ্ঞী দৃষ্টা।
- 'উস্‌নে রানিয়াঁ দেখীঁ' = তেন রাজ্ঞ্যঃ দৃষ্টাঃ।

ভাবে সকর্মক ক্রিয়া {
'উস্‌নে রাজাকো দেখা' = তেন রাজ্ঞঃ বিষয়ে দৃষ্টং।
'উস্‌নে রাজাওঁকো দেখা' = তেন রাজ্ঞাং বিষয়ে দৃষ্টং।
'উস্‌নে রানীকো দেখা' = তেন রাজ্ঞ্যঃ বিষয়ে দৃষ্টং।
উস্‌নে রানিয়োঁকো দেখা' = তেন রাজ্ঞীনাম্‌ বিষয়ে দৃষ্টং।

অকর্মক ক্রিয়ার ভাবে প্রয়োগ, যেমন 'উস্‌নে গয়া' = তেন গতম্‌, সাধু-হিন্দুস্থানীতে হয় না, কিন্তু ভাখা-হিন্দুস্থানীতে ক্বচিৎ মিলে।

সকর্মক অতীতের ক্রিয়া '-মূলে' '-ত'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণের স্থানীয়। ইহা কর্মকে অনুসরণ করে, কর্মের অনুসারে লিঙ্গ ও বচনে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে; এবং কর্তা, তৃতীয়া বা করণে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বাঙ্গালায় এইরূপ রীতি অজ্ঞাত; কিন্তু এখন অজ্ঞাত হইলেও, প্রাচীন বাঙ্গালাতে বিদ্যমান ছিল; পরে ক্রমে ক্রমে মধ্য যুগের বাঙ্গালায় কর্ম- বা ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ লুপ্ত হয়, বাক্য কর্তৃ-বাচ্যে আসিয়া যায়। চর্য্যাপদের কতকগুলি উদাহরণে ইহা বেশ বুঝা যায়; যথা 'খুণ্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি' (৮): 'কাচ্ছি' স্ত্রী-লিঙ্গ, কাজেই 'মেলিলি'—ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ = খুণ্টিকাং উৎপাট্য মেলিতা কচ্ছিকা; 'তোহর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরী মালী' (১০) = তোর তরে মুই ঘলিলী হাড়েরী মালী = ময়া নিক্ষিপ্তা অস্থি-রচিতা মালিকা; 'সেজী ছাইলী, রাতি পোহাইলী' (২৮) = * শয্যিকা ছাদিতা, * রাত্রিঃ প্রভাতিতা; 'ঘরিণী লেলী' (৪৯) = গৃহিণী নীতা। অকর্মক ক্রিয়ায় অতীতে ক্রিয়া-পদ কর্তার বিশেষণ হইত; এরূপ অবস্থা আদিম-মধ্য যুগের বাঙ্গালায় ক্বচিৎ রক্ষিত আছে; যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'চলিলী রাহী' = চলিতা রাধিকা। পরে মধ্য যুগে এইরূপ প্রয়োগ একেবারে অন্তর্হিত হয়। '-ইল'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার অতীত রূপে সর্বনাম-দ্যোতক প্রত্যয় সংযোজিত হইয়া, সংস্কৃতের 'অ-খাদয়ৎ, আ-খাদয়-ঃ' প্রভৃতি তিঙন্ত পদের মতো, বাঙ্গালায় ক্রিয়ার রূপ 'খা-ইল—অ' = খাইল, 'খা-ইল—আ' = খাইলা, 'খা-ইল—আম্‌' = খাইলাম-তেদাঁড়াইয়া যায়।

[৪] ণিজন্ত-রূপের কর্ম-বাচ্যে ব্যবহার

§ ২৯। বাঙ্গালা ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় ণিজন্ত-ক্রিয়া কর্ম-বাচ্যে ব্যবহৃত হয়। এই প্রয়োগে একটু সক্ষমতার ভাব বিদ্যমান। হ্বূর্নলে ও তেস্‌সিতোরি এই প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন[১১]।

১১। Gaudian Grammar, § 484 : Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, (Indian Antiquary, 1914-16), § 140.

আধুনিক গুজরাটীতে অন্য প্রকার কর্ম-বাচ্যের প্রয়োগ নাই, কেবলমাত্র এই ণিজন্ত প্রয়োগেরই চলন আছে।

বাঙ্গালা ভাষায় উদাহরণ :—

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—পৃঃ ৮৯—'সেহি এহা পথে মাহাদানী বোলাএ' (=কথিত হয়); পৃঃ ১৮৬—'যেহ্ন না ছাড়াএ ঘোল' (=বিক্ষিপ্ত হয়)।

আধুনিক বাঙ্গালা—

'বেশ মানায়'; 'কথাটা ভালো শুনায় না'; 'কথাটা চারাইয়াছে'; 'সে ভালো মানুষ কহায় বটে, কিন্তু লোক সুবিধার নয়'; 'এতে কিন্তু দোষ খণ্ডায় না'; 'যত পরখায়, তত দোষ বার হয়'; 'দুল পরিবার জন্য কান বেঁধায়'; 'এটা তত খারাপ দেখাবে না'; ইত্যাদি। সাধারণতঃ এই সকল স্থানে অনির্দিষ্ট-কর্তৃকত্ব বিদ্যমান।

উড়িয়াতেও এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়; যথা—জগন্নাথ দাসের 'ধ্রুব-চরিত্র' (কাঁথী সংস্করণ), পৃঃ ৮—'সে বোলাই পাটরাণী'; পৃঃ ৪৮—'দেবগণ মধ্যে তু বোলাউ সুনাশীর'; পৃঃ ২৬—'দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র-রাজ এ বোলাই', ইত্যাদি ॥*

*লেখকের The Origin and Development of the Bengali Language (সংক্ষেপে ODBL) গ্রন্থে বাঙ্গালা ভাষায় কর্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া লইয়া যে আলোচনা আছে, জিজ্ঞাসু পাঠক তাহাও পড়িয়া দেখিতে পারেন (দ্রষ্টব্য Part II, pp. 909-29, এবং Part, III pp. 94-95)। এই গ্রন্থ প্রথমে দুই খণ্ডে ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল পরে, ১৯৭০ সালে এই দুই খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ George Allen & Unwin Ltd. কর্তৃক লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ১৯৭২ সালে একটি অতিরিক্ত খণ্ডও (Part III) প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডটি নূতন, ইহাতে আছে সংশোধন সংযোজন ও অতিরিক্ত বাঙ্গালা শব্দের সূচী।

[টিপ্পনী—এই প্রবন্ধে আমি 'গুজরাটী', 'মারাঠী' বানান লিখিয়াছি। এতাবৎ সাধারণতঃ 'গুজরাতী, মরাঠী' লেখা হয়, আমি নিজেও শেষোক্ত দুই রূপ-ই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। এখন আমি 'গুজরাটী, মারহাট্টী (বা 'মারাঠী') লেখার পক্ষে; কারণ এই দুই রূপ হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব রূপ। 'সংস্কৃত' পদ 'গুর্জর-ত্রা' হইতে 'গুজরাত' শব্দের উৎপত্তি: 'গুর্জরত্রা>গুজ্জরত্ত> গুজরাত'; তাহা হইতে 'গুজরাতী', এবং গুজরাটের লোকেরা এই দন্ত্য-ত-যুক্ত পদ-ই ব্যবহার করেন। তদ্রূপ 'মহারাষ্ট্রী>মহারট্‌ঠী>মহরাঠী>মরাঠী'; মহারাষ্ট্র-নিবাসিগণ এই রূপই ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালাতে আমরা

'গুজরাট' পাই—এখানে 'রাষ্ট্র' শব্দের সহিত যোগ অনুমান করায় মূর্ধন্য-'ট' আসিয়া গিয়াছে; এবং মহারাষ্ট্রীর প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ 'মহারাট্টী, মারহাট্টী' বা 'মারাঠী'; প্রাকৃত রূপ-বিশেষ 'মরহাঠী'-ও মেলে। এই দুই দেশের নাম চলিত-বাঙ্গালায় আমরা 'গুজরাট', ও 'মারহাট্টা' বা 'মারাট্টা দেশ' বলিয়া থাকি; এই রূপ দুইটি আমাদের বাঙ্গালা ভাষার। গুজরাটীরা বা মারহাট্টারা কী লেখেন, তাহা দেখিবার দরকার মনে করি না। তাঁহারাও আমাদের বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার নাম 'বাঙ্গলা, বাঙ্‌লা, বাংলা' বা 'বাঙ্গালা'কে আমাদের মতো বানান করিয়া লেখেন না; তাঁহারা লেখেন ও বলেন 'বংগাল, বংগালী'। মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন 'গুজরাট' দেশের সম্বন্ধে কিছু লেখেন বা বলেন, তখন তাঁহারা নিজ ভাষার শব্দ 'গুজরাথ, গুজরাথী'ই ব্যবহার করেন, 'গুজরাত, গুজরাতী' কদাচও মারহাট্টীতে দেখি নাই। তদ্রূপ 'ওড়িয়া, পঞ্জাবী' ইত্যাদি না লিখিয়া, বাঙ্গালায় 'উড়িয়া, পাঞ্জাবী' লেখাই সমীচীন মনে করি। 'হিন্দুস্থানী' শব্দকে বিশুদ্ধ উর্দু রূপ ধরিয়া 'হিন্দোস্তানী' লিখিলে বাঙ্গালা ভাষার উপর উৎপীড়ন করা হইবে। কোনও ইংরেজ, French, German, Danish-এর বদলে তত্তদ্-ভাষা অনুযায়ী 'বিশুদ্ধ' রূপ Français, Deutsch, Dansk লেখা বা বলার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না; তদ্রূপ ফরাসিও নিজ ভাষার অনুরূপ Anglais (ইংরেজ, আংরেজ), Allemand (এলেমান, জরমান), Danois (দিনেমার) ছাড়া আর কিছু প্রয়োগ করিবেন না। 'বিশুদ্ধ' রূপের নজীর দেখাইলে, বাঙ্গালা ভাষার তাবৎ তদ্ভব শব্দকে উক্ত নজীরের বলে বাঙ্গালা রূপ পরিত্যাগ করাইয়া আর কিছুর মূর্তি ধরাইতে হয়। বরং 'গুজরাট, মারহাট্টা' প্রভৃতি পদ-ই বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ বিশুদ্ধি-রক্ষায় সহায়ক হইবে।]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
২য় সংখ্যা, ১৩৩০
[সামান্য সংশোধন-সহ পুনর্মুদ্রিত]

"বাঙ্গলা ভাষায় অনুজ্ঞা"

প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য*

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় বাঙ্গলা ভাষায় অনুজ্ঞার রূপের যে উৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি বিষয়ে অমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না।[১]

সাধারণ অনুজ্ঞা (বা বর্তমান কালের অনুজ্ঞা) মধ্যম পুরুষের রূপের যে উৎপত্তি তিনি নির্ণয় করিয়াছেন (যেমন 'চর্, চর' < 'চর, চরহ্' < 'চর, চরথ + চরত'), সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই। প্রথম পুরুষের সম্বন্ধে খালি এইটুকু বলা অবশ্যক মনে করি যে, প্রথম পুরুষের বহুবচনে (= আধুনিক সম্ভ্রম-সূচক প্রথম ও মধ্যম

* বাঙ্গলা ১৩৩১ সালে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় (পৃঃ ৯৫-১০০) প্রকাশিত অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের 'বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা'-শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য ঐ বৎসর ১৩৩১ সাল ১লা চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একত্রিংশ বর্ষের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ 'বাঙ্গালা' এইরূপ বানান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা না ব্যুৎপত্তিসংগত না উচ্চারণসংগত; তিনি 'বাংলা' এইরূপ বানানের পক্ষপাতী। 'বঙ্গাল' > 'বাঙ্গাল, বাঙাল', 'বঙ্গাল + আ' > বাঙ্গালা' > আধুনিক 'বাঙ্গ্লা, বাঙ্লা', 'ঙ্গ' হইতে 'গ'-এর লোপে 'ঙ্' উচ্চারণ, এবং আদ্য অক্ষরে স্বরাঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায় মধ্যস্থিত অক্ষরের 'আ'-কারের লোপ। 'ঙ্গ'-এর দুই প্রকার উচ্চারণ বিদ্যমান : [১] 'ঙ্গ' [২] 'ঙ', 'বাঙ্গালা' > 'বাঙ্গলা', এই বানান ব্যুৎপত্তি ও আধুনিক উচ্চারণ, উভয়েরই অনুগামী। সংস্কৃতে অনুস্বারের উচ্চারণ ছিল, যে স্বরের পরে অনুস্বারের প্রয়োগ হইত, সেই স্বরের অনুনাসিক প্রলম্বীকরণরূপে, 'অং' = 'অঅঁ', 'ইং' = 'ইইঁ', 'উং' = 'উউঁ', ইত্যাদি। এইরূপ উচ্চারণ প্রাকৃতে ছিল, এবং আধুনিক ভারতীয় আর্য্য-ভাষার তদ্ভব শব্দাবলীতে অনুস্বার অনুনাসিকরূপেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, যেমন 'করণকম্, করণকং' > 'করণয়ং' > মারহাট্টী 'করণেঁ', 'চলিতব্যাকং' > 'চলিঅব্বউং' > গুজরাটী 'চলবঁু'। আধুনিক যুগের সংস্কৃত উচ্চারণে ও তৎসম শব্দের উচ্চারণে ভারতের নানা প্রদেশে অনুস্বারের প্রাচীন উচ্চারণ আর রক্ষিত নাই, নানা বিশিষ্ট নাসিক্য ধ্বনিতে ইহার বিকার ঘটিয়া গিয়াছে। যেমন দক্ষিণ-ভারতে 'ং', = 'ম্', 'হংসঃ' = 'হম্সঃ' বঙ্গদেশে 'ং' = 'ঙ্' 'হংসঃ', = 'হঙ্শঃ', 'সংস্কৃতম্' = 'শঙ্শ-ক্রিতম্'; উত্তর ভারতে 'ং' = 'ন্', 'হংসঃ', 'বংশঃ' = হন্স্, বন্স্, ইত্যাদি। সুতরাং 'বাঙ্গলা, বাঙ্লা'কে 'বাংলা' (অর্থাৎ কিনা-বাআঁলা') লিখিলে, অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিলে, এই বানানকেই অশুদ্ধ বলিতে হয়।†

† [বর্তমানে অবশ্য 'বাংলা'—এই বানানটি প্রয়োগসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, বলা চলে। এ বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধের শেষভাগে, পৃঃ ২২৭ দ্রষ্টব্য।]

পুরুষে) যে '-উন্' প্রত্যয় বাঙ্গলায় আমরা পাই ('চরুন' = 'চর্+উন্'), তাহা মূলে আদি আর্য্যভাষার (সংস্কৃতের) '-অন্তু' প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহার বিকাশ স্বাভাবিক ভাবে হয় নাই ; সংস্কৃত 'ন্ত' বাঙ্গলায় হয় 'তঁ'-তে, নয় কেবল 'ত'-য়ে পরিণত হইয়া থাকে (যেমন 'দন্ত>দাঁত', 'ত্বরন্ত->তুরিৎ', 'চলন্ত-> চলিত', 'গৃহ+অন্ত>ঘরত্' [=ঘরে], 'অন্তরে>তরে' [৪র্থী-তে], ইত্যাদি), 'ন'-য়ে নহে। 'চলন্তি>চলেন, চলন্তু>চলুন'—এখানে 'ন্ত'-র 'ন'-য়ে পরিণতি হইল কি রূপে ? এই 'ন' হইতেছে বিশেষ্য পদের বহুবচন-দ্যোতক প্রত্যয়ের প্রভাবে, সংস্কৃতের ষষ্ঠীর বহুবচনে যে '-আনাম্'-প্রত্যয় পাওয়া যায়, প্রাকৃতে তাহা '-আনং, -আন, -আণং, -আণ, -ন, -ণ' রূপে মেলে, এবং এই -'ন, -ণ' আধুনিক আর্য্যভাষায় বহুস্থলে প্রথমা ও অন্যান্য বিভক্তিরও বহুবচনের প্রত্যয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে (যেমন ব্রজভাষায় 'ঘোরন, ঘোড়ন', পূর্বী-হিন্দীতে 'ঘোড়ন', মৈথিলীতে 'ঘোড়নি', ইত্যাদি)। বাঙ্গলায়ও এই বহুবচনের 'ন' বিদ্যমান ছিল, এবং 'গুলা-ন্', প্রাদেশিক 'গুলাইঁ, লোকাইঁ, লোকাইন্' প্রভৃতি রূপে এই 'ন'-কারের অস্তিত্ব আছে।[২] '-ন্ত', '-ন্তু'-র 'ন'-য়ে পরিবর্তনে এই বিশেষ্যপদের 'ন'- কারের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। মারহাট্টী 'চরোৎ, চরুৎ'-তে দেখা যাইতেছে যে, '-ন্তু'-র 'ওৎ, উৎ'-তে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই পরিবর্তন হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উৎপত্তি শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন :—

	উত্তম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ	
	একবচনে	বহুবচনে	একবচনে	বহুবচনে	একবচনে	বহুবচনে
সংস্কৃত	চরিষ্যামি	চরিষ্যামঃ	চরিষ্যসি	চরিষ্যথ	চরিষ্যতি	চরিষ্যন্তি
বাঙ্গলা	চরিউ চরিউ	চরিমো	*চরিসি	চরিহ	চরিহে, চরিএ	×

২। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ আধুনিক বাঙ্গালার 'তিনি' পদকে সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ বহুবচন 'তানি হইতে আগত বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু 'তানি' কিছুতেই 'তিনি'-র মূল হইতে পারে না, 'তিনি' প্রাচীন বাঙ্গলাতে 'তিহঁ, তেহঁ' রূপে মেলে ; 'তেহঁ তিহঁ' = 'তেনহ, তিনহ' = '*তেন, *তিন, *তাণ'

ইহার মধ্যে মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের রূপের উৎপত্তি লইয়া আমার ঐকমত্য আছে। যদিও 'চরিএ'-র মতো 'হ'-কার-বিহীন '-ইএ'-যুক্ত পদ কে মূলে কর্ম-বাচ্যের পদ বলিয়াই আমার মনে হয়—এক 'হ'-কারযুক্ত রূপকেই ভবিষ্যতের রূপ বলিয়া আমি নিঃসংকোচে গ্রহণ করিতে পারি। (এসম্বন্ধে বিচার ১৩৩০ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মৎপ্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষায় কর্ম- ও ভাব-বাচের ক্রিয়া'-শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৫৭ প্রভৃতি)।*

কিন্তু উত্তম পুরুষের 'চরিমো, চরিউ, চরিউ' এই পদগুলি যে সংস্কৃত 'চরিষ্যামি চরিষ্যামঃ' হইতে হইয়াছে, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না। 'চরিমো', 'চরিউ', এইরূপ '-মো' ও '-ইউ' প্রত্যয় দুইটির, একটির সহিত আর একটির একবচন বহুবচন সম্পর্ক বা অর্থগত সাদৃশ্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা ভাষায় চর্য্যাপদের যুগ হইতেই ক্রিয়ার একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং কেবল এক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিদ্যমান থাকা একটু অস্বাভাবিক। অপর '-মো'- বা '-ইমো'- প্রত্যয়ান্ত রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুষ্প্রাপ্য—শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহের উদ্ধৃত এক 'বঞ্চিমো' (শ্রী কৃ কীঃ, পৃঃ ৩৮৭) ছাড়া অন্যত্র অপ্রাপ্য বলিলেই হয়। অন্যান্য ক্রিয়ার উত্তম পুরুষে '-ইবোঁ' প্রত্যয়ই পাওয়া যাইতেছে—'করিবোঁ, জানিবোঁ, খাইবোঁ', ইত্যাদি। (এই '-ইবোঁ'-র উৎপত্তি এইরূপ: '-ইতব্য'> '-ইঅব্‌ব'>'-ইব্‌ব'>'-ইব'+'-হোঁ'<'হউঁ হাঁউ' <'হৱ‍্'<'হউং'<'হকং'< 'অহকং'<'অহং': 'চলিতব্য (ক) + 'অহ (ক)ম্'>চলিব (া) + হোঁ' > 'চলিবাহোঁ, চলিবহোঁ, চলিবোঁ')। 'বঞ্চিমো' পদ 'বঞ্চিবোঁ-'র বিকারেই উদ্ভূত। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ '-ইষ্যামঃ', '-ইষ্যামি' হইতে যথাক্রমে '-ইমো', '-ইউ' প্রত্যয়দ্বয়ের উৎপত্তি নির্দেশ করিয়া একটু সন্দেহের সঙ্গে বলিয়াছেন, "ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে, 'চরিউ' ও 'চরিমো' এই উভয়ের মধ্যে বচন পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

—'তাণং' (>প্রাদেশিক বাঙ্গলা 'তান'—তাঁহার)—,*তানাম্' 'তেষাম্' স্থলে; তেহঁ, তিন্‌হ, তেন, তাণ' প্রভৃতি মূলে এই 'ন'-কার-যুক্ত ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ, 'তেহঁ, তেন' পদে '-ই' প্রত্যয় (যাহার মূল হইতেছে তৃতীয়ার '-এভিঃ>-এহি>-হি' প্রত্যয়) যোগ করিয়া '*তেঁহি, তেনি>তিনি' উৎপত্তি। সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য স্বর বাঙ্গলায় প্রায় সর্বত্রই লুপ্ত, যেখানে লোপ হয় নাই, সেখানে বিশেষ কারণ আছে এবং সে কারণগুলির একটিও 'তানি'-র মতো পদকে বাঙ্গলায় ই-কারান্ত করিয়া রাখিবার পক্ষে সমর্থক নহে।

*এই প্রবন্ধটি বর্তমান সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হইল, দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৯২-২১৬।

ইহা অতীব অদ্ভুত ব্যাপার। যাহা সংস্কৃতে ছিল বহুবচন, তাহা বাঙ্গলায় হইল একবচন ; এবং সংস্কৃতের একবচনের প্রত্যয় বাঙ্গলায় দাঁড়াইল বহুবচন। '-ইমো' প্রত্যয় '-ইবোঁ'-র বিকারেই উদ্ভূত, এবং এই '-ইমো' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অতি বিরল, ইহার সহিত '-ইউ'-এর কোনও সম্বন্ধ নাই। '-ইউ'-র উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার মত আমি "বাঙ্গালা ভাষায় কর্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া" প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩০, পৃঃ ৬৯)। '-ইউ' যদি '-ইষ্যামি' (বা '-ইষ্যামঃ') হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা সানুনাসিক রূপ ('-ইউঁ') পাইতাম। অবশ্য, কৃত্তিবাস হইতে উদ্ধৃত উদাহরণে '-ইউ' পাইতেছি, কিন্তু কৃত্তিবাস ঢের পরের লেখক, এবং যে পুঁথি দুইখানি হইতে পরিষদের অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের বয়স ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ, তখন '-ইউ' এই কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার প্রয়োগ লুপ্তপ্রায়, সে সময়ে অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু একটা লিপিকর-প্রমাদ হেতু আসিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। '-ইষ্যামঃ' হইতে '-ইমো'র উৎপত্তি বিষয়ে দুইটি অন্তরায় আছে—[১] সংস্কৃতের অন্ত্য স্বর আধুনিক বাঙ্গলার তদ্ভব পদে বর্তমান থাকে না, [২] সংস্কৃতের দুই স্বরধ্বনির মধ্যে একক অবস্থিত 'ম' বাঙ্গলায় ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় 'বঁ' ও পরে কেবলমাত্র 'ঁ' -তে পরিণত হয়, যেমন 'ভূমি—ভূঁই ; স্বামী—সাঁই ; সংক্রম—সাঁকোঁ>সাঁকো ; গ্রাম—গাঁ ; নাম—নাঁ, না' ('কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি, সে না কোন জনা'=কঃ নাম বংশীং বাদয়তে, স নাম কঃ পুনঃ জনঃ)। (যেখানে তৎসম শব্দের বিশেষ প্রভাব আছে, সেখানে কচিৎ 'ম'-কারের পুনরধিষ্ঠান ঘটিয়াছে, যেমন 'নাম—না', মারহাট্টি 'নাঁব', কিন্তু বাঙ্গলায় সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয় 'ম'-যুক্ত রূপ, 'নাম')।

সংস্কৃতের ভবিষ্যৎ বা লৃট্ এর পদের মধ্যে একমাত্র মধ্যম পুরুষের পদ আজকাল বিদ্যমান, '-ইহ>-ইও'-প্রত্যয়ান্ত হইয়া। পশ্চিমভারতীয় পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মধ্যদেশের ব্রজভাষা কনৌজিয়া বুন্দেলী, এবং কতকটা পূর্বী-হিন্দী ও ভোজপুরী ছাড়া অন্যান্য আর্য্যভাষায় ইহার ব্যবহার লুপ্তপ্রায়। যেখানে লুপ্ত, সেখানে নূতন প্রত্যয়ের প্রয়োগ আসিয়া গিয়াছে ; যেমন '-ইতব্য>-ইব, -অব' ; শতৃর '-অন্ত>-অন্দ, -অৎ'।

প্রাদেশিক বাঙ্গলায় ও প্রাচীন বাঙ্গলায় যে '-ইম্, -ইমু, -মু, -মোঁ' প্রত্যয় পাওয়া যায়, উত্তম পুরুষের ভবিষ্যতে, তাহা প্রাচীন বাঙ্গলায় '-ইবাহোঁ>'-ইবোঁ' হইতেই জাত ; চন্দ্রবিন্দুযুক্ত 'বঁ'-র 'ম'-য়ে পরিণতি খুবই স্বাভাবিক ; 'বোঁ>বোঁ

>ভো, ঙ, মো, ম', ইত্যাদি। (প্রাচীন বাঙ্গলায় 'ঙ'–'বঁ')। চন্দ্রবিন্দু না থাকিলেও দুই স্বরের মধ্যস্থ কেবল 'ব'-এর 'ম'-এ পরিণতি অন্যত্র সুলভ; তুলনীয়, উড়িয়া 'দেখিবি<দেখিমি' (উত্তম পুরুষে), মগহী 'লেমা, করমা, চলমা<লেবা, করবা, চলবা' (মধ্যম পুরুষে)।

[এই মন্তব্যটি পঠিত হইবার পরে সভায় উপস্থিত সতীশচন্দ্র রায় ও কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। লেখক সে আলোচনার উত্তরে তাঁহার বক্তব্য বলেন। পরিষৎ-পত্রিকায় 'মন্তব্য'-এর সঙ্গে এই 'আলোচনা' ও তাহার উত্তর উভয়-ই মুদ্রিত হয়। এখানে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে]

আলোচনা

'শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্‌-এ মহাশয় বলিলেন,—

"মাননীয় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পঠিত প্রবন্ধের সম্বন্ধে আমাকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের "বাঙ্গলা ভাষায় অনুজ্ঞা"-শীর্ষক প্রবন্ধটি আমি ভালো করিয়া পড়িতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু ঐ প্রবন্ধটির সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমার মনে দুই একটি বিষয়ে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সে সম্বন্ধেই এখন দুই চারিটি কথা বলিব। আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা বড়ো একটা দেখা যায় না। বড়োই আনন্দের বিষয় যে, ভাষাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু, পণ্ডিত শহীদুল্লাহ্ সাহেব, আর তাঁহাদের মতোই আরও দুই এক জন ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। সুনীতিবাবু এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা শতগুণে বেশি অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছেন; তিনি এজন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার এই প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা করার সুবিধা হইবে। যাহা হউক, সুনীতিবাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে আমার মনে যে সন্দেহ উদিত হইয়াছে, তাহা এই :—

"[১] সংস্কৃতের '-তব্য' প্রত্যয়ের অর্থের সহিত ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া-বিভক্তির একটু সাদৃশ্য আছে—সন্দেহ নাই; এবং বিভক্তিগুলির বাহুল্য ও জটিলতার বর্জন দ্বারা উহাদের সরলতা পাদনের দিকেই সকল অপভ্রংশের গতি—ইহাও সত্য বটে; কিন্তু সংস্কৃত '-তব্য' প্রত্যয় হইতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তির '-ব' ('করিব, যাইব, খাইব', ইত্যাদির) উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা

স্বীকার করিলে দেখা যাইবে যে, এ স্থলে সহজ ও স্বাভাবিক 'সে যাইব' (প্রাচীন বাঙ্গালা), 'তুমি যাইবা', 'মুঞি যাইমু' (প্রাচীন বাঙ্গালা) ইত্যাদির direct বা সরল উক্তির পরিবর্তে 'তাহা কর্তৃক যাওয়া হউক' ('তেন গন্তব্যং'), 'আমা কর্তৃক যাওয়া হউক' ('ময়া গন্তব্যং'), ইত্যাদি indirect ও round about অর্থাৎ ঘুরাইয়া বলা বাক্য-রীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন বা আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যতের 'সে যাইব', 'মুঞি যাইমু' ইত্যাদি প্রয়োগের মধ্যে কর্তৃপদে, প্রথমা বিভক্তি ছাড়া '-তব্য' প্রত্যয়ের জন্য অপরিহার্য্য তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার দেখিতে পাই না ; এরূপ অবস্থায় সংস্কৃত '-তব্য' প্রত্যয় হইতেই ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তির 'ব'-কার উদ্ভূত হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে মনে খুবই সন্দেহ জন্মে।

"[২] সংস্কৃত '-তব্য' প্রত্যয় হইতেই বাঙ্গালা ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তি 'ব'-কারের উৎপত্তি হইয়াছে, স্বীকার করিলেও, '-তব্য' প্রত্যয়ের রূপ প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ—তিন পুরুষেই এক প্রকার বলিয়া, বাঙ্গালার ভবিষ্যতের উত্তম পুরুষেও 'মুঞি করিমু'-স্থলে 'মুঞি করিব' প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়াই সম্ভবপর ছিল, কিন্তু সেরূপ না হইয়া 'মুঞি করিমু', 'মুঞি যাইমু' ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়ায় সংস্কৃতের বর্তমানের 'করোমি', 'যামি' ইত্যাদি অপভ্রংশে প্রাচীন বাঙ্গালায় 'করোঁ', 'যাওঁ', 'যাউ', 'যাঙ' ইত্যাদির ন্যায় সংস্কৃত ভবিষ্যতের '-স্যামি' বিভক্তি হইতেই 'করিমু', 'যামু' ইত্যাদির 'মু' উদ্ভূত হইয়াছে—এরূপ অনুমানই সমীচীন হনে হয়।

"[৩] শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু যে ভাবে 'করব+হুঁ = করবহুঁ, করবুঁ, করমু' ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন, তাহাও সন্তোষজনক মনে হয় না। উত্তম পুরুষ নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলেন বলিয়া 'করোঁ', 'করলুঁ', 'করমু' ইত্যাদির প্রয়োগের স্থলে কর্তৃপদ 'মুঞি' উহ্য রাখিলেও অর্থ-প্রতীতির কোনও ব্যাঘাত হয় না ; কিন্তু প্রথম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের স্থলে কর্তৃপদ উহ্য রাখিলে কে কর্তা, সে বিষয়ে অনিবার্য্য সন্দেহ থাকিয়া যায় ; এ জন্য 'করব' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের সহিত কর্তৃপদ 'হুঁ' (সংস্কৃত 'অহং' শব্দের অপভ্রংশ) যোগ করার কোনও প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও উহা যোগ করায় এবং প্রথম ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদের স্থলে অনিবার্য্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও প্রথম ও মধ্যম পুরুষের কর্তৃপদ-সূচক কোনও চিহ্নের প্রয়োগ না করিয়া শুধু 'করব'—যাহার অর্থ প্রাচীন বাঙ্গালায় 'সে করিবে' বা 'তুমি করিবা' দুই-ই হইতে পারে—এরূপ সন্দিগ্ধার্থ ক্রিয়া পদের প্রয়োগ [illegible] একান্তই অসম্ভব মনে হয়।

"[৪] বাঙ্গালা অতীতের বিভক্তি '-ল' যে সংস্কৃতের 'ক্ত' (অতীতের অর্থে কৃদন্ত 'ক্ত' প্রত্যয়) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বোধ হয়, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। বাঙ্গালা অতীতের উত্তম পুরুষের ক্রিয়া-বিভক্তিতেও আমরা '-লোঁ', '-লু' (পরবর্তী সময়ে '-নু') দেখিতে পাই। 'ক্ত' প্রত্যয়ের অপভ্রংশে 'ল' ব্যতীত 'লোঁ' বা 'লু' আসিতে পারে না ; সুতরাং এ স্থলে ল-কারের অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু-সংযোগ সংস্কৃত উত্তম পুরুষের '-অম্' বিভক্তির প্রভাব-সম্ভূত না বলিয়া গত্যন্তর দেখা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালার উত্তম-পুরুষের 'করোঁ', 'মরোঁ' ইত্যাদি স্থলেও 'ওঁ'-কে সংস্কৃত '-মি' বিভক্তি হইতে উদ্ভূত না বলিয়া উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালা বর্তমান ও অতীতের উত্তম পুরুষের বিভক্তির analogy বা সাদৃশ্য হেতু, বাঙ্গালা ভবিষ্যতের '-মু' বিভক্তিও সেইরূপ সংস্কৃত ভবিষ্যতের '-স্যামি' বিভক্তি হইতে উৎপন্ন কিংবা উহারই প্রভাবসম্ভূত, এরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন মনে হয়।

"[৫] শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু সংস্কৃত (ং) অনুস্বারের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, এ স্থলে উহার কোনও উপযোগিতা বুঝিতে পারিলাম না। বাংলার 'বাঙ্গালা' শব্দটাকে কেহ-ই সংস্কৃত অনুস্বারের বিশুদ্ধ উচ্চারণ অনুসারে 'বা-আঁ-লা' বলিয়া উচ্চারিত করিবেন না ; 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গলা' লিখিলেও নিশ্চিতই উহা 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্‌লা'ই উচ্চারিত হইবে ; এ অবস্থায় 'বাংলা' না লিখিয়া 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গলা' লেখার বিশেষ কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।"

'শ্রীযুক্ত সতীশবাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু এই উত্তর দিলেন,—

"রাত্রি অধিক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশবাবু যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমার বক্তব্যের সমালোচনা করিলেন, তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এখন সম্ভবপর হইবে না। তবে মোটামুটি এই কয়টি কথা বলিতে চাহি।

"[১] সংস্কৃতের অতীতের ক্রিয়াপদগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া যায়। প্রাকৃতে কচিৎ একটা আধটা লঙ্, লুঙ্, লিট্-এর পদ দেখা যায়, কিন্তু প্রায় সর্বত্র '-ত'-প্রত্যয়ান্ত পদের সাহায্যেই অতীত ক্রিয়ার দ্যোতনা হইয়া থাকে। অকর্মক ক্রিয়া হইলে এই '-ত'- প্রত্যয়ান্ত পদ কর্তার বিশেষণ হয়। সকর্মক হইলে কর্মের বিশেষণ হয় ও কর্তাকে তৃতীয়ায় আনা হয় ; যেমন প্রাচীন সংস্কৃতের রীতি অনুসারে—'অহং জগাম, অহং রাজানম্ অপশ্যম্', কিন্তু প্রাকৃতে 'অহং (অহঅং, হকং, হগং, হগে' ইত্যাদি) গদো (গও, গদে)', ও 'মএ (=ময়া) রাজা (রাআ,

লাযা, লাআ) দেক্‌খিও (বা দিট্‌ঠো, দিশ্‌টে)।' এই '-ত'-প্রত্যয়ান্ত রূপে স্বার্থে '-ইল্ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া বাঙ্গলায় অতীত কালের '-ইল' প্রত্যয় দাঁড়াইল; 'অহঅং গঅ-ইল্ল' > প্রাচীন বাঙ্গলা 'হউ গেল', 'মএ রাজা দেক্‌খিঅইল্ল', প্রাচীন বাঙ্গলা 'মই রাজা দেখিল'। অর্থাৎ অতীত অকর্মক ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ, সকর্মক ক্রিয়ার সকর্মক কর্মবাচ্যে প্রযোগ। হিন্দীতে এই রূপ এখনও বিদ্যমান আছে, যেমন ব্রজভাষায়—'হোঁ গয়ো' (হোঁ = অহং, গয়ো = গঅউ = গঅও = গতক:), কিন্তু 'মৈঁ রাজা দেখ্যো' (মৈঁ = ময়া, দেখ্যো = দেক্‌খিঅউ = দেক্‌খি-অও = * দৃক্ষিতক:, দৃষ্ট-অর্থে)। তুলনীয় প্রাচীন বাঙ্গলা (চর্য্যাপদ ৩৫) -'এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ। এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ।' এখানে 'হাঁউ অচ্ছিলেঁ' = স্থিতোঽহং—হাঁউ বা হউ = অহং, 'মই বুঝিল' = 'ময়া জ্ঞাতং'), এক-ই পদে পাশাপাশি প্রথমার 'হাঁউ' = 'অহং'-যোগে অকর্মক 'অচ্ছ' বা 'আছ্‌' ধাতুর সঙ্গে কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ ও সকর্মক 'বুঝ্‌' ধাতুর সঙ্গে তৃতীয়ার 'মই' = 'ময়া'-যোগে কর্মবাচ্যে প্রযোগ আমরা পাইতেছি। দেখা যাইতেছে, অতীতে তিঙন্ত পদগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় এইরূপ ঘুরাইয়া বলিবার—সকর্মক ক্রিয়াকে কর্মবাচ্যে আনিয়া বলিবার—রেওয়াজ আসিয়া গিয়াছে।

"অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও দেখিতে পাইতেছি যে, '-তব্য' > '-ইব'-প্রত্যয়ান্ত রূপ ভবিষ্যতের ল্‌ট্‌ বা তিঙন্ত রূপগুলির স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এখানে সকর্মক অকর্মক ক্রিয়ার ভেদ নাই,—উভয় স্থলেই কর্মবাচ্যের প্রয়োগ হয়, যেমন 'যুষ্মাভি: ভবিতব্যং', 'ময়া দাতব্যা পৃচ্ছা' = প্রাচীন বাঙ্গলায় 'তুম্‌হে হোইব' (চর্য্যা ৫), 'মই দিবি পিরিচ্ছা' (চর্য্যা ২৯)। প্রাচীন বাঙ্গলায় এই অনুসারে আমরা দেখি—

"উত্তম পুরুষ—মই (মুঞি, ইত্যাদি = ময়া), আমি (= অম্‌হে, অম্‌হহি = অস্মাভি:) জাইব, খাইব (= যাতব্যং, খাদিতব্যং)।

"মধ্যম পুরুষ—তই (তুঞি ইত্যাদি = ত্বয়া), তুমি (= তুম্‌হে, তুম্‌হহি = = যুষ্মাভি:) জাইব, খাইব।

"প্রথম পুরুষ—সে জাইব, সে খাইব। এখানে প্রথম পুরুষে তৃতীয়ার 'তে' (= তেন)-স্থলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখা যাইতেছে যে, প্রথমায় 'সে' ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথমা ও তৃতীয়ার পদের অদলবদল প্রাচীন বাঙ্গলায় বিরল নহে। প্রাচীন বাঙ্গলার প্রথমার 'হাঁউ'(= অহং)-কে তৃতীয়ার 'মই, মই' (= ময়া)

বিতাড়িত করিয়াছে। তদ্রূপ প্রাচীন বাঙ্গলার প্রথমা 'তো', 'তু' (<ত্বং)-কে তৃতীয়ার 'তুই' ('ত্বয়া') দূরীভূত করিয়াছে। কেবল ইহার ব্যতিক্রম আমরা এই প্রথম পুরুষেই দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন বাঙ্গলাতে 'তেঁ জাইব, তেঁ খাইব' রূপ-ই হওয়া স্বাভাবিক ও প্রাকৃত ব্যাকরণের রীতি ধরিয়া দেখিলে এই রূপ-ই অপেক্ষিত; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলায় কিরূপ প্রয়োগ ছিল আমরা তাহা জানি না। কিন্তু প্রথমা ও তৃতীয়ার গোলমাল অতীতের ক্রিয়ায় যে প্রাচীন বাঙ্গলায় হইয়াছিল, তাহা সহজেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি—যেমন 'হাঁউ সুতেলি' = আমি শুইলাম (চর্য্যা ১৮—এখানে প্রথমার প্রয়োগ), 'হাঁউ অচ্ছিলেঁ' = আমি ছিলাম (চর্য্যা ৩৫—প্রথমার প্রয়োগ); কিন্তু 'মোএ ঘলিলি হাডেরি মালী' = আমি হাড়ের মালা ফেলিয়া দিলাম (চর্য্যা ১০—তৃতীয়ার প্রয়োগ), 'মই বুঝিল' = আমি বুঝিলাম (চর্য্যা ৩৫—তৃতীয়ার প্রয়োগ), এরূপ স্থলে 'হাঁউ', 'মই' দুই বিভিন্ন সুবন্ত রূপের মধ্যে গোলমাল ঘটা স্বাভাবিক, স্বীকার করিতেই হইবে। তদ্রূপ প্রথম পুরুষেও 'সে, তেঁ' (= সঃ, তেন)-র অদল-বদলও অপেক্ষিত, ও ক্রমে যে বহুলতর রূপে প্রযুক্ত প্রথমার 'সে' তৃতীয়ার 'তেঁ'-কে দূরীভূত করিতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

"[২, ৩, ৪] 'মুঞি করিব, আমি করিব' এইরূপ প্রয়োগ প্রাচীন বাঙ্গলাতে খুবই দৃষ্ট হয়। যথা—চর্য্যা ৩৬—'শাখি করিব জালন্ধরিপাএ' = (আমি) জালন্ধরিপাদকে সাক্ষী করিব। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও এইরূপ প্রয়োগ যথেষ্ট আছে; পৃষ্ঠা ১১৪—'তোম্হার করিব অম্হে উচিত সমান' (= সম্মান), পৃষ্ঠা ১৮৫—'আম্হে বহিব তোর ভার', 'আম্হে সত্য করিব', ইত্যাদি।

"কেবল-মাত্র '-ইল', '-ইব'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ তিন পুরুষেই ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনতম বাঙ্গলায় এই ব্যবস্থা ছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়। এখনও বাঙ্গলার কোনও-কোনও আঞ্চলিক ভাষায় এই রীতি বিদ্যমান, তুলনা—ঢাকা অঞ্চলে 'সে ক'রুব' = সে করিবে। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় (চণ্ডীদাসের পূর্ব হইতেই) খালি '-ইল', '-ইব' উত্তম, মধ্যম বা প্রথম পুরুষ বুঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। '-ইল, ইব'-র সঙ্গে পুরুষদ্যোতক কিছু জুড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল। যে অংশ জুড়িয়া দেওয়া হইল, তাহা হয় কোনও সর্বনাম-পদ, নয় বর্তমানের ক্রিয়াপদের অনুকরণে আনীত কোনও বিভক্তি। এইরূপ ব্যবস্থা আমরা স্পষ্টই পুরাতন বাঙ্গলায় দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনও জল্পনা বা অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—"উত্তম পুরুষ =

অতীতকালে 'কৈল' (=প্রাকৃত কঅ-,কয়-ইল্ল=কৃত+ইল) ; 'কৈলা+হোঁ'= 'কৈলাহোঁ' (এই 'হোঁ', প্রাচীন বাঙ্গলার 'হাঁউ' হইতে ; তুলনীয়—'হৈলাহোঁ' ; প্রাচীন অসমিয়াতে ='আঙোঁ' প্রত্যয় মেলে, মৈথিলীতেও 'অহুঁ'), তাহা হইতে 'কৈলাওঁ, কৈলাঙ, কৈলোঁ, কৈলো, কৈলুঁ, কৈলুম্' ইত্যাদি ; ও এই প্রকার রূপের প্রসারে—'করিলাহোঁ, করিলাওঁ, করিলোঁ, করিলুম্, ক'রলুম, ক'রনু', 'করিল+আমি'='করিলাম্'।

"মধ্যম পুরুষ—'কৈল' ; 'কৈলেহেঁ, কৈলাহা' অসমিয়াতে এই প্রকার রূপ পাওয়া যায় ; মৈথিলীতে—'কৈলহ, কৈলেঁ, কৈলহি<কৈলেহেঁ', এখানে 'আহা' <'অহ' প্রত্যয়, বর্তমানের ক্রিয়ার মধ্যম পুরুষের অনুসরণে, যথা 'চলহ, চলাহা' ='চলথ' ; এবং 'এহেঁ'='আহা, অহ' প্রত্যয়ে বহুবচন-দ্যোতক চন্দ্রবিন্দু যোগে। [বহুবচন জানাইবার জন্য চন্দ্রবিন্দু বা '-ন-' বা '-ন্হ-' আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিতে খুবই সাধারণ—ও এই চন্দ্রবিন্দু বা '-ন-' বা '-ন্হ-', বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের ষষ্ঠীর বহুবচনের '-আনাম্' বিভক্তির 'ন' হইতে জাত, এ কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তাহা হইতে 'কৈলা, কৈলে, কৈলেঁ' (=করিলা, করিলে, করিলেন) ইত্যাদি। অনাদরে 'কৈলি' (='কৈল+ই', 'ই<হি', সাধারণ অনুজ্ঞার রূপ হইতে অনুমিত হয়), >'করিলি'।

"প্রথম পুরুষ—'কৈল', 'কৈলে' ('-এ' প্রত্যয় এখানে বর্তমান ক্রিয়ার প্রথম পুরুষের এ-কার হইতে অনুমিত হয়) ; 'কৈলান্তি, কৈলান্ত, কৈলেন্ত, কৈলেন' (বর্তমানের প্রথম পুরুষের বহুবচন হইতে গৃহীত) ; 'করিল, করিলে>ক'রলে, করিলেন্ত, করিলেন', ইত্যাদি।

"তদ্রূপ ভবিষ্যতেও উত্তম পুরুষে—'মুই, আমি করিব' ; 'করিবাহোঁ>করিবোঁ, করিবুঁ, করিমু, করিম্, ক'রমু'। 'করিব+আমি>করিবাম' (ময়মনসিংহের ভাষায়)।

"মধ্যম পুরুষে—'তুই, তুমি করিব' ; 'তুমি করিবাহা, করিবাহেঁ, করিবেহেঁ> করিবা, করিবে, করিবেন'। অনাদরে 'তুই করিবি'।

"প্রথম পুরুষে—'সে, তাহারা করিব' ; 'করিবে' ; 'করিবান্ত, করিবেন্ত, করিবেন'।

'করিবোঁ' পদে 'ব' স্পষ্ট বিদ্যমান। 'করিবোঁ' পদের 'ব' অনুনাসিক ওষ্ঠ্য স্বর 'ওঁ'-কারের সহিত যুক্ত হওয়ায় সহজেই 'মো', 'মু' হইয়া যায় ; 'করিমো> করিমু, ক'রমু'। কিন্তু 'করিব+আমি'—এখানে স্বরবর্ণটি কণ্ঠ্য অ-কার হওয়ার

দরুন, 'ব'-এর 'ম'-তে পরিবর্তনের দিকে প্রবণতা রুদ্ধ হইয়াছে ; তদ্রূপ মধ্যম ও প্রথম পুরুষের রূপে 'ওঁ' না থাকায় 'ব'-ই বহাল আছে।

"কৈলোঁ, করিলোঁ, করিবোঁ'—ইহাদের অনুনাসিক বর্তমানের ক্রিয়ার 'করোঁ, খাওঁ, চলোঁ' প্রভৃতি রূপে যে অনুনাসিক বিদ্যমান, তাহা হইতে হইতে পারে। এই অনুনাসিক সংস্কৃতের '-মি, -মঃ' প্রত্যয়ের বিকারে উৎপন্ন। 'করোমি> *করমি>*করিমি>*করিঁরিঁ>*করীঁ>করি; কুর্মঃ>*করোমো>*করমো> *করওঁ, করঙ>করোঁ'। ইহা অসম্ভব নহে যে, মধ্যম পুরুষের ও প্রথম পুরুষের রূপের মতো অতীতে ও ভবিষ্যতে '-ইল', '-ইব' প্রত্যয়ের সঙ্গে বর্তমানেরই বিভক্তি 'ওঁ' জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে একটি বড়ো কথা বলা চলে ; 'হোঁ' রূপটি পুরাতন বাঙ্গলায় ও অসমিয়াতে, তথা 'অহুঁ' রূপে মৈথিলীতে আমরা পাইতেছি। আর তদ্ভিন্ন 'চলিলাম, করিবাম' প্রভৃতি পদে স্পষ্টই '-ইল', '-ইব'+'আমি' পাইতেছি। 'চলিবাহোঁ'>'চলিবোঁ', 'চলিলাহোঁ>চলিলোঁ' পদে কেবল আধুনিক 'আমি' স্থলে প্রাচীন 'হোঁ, হাঁউ, হউঁ'। তবে এ ক্ষেত্রে এরূপ মনে করিলে ব্যাখ্যা চলে যে, 'চলিবোঁ, চলিবাহোঁ ; চলিলোঁ, চলিলাহোঁ', এই প্রকার রূপে লুপ্ত উত্তম পুরুষের সর্বনাম 'হোঁ' ও বর্তমানের ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের রূপের 'ওঁ', এই দুইয়ের-ই অস্তিত্ব আছে।

"[৫] 'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা, বাংলা' বানান লইয়া আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা আলোচ্য প্রসঙ্গের বহির্ভূত বলিয়াই পাদটীকায় তাহাকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'বাঙ্গলা'—এই বানানকে 'না ব্যুৎপত্তি-সংগত, না উচ্চারণ-সংগত' বলিয়াছিলেন। আমি 'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা' ও 'বাঙলা' এই তিন প্রকার বানানই লিখিয়া থাকি, অনুস্বার দিয়া লেখার পক্ষপাতী নই। 'বাঙ্গলা'—এইরূপ বানানকে যে ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ, দুই দিক্ ধরিয়া বিচার করিলে বিশেষ ভাবে সমর্থিত করা যায়, তাহা আমার বিশ্বাস ; এবং সেই জন্য আমার মন্তব্যে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছি।[৩]

"আজকার প্রবন্ধের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সতীশবাবু তাঁহার সন্দেহ কয়টি

৩ কার্যতঃ 'বাঙ্গলা বাঙ্গালা, বাঙলা, বাংলা' এই চার প্রকার রূপ-ই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এগুলির মধ্যে 'বাংলা' রূপটির সমধিক প্রচলনের হেতু এই যে, ইহার বানান সরল, ইহাতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন নাই এবং ইহা লেখাও সহজ। তবে, জাতি বুঝাইতে 'বাঙ্গালী' বা 'বাঙালী' ব্যতীত অন্য রূপ চলিবে না।

উল্লেখ করিয়া আমার ব্যাখ্যা করিবার অবসর দিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

"শ্রীযুক্ত কিরণবাবু 'আমি, হম্' প্রভৃতি সর্বনাম পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্ন আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হইলেও যথাসাধ্য সংক্ষেপে সমাধানের চেষ্টা করিব। 'আমি, হম্' সংস্কৃত 'অহম্' শব্দ হইতে উদ্ভূত নহে। বাঙ্গলায় ও আধুনিক আর্য্যভাষায় সর্বনাম উত্তম পুরুষের উৎপত্তি এই :—

"প্রথমা একবচনে—বৈদিক বা সংস্কৃতে 'অহম্'। প্রাকৃতে এই 'অহম্' পদে একটা স্বার্থে 'ক' জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে হইল 'অহকং'। 'অহকং' অশোক অনুশাসনে 'হকং' রূপে পাওয়া যায়, সাহিত্যের (সংস্কৃত নাটকের) মাগধী প্রাকৃতে 'হকং'-এর পরিবর্তন হয় 'হকে, হগে, হগ্গে'। চলিত-ভাষায় সমগ্র উত্তর-ভারতে 'হকং' পদটি, 'হগং, হঅং, হবং, হউ' এইরূপে পরিবর্তিত হয়। এই 'হউ' পদটি গুজরাটীতে 'হুঁ', পশ্চিমা-হিন্দী (ব্রজভাষা)-তে 'হোঁ', ও প্রাচীন বাঙ্গলাতে (চর্য্যাপদের ভাষায়) 'হাঁউ' রূপে মেলে (যেমন 'হাঁউ নিরাসী, খমন ভতারে', চর্য্যা ২০; 'তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী', চর্য্যা ১০; 'এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহে', চর্য্যা ৩৫)। গুজরাটী ও ব্রজভাষাতে 'অহম্—অহকং'-পদ-জাত কর্তৃকারকের একবচনের রূপ 'হুঁ, হোঁ' এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ইহা প্রাচীন বাঙ্গলার যুগের পর হইতেই বাঙ্গলা ভাষায় লোপ পাইয়াছে।

"তৃতীয়া একবচনে—সংস্কৃতে 'ময়া'। প্রাকৃতে ইহা 'মএ' রূপ গ্রহণ করে, তৎপরে অপভ্রংশে 'মই'। বিশেষ্য পদে তৃতীয়ায় সংস্কৃতের '-এন' প্রত্যয় অন্ত্য যুগের প্রাকৃতে 'এং' বা 'এ'-তে পরিণত হয়; যেমন 'হস্তেন>হত্থেণং, হত্থেণ> হত্থেং, হত্থেঁ>হাথেঁ, হাথে, হাতে'; এই বিশেষ্য পদের রূপ হইতে '-এন'-বিভক্তি-জাত চন্দ্রবিন্দু, 'মই' পদের উপর প্রভাব ফেলে, তাই 'মই' রূপটি আমরা পাই। এই 'মই' হইতেছে আমাদের বাঙ্গলায় 'মুই, মুঞি, মুয়িঁ, মুহি', ইত্যাদি। হিন্দীর 'মৈঁ'-ও এই এক-ই শব্দ।

"চতুর্থী একবচনে—'মহম্'। প্রাকৃতে 'মজঝ, মজ্ঝু'। ইহা হইতে হিন্দীর 'মুঝ্' (যেমন 'মুঝ্‌কো' =আমাকে, 'মুঝে'=আমায়)। হিন্দীর প্রভাবে বাঙ্গলার ব্রজবুলী সাহিত্যে 'মঝু'=আমার।

"ষষ্ঠী একবচনে—'মম'। 'মম' ক্রমে 'মব' ও পরে 'মো' হইয়া দাঁড়ায়। ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'মো' প্রাচীন বাঙ্গালায় মেলে। 'মো'-তে আবার নূতন করিয়া ষষ্ঠীর '-র' বিভক্তি যোগ করিয়া 'মোর'।

"প্রথমা বহুবচনে—সংস্কৃতে 'বয়ম্'। কিন্তু প্রথমা ছাড়া অন্য বিভক্তিতে বহুবচনে সংস্কৃতে যে 'অস্ম'-রূপ আসে, প্রাকৃতে তাহাই অবলম্বন করিয়া বহুবচনে 'অম্হে' পদের সৃষ্টি হয়। এই 'অম্হে' হইতে প্রাচীন বাঙ্গলা 'আম্হি' (আহ্মি), ও পরে 'আমি'। হিন্দীর 'হম্' ও 'অম্হে' এই পদ হইতে, এবং সাধু-হিন্দীতে 'হম্' সদাই বহুবচন।

"তৃতীয়া বহুবচনে—'অস্মাভিঃ' হইতে প্রাকৃতে 'অম্হেহি' ও 'অম্হহি'। ইহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গলায় 'আম্হে' (আহ্মে), উড়িয়ায় 'আম্ভে'। প্রথমার 'আম্হি' (আহ্মি) ও তৃতীয়ার 'আম্হে' (আহ্মে) এই দুই রূপ কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলার যুগ হইতে আর তাহাদের পার্থক্য বজায় রাখে নাই—উভয়েই আধুনিক বাঙ্গলা 'আমি'-তে মিলিয়া গিয়াছে।

"বহুবচনের অন্য বিভক্তির রূপ বাঙ্গলায় আসে নাই। দেখা যাইতেছে, উৎপত্তি-হিসাবে বাঙ্গলার উত্তম পুরুষের সর্বনামের কতকগুলি পদ হইতেছে একবচনের, আর একটি পদ বহুবচনের। যথা,—

একবচন	বহুবচন
প্রথমা—(অহম্ > অহকং >) হাঁউ [লুপ্ত]	(অস্মে > অম্হে > আম্হি > আমি
তৃতীয়া (ময়া > মএ >) মই, মঈ, মুই	(অস্মাভিঃ > অম্হেহি >) আম্হে >
চতুর্থী—(মহ্যম্ > মজ্ঝ >) মজ্ঝ [ব্রজবুলী]	আমি
ষষ্ঠী—(মম >) মো, মো + র = মোর	

"অসমিয়া ভাষায় এখনও 'মই' = একবচনে = আমি, ও 'আমি' = বহুবচনে, আমরা অর্থে। প্রাচীন বাঙ্গলায় 'আমি' পদটি একবচনে ব্যবহৃত হইতে থাকে ; 'মই', মুই' ও 'আমি'-র মধ্যে বচন-ঘটিত পার্থক্য চলিয়া যায়। সুতরাং পরবর্তী-কালে নূতন বহুবচনের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ায়, 'আমি-সব, আমা-সব, মো-সব, মুই-সব' ও 'মোরা, আমরা'—এই প্রকার বহুবচনের নবীন রূপগুলি সৃষ্ট হয়। হিন্দীতেও সেইরূপ 'হম্' পদ একবচনে প্রযুক্ত হইতে থাকিলে নূতন বহুবচনের রূপ 'হম্-লোগ'-এর উদ্ভব॥"[৪]

৪ বাঙ্গলা ক্রিয়াপদের রূপের বিবর্তন সম্বন্ধে লেখকের The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তর আলোচনা আছে।

'বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্তমান কালের উত্তম পুরুষ' শীর্ষক প্রবন্ধে সম্বন্ধে মন্তব্য

[১] বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় কর্তৃক লিখিত এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি ('বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষার বর্তমান কালের উত্তম পুরুষ', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৭, পৃঃ ৮২-৯৪) পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। 'চলোঁ—চলি'—এই প্রকারের বর্তমানের রূপগুলির যে উৎপত্তি আমার পুস্তকে আমি নির্দেশ করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি যে তাহা বর্জন করিতে হইবে। বন্ধুবর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হইতে এবং আধুনিক আঞ্চলিক বাঙ্গালার প্রয়োগ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মধ্য যুগের ও প্রাচীন যুগের বাঙ্গালায় নিম্ন প্রকারের প্রয়োগ হইত :—

বর্তমান, উত্তম পুরুষ, একবচনে— 'মই, মেঁা, মোএঁ চলোঁ, করোঁ';
বহুবচনে—'আহ্মে' [=আম্হেঁ] চলীএ চলী, করীএ করী'।

বাঙ্গালা ভাষার স্বস্থানীয় অন্য আধুনিক ভারতীয় আর্য্য-ভাষা, তথা অপভ্রংশ ও প্রাকৃতের নজীরগুলি প্রশংসনীয় অনুসন্ধানের সহিত অনুশীলন করিয়া এই রূপগুলির যে ব্যুৎপত্তি তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট সম্পূর্ণরূপে সমীচীন বলিয়া মনে হয়, এবং আমি এই ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইতেছি :—

একবচনে—'চলামি, করোমি' হইতে 'চলমি, করমি, *চলম, *করম, চলবঁ, করবঁ, চলউঁ, করউঁ'-র মধ্য দিয়া 'চলোঁ, করোঁ' ('অহম্'-স্থলে 'ময়া' ও 'মম' হইতে উদ্ভূত অপভ্রংশ 'মই', 'মো'+তৃতীয়ার '-এন'-যোগে 'মই' ও 'মোএঁ' প্রভৃতি রূপের উৎপত্তি)।

বহুবচনে ভাববাচ্যের রূপ—'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে' > প্রাকৃত 'অম্হেহিং *করিয়তি, *করিয়াতি, *করীয়তি, করীঅদি' > অপভ্রংশ 'অম্হহিঁ করীঅই' > প্রাচীন বাঙ্গালায় '*আম্হহি বা আম্হই, আম্হে করীঅই, করীএ'> মধ্য যুগের বাঙ্গালায় 'আহ্মে (=আম্হেঁ) করীএ, করী'।

'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে' হইতে যে গুজরাটী 'অমে করীএ' হইয়াছে, ইহা ১৯১৪ সালে L. P. Tessitori তেস্সিতোরি দেখাইয়াছিলেন, এবং আমার বইয়ে (The Origin and Development of the Bengali Language, সংক্ষেপে ODBL) ৯১০-এর পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের উল্লেখ আমি করিয়াছি।

আমার পুস্তকের নবীন সংস্করণ হইলে তাহাতে এই ব্যুৎপত্তিই প্রদর্শিত হইবে।*

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত ব্যুৎপত্তি-ক্রমের সহিত আমি যে ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছি তাহার তুলনা করিলে সামান্য দুই একটি পার্থক্য দৃষ্ট হইবে।

[২] অপভ্রংশের উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞার একবচনের প্রভাব বিহারীতে যে আসিয়া গিয়াছে, ইহা খুবই সম্ভব। পশ্চিমা হিন্দীতে যে অনুজ্ঞা ও বর্তমান এক-ই রূপে মিলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা তথা-কথিত বর্তমানের অনুজ্ঞায় প্রয়োগ হইতে সুস্পষ্ট।

[৩] ৩৩-সংখ্যক চর্য্যাপদে 'আবেশী' (= আইসি) পদকে আমি বর্তমান উত্তম পুরুষের ক্রিয়া বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্তমান উত্তম পুরুষ '-ই'- বা '-ঈ-'-কারান্ত রূপ হইলেই, মূলে তাহা কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত বর্তমান একবচনের রূপ বলিয়া ধরিতে হইবে; এই হিসাবে শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত 'আবিশ্যতে' = মাগধী প্রাকৃত 'আবিশ্‌শদি, *আবিশীঅদি'—প্রাচীন বাঙ্গালা 'আবেশী'—এই প্রকার ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে একটু অন্তরায় ঘটে; মাগধী প্রাকৃতের সম্ভাব্য রূপ '*আবিশীঅদি' মাগধী অপভ্রংশে দাঁড়াইবে '*আবিশীঅই', এবং প্রাচীন বাঙ্গালায় তাহার পরিবর্তনের রূপ হওয়া উচিত '*আবিশীএ'। চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালায় অন্ত্য '-অই' অবিকৃত থাকে, দুই এক স্থলে সন্ধির ফলে এই '-অই'কে '-এ' রূপে পাওয়া গিয়াছে। আমার মনে হয়, 'ক্ত'-কারান্ত রূপ 'আবিষ্ট'-স্থলে কথ্য ভাষায় প্রযুক্ত '*আবিশিত' হইতে মাগধী প্রাকৃতে '*আবিশিদ', মাগধী অপভ্রংশে '*আবিশিঅ', এবং তাহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় '*আবিশী', বর্ণবিন্যাস-বিভ্রাটে 'আবেশী'। অন্ত্য '-ইঅ' অপভ্রংশে থাকিলে, ভাষায় '-ঈ'-রূপেই তাহার পরিণতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই হিসাবে, ৬-সংখ্যক চর্য্যার 'হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জাণী'-র 'জাণী' পদটিকে 'জ্ঞাত—*জানিত—জাণিদ—জাণিঅ—জাণী' রূপে ব্যাখ্যা করিলেই ভালো হয়—আমার পুস্তকে (পৃঃ ৯১২) প্রস্তাবিত 'জ্ঞায়তে>জাণীঅই>জাণী' এইরূপ ব্যাখ্যা ততটা সমীচীন বলিয়া এখন মনে হইতেছে না।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত পাঠ 'বিহরহুঁ স্বচ্ছন্দেঁ' (চর্য্যাপদ ৩৯) আমার গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে।

*দ্রষ্টব্য ODBL, Pt III, Supplementary, 1972, pp 94-95

[৪] পশ্চিমা অপভ্রংশের বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের বহুবচনের '-হুঁ' প্রত্যয়ের সহিত চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালার অনুরূপ '-হুঁ' প্রত্যয়ের সম্বন্ধ আমার পুস্তকে আলোচিত হয় নাই। পরবর্তী বাঙ্গালার অতীত কালের ক্রিয়ায় উত্তম পুরুষে প্রযুক্ত '-হোঁ' প্রত্যয়ের সহিত প্রাচীন বাঙ্গালার এই '-হুঁ' প্রত্যয়ের সাদৃশ্য দৃষ্টে, এবং 'অহম্ > অহকং > হকং > হঅং > হব়ং > হউ > হোঁ'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুমানে, আমাব পুস্তকে প্রাচীন বাঙ্গালার '-হুঁ'-র উৎপত্তি নির্ধারণের প্রয়াস করিয়াছিলাম, পশ্চিমা অপভ্রংশের বর্তমান উত্তম পুরুষের '-হুঁ' বিভক্তির কথা এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত করা হয নাই অনবধানতাবশতঃ (মৎ-প্রণীত The Origin and Development of the Bengali Language, পৃঃ ৯৩৪ ও ৯৭৫)। মধ্য বাঙ্গালার '-হোঁ' প্রত্যয় ঠিক 'অহম্' হইতে জাত কি না, সে বিষয়ে এক্ষণে আমার সন্দেহ হইতেছে, এ বিষয়ে পবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, পশ্চিমা অপভ্রংশের এই বহুবচনের '-হু' প্রত্যয়ের উৎপত্তি কী? শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই অপভ্রংশ প্রত্যয় সম্বন্ধে আমি স্পষ্ট কোনও মত দেই নাই, এখনও দিতে চাহি না। তবে একটা অনুমানের কথা বলিয়া রাখি। প্রাকৃতে 'চলামি—চলামো', তাহা হইতে পশ্চিমা অপভ্রংশের প্রথম যুগে '*চলম—চলমু' ও পরে '*চলবঁ—চলবুঁ', এবং শেষে '*চলউঁ—চলউ'; পরে মধ্যম পুরুষের বহুবচনের রূপে অবস্থিত '-হ' -কারের প্রভাবে উত্তম পুরুষের বহুবচনেও হ-কার আসিয়া যায়—'চলসি, চলহি—চলহু' (<প্রাকৃত 'চলসি—চলহ')। অধ্যাপক Jules Bloch ঝ্যুল ব্লক্ যে উত্তম পুরুষের এই হ-কারকে আগমাত্মক বলিয়া ধরিয়াছেন, একটু অন্যভাবে আমি তাহার সমর্থন করিতে চাহি। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহের প্রস্তাবিত '-অম্হ' হইতে '-অহুঁ,' এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা তাদৃশ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের '-ম্হ' আধুনিক ভাষার প্রাচীন যুগেও '-ম্হ' রূপেই থাকে, অপভ্রংশের যুগে এই '-ম্হ'-এর 'হুঁ' বা 'হূঁ'-তে পরিবর্তন কতকটা আকস্মিক এবং অনপেক্ষিত হইয়া পড়ে। পশ্চিমা অপভ্রংশের এই '-হুঁ' প্রত্যয়ের সহিত মধ্যযুগের বাঙ্গালার '-হুঁ' প্রত্যয় সংযুক্ত বলিয়াই মনে হয়; তবে মূলে পৃথক্ও হইতে পারে।

[৫] উড়িয়ার উত্তম পুরুষের রূপগুলির সম্বন্ধে এইবার দুটি কথা বলিয়া আমার মন্তব্য শেষ করিব। বর্তমানে উত্তম পুরুষের একবচনে—'মুঁ করেঁ',

বহুবচনে 'আম্ভে বা আম্ভেমানে করুঁ'। 'মুঁ করে'—এইরূপ চন্দ্রবিন্দুহীন রূপও পাওয়া যায়—গঞ্জাম জেলার উড়িয়ায়। 'মুঁ করি'—এইরূপ ই-কারান্ত রূপ কোনও ব্যাকরণে পাই নাই, কেবল Sir George Grierson স্যর জর্জ গ্রিয়ার্সনের Linguistic Survey of India-তে আছে; এক 'মুঁ অছি'—এই 'অছ্' ধাতু ভিন্ন অন্যত্র অনমুনাসিক ই-কারান্ত রূপ সাধারণ উড়িয়ায় অজ্ঞাত; যদি কোনও আঞ্চলিক রূপভেদে মেলে, তাহা হইলে ইহাকে 'করেঁ' এই রূপের দ্রুত-উচ্চারণ-জাত বিকার বলিয়াই ধরিতে হইবে। সুতরাং উড়িয়ার উত্তম পুরুষের একবচনের রূপ হইতেছে—'করেঁ>করে>করি'। 'করেঁ, করে, করি'-র উৎপত্তি শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব ঠিকই ধরিয়াছেন: 'করোমি'>'করমি'>'করবিঁ'>*করইঁ> 'করেঁ'। 'করি' এই রূপটি সন্দেহ-জনক, এবং ইহাকে 'করেঁ>করে'-রই বিকার-জাত বলিয়া ধরিবার পক্ষে অন্তরায় কিছুই নাই; ইহাকে বাঙ্গালা 'চলি'-র মতো কর্ম- বা ভাব-বাচ্যের 'ক্রিয়তে'>'*করিয়তি, করিয্যতি'>'করিয়দি, করিঅদি'> 'করিঅই' হইতে আনিবার প্রয়াসের কোনও আবশ্যকতা নাই। উড়িয়ার বর্তমান উত্তম পুরুষ বহুবচনের ক্রিয়াপদ—যথা 'করুঁ'—পশ্চিমা অপভ্রংশের 'করহুঁ'-র সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারে,—যেমন শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ অনুমান করেন; কিন্তু আমার মনে হয়, পশ্চিমা অপভ্রংশের দিকে যাইবার প্রয়োজন নাই; মাগধী অপভ্রংশ হইতে ইহার উদ্ভব হইতে পারে—'কুর্মঃ'>'করোম'>'করম'>*করবঁ' >'করউঁ' হইতে 'করুঁ'-কে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিবার পক্ষেও কোনও অন্তরায় নাই।

[৬] এই সম্পর্কে একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। উড়িয়ায় বাঙ্গালার 'চল্'-ধাতু পাই না—পাই 'চাল্', আ-কার-যুক্ত রূপ; মধ্যযুগের বাঙ্গালায় 'চলোঁ —চলী', আধুনিক বাঙ্গালায় 'চলি'; বিহারীতে ও হিন্দীতেও এই 'চল্' ধাতু; —কিন্তু উড়িয়ায় 'চালেঁ—চালুঁ'। 'চাল্'—এই আকারযুক্ত রূপের কারণ কী? গুজরাটীতেও আকারযুক্ত 'চাল্'—অন্য ভাষার মতো অ-কার-যুক্ত 'চল্' ধাতু নাই: 'হুঁ চালুঁ—অমে চালিয়ে' = 'অহং *চল্যামি'—'অস্মাভিঃ চল্যতে'। উড়িয়ার ও গুজরাটীর তৎসম বা সংস্কৃত এবং তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দে মূলস্থানীয় সংস্কৃতের শব্দের মধ্যস্থিত '-ল-,-লা-,-লি-,-লী-,-লু-,-লূ-,-লে-,-লো-', মূর্ধন্য 'ळ-'তে-পরিবর্তিত হইয়া যায়; কিন্তু সংস্কৃত বা প্রাকৃতের '-ল্ল,-ল্লা' ইত্যাদি দ্বিত্বাবস্থিত 'ল্ল' থাকিলে, তাহার পরিবর্তন হয়—সাধারণ দন্ত্য 'ল'-য়ে। যেমন উড়িয়া 'ভল' (=ভল্ল= *ভদ্ল=ভদ্র), 'তেল' (=তেল্ল=*তৈল্য বা তৈল´), কিন্তু 'কাळ' (=কাল)

'তুচ্চ' (= তুলক), ইত্যাদি। সংস্কৃত 'চল্' ধাতুর উড়িয়ায় 'চচ্চ' রূপ গ্রহণ করা উচিত ; 'চাচ্চ, চচ্চণ', 'গোপাচ্চ' প্রভৃতি শব্দে এইরূপ মেলে। কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা 'চল্' ধাতুর প্রতিরূপ উড়িয়াতে 'চাল্'—'চাচ্চ' নহে : উড়িয়া 'চাল্'-এর প্রাকৃত মূল হইবে 'চল্ল', এবং ইহার সংস্কৃত আধারস্থল হইতেছে '*চল্য',—'চল্' নহে। সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে কর্মবাচ্যের '*চল্যাতে', কর্তৃবাচ্যের 'চলতি'-র পার্শ্বে স্থান পায়—'অহং চলামি - অস্মাভিঃ *চল্যতে' > প্রাকৃতে 'চচ্চমি—চল্লই' ; পরে 'চল্লই' হইতে 'চল্ল' > 'চাল' আসিয়া ধাতুর মৌলিক রূপটিকে গ্রাস করিয়া বসে। তাই উড়িয়ায় (এবং গুজরাটীতে) 'চাল্' ধাতু,—'চল্' নহে। এ বিষয়ে মৎপ্রণীত পুস্তকের (ODBL) পৃষ্ঠা ৯৪৩ দ্রষ্টব্য।

[৭] মধ্যযুগের বাঙ্গালায় '-ইউ' প্রত্যয়ান্ত রূপগুলি কর্মবাচ্যের বা ভাববাচ্যের বলিয়াই মনে হয় ; চর্য্যাপদের দুই একটি প্রয়োগ '-ইউ' প্রত্যয়ের সঙ্গে যে কেবলমাত্র উত্তম পুরুষের কর্তার যোগ নাই, প্রথম বা মধ্যম পুরুষেরও আছে, তাহা বুঝা যায় ; এবং ইহা হইতে এই প্রত্যয়ের মূল যে অনুজ্ঞা উত্তম পুরুষ বহুবচনের রূপ নহে, বরঞ্চ কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্যের প্রথম পুরুষেরই রূপ (একবচনের), তাহা সুস্পষ্ট ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
২য় সংখ্যা, ১৩৩৭

বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

মানুষের জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, শব্দ-সম্ভারে এবং ব্যঞ্জনা-শক্তিতে তাহার ভাষারও প্রসার ঘটিয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র, বিচারের ক্ষেত্র এবং ভৌতিক বিষয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্র ও প্রয়োগের ক্ষেত্র বাড়িয়া যায়, তখন নানা নূতন শব্দের আবশ্যকতা আসিয়া যায়। কোনও জাতি যদি আত্মনিষ্ঠ থাকে এবং বাহিরের জগতের সহিত তেমন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত না থাকে, অপেক্ষাকৃত সভ্যতর বা উন্নততর অন্য কোনও জাতির প্রভাবে যদি না পড়ে, তাহা হইলে তাহার নিজের ভাষার সাহায্যে যেমন-যেমন আবশ্যক তেমন-তেমন নূতন নূতন শব্দ তৈয়ার করিয়া লয়—পরমুখাপেক্ষী হইবার অবসর না থাকায়। প্রাচীন কালে এই রূপটি ঘটিয়াছিল সংস্কৃত, গ্রীক ও চীনা ভাষায়—এই ভাষাগুলি 'স্বদেশী' ভাবের ভাষা, এগুলি সুপ্রাচীন কালে বাহিরের ভাষার দ্বারস্থ হয় নাই। কিন্তু ইতিহাসের প্রগতি অনুসারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিলন মিশ্রণ সংঘাত ও সহযোগিতা স্থাপিত হইলে, জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং ভাষার ক্ষেত্রে লেন-দেন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে, অপেক্ষাকৃত অগ্রসর কোনও জাতির সাহচর্যে আসিলে, অনগ্রসর জাতি ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করিতে গেলে একটু বিপদে পড়ে—সহজ ধীর মন্থর উন্নতির ধারা ছাড়িয়া অনগ্রসর জাতিকে অগ্রসর জাতির সঙ্গে তাল রাখিয়া দ্রুতবেগে চলিতে হয়। ফলে নূতন নূতন ভাব ও বস্তুর জন্য দ্রুত ও ঝটিতি নূতন নূতন শব্দ, নিজের ভাষার উপাদান ধাতু-প্রত্যয়াদির সাহায্যে গঠন করা সহজ অথবা সম্ভবপর না হইলে, প্রস্তুত এবং হাতের নাগালের মধ্যে অবস্থিত বিদেশী শব্দ গ্রহণ করার দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা বা প্রবৃত্তি দেখা যায়—অবশ্য যদি বিদেশী বৈজ্ঞানিক ও অন্য পারিভাষিক শব্দ, ধ্বনি ও ব্যাকরণ উভয় দিক দিয়া এই-সব বিষয়ে অনগ্রসর ভাষার প্রকৃতির বিরোধী না হয়, এই-সব বিদেশী শব্দ যদি সহজে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। সংস্কৃত, গ্রীক, চীনা—এই প্রকার 'স্বদেশী' বা আত্মকেন্দ্রী উন্নতিশীল জাতির প্রাচীন ভাষায়, উত্তরকালে, বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত সংযোগের ফলে, অল্পস্বল্প বিদেশী শব্দ আবশ্যক-মতো গৃহীতও হইয়াছিল। যেমন, জ্যোতিষবিদ্যায় গ্রীক প্রভাবের ফল হেতু সংস্কৃতে অনধিক ত্রিশটি গ্রীক শব্দ প্রবেশ লাভ করে; যেমন গ্রীক ভাষায় কিছু কিছু সংস্কৃত ও দুই পাঁচটি প্রাচীন মিসরীয় শব্দ আসে; এবং

চীনা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে দুই-দশটা সংস্কৃত শব্দও গৃহীত হয়। ভাষার প্রকৃতির বিরোধী না হইলে, প্রাচীন কালে আবশ্যক-মতো বিদেশী শব্দ গ্রহণ করা অনুচিত বা দূষণীয় বলিয়া মনে হইত না, কি ভারতে, কি গ্রীসে, কি চীনে।

তারপরে, খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে, পৃথিবীতে কয়টি প্রাচীন সভ্যতার নবীন প্রকাশ, নানা জাতির উপর অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ঘটিল এশিয়া খণ্ডের প্রায় তাবৎ ভাষার উপরে—ফলে, ইন্দোনেসিয়ায়, ইন্দোচীনে, মধ্যএশিয়ায় ও ঈরানে নানা ভাষা কর্তৃক সংস্কৃত শব্দের গ্রহণ ও এই-সব সংস্কৃত শব্দের দ্বারা নিজেদের পুষ্টিসাধন আরম্ভ হইল। ঈরানের প্রাচীন সভ্যতা বৈদিক আর্য্য সভ্যতার সহোদরা এবং কতকটা প্রতিস্পর্ধী ছিল, এইজন্যই ঈরানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার কিঞ্চিৎ পরিমাণে হওয়া সত্বেও ঈরানের ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব ততটা আসে নাই। আরবী ভাষা যখন নবীন ইসলামী ধর্ম সংস্কৃতির দর্শন শিল্প ও কলার বাহন হইয়া খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের দ্বিতীয় ভাগে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন আরবীর অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর প্রভাব পড়িতে আরম্ভ করিল ঈরানী বা ফার্সী ভাষার উপরে এবং মধ্যযুগের স্পেনীয় ভাষার উপরে। ঈরানের ও স্পেনের লোকদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রসারের ফলে, আরবীর এই প্রভাব অবশ্যম্ভাবীরূপে আসিয়াছিল। কিন্তু এদিকে, ভারতীয় বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-বিদ্যা—আরব-ইসলামী জগতের উপরে তাহার ছাপ দিয়া গিয়াছে, এই-জন্য আরবীতে এই-সব-বিদ্যাসম্পৃক্ত কতকগুলি ভারতীয় শব্দ পাওয়া যায়; এবং দর্শনে ও অন্য বিষয়ে, আরবী ভারতীয় শব্দ যথাযথ গ্রহণ না করিয়া অনুবাদ করিয়া লইত। (এই ব্যাপারটি তিব্বতী ও চীনা ভাষাদ্বয়েও হইয়াছিল)। আরবীতে গ্রীক শব্দও কতকগুলি এইভাবে প্রবেশ লাভ করে।

বিদেশী শব্দ ধার করিয়া আত্মসাৎ করার ব্যাপারে আজকাল আমরা পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ফেলিতে পারি—(১) Building Languages - যেসব ভাষা আত্মনিষ্ঠ, গঠনশীল ভাষা, দরকার হইলে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের ধাতু-প্রত্যয় এবং অন্য শব্দের সাহায্যে নূতন শব্দ গড়িয়া তুলিয়া, সর্বত্র প্রয়োগের শক্তি রাখে; এবং (২) Borrowing Languages —পরাশ্রয়ী ভাষাসমূহ, যেগুলি বহুকাল ধরিয়া অন্য কোনও একটি ভাষার আওতায় পড়িয়া, আবশ্যক হইলে সোজাসুজি এই আশ্রয়স্থল ভাষা হইতে নিঃসংকোচে শব্দ গ্রহণ করে। জরমান ভাষা, চীনা ভাষা, আরবী ভাষা—মুখ্যতঃ

গঠনশীল ভাষার পর্য্যায়ে পড়ে, যদিও এখন সভ্যতার, বিশেষতঃ আধুনিক বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক প্রসারের ফলে, ভাষান্তর হইতে অল্পবিস্তর শব্দ এই গঠনশীল ভাষাগুলিও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। জাপানী, উর্দু, ফার্সী, ইংরেজি,—এই চারিটি পরাশ্রয়ী ভাষার দৃষ্টান্ত। গত ১৫০০ বৎসর ধরিয়া চীনা সভ্যতার প্রভাবে পড়িয়া জাপানী ভাষা এখন নিজের চেষ্টায় শব্দ-গঠন করিবার শক্তি হারাইয়া বসিয়াছে, সহস্র সহস্র চীনা শব্দ গ্রহণ করিয়াছে—অবশ্য এই-সব চীনা শব্দ জাপানী ভাষায় তাহার ভোল ফিরাইয়া উচ্চারণে ও প্রকৃতিতে জাপানী বনিয়া গিয়াছে। উর্দু ভারতীয় ভাষা,—ইহাতে ভারতীয় শব্দ এবং বাক্যবিন্যাস-রীতি বহুশঃ অব্যাহত থাকিলেও, উচ্চ কোটির শব্দ, এমন কি শত শত সাধারণ শব্দের জন্য ফার্সীর দ্বারস্থ হয়—এই ঋণের ফলেই হিন্দুস্থানী উর্দু ভাষার উদ্ভব। ফার্সীর (আধুনিক ফার্সীর) শব্দ এখন শতকরা ৬০ হইতে ৮০ আরবীর নিকট হইতে গৃহীত—উচ্চারণে ও প্রয়োগে অবশ্য এগুলির আরবী প্রকৃতির অনেকাংশে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তেমনি ইংরেজির শব্দ-গঠন-শক্তি এখন আর কেবল বিশুদ্ধ ইংরেজি শব্দকে লইয়া নহে, গত ৮।৯ শত বৎসর ধরিয়া ইংরেজি শব্দ-নির্মাণ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া ক্রমাগত ফরাসি ও লাতীনের শব্দ-ভাণ্ডারের সামনে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাধারণ ইংরেজিতে এখন শতকরা ৬০-এর উপর হইতেছে ফরাসি এবং লাতীন শব্দ। যে কোনও আরবী শব্দ বা লাতীন ও ফরাসি শব্দ এখন অবলীলাক্রমে যথাক্রমে ফার্সী ও ইংরেজিতে ব্যবহার করা যায়।

আমাদের উন্নত ভারতীয় ভাষাগুলি দুইটি শ্রেণীতে পড়ে—আর্য্যগোষ্ঠির ভাষা ও দ্রাবিড় গোষ্ঠির ভাষা। উত্তর-ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে আর্য্যগোষ্ঠির ভাষাগুলি প্রচলিত—বাঙ্গলা, অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিল, মগহী, ভোজপুরী, কোসলী বা পূর্বীহিন্দী, পশ্চিমাহিন্দী (হিন্দুস্থানী অর্থাৎ উর্দু-হিন্দী, ব্রজভাষা, কনোজী, বুন্দেলী, বাঙ্গরু, জানপদ হিন্দুস্থানী), পূর্বী-পাঞ্জাবী, লহন্দী বা হিন্দকী (পশ্চিমা পাঞ্জাবী), কুমায়ুনী, গঢ়বালী, খসকুরা বা নেপালী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধী—এগুলি হইতেছে প্রধান আধুনিক বা নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা। সংস্কৃত—প্রাকৃত—ভাষা; মোটামুটি এই তিন ধাপে ভারতীয় আর্য্য ভাষার বিকাশ। সংস্কৃতের কোলেই এগুলির জন্ম, আবহমান কাল হইতে কুলাগত রিক্থরূপে সংস্কৃতের শব্দসম্ভারে এগুলি পুষ্ট। দুই এক স্থলে ব্যত্যয়ও হইয়াছে—যেমন হিন্দুস্থানীর একটি বিশিষ্ট রূপ, সংস্কৃতকে বর্জন করিয়া ফার্সীর আশ্রয় গ্রহণ

করিয়া, বিশেষ করিয়া মুসলমান লেখকদের হাতে, 'উর্দু'রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক, উত্তরাধিকার-সূত্রে, এবং ঐতিহ্যের বলে, সংস্কৃতের বিশাল শব্দসম্পদ্ আর্য্য ভাষাগুলিতে সহজেই স্থান পাইয়া আসিয়াছে, ইহা-ই হইতেছে পরম্পরা। যদি এই সকল শব্দ সাধারণ্যে গ্রহণ করে, তাহা হইলে ইহাতে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না। যেমন লাতীন ভাষার অক্ষয় শব্দ-ভাণ্ডার, লাতীন হইতে উদ্ভূত ইতালীয়, ফরাসি, স্পেনীয় প্রভৃতি ভাষার নিকট সদাসর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। দরকার হইলে, সংস্কৃতের শব্দ বাঙ্গলা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় নিঃসংকোচে গৃহীত হইবে—ইহা-ই চিরাচরিত রীতি। এইজন্য আধুনিক আর্য্য ভাষাগুলি অনেকটা গঠনশীল থাকিতে পারে নাই—সংস্কৃতাশ্রয়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপর, তেলুগু কন্নড তামিল মালয়ালম্ প্রভৃতি প্রৌঢ় দ্রাবিড়-গোষ্ঠির সাহিত্যিক ভাষা, উত্তর-ভারতের আর্য্য ভাষাগুলিরই মতো, এক-ই নিখিল ভারতীয় হিন্দু অর্থাৎ মিশ্র আর্য্যানার্য্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া সহজেই এই হিন্দু সভ্যতার ধারক, বাহক ও পরিপোষক সংস্কৃত ভাষার মুখাপেক্ষী হইয়া, কম-পক্ষে গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত শব্দ আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছে। এই সংস্কৃতনিষ্ঠতা বিষয়ে আর্য্য ও দ্রাবিড় উভয় শ্রেণীর ভাষা একই পথের পথিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল আধুনিক তামিলে, উত্তর-ভারত-বিরোধী এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ও তাঁহাদের পরিপোষিত ও পরিপোষক সাহিত্যিকগণ, তামিলের দ্বারা গৃহীত সংস্কৃত রিক্‌থকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়া, সংস্কৃত হইতে তামিলে আগত শত শত সংস্কৃত শব্দকে এখন বর্জন করিয়া তাহাদের স্থানে বিশুদ্ধ তামিল শব্দ প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা সর্বত্র ফলপ্রসূ হয় নাই, ও হইতেছে না।

আধুনিক কালে ভারতীয় উন্নত আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষাগুলিকে একটি নূতন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শত বর্ষের অধিক কাল হইল, ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, ইংরেজ শাসন-পদ্ধতির প্রচলন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় জ্ঞান বিচার-ধারা, জড়-বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প গৃহীত হইয়া যাইবার ফলে, নব-নব ইউরোপীয় ভাব ও বস্তুর জন্য আমাদের সমস্ত ভাষাতেই বহু বহু নূতন শব্দের আবশ্যকতা আসিয়া গেল। বাঙ্গলা, হিন্দী, মারাঠী, তেলুগু প্রভৃতি ভাষায় আবশ্যক এই-সব শব্দ আনিয়া দিবার তাগিদ আসিল। প্রায় সর্বত্রই সহজ ভাবে সংস্কৃত হইতে শব্দ গৃহীত হইতে লাগিল।

কিন্তু দেখা গেল, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার যদি কেবল উচ্চশিক্ষিত

শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমিত না রাখিতে হয়, জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যদি আধুনিক বিজ্ঞান শিল্প-বিদ্যা মানবিকী-বিদ্যা প্রভৃতিরও স্থাপনা ও বিকাশ ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে কেবল কঠিন পণ্ডিতী সংস্কৃত শব্দে চলিবে না। বিভিন্ন আধুনিক ভাষায় সর্বত্রই সেগুলির নিজস্ব একটি করিয়া প্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, মূলতঃ তাহার স্বকীয় শব্দসমূহকে অবলম্বন করিয়া। এই প্রকৃতিকে অবহেলা করিলে পণ্ডশ্রম হইবে, ভাষার প্রকাশ-শক্তি ব্যর্থ হইবে। জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক বা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কার্য্যকর করিতে হইলে, বাঙ্গলা ভাষায় বিদেশাগত ভাব, বস্তু ও প্রক্রিয়ার জন্য বিদেশী শব্দের প্রতিশব্দ রূপে, কেবল অপ্রচলিত এবং দুরূহ সংস্কৃত শব্দ আনিলে চলিবে না; সর্বজনবোধ্য, সহজ, সরল বাঙ্গলা শব্দ অথবা বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে পূর্ণরূপে অনুপ্রবিষ্ট কিছু কিছু বিদেশী শব্দও রাখিতে হইবে। 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা'র ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের আবশ্যকতা ও মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লইলেও অন্য দিকটির কথাও ভাবিতে হয়।

বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট বস্তু, প্রক্রিয়া ও ভাব এখন আমাদের মধ্যে বন্যার জলের মতো আসিতেছে, ভারতের চিত্ত ও কর্মকে সর্বদিকে যেন প্লাবিত করিয়া দিতেছে। আমরা এখন নিঃশ্বাস লইবার সময় পাইতেছি না—এত দ্রুত এবং এত ব্যাপকভাবে এই-সব বস্তু, প্রক্রিয়া, ভাব, আদর্শ, ও তাহাদের প্রকাশক ready-made বা তৈয়ারী বিদেশী শব্দ আসিয়া যাইতেছে। তাহার উপর, আর একটি কথা আমাদের স্বাধীনতালাভের পর দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষ এক এবং অখণ্ড দেশ, তাহার ঐতিহ্য এক, তাহার সংস্কৃতি এক। কিন্তু তাহার ভাষা এক না হইলেও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা এক-ই সংস্কৃত ভাষার সুবর্ণসূত্রে নিবদ্ধ। এই জন্য আমাদের অনেকের এই আগ্রহ ও চিন্তা বিভিন্ন ভাষায় গৃহীত সংস্কৃত শব্দ, ভারতীয় জাতীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিপোষক বিধায়, পারিভাষিক শব্দ সংগঠনে এই সংস্কৃতের প্রতি নিষ্ঠা পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখিতে হইবে। তাহা হইলে উত্তরোত্তর আমাদের পারিভাষিক শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ভাষাবিষয়ক ঐক্য বা ঐক্যবোধও আমাদের বাড়িতে থাকিবে।

এই-সমস্ত সমস্যার সমাধান কী করিয়া করা যাইবে, তাহা সর্বভারতীয় পারিভাষিক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে সমস্ত ভাষার পণ্ডিতদের বিশেষভাবে চিন্তিত করিয়াছে। ১৮৭৭ সালে বাঙ্গলা দেশের মনীষী প্রাচীন-ভারত-বিদ্যাবিৎ ও বিজ্ঞানবিৎ বাঙ্গলা ভাষার সুসাহিত্যিক ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাঙ্গলা তথা

অন্য ভারতীয় ভাষায় কি ভাবে পারিভাষিক শব্দ রচনা করিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ ও সুযুক্তিযুক্ত একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত করেন। এটি ভারত সরকার কর্তৃক কিছুকাল হইল পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার পুনঃপ্রচারের জন্য আদৌ চেষ্টা হয় নাই, এবং ইহার যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবগুলিও পুনরালোচিত ও গৃহীত হয় নাই। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গঠন সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ কতকগুলি প্রস্তাব বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত নিবন্ধে প্রকাশিত করেন। পরে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে প্রায় তিরিশ বছর আগে অনুরূপ আর কতকগুলি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়, কিন্তু সেগুলি কার্য্যকর হয় নাই। ১৯৫৩ সালে মহারাষ্ট্রে পুণা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটি সম্মেলন আহূত হয়, আধুনিক ভারতীয় ভাষায় পরিভাষা রচনা কি ভাবে হওয়া উচিত তাহার বিচারের জন্য। এই সভায় আমার বক্তব্য আর প্রস্তাব বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া আমি একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করি, এটি প্রকাশিত হইয়াছিল (Scientific and Technical Terms in Modern Indian Languages, Vidyoday Library, 72 Mahatma Gandhi Road, Calcutta 9, 1953*)।

হিন্দীকে নিখিল ভারতের অন্যতর (বহু হিন্দীভাষীর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে একমাত্র) সরকারী ভাষা করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দীতে এখন জোরের সঙ্গে পারিভাষিক শব্দ নির্মাণের কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু বেশির ভাগ কাজ যাহা হইতেছে, তাহাকে কেবল অভিধান-প্রণয়ন মাত্র বলা যাইতে পারে। সুযোগ্য ও অযোগ্য পণ্ডিত পণ্ডিতম্মন্য কতকগুলি ব্যক্তি, লাইব্রেরি ঘরে বসিয়া, নানা অভিধান ঘাঁটিয়া, বিভিন্ন মানবিকী ও ভৌতিকী বিদ্যার—Humantiies বা মানব-বিজ্ঞান, Science বা জড়বিজ্ঞান, Technology বা যন্ত্র-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ঠিক করিয়া দিতেছেন। এই-সব শব্দ হইতেছে বেশির ভাগই প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, অথবা সংস্কৃত ধাতু-প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠিত নবীন সংস্কৃত শব্দ। ইঁহাদের অন্য উদ্দেশ্যেও আছে—ভারতের সমস্ত ভাষায় ইঁহাদের প্রস্তাবিত বা উদ্ভাবিত এই-সমস্ত শব্দ গৃহীত হউক। বহু বহু লক্ষ টাকা খরচ করিয়া বিগত কয় বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ প্রস্তুত এই-সব শব্দ সর্বত্র গৃহীত হইতেছে না এবং হিন্দীর ক্ষেত্রেও যেন চলিতেছে না।

*এই প্রবন্ধটি লেখকের নির্বাচিত ইংরেজি প্রবন্ধ-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে (Select Papers, Vol. Two) পুনর্মুদ্রিত হইতেছে।

এ বিষয়ে আমার মনে হয় ভারতের সর্বত্র ভ্রান্ত পথে আমরা চলিতেছি। বিজ্ঞানের লেখকদের জন্য আমরা শব্দ তৈয়ার করিয়া অভিধান বানাইতেছি, রাজকার্য্যে ও অন্য সাধারণ-জাতীয় কার্য্যে প্রয়োগের জন্য আমরা তদ্রূপ পারিভাষিক শব্দের ইংরেজি-বাঙ্গলা বা ইংরেজি-হিন্দী বা ইংরেজি-তেলুগু অভিধান ছাপাইয়া দিতেছি, এই আশায় যে লেখকগণ, বক্তৃগণ, কার্য্যবাহী কর্মচারিগণ আবশ্যক-মতো এই অভিধানের পৃষ্ঠা উল্‌টাইয়া ইংরেজির ভারতীয় প্রতিশব্দটি ব্যবহার করিবেন আমাদের ভাষা দাঁড়াইয়া যাইবে। কার্য্যতঃ ইহা হইতেছে না। ভাষাজ্ঞান যদি গোড়া হইতেই ঠিক না থাকে, অভিধানে কিছু-ই করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার জন্য অনেক সময়ে অব্যবসায়ী অভিধান-প্রণেতা যে শব্দ ঠিক করিয়া দিলেন, তাহা হয়তো বিজ্ঞানীর পছন্দসই হইল না। এ অবস্থায় যতদিন পর্য্যন্ত ব্যবসায়ী বৈজ্ঞানিক, মাতৃভাষার সম্বন্ধে যাঁহার দরদ আছে, এবং যাঁহার জ্ঞান ও রুচি আছে, আপন মাতৃভাষায় তাঁহার আলোচ্য বিজ্ঞান-বিষয়ে, যে কেবল বাঙ্গলা জানে এমন পাঠকের বোধগম্য করিয়া বই না লিখিতেছেন, ততদিন পারিভাষিক শব্দের প্রচার হইল, তাহা বলিতে পারা যাইবে না। কোনও ভারতীয় ভাষায় একখানি ভালো সর্বজনবোধ্য ও সুখপাঠ্য বিজ্ঞানের বই যদি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে পারিভাষিক শব্দ নির্ধারণের পথে যে কাজ হইবে দুই হাজার পৃষ্ঠার বৈজ্ঞানিক শব্দকোষে তাহা হইবে না। অবশ্য, প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক শব্দকোষের উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিবে না। যাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে স্থানীয় ভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের সাহায্য চান, তাঁহারা প্রথমে নিজে সব সময়ে ভাষণাদিতে শুদ্ধ বাঙ্গলা বলিবার অভ্যাস করুন—তবে অন্য চেষ্টা। 'স্যার এই বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজকে স্টেটের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ রূপে এস্‌টাব্লিশ্‌ করবার জন্য বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট কি স্টেপ্‌স্‌ নিচ্ছেন ?'—এই পথ সুষ্ঠু বা কার্য্যকর পথ নয়।

আজকাল হিন্দীতে শব্দ-গঠনের জন্য চারিটি পরস্পর-বিরোধী পদ্ধতি চলিতেছে। (১) সংস্কৃত-নিষ্ঠ পদ্ধতি—যতদূর সম্ভব অধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা। এই-সব শব্দ অনেক স্থলে যেমন সাধারণ হিন্দী-ভাষীর পক্ষে দুর্বোধ্য, তেমনি অহিন্দী প্রান্তে-ও চলিবার অযোগ্য। Industry অর্থে 'উদ্যোগ' বাঙ্গলায় চলিবে ? Block Development অর্থে 'প্রখণ্ড বিকাশ' বলিলে, বাঙ্গলায় আমরা তাহার অর্থগ্রহণ করিতে পারিব ? Compulsion অর্থে 'বশীকরণ' শুনিয়াই বঙ্গভাষীর মনে সঙ্গে সঙ্গে 'মারণ, উচাটন, স্তম্ভন'-এর কথাও

আসিবে না কি? 'হিন্দী সংসার' অর্থাৎ হিন্দী-ভাষী জগতে এইরূপ সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি উঠিতেছে। (২) ফার্সী-নিষ্ঠ হিন্দী—অথবা উর্দু। বহু মুসলমান, এবং পশ্চিম উত্তর-প্রদেশের ও পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ এই প্রকার 'হিন্দী'র পক্ষপাতী। কিন্তু পূর্ব উত্তর-প্রদেশের হিন্দী-ভাষী ও অহিন্দী-প্রান্তের জনসাধারণ, মায় মুসলমান, 'মুবারক বুহ আদমী জো শরীরোঁ কী রাহ পর নহীঁ চলতা ঔর খাতাকারোঁকে মজলিসমেঁ নহীঁ বৈঠতা'—এইরূপ ভাষা বুঝিবে না, বা পছন্দ করিবে না। (৩) ইংরেজি-নিষ্ঠ পদ্ধতি—জনকয়েক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই পদ্ধতির পক্ষপাতী—ইহাদের মতে, ইংরেজি বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ অনাবশ্যক, যত পারো মূল 'আন্তর্জাতিক' ইংরেজি শব্দ ভারতীয় ভাষায় আনিয়া বসাইয়া দাও, হিন্দীর 'ক্রিস্টালাইজ্‌ড ন হোকর জো গ্যাসিয়োজ হালৎ সস্পেন্‌শন মেঁ রহতা হৈ', অথবা বাঙ্গলার "এই 'ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট'টাকে বলে 'ফিল্ড ম্যাগনেট', আর ওই 'কয়েল'কে বলে 'আর্মেচার'। 'ম্যাগ্‌নেট'-টাকে সবেগে ঘোরানোর ফলে 'ইণ্ডাক্‌সনের' প্রভাবে 'আর্মেচারে' তড়িৎশক্তি সঞ্চারিত হয়"—বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার কালে হয়তো এইরূপ খিচুড়ি ভাষা এখন অপরিহার্য্য, কিন্তু ইহা কত দিন থাকিবে? এবং প্রশ্ন হইতে পারে, এইরূপ ভাষা গৃহীত হইয়া গেলেই বা কী ক্ষতি? অবশ্য এইরূপ ভাষার পরের পদক্ষেপ হইবে—বিশুদ্ধ ইংরেজি। (৪) আর একদল চাহেন, 'আম্‌-ফহ্‌ম' অর্থাৎ জনসধারণের বোধ্য হিন্দী, যাহাতে যতদূর সম্ভব কঠিন সংস্কৃত এবং আরবী-ফার্সী ও ইংরেজি শব্দ থাকিবে না—কৃষাণমজুর ও কারিগরের মধ্যে ব্যবহৃত ও তাহাদের বোধগম্য শব্দ মাত্র থাকিবে। এইরূপ ভাষার শব্দসমষ্টি বেশি হইতে পারে না। নূতন শব্দের চাহিদা মিটাইতে হইবে—সুপ্রচলিত শব্দের আধারে নূতন শব্দ গঠন করিবে, সংস্কৃত বা ফার্সী বা ইংরেজির দ্বারস্থ হইলে চলিবে না। সাধারণ অশিক্ষিত জনের ব্যবহৃত শব্দ-সমষ্টি, যে কোনও ভাষায় ৩-৪ শত শব্দের অধিক হয় না। এই মতের সমর্থকগণের দুরাশা, এই ৩-৪ শত শব্দকে অবলম্বন করিয়া নূতন শব্দ বানাইয়া, তাঁহারা আধুনিক প্রগতিশীল সুসভ্য মানব-সমাজের ভাষাগত চাহিদা মিটাইবেন। যেমন, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ Adopted son অর্থে 'দত্তক পুত্র' ইঁহারা ব্যবহার করিবেন না, যেহেতু গ্রাম্য হিন্দীতে 'দত্তক পুত্র' পণ্ডিতী শব্দ এবং অজ্ঞাত। চলতি বাক্য-ময় শব্দ 'গোদ মেঁ লিয়া হুআ বেটা'—ইহাও অচল। নূতন শব্দ ইঁহারা সৃষ্টি করিলেন—'বিটিয়ায়া বেটা' অর্থাৎ 'যাহাকে বেটা বা পুত্র করা হইয়াছে'।

এই চৌ-টানাতে পড়িয়া হিন্দী এখন হিমশিম খাইতেছে। আমাদের বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক শব্দ-গঠনের জন্য কোন্ রীতি অনুসরণ করিব? শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরিভাষার জন্য যাহা পুস্তকে ব্যবহৃত হইবে, কলেজে ইস্কুলে যাহা আলোচিত হইবে, অধিকারী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কাজ করুন—প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ তাঁহারা পারিভাষিক শব্দের অভিধান বর্জন করিয়া নিজেরাই বই লেখার কাজে নামুন, তাঁহারা যে পরিভাষা ব্যবহার করিবেন তাহাই সকলের মান্য ও গ্রহণযোগ্য হইবে।

তারপরে রাষ্ট্রীয় বা সরকারী কাজে ব্যবহৃত পরিভাষা। এই কাজে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের অধিকারিগণকে বাঙ্গলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা এবং মাতৃভাষা বলিয়া ইহার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করিয়া তবে নামিতে হইবে। অবশ্য হাতের কাছে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ সর্বদা হাজির থাকিবেন, সলা-পরামর্শ দিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতে, সমালোচনা করিতে, নূতন প্রস্তাব পেশ করিতে।

এই কাজে দেশের মধ্যে মাতৃভাষার সংবাদপত্রগুলির দ্বারা অপরিসীম সহায়তা হইয়াছে, হইতেছে, এবং আরও হইবে। আমরা অনেক সময়ে সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং পরিচালকদের কৃতিত্ব লক্ষ্য করি না, উপরন্তু অবহেলা করিয়া থাকি। বিদেশী জরুরী খবর আসিল, রাজনীতি অর্থনীতি যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেক বিভাগের সহিত সংযুক্ত সংবাদ,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে হইবে। সাধারণতঃ অনুবাদকেরা যদি ভালো বাঙ্গলা লেখক হন, ভাষার নাড়ীর সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া ইঁহারা যে সমস্ত প্রতিশব্দ দেন, বহুস্থলেই জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করে, তাহাকে কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে করে না। এই-সব শব্দ আবার সহজে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় সংক্রমিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গলা ভাষা এখন সরকারীভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্য সরকারী ভাষা বা রাজভাষার মর্য্যাদা পাইয়াছে। সরকারী কাজের জন্য, বিভিন্ন বিভাগের কৃত্য ও কর্মচারীদের ইংরেজি নামের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা নামের আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির কিছু কাল পর হইতেই স্বর্গত রাজশেখর বসু মহাশয়ের পরিচালনায়, বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'পরিভাষা-সংসদ্' এই প্রকার শব্দ-চয়ন ও শব্দ-গঠনের কাজ করিয়া আসিতেছেন। চারি খণ্ডে রাজ্যের বিভিন্ন কার্য-বিভাগে ব্যবহৃত প্রায় ৪০০০ শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে বহু শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, বহু শব্দ আবার লোক-সমাজে গৃহীত হইবার পক্ষে অন্তরায় দেখা দিতেছে। প্রথমতঃ, ইংরেজি শব্দটি বিশেষ

পরিচিত এবং সর্বজন-ব্যবহৃত শব্দ হইয়া দাঁড়াইবার ফলে, সংস্কৃত শব্দটি সম্ভবতঃ একটু অপরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং সেইজন্য সুপরিচিত ইংরেজি শব্দ কেহ বর্জন করিতে চাহিতেছে না ও পারিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত শব্দটি একটু দুরূহ বা দুরুচ্চার্য্য হইলে তো কথাই নাই—সেইরূপ শব্দ একটু ব্যঙ্গের বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে—এবং উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার পক্ষে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শক্তি যে অসাধারণ, ইহা সর্বজন-বিদিত। তৃতীয়তঃ, এক-ই ইংরেজি শব্দের জন্য ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন শব্দ প্রস্তাবিত হওয়ায়, ভিতর হইতেই সমগ্র ভারতের একতা সংরক্ষণের তাগিদে ইংরেজি শব্দ বর্জন করা যুক্তি এবং কার্য্যকরতা উভয় দিক্ হইতেই সংগত মনে হইতেছে না।

নিখিল ভারতের তাবৎ ভাষায় ইংরেজি শব্দের এক-ই প্রতিশব্দ গৃহীত হউক—এই উদ্দেশ্যে, হিন্দীতে এবং বাঙ্গলা মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতিতেও যে শব্দ গঠন হইতেছিল, তাহা সর্বত্র সকল ভাষার উপযোগী না হওয়ায় এই আদর্শ ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এক-ই সংস্কৃত শব্দের বিভিন্ন অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে—এখন যে-কোনও ভাষা তাহার দ্বারা স্বীকৃত অর্থ (তাহা সংস্কৃতের মূল অর্থের যতই বিরোধী বা বিপরীত হউক না কেন) ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিবে, তাহা সম্ভবপর নহে। যেমন 'উপন্যাস' শব্দের অর্থ বাঙ্গলায় 'কথাসাহিত্য, নভেল', কিন্তু তামিলে ও তেলুগুতে ইহার অর্থ 'ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ বা বিচার'; 'চেষ্টা' অর্থে মারাঠীতে 'রসিকতা', 'অনুরাগ' অর্থে উড়িয়ায় 'প্রচণ্ড ক্রোধ'। প্রথম প্রথম বাঙ্গলা সরকার যে প্রায় ৪০০০ শব্দের প্রতিশব্দ তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে এই দুইটি নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়—(১) যতদূর সম্ভব, সংস্কৃত হইতেই শব্দ-চয়ন করা হইবে বা সংস্কৃত ধাতু-প্রত্যয়ের সহায়তায় গঠন করা হইবে; এবং (২) যাহাতে সমগ্র ভারতের তাবৎ ভাষায় যতদূর সম্ভব গ্রহণ করিতে পারা যায়, বা অন্ততঃ সকলের বোধগম্য হয়।

এখন দেখা যাইতেছে যে, এই দুই নীতিকে পুরাপুরি গ্রহণ করা সুবিধাজনক নহে। হিন্দীতে সংস্কৃত শব্দগুলির অর্থ, বহু স্থলে বাঙ্গলায় সেই শব্দের প্রচলিত অর্থ হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যেমন 'অভিমান'—হিন্দীতে 'গৌরববোধ', বাঙ্গলায় 'প্রিয়জনের প্রতি বিরূপ ভাব প্রদর্শন'; 'প্রবন্ধ' হিন্দীতে 'ব্যবস্থা', বাঙ্গলায় লিখিত 'প্রস্তাব' বা 'নিবন্ধ'; 'শোধ' হিন্দীতে 'গবেষণা', বাঙ্গলায় 'পরিশোধ' ইত্যাদি। এই হেতু, এখন বঙ্গীয় বিধানমণ্ডলী (বিধান সভা এবং 'সনৎ সভা বা বিধান পরিষদ্) দ্বারা যে পুনরুজ্জীবিত নূতন পরিভাষা-সংসদ্ গঠিত

হইয়াছে, এবং এতাবৎ নিয়মিতভাবে বিধান-গৃহে যাহার ৩০টি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে ও এই অধিবেশনসমূহে আরও প্রায় ২০০০ প্রতিশব্দ প্রস্তাবিত হইয়াছে, সেই নূতন পরিভাষা-সংসদে, "সর্বভারতে চলুক বা না চলুক, বাঙ্গালীর নিকট সহজবোধ্য হইবে কি না এবং বাঙ্গলা ভাষায় চলিবে কি না, তাহারই উপর বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে।" পশ্চিম বাঙ্গলা পরিভাষা-সংসদ্ এখন বাঙ্গলা প্রতিশব্দগুলিকে যথাসম্ভব সহজ ও সরল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেবল বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দই মানিতে হইবে, এই নীতির পরিবর্তে, যাহাতে সকলে বিনা আয়াসে বুঝিতে পারে, এমন সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা ভাষায় স্থান-প্রাপ্ত অন্য ভাষার (যথা হিন্দী উর্দু এবং ইংরেজির) শব্দ—ভাষার কোনও সহজবোধ্য শব্দ বাদ দিতেছেন না। এই হেতু পরিভাষা-সংসদের প্রস্তাবিত শব্দ-সংকলনে বিস্তর ইংরেজি শব্দও থাকিয়া যাইতেছে, বহু স্থলে সহজবোধ্য শুদ্ধ বাঙ্গলা বা হিন্দী অথবা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের পাশেও। সংস্কৃত অনুবাদের চেষ্টা অনেক সময়ে নিরর্থক ও কষ্টকর হইয়া পড়ে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিবেন যে, জাতীয়তাবোধকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে, কিন্তু যুগধর্মের ফলে নূতন বিদেশী (বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষার) বহু বহু শব্দের বাঙ্গলা ভাষায় প্রবেশ অপরিহার্য্য।

ভাষা কাহারও নির্দেশ বা ইচ্ছা অনুসারে গঠিত হয় না—"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ" ভাষা সকলের সমবেত চেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শবাদের পথেই চালিত হয়। বাঙ্গালী জনসাধারণের মাতৃভাষা সম্বন্ধে সাবহিত হইবার এবং মাতৃভাষার জন্য শ্রম স্বীকারের উপরেই ভাষার প্রগতি নির্ভর করিবে।

দেশ

সাহিত্য সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭১

ভারতের প্রতিবেশী চীন কর্তৃক অতি প্রাচীনকাল হইতেই ছাপা বইয়ের প্রচলন ছিল। চীনের বিখ্যাত T'ang থাঙ্-বংশীয় রাজাদের যুগের পূর্বে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৬১৮ সালের পূর্বে, পাথরের দেয়ালের গায়ে শাস্ত্রগ্রন্থ বা অন্য কোনও বইয়ের অংশ খুদিয়া, তাহা হইতে কাগজে ভুষার ছাপ লইবার রেওয়াজ ছিল। এইরূপে ভুষার ছাপে ছাপা লম্বা লম্বা কাগজের ফালি বই হিসাবে রাজধানী হইতে চীন-দেশের চতুর্দিকে প্রেরিত হইত। তারপরে কাঠের পাটায় খুদিয়া ছাপিবার রীতি প্রচলিত হয়; কাঠের পাটায় অক্ষরগুলি উল্টা করিয়া লিখিয়া লেখা অংশকে পরে উঁচা করিয়া খুদিয়া লওয়া হইত, এবং তাহা হইতে কাগজে ছাপা হইত। এইরূপে বই ছাপাইবার পদ্ধতি Han হান-বংশীয় রাজাদের শাসনকালে খ্রীষ্টপূর্ব ২০২ হইতে খ্রীষ্টীয় ২২১-এর মধ্যে চীনদেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। পরে পৃথক পৃথক কাঠের অক্ষর তৈয়ারী করিয়া তাহাদের সাহায্যে ছাপাইবার পদ্ধতি চীনে আবিষ্কৃত হয়, এবং খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মধ্য ভাগেই এইরূপে আলাহিদা আলাহিদা অক্ষরের সমাবেশে বই ছাপাইবার প্রথা চীনদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়। ছাপাইবার পদ্ধতি চীন হইতে কোরিয়ায়, জাপানে, মাঞ্চুজাতির মধ্যে, মোঙ্গোলদের মধ্যে এবং তিব্বতে প্রচারিত হয়; কিন্তু এই-সব দেশে কাঠের পাটায় করিয়া ছাপাইবার রীতি-ই প্রচলিত হইয়াছিল, পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর দ্বারা ছাপানোর রীতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হয় নাই। চীন দেশেও পরবর্তীকালে এইরূপ block printing বা কাঠের পাটায় ছাপা-ই বেশি করিয়া হইত। এইরূপ ছাপাতে বইয়ের পৃষ্ঠায় ছবি মুদ্রিত করা সম্ভব হইত, এবং ছবি খুব দেওয়াও হইত।

বিদ্যা-প্রচারের অপূর্ব সহায়ক এই আবিষ্কারটি কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচারিত বা গৃহীত হয় নাই। মধ্যযুগে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিলেও, তিব্বতীদের দেখাদেখি বই ছাপাইবার কথা ভারতীয় পণ্ডিতদের মাথায় আইসে নাই। অথচ ভারতবর্ষে কাঠের ছাপ দিয়া কাপড়ের উপর চিত্রমুদ্রণ-রীতি সুপ্রাচীন যুগ হইতেই প্রচলিত ছিল, ভারতের রঙ্গীন নক্সাদার ও চিত্রময় ছিটের কাপড় ভারতের বাহিরে নানা দেশে পণ্য হিসাবে রপ্তানি হইত, কাপড়ে ছাপা দেবতার নাম-লেখা 'নামাবলী' চাদরও দেশে ব্যবহৃত হইত। বই ছাপানোর দিকে অবধান না করায় প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতবর্ষে এই একটি অতি আবশ্যকীয় শিল্পের আবিষ্কার বা প্রয়োগ ঘটিয়া উঠে নাই।

ওদিকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্য ভাগে, এ বিষয়ে চীনের বহু পরে, ইউরোপে নূতন করিয়া ছাপার আবিষ্কার ঘটিল, আলাহিদা হরফ বানাইয়া ও সাজাইয়া ছাপিবার রীতি প্রবর্তিত হইল। ইউরোপ এই সাধনের সাহায্যে জ্ঞানরাজ্য জয় করিতে অগ্রসর হইল। ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও ইউরোপের অনুকরণে তুরস্ক প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মুসলমান দেশে ছাপাইবার রীতি গৃহীত হয় নাই। ইউরোপীয়েরা স্বয়ং আসিয়া যখন আমাদের দেশে ছাপাখানা বসাইয়াছে, তখন হইতেই এদেশে বই ছাপিবার রীতি স্থান পাইয়াছে।

১৪৯৭ (মতান্তরে ১৪৯৮) খ্রীষ্টাব্দে পোর্তু্গীসেরা ভারতে প্রথম পদার্পণ করে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে গোয়া নগরীতে পোর্তু্গীসেরা প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত করে। প্রথমটায় কেবল ইউরোপ হইতে আনীত রোমান অক্ষর দিয়াই ছাপা হইত। পোর্তু্গীসেরা রোমান অক্ষরেই গোয়ার স্থানীয় ভাষা কোঙ্কণী মারাঠী ছাপিতে থাকে; এই ভাষায় রোমান অক্ষরের সাহায্যে পোর্তু্গীস পাদ্রিদের চেষ্টায় একটা খ্রীষ্টিয়ান সাহিত্য ক্রমশঃ গড়িয়া উঠে। ভারতীয় বর্ণাবলীর মধ্যে তামিল বর্ণমালা প্রথম ছাপায় উঠে—১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মালাবার-প্রান্তের কোচিন্-নগরে Joannes Gonsalves যোয়ান্নেস্ গোনসাল্ভেস্ নামে একজন যেসুইট সম্প্রদায়ের পাদ্রি প্রথম তামিল অক্ষর তৈয়ার করেন '(Linguistic Survey of India, Vol. IV, p. 301)।

ইহার দুই শত বৎসর পরে, এখন অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৯২৮ সাল হইতে ঠিক দেড় শত বৎসর আগে, খ্রীষ্টীয় ১৭৭৮ সালে Nathaniel Brassey Halhed নাথানিএল্ ব্রাসি হাল্‌হেড্ হুগলী হইতে তাঁহার Grammar of the Bengal Language বা 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' প্রকাশ করেন। ঐ ব্যাকরণ সর্বপ্রথম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হয়। অক্ষরগুলি সীসায় ঢালিবার জন্য ছেনী কাটেন Sir Charles Wilkins স্যর্ চার্ল্‌স্ উইল্‌কিন্স্; ইনি প্রথম ইউরোপীয় সংস্কৃত-বিদ্‌গণের মধ্যে অন্যতম; এবং Sir William Jones স্যর্ উইলিয়ম জোন্স্-এর সহিত Asiatic Society of Bengal সভার প্রতিষ্ঠা করেন। উইল্‌কিন্স্-সাহেবকে এই কারণে বাঙ্গালা ছাপাখানার স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। তিনি অক্ষর কাটিবার প্রণালী পঞ্চানন কর্মকার নামক একজন বাঙ্গালী কারীগরকে শিখাইয়া যান। এই পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুরের পাদ্রি কেরী কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা হরফ-কাটা শিল্পের স্থাপনা ও প্রচার

হয়। (হাল্‌হেড্‌ ও উইল্‌কিন্স্‌ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে-প্রণীত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯১৯ সালে প্রকাশিত *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1800-1825*, পৃঃ ৭৮-৮৮ দ্রষ্টব্য)।

১৭৭৮ সালের পূর্বে ছাপা বইয়ে বাঙ্গালা অক্ষর পাওয়া যায় দুই খানি ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত বইয়ে—এই বই দুইখানিতে বাঙ্গালা বর্ণমালা ও বাঙ্গালা লেখার নমুনা হিসাবে চিত্রপটে বাঙ্গালা হরফ দেওয়া হইয়াছিল। ১৭২৫ সালের জর্মানির Leipzig লাইপৎসিক নগর হইতে Georg Jacob Kehr গেওর্গ্‌ যাকোব্‌ কের্‌ নামে একজন জর্মান পণ্ডিত Aurenk Szeb অর্থাৎ ঔরঙ্গজেব বাদশাহের Dehli দিল্লী বা Dshihanabad জাহানাবাদ-এর টাকশাল হইতে প্রচারিত রৌপ্যমুদ্রার আলোচনা ও তদ্ব্যপদেশে প্রাচ্যখণ্ডের ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের ইতিহাস ইত্যাদি আলোচনা করিয়া লাতীন ভাষায় একখানি বই প্রকাশ করেন। এই বই লণ্ডনে ব্রিটিশ-মিউজিয়াম-এ আমার দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কের্‌-এর বইয়েব পরিশিষ্টে বাঙ্গালা ও অন্য কতকগুলি ভাষার বর্ণমালা দেওয়া হইযাছে। ইহার ৪৮ পৃষ্ঠাতে ১ হইতে ১১ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সংখ্যাগুলি ছাপানো আছে, এবং ৫১ পৃষ্ঠার সম্মুখে চিত্রপটে বাঙ্গালা ব্যঞ্জনবর্ণগুলি ও একটি জর্মান নাম, Sergant Wolfgang Meyer "শ্রীসরজন্ত বলপকা° (=ভল্‌ফ্‌গাঙ্‌) মাএর" রূপে বাঙ্গালা অক্ষরে প্রত্যক্ষরীকৃত হইয়াছে। কের্‌-এর বই হইতে Johann Friedrich Fritz যোহান্‌ ফ্রীদ্‌রিখ্‌ ফ্রিৎস্‌ কর্তৃক লাইপৎসিক নগর হইতে ১৭৪৮ সালে Orientalischer und Occidentalischer Sprachmeister অর্থাৎ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা শিক্ষক' নামক পুস্তকে বাঙ্গালা ব্যঞ্জনবর্ণের চিত্রটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে (Linguistic Survey of India, Vol. V, Part I, p. 23; Vol. IX, Part 1, pp. 8, 9)। কের্‌-এর পরে ১৭৪৩ সালে হলাণ্ডের লাইডেন্‌ নগর হইতে David Mill ডেভিড্‌ মিল্‌ Dissertatio Selecta নামে লাতীন ভাষায় একখানি বই প্রকাশ করেন,—ইহাতে মুসলমান ধর্মমতের সমালোচনা করা হইয়াছে—এই বইয়ের শেষাংশে তিনি ফার্সী, হিন্দুস্থানী ও আরবী এই কয়টি প্রাচ্য ভাষার আলোচনা করিয়াছেন, Ketelaer কেটেলের নামে একজন ওলন্দাজ লেখকের রচিত হিন্দুস্থানী ভাষার একখানি ব্যাকরণ দিয়াছেন এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ চিত্রপটে রোমান অক্ষরে উচ্চারণসহ অতি সুন্দর ছাঁদে লেখা বাঙ্গালা ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি দিয়াছেন। দেবনাগরী অক্ষরের প্রথম প্রতিলিপি

উঠিয়াছিল Athanasius Kircher আতানাসিউস্ কির্খের্-এর China Illustrata নামক পুস্তকে (১৬৬৭ সালে আম্স্টারডাম্-এ প্রকাশিত) ; এবং হরফে-ছাপা দেবনাগরী ও কায়থী অক্ষর প্রথম পাওয়া যায় Cassiano Beligatti কাস্সিয়ানো বেলিগাত্তি-রচিত পুস্তকে—Alphabetum Brammhanicum seu Indostanum Universitatis Kasi, Romae 1761 (Linguistic Survey of India, Vol IX, Part 1, p. 4, pp. 9-10).

পোর্তুগীসেরা ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে) Vasco da Gama ভাস্কো-দা-গামা-র নেতৃত্বে প্রথম ভারতে আইসে, এবং উত্তর-কেরল দেশে কালিকট-নগরে পহুঁছে। ইহারা প্রথমতঃ বাণিজ্য-ব্যপদেশে আগমন করে, এবং মুসলমান আরব ও অন্যজাতীয় বণিক্গণ যাহাদের হাতে এতাবৎ দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রবাহী বহির্বাণিজ্য ছিল, তাহারা নিজ স্বার্থহানির আশঙ্কায় পোর্তুগীসদের সহিত শত্রুতা করিতে থাকে। দক্ষিণ-ভারতের সাগরোপকূল হইতে নবাগত পোর্তুগীসেরা ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য এশিয়ার অন্য অন্য ভূভাগে আপনাদের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের বিস্তার করিতে থাকে। ১৫১৭ সালে বঙ্গদেশে ইহাদের প্রথম আগমন ঘটে (বাঙ্গালায় ইহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে J. J. A. Campos-প্রণীত History of the Portuguese in Bengal, কলিকাতা ১৯১৯, দ্রষ্টব্য)। ঐ যুগে বাণিজ্য-প্রসার, সাম্রাজ্য-লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার, এই তিন উদ্দেশ্য লইয়া পোর্তুগীসেরা স্বদেশ হইতে বহির্গত হইত। বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য-প্রসার ঘটিয়াছিল, কিন্তু পোর্তুগীসদের সাম্রাজ্য-পত্তন হইতে পারে নাই—যদিও কতকগুলি পোর্তুগীস জলদস্যু কিছুকাল ধরিয়া দক্ষিণ-বাঙ্গালার উপকূল প্রদেশে লুণ্ঠন ও উপদ্রব করিত, এবং মেঘনার মুখে সন্দ্বীপ দ্বীপ কিছুকাল নিজেদের অধিকারে রাখিয়াছিল।

পোর্তুগীসদের প্রথম আগমনের সময়ে বাঙ্গালায় সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ স্বাধীন নরপতি ছিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল ছিল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ পর্য্যন্ত। ইঁহার পূর্বে বাঙ্গালা দেশে অরাজকতা চলিতেছিল। হাবশী-জাতীয় খোজা ক্রীতদাসগণ রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিয়া বসিত। হোসেন শাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন, এবং ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ্ রাজা হন, ইঁহার রাজত্বকাল ১৫১৯ হইতে ১৫৩২ পর্য্যন্ত। নসরৎ

শাহের পরে গৃহ-বিচ্ছেদ ও বাহিরের আক্রমণে এই বংশ বেশি দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। হোসেন শাহের অপর এক পুত্র গিয়াসুদ্দীন, ভ্রাতা নসরৎ শাহের জীবদ্দশায়, নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, এবং ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজা হন। গিয়াসুদ্দীনের শাসনকালে, গোয়ার শাসনকর্তা Nuno da Cunha নুনো-দা-কুঞা ১৫৩৪ সালে পাঁচখানি জাহাজে করিয়া দুই শত পোর্তুগীস সৈন্য Martin Affonso de Mello Jusarte মার্তিন আফ্‌ফন্‌সো-দে-মেল্লো জুসার্তের অধীনে বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীস প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠান। দূতরূপে প্রেরিত জন কয়েক পোর্তুগীস উপঢৌকনসহ চট্টগ্রাম হইতে রাজধানী গৌড়নগরে আসিলে গিয়াসুদ্দীনের আজ্ঞায় তাহারা কারারুদ্ধ হয়, এবং রাজার আজ্ঞায় জুসার্তেকে ত্রিশজন অনুচরের সহিত ধৃত করিয়া গৌড়ে আনা হয়। ইতিমধ্যে বিহারের আফগান-জাতীয় জায়গীরদার শের খাঁ (পরে যিনি শের শাহ্‌ বাদশাহ্‌ হন) গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। পোর্তুগীসগণ এই লড়াইয়ে গিয়াসুদ্দীনকে সাহায্য করে এবং প্রতিদানে মুক্তিলাভ করে, ও পরে চট্টগ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পায়। নুনো-দা-কুঞার অনুমতি লইয়া জুসার্তে পুনরায় গৌড়ে আসেন, কিন্তু আবার বন্দী হন। তখন নুনো-দা-কুঞা জুসার্তের সাহায্যের জন্য নয়খানি জাহাজে সাড়ে তিন শত পোর্তুগীস সৈনিক পাঠান। এবার পোর্তুগীসেরা বাধ্য হইয়া চট্টগ্রামে বঙ্গের সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু শের খাঁ আবার গৌড় আক্রমণ করায় এবং পোর্তুগীসেরা গিয়াসুদ্দীনকে পূর্বের মতন সাহায্য করায় তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দেন, এবং গোয়ার পোর্তুগীসদের নিকট শের খাঁর বিপক্ষে লড়াই করিবার জন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠান। বাঙ্গালাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এইরূপে পোর্তুগীসেরা জড়াইয়া পড়ে। গোলন্দাজী ও জাহাজী কাজেকুশলতার জন্য তাহারা বিশেষভাবে সাহসী ও পরাক্রান্ত জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে থাকে। যাহা হউক, গিয়াসুদ্দীন অবশেষে শের খাঁ কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া ১৫৩৮ সালে প্রাণত্যাগ করেন। পোর্তুগীসেরা গোয়া হইতে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিল—Parez de Sampayo পেরিজ-দে-সাম্পাইও-র অধীনে আরও নয়খানি জাহাজ বঙ্গদেশে আসে, কিন্তু তখন শের খাঁ বিজয়ী, ও গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছে (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস', দ্বিতীয় ভাগ, নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) শের খাঁ বিহার ও বাঙ্গালাদেশ করতলগত করেন, এবং তাহার পরে মোগল বাদশাহ্‌ হুমায়ুন-কে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া নিজে দিল্লীর সম্রাট হন।

শের শাহের মৃত্যুর পর হইতে সম্রাট আকবরের বঙ্গ-বিজয় পর্য্যন্ত (১৫৪৫—১৫৭৬) ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল বাঙ্গালার পক্ষে এক প্রকার অরাজকতার যুগ। শের শাহের মৃত্যুর পরে দিল্লীতে তাঁহার বংশের রাজারা রাজত্ব করিতে থাকেন ; বাঙ্গালাদেশ তাঁহাদের প্রতিনিধিদের দ্বারায় শাসিত হইতে থাকে। কিন্তু দিল্লীতে সূর-বংশীয় রাজাদের ক্ষমতার হ্রাস হইতে লাগিল, এবং ১৫৫২ সালে বাঙ্গালার শাসনকর্তা মোহাম্মদ খাঁ সূর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সূর-বংশীয় চারিজন রাজা ১৫৫২ হইতে ১৫৬৩ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে বাঙ্গালাদেশে রাজত্ব করেন। তৎপরে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে বাঙ্গালাদেশ বিহারের শাসনকর্তা সোলেমান কররানীর অধীনে আইসে (১৫৬৪ সাল)। সোলেমান আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রবর্ধমান মোগল সাম্রাজ্যের কবল হইতে নিজ রাজ্য রক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র দাউদ ১৫৭২ সালে নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা করায় আকবরের সেনাপতি তোড়লমল্লের নিকট পরাজিত হন, এবং যুদ্ধে ধৃত ও নিহত হন। এইরূপে ১৫৭৬ সাল হইতে বাঙ্গালাদেশে আকবরের শাসন ও রাজ্যের সুশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল।

বাঙ্গালার অধিকার লইয়া যখন বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্তে এবং উত্তর ও পশ্চিম অংশে এইরূপে পাঠানে-পাঠানে এবং মোগলে-পাঠানে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছে, এমত অবস্থায় বাঙ্গালাদেশের অভ্যন্তরে মুসলমান রাজশক্তি অব্যাহত থাকা সম্ভব ছিল না। এদিকে বাঙ্গালায় পের্তুগীসেরা কিছু প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছে, ১৫৩৪ হইতে ১৫৩৮-এর মধ্যে তাহারা বাঙ্গালায় যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগ দিয়াছে ; বাঙ্গালার এক স্বাধীন মুসলমান রাজা তাহাদের নিকট যুদ্ধ-ব্যাপারে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। বিদেশী তুর্ক ও পাঠান রাজত্বের এই অরাজকতার ও শক্তিহীনতার কালে বাঙ্গালার বহু হিন্দু ও স্থানীয় মুসলমান জায়গীরদার ও সামন্তরাজ কার্য্যতঃ ও নামতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রাজারাও এই সময়ে নিজেদের স্বাধীন বিবেচনা করিতেন। ১৫৫৯ সালে গোয়া নগরীতে এপ্রিল মাসের ৩০-এ তারিখে, নিজ দুই প্রতিভূ নেয়ামৎ খাঁ (Nemat Cão) ও কানু বা গণু বিশ্বাস (? Guannu Bysuar = Biswas ?)-এর মারফৎ বাকলার রাজা পরমানন্দ রায় (Parmananda Ray el Rei de Baclaa) পোর্তুগীসদের সঙ্গে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তের মধ্যে এই ছিল যে, একখানি গোয়া ও পারস্য উপসাগরে এবং আর একখানি মালয় উপদ্বীপে—বৎসরে এই দুইখানি করিয়া বাকলার রাজার বাণিজ্য-পোতকে পোর্তুগীসেরা ছাড়পত্র দিবেন, যাহাতে

পোর্তুগীস নৌবহর দ্বারা তাহাদের উপর কোনও উপদ্রব না হয়; এবং এই সুযোগের পরিবর্তে রাজা পোর্তুগীসদিগকে নিজ রাজ্যে ব্যবসায়ের ও গমনাগমনের সুবিধা দিবেন, বাঙ্গালার অন্য রাজার সহিত পোর্তুগীসেরা সন্ধি করিলে রাজা আপত্তি করিবেন না, এবং পোর্তুগালের রাজার সম্মানের জন্য বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণে বাঙ্গালাদেশে উৎপন্ন কিছু পণ্যবস্তু উপঢৌকন দিবেন। (Calcutta Review পত্রের 1925-এর May-র সংখ্যাতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত Historical Records at Goa প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে পোর্তুগীসেরা যে এক প্রকার রাজা হইয়া বসিয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা কবিকঙ্কণে পাই, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী-রচিত চণ্ডীকাব্য ষোড়শ শতকের শেষ পাদে লেখা বাঙ্গালা বই, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, "হরমাদ" অর্থাৎ পোর্তুগীস রণতরীর (Harmáda-র) ভয়ে বাঙ্গালার বাণিজ্যপোতের পক্ষে সাগর-যাত্রা নিরাপদ ছিল না। ("ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিতে বাহিযা যায় হরমাদের ডরে।")। বাঙ্গালাদেশে রাজনৈতিক ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে ষোড়শ শতকের মধ্যে এইরূপে নানা সংঘাতের মধ্য দিয়া পোর্তুগীসদের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে।

ভারতে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকার্য্যে পোর্তুগীসেরা ষোড়শ শতক হইতে নিযুক্ত হয়—এই শতকের শেষপাদে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের আগমন ঘটিয়াছিল। বাণিজ্যের চেষ্টায় ক্রমে ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি অন্য ইউরোপীয় জাতির ভারতবর্ষে আগমনের ফলে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হইতে বাঙ্গালাদেশে ও প্রাচ্য-খণ্ডের অন্যত্র পোর্তুগীসদের রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব খর্ব হইতে থাকিলেও, পোর্তুগীস রোমান কাথলিক সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের পূর্বগামীদের খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকার্য্য এবং পোর্তুগীস প্রভাবের ফলে যাহারা বাঙ্গালায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে উক্ত ধর্মকে রক্ষা করার কার্য্য আরও শতবৎসর ধরিয়া বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে চালাইয়া আসিয়াছিলেন। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার মোগল শাসকেরা পোর্তুগীসদের ক্ষমতা ও তজ্জনিত ঔদ্ধত্য দমন করিবার জন্য তাহাদের আশ্রয়স্থল হুগলী বন্দর কাড়িয়া লন, ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের প্রভাব একেবারে কমিয়া আইসে। পোর্তুগীসদের মধ্যে অনেকে শান্তির সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিত, কিন্তু দুর্ধর্ষ প্রকৃতির অনেকে আবার বঙ্গোপসাগরে ও দক্ষিণ এবং পূর্ব বঙ্গে দস্যুতা করিত, এবং এই দস্যুতা-কার্য্যে তাহারা আরাকানের মগ জাতির সাহচর্য্য পাইত। পূর্ববঙ্গে ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে

মোগল-রাজপ্রতিনিধি শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রামে পোর্তুগীসদের উচ্ছেদ সাধন করেন। ইহার পর হইতেই, একাধারে অর্থশালী বিদেশী বণিক্ এবং দুর্ধর্ষ জলদস্যু ও সাগর-পথের একচ্ছত্র অধিকারী হিসাবে পোর্তুগীসদের যে অব্যাহত প্রতিপত্তি ছিল তাহা লোপ পাইয়া গেল ; অন্য ইউরোপীয় জাতি আসিয়া তাহাদের প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইল, তাহাদের স্থানে আসিয়া বসিল। কিন্তু এই বাহ্য ক্ষমতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও, পোর্তুগীসেরা বাণিজ্য ও খ্রীষ্টধর্মের সূত্রে ইউরোপীয়-জগতের সহিত ভারতের যে যোগ সৃষ্টি করিযাছিল, সে যোগ কিছুকাল ধরিয়া অটুট রহিল, এবং তাহাব জন্য অষ্টাদশ শতকে ও ত্যহাব পরেও পোর্তুগীসদের প্রভাব জীবন্ত ছিল। পোর্তুগীস ধর্মপ্রচারকেরা বাঙ্গালাদেশে দেশী ও বিদেশী রোমান কাথলিক সম্প্রদাযের খ্রীষ্টান-সমাজকে পরিচালনা করিতে থাকে, এবং গোযা হইতে প্রেরিত পোর্তুগীস বা পোর্তুগীস-বংশজাত পাদ্রিদের দ্বারা পূর্ববঙ্গে ও অন্যত্র অবস্থিত বাঙ্গালী রোমান কাথলিকদের ধর্মগুরুর কাজ এখনও অনেকটা চলিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের অভ্যুত্থানের পূর্বকাল পর্য্যন্ত এক প্রকার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা পোর্তুগীস ভাষা দেশবাসী ও ইউরোপীয় বিদেশীগণের মধ্যে বার্তালাপের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পোর্তুগীসেরা অনেক নূতন বিদেশী বস্তু, নূতন বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদি, এবং কতকগুলি নূতন রীতি ও অনুষ্ঠান (যেমন "নীলাম", "স্ফূর্তি") এদেশে আনয়ন করে। সেই সমস্ত বস্তু ও রীতির পরিচায়ক শব্দ পোর্তুগীস ভাষা হইতে বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গৃহীত হয়। এইরূপ শতাধিক পোর্তুগীস শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় এখনও সাধারণ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ-লিখিত "বঙ্গে পোর্তুগীস প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পোর্তুগীজ পদাঙ্ক', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৮ সাল, প্রথম সংখ্যা ; J. J. A. Campos-প্রণীত *History of the Portuguese in Bengal*, Calcutta 1919, পৃঃ ২১৪-২২০, মৎ-প্রণীত *The Origin and Development of the Bengali Language*, পৃঃ ২১৪-২১৫, পৃঃ ৬২০-৬৩২)।

ধর্মপ্রচারের জন্য পোর্তুগীস পাদ্রিদের কবে বঙ্গদেশে প্রথম পদার্পণ ঘটিয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না ; তবে বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট পোর্তুগীস ব্যবসায়ী বা সৈনিক, এবং তাহাদের নফর-গোলাম বা ক্রীতদাস, ও পোর্তুগীস-বাঙ্গালী মিশ্র 'মেটে-ফিরিঙ্গী'-দের আশ্রয় করিয়াই ইহাদের আগমন ঘটিয়াছিল ; এই রকম একটা দুরাশা লইয়াও ইহাদের আগমন হইয়াছিল যে ক্রমে বাঙ্গালা দেশের তাবৎ

অধিবাসী নিজ হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া রোমান কাথলিক খ্রীষ্টানির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। প্রতাপাদিত্য প্রমুখ বাঙ্গালার হিন্দু রাজারা এ বিষয়ে পোর্তুগীস পাদ্রিদিগকে অবাধ অধিকার দেন, এবং দেশী ও ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের উপাসনার জন্য গির্জা প্রভৃতিও প্রস্তুত করিতে অনুমতি দেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে কোনও সময়ে পাদ্রিরা বাঙ্গালায় আগমন করে। খ্রীষ্টীয় ১৫৯৯ সালের ৭ই জানুয়ারি তারিখে যেসুইট্-সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মপ্রচারক Francisco Fernandes ফ্রান্সিস্কো ফের্নান্দেস্ পূর্ব-বঙ্গে সোনারগাঁর সন্নিকটস্থ শ্রীপুর হইতে গোয়ায় উক্ত সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ Nicolas Pimenta নিকোলাস্ পিমেন্তা-র নিকট একখানি পত্র লেখেন। এইপত্রে এই কথার উল্লেখ আছে যে, ফের্নান্দেস্ খ্রীষ্টান ধর্মের মূল কথাগুলিব ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ছোটো একখানি বই এবং একখানি প্রশ্নোত্তরমালা লেখেন, এবং তাঁহাব এক সহকর্মী পাদ্রি Dominic de Souza দোমিনিক-দে-সুজা (যিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখিবাব চেষ্টা করিয়াছিলেন) এই দুইখানি বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন (দ্রষ্টব্য সুশীলকুমার দে-র History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, পৃঃ ৬৭-৬৮; মৎ-প্রণীত The Origin and Development of the Bengali Language, পৃঃ ২৩৩)। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে অন্ততঃ ষোড়শ শতকের শেষ দশকে পোর্তুগীস পাদ্রিরা বাঙ্গালাদেশেব লোকের কাছে তাহাদের নিজ ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা শিখিয়া তাহাতে বই অনুবাদ করিতেছেন, এবং এইরূপে বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন একটি সাহিত্যের ধারা প্রবর্তন করিতেছেন। ১৫৯০-১৬০০-র মধ্যে এইরূপে একটি ফিরাঙ্গী-বাঙ্গালা 'ক্রিস্তাঙ' বা খ্রীষ্টান সাহিত্যের উদ্ভব হইল, যাহা অন্যূন ১৫০ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাদেশের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবন্ত ছিল। পরে অন্যান্য ইউরোপীয় খ্রীষ্টানগণের ধর্মপ্রচার-চেষ্টা আসিয়া পড়ায় এই সাহিত্যের ধারা নূতনভাবে অনুপ্রাণিত ও রূপান্তরিত হয়। ১৮০০ সালের পর হইতে কেরী, মার্শমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি, পোর্তুগীস পাদ্রি দে-সুজা ও তাঁহার সহকর্মী ও কার্য্যাধিকারীদের স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া, এক নূতন ইংরেজি-বাঙ্গালা খ্রীষ্টান সাহিত্যের পত্তন করেন। এই নূতন ইংরেজি-বাঙ্গালা সাহিত্যের খ্রীষ্টানী ভঙ্গি অনেকাংশে পোর্তুগীসদের সৃষ্ট ফিরাঙ্গী-বাঙ্গালা সাহিত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

খ্রীষ্টীয় ১৬০০ সালের পূর্বে ঢাকা অঞ্চলে এই ফিরাঙ্গী-বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভব। ফরাসি পর্য্যটক Tavernier তাভের্নিয়ে আনুমানিক ১৬২০ সালের

দিকে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া ঢাকার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, সেখানে আগস্তীনীয় সম্প্রদায়ের গির্জার বাড়িটি খুব বড়ো এবং অতি সুন্দর। ঢাকা জেলায় ভাওয়ালে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বিশেষ প্রবল হইয়াছিল। ঢাকা ব্যতীত হুগলীতেও পাদ্রিদের গির্জা এবং আস্তানা ছিল। ১৬৬০ সালের দিকে আর একজন বিখ্যাত ফরাসি পর্য্যটক Bernier বেয়ারনিয়ে লিখিয়া-গিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে আট নয় হাজার ফিরাঙ্গী বা পোর্তুগীসের বাস ছিল (ইহারা সকলেই যে বিশুদ্ধ পোর্তুগীস-জাতীয় ছিল তাহা নহে), এবং বঙ্গদেশে পোর্তুগীস যেসুইট ও অগস্তীন সম্প্রদায়ের মিশনরীও ছিল। "জেসুইট পাদরী মার্কস আন্তনিও সাতুচি (Marcos Antonio Satuchi) ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৪ পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন---'পাদরীগণ তাঁহাদের কর্তব্য সাধনে বিরত নহেন, তাঁহারা এই দেশের ভাষা উত্তমরূপ শিখিয়াছেন; অভিধান, ব্যাকরণ, অপরাধ-ভঞ্জন ও প্রার্থনা-পুস্তক প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্ম বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন; ইহার পূর্বে এ সমস্ত কিছুই ছিল না।" (সুশীলকুমার দে—'ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক' প্রবন্ধ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৩, পৃঃ ১৮০)। ষোড়শ শতকের শেষ পাদে ইহার পত্তন হইবার পরে সপ্তদশ শতকের চতুর্থ পাদের মধ্যে যে ফিরাঙ্গী-বাঙ্গালা খ্রীষ্টান সাহিত্য প্রতিষ্ঠা পাইয়া গিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। অবশ্য, এই সাহিত্য তখন হাতে লেখা বইয়েই নিবদ্ধ ছিল, এবং বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সমাজের গণ্ডী কাটিয়া বাহিরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে এই পোর্তুগীসেরা ব্যতীত অন্য কোনও ইউরোপীয় জাতি খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারে নিযুক্ত হয় নাই; ফরাসি ও ইংরেজেরা তাহাদের অভ্যুত্থানের সময়ে কেবল নিজেদের স্বজাতীয়গণের সমবেত ধর্মানুষ্ঠানের জন্য এক-আধ জন পাদ্রি পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত ছিল। গোয়া নগরীতে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভ হইতে পোর্তুগীসদের প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, এবং ছলে বলে কৌশলে সেখানকার অধিবাসী বিস্তর অ-পোর্তুগীস লোককে খ্রীষ্টান করিয়া দেওয়ায়, গোয়া পর্তুগীস কাথলিক ধর্মের একটি বড়ো পীঠস্থান ও কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়, এবং পোর্তুগীস পার্থিব ক্ষমতার হ্রাস হইলেও, বাঙ্গালা ও ভারতের অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত পোর্তুগীস ধর্মস্থানগুলির পরিচালনা এই গোয়া নগরীই করিয়া আসিতে সমর্থ হয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে (১৭৪৩ সালের কাছাকাছি, যে সময়ে আমাদের আলোচ্য পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়) বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীসদের

১৫টি মিশন বা ধর্মপ্রচার কেন্দ্র ছিল। ইহার মধ্যে ভাওয়ালের Santo Nicolao de Tolentino তোলেন্তিনোর সন্ত নিকোলাস্-এর নামে উৎসর্গীকৃত গির্জা ও মিশনটি অন্যতম ছিল। পাদ্রি Frey Ambrosia de Santo Agostinho, সন্ত অগস্তীন সম্প্রদায়ের ভাই আম্ব্রোসিও, এই সময়ে অগস্তীনীয়দের মঠাধ্যক্ষ ছিলেন; ইনি ১৭৫০ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে গোয়ার রাজপ্রতিনিধিকে S. Nicolao de Tolentino-র মিশন সম্বন্ধে লেখেন; এই সময়ে এই মিশন বেশ সমৃদ্ধ অবস্থায়। বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীসদের প্রতিষ্ঠিত আস্তানাগুলি এখনও বহুস্থানে বিদ্যমান আছে, কিন্তু এখন সব জায়গায় ইহাদের যাজক বা সন্ন্যাসিগণ পোর্তুগীস বা গোয়ানীস নহে; বহুশঃ এগুলি এখন পোপ কর্তৃক অনুমোদিত বেলজিয়ান্ ও আইরীশ যেসুইট্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু ঢাকার ভাওয়ালের S. Nicolao de Tolentino-র প্রাচীন গির্জা ও মিশন এখনও বিদ্যমান, এবং এখানে এখনও পোর্তুগীস বা গোয়ানীস প্রভাব পুরাদস্তুর বর্তমান আছে। ১৯২১ সালের বঙ্গদেশের লোক-গণনার বিবরণী-পুস্তক (Census Report for Bengal, 1921) হইতে জানা যায় যে, নারায়ণগঞ্জের ২০ মাইল উত্তরে পোর্তুগীস গির্জার অধীন এক প্রকাণ্ড জমীদারি আছে, মোগলদের আমল হইতে এই জমীদারির চাষী বা প্রজারা প্রায় সকলেই রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান। এই অঞ্চলের খ্রীষ্টান অধিবাসীরা সংখ্যায় ২৬,০৮৩ জন পুরুষ এবং ২৪,৪৭৪ জন স্ত্রীলোক, সমগ্র বাঙ্গালার খ্রীষ্টানদের মধ্যে ⅓ অংশেরও অধিক এখানেই বাস করে। পোর্তুগীস গির্জাগুলি মাদ্রাজ শহরের ময়িলাপুরের বিশপের অধীন এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত হয়, এবং ময়িলাপুরের বিশপ হইতেছেন গোয়ার পোর্তুগীস আর্কবিশপের অধীন। এখানকার পাদ্রিরা পোর্তুগীস-ভাষী গোয়ানীস-জাতীয়। একবার ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিবার সময় এইরূপ কতকগুলি পাদ্রির সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল।

বাঙ্গালাদেশে পোর্তুগীস খ্রীষ্টানদের এক বড়ো কেন্দ্র নাগরী বা ভাওয়ালে বসিয়া ১৭৩৪ সালে পাদ্রি Manoel da Assumpçam বা Assumpção মানোএল্-দা-আস্সুম্প্‌সাঁও একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান লেখেন। পাদ্রি মানোএল্ পরবর্তী যুগের কেরী মার্শমান প্রভৃতির পক্ষে এক প্রধান পথিকৃৎ। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের পত্তন যাঁহাদের দ্বারা হইয়াছিল, তাঁহাদের একজন হিসাবে, এবং প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণের রচয়িতা হিসাবে, পাদ্রি মানোএল্ প্রত্যেক বঙ্গভাষী ও বাঙ্গালী সাহিত্যানুরাগীর সম্মানের পাত্র, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও জীবনী

আমাদের কৌতূহলের বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহার সম্বন্ধে তাদৃশ সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বা বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ে তিনখানি বইয়ের সঙ্গে ইঁহার সম্বন্ধ ছিল, কেবল এইটুকু জানা যায়। একখানি বই ইনি পোর্তুগীস হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন; বইখানির নাম **Creper Xaxtrer Orthbhed** 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'।* ...দ্বিতীয় বইখানি একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের লেখা, খ্রীষ্টান ধর্মসংক্রান্ত **Dialogue** বা আলাপ-আলোচনা-বিষয়ক, "বুসনা বা ভূষণার কোনও রাজপুত্র এই খ্রীষ্টান পাদ্রিদের আশ্রয়ে আসিয়া খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হন এবং **Dom Antonio de Rozario** এই নামে পরিচিত হন। নবগৃহীত ধর্ম বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন।"†

তৃতীয় বইখানি হইতেছে আমাদের এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ। এভোরার অধিবাসী মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাওঁ পূর্বভারতের মণ্ডলীভুক্ত অগস্তীনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন (**Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregação da India Oriental**), ইহা তাঁহার ব্যাকরণ ও শব্দকোষের নামপত্র হইতে জানা যায়। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর ক্ষুদ্র ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, তিনি (**St. Nicolao de Tolentino**-র মিশনের পরিচালক (**Reitor da Missiõ de S. Nicolao de Tolentino**) ছিলেন। **J. J. A. Campos** তাঁহার *Bandel · History of the Angustinian Convent of the Church of Our Lady*-নামক বইয়ের ৮৪-৮৯ পৃষ্ঠায় পোর্তুগীস মঠাধ্যক্ষদের একটা আনুমানিক পরম্পরা দিয়াছেন, তাহাতে খ্রীষ্টীয় ১৭৫৭ সালে (এই বৎসর সিরাজদ্দৌলা হুগলী নগর জ্বালাইয়া দেন) ফ্রেই মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাওঁ-এর নাম পাওয়া যায়। ওদিকে তাঁহার বইয়ের ভূমিকায় ১৭৩৪ সাল পাইতেছি, আর এদিকে ১৭৫৭: এই দুই তারিখের কত পূর্ব হইতে এবং কত পর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রচার-কার্য্য চলিয়াছিল, এবং তাঁহার জীবৎকাল কোন্ তারিখ হইতে কোন্ তারিখ পর্য্যন্ত, তাহা জানিবার

* দ্রষ্টব্য এই সংকলনে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" এবং "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্ব", পৃ: ১৪৬-৫৭, ১৫৮-৮৪।

† এই পুস্তকখানি 'ব্রাহ্মণ-রোমান-কাথলিক-সংবাদ' নামে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী প্রবন্ধ "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ", পৃ: ১৪৬-৫৭।

উপায় নাই। তিনি যে পোতু´গাল হইতে আগত একজন পাদ্রি ছিলেন, তাহা তাঁহার বইয়ের ভূমিকা হইতে জানা যায়। বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিলে এবং এখানে লালিত পালিত হইলে যেরূপ খাঁটি বাঙ্গালা লিখিতে পারা উচিত, ইহারা বাঙ্গালা সেরূপ নহে—বিদেশীর মনের ছাপ এবং বিদেশি-জন-সুলভ ভুল ইহাতে যথেষ্ট আছে। তিনি যে একজন কর্তব্যপরায়ণ ধর্মগুরু ছিলেন, বঙ্গভাষী শিষ্যদের জন্য তাহাদের ভাষা তখনকার দিনের পক্ষে বেশ ভালো করিয়াই শিখিয়া খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাহাতে বই অনুবাদ করিয়া লিস্‌বন হইতে ছাপাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। তাঁহার অনুবর্তন করিয়া যাহাতে অন্য পোতু´গীস ধর্মগুরুরাও বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের মধ্যে নিজ নিজ কর্তব্য যথোপযুক্ত ভাবে পালন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের পথ সুগম করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা ও শব্দকোষ প্রণয়ন। এই সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকা—"নিবেদন, পাঠক ও নবীন প্রচারকের প্রতি"—দ্রষ্টব্য। বাঙ্গালী খ্রীষ্টানেরা স্বধর্মে আস্থাবান্ থাকে, ধর্মবীজ ও ধর্মানুমোদিত রীতি-নীতি যথাযথ পালন করে, ইহা-ই অবশ্য তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ১৬৮০ সালের দিকে বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষ যে বাঙ্গালাদেশের পোতু´গীস পাদ্রিদের কর্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা কবিযা গিয়াছেন, পাদ্রি মানোএলের মতন ধর্মগুরুর কার্য্য হইতে সেই প্রশংসার যথার্থতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

পুরাতন বাঙ্গালায় গদ্যলেখা বেশি পাওয়া যায় না। গদ্য-সাহিত্য দেশে অজ্ঞাত ছিল বলিলেই হয়। পুরাতন বাঙ্গালার গদ্য আলোচনা করিতে গেলে সাহিত্যের অভাবে চিঠি-পত্র দলিল-দস্তাবেজ আমাদের উপজীব্য হইয়া উঠে। গদ্য-সাহিত্য ইউরোপীয় প্রভাবেই বাঙ্গালায় গড়িয়া উঠে। শূন্য পুরাণের মতো বইয়ের কিছু কিছু অংশ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বিশেষের দার্শনিক মতবাদ লইয়া প্রশ্নোত্তরমালা, এবং একটি আধটি গদ্যগল্প—খ্রীষ্টীয় ১৮০০ সালের পূর্বেকার বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের নমুনা যাহা আমাদের নয়নগোচর হইয়াছে তাহাতে ইহার অধিক আর বিশেষ কিছু নাই। এখন ১৭৩৪ সালের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর খবর আমরা পাইয়াছি। ...ভূষণার রাজপুত্র দোম্ আন্তনিও-র প্রশ্নোত্তরমালার মূল্য আরও বেশি। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থে—এবং খুব সম্ভব দোম্ আন্তনিও-র বইয়েও—বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি খ্রীষ্টান সাধুর ইতিবৃত্ত ও অন্য আখ্যায়িকা আছে, বড়ো বড়ো গদ্য-রচনা আছে; পুরাতন বাঙ্গালার গদ্যের ও সাধারণ শব্দ-

সম্পদের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এইগুলি। এই দুই আদি গদ্য-গ্রন্থকে বাদ দিলে বাঙ্গালা গদ্য-রচনা-রীতির ও বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস অপূর্ণ থাকিবে।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের পত্তনে সাহায্য করার দরুন পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাওঁ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্ততঃ একটি পৃষ্ঠার দাবি করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালার প্রথম ব্যাকরণকার ও কোষকার বলিয়া উচ্চস্থান তাঁহার প্রাপ্য। পোর্তুগীস পাদ্রিদের পথ অনুসরণ করিয়া পরে ১৭৮০ সালের দিকে Augustin ওগ্যুস্ত্যাঁ ওসাঁ নামে একজন ফরাসি রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা শব্দ লিখিয়া ফরাসি-বাঙ্গালা অভিধান সংকলন করিয়া স্বজাতির মধ্যে বাঙ্গালার চর্চা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন (ওসাঁর সম্বন্ধে ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতী'তে মৎপ্রণীত প্রবন্ধ পৃঃ ১৩৬-৩৭, দ্রষ্টব্য)। ইংরেজ হালহেড, ও তৎপরে কেরী প্রভৃতিও পাদ্রি মানোএল্-এর অনুবর্তক।

আস্‌সুম্প্‌সাওঁ-এর বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন, পাদ্রি হস্‌টেন সাহেব, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার উল্লেখ করিয়াছেন (Grierson—Linguistic Survey of India, Vol. V, Part 1, P. 23; The Rev. Father Hosten, S. J.—Bengal, Past & Present, Vol. IX, Part 1; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩, ৩য় সংখ্যা; *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century*); এই বইয়ের নামপত্রের ছবিও বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই বইয়ের আলোচনা যতটুকু হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র ইহার নাম লইয়া, বোধ হয় এক গ্রিয়ার্সন সাহেব ছাড়া আর কেহ এই বই চোখে দেখিয়া ইহার সম্বন্ধে কিছু লিখিবার সুযোগ পান নাই। ১৯১৯ সালে লণ্ডনে পহুঁছিয়া ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া এই বই প্রথমেই সাগ্রহে দেখি। এই বইয়ের দুইখানি প্রতিলিপি লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে আছে। একখানি খণ্ডিত, আরখানি সম্পূর্ণ। আস্‌সুম্প্‌সাওঁ-এর বইখানি আকারে ক্ষুদ্র—ইহার নামপত্রেরযে ছবি দেওয়া হইল (পৃঃ ২৬০) সে ছবি মূল পুস্তকের সমান আকারের ফোটো হইতে যথাযথ ভাবে করা হইয়াছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা x, 592; প্রথম দশ পৃষ্ঠা ভূমিকা প্রভৃতি লইয়া; তৎপরে ১-৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ব্যাকরণ;...। তৎপরে ৪১-৫৯২ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শব্দ-সংগ্রহ: ৪১-৩০৬ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-পোর্তুগীস, ও ৩০৭-৫৭০ পর্য্যন্ত পোর্তুগীস-বাঙ্গালা, এবং ৫৭১-৫৯২ পর্য্যন্ত বাকি পৃষ্ঠায় নানারূপ শব্দ শ্রেণী হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে—যেমন তিথির

VOCABULARIO
EM IDIOMA
BENGALLA,
E
PORTUGUEZ.

Dividido em duas partes

DEDICADO

Ao Excellent. e Rever. Senhor.

D. Fr. MIGUEL
DE TAVORA

Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Mageſtade,

Foy deligencia do Padre

Fr. MANOEL
DA ASSUMPC,AM

Religioſo Eremita de Santo Agoſtinho da Congrega-ção da India Oriental.

✠

LISBOA:

Na Offic. de FRANCISCO DA SYLVA.

Livreiro da Academia Real, e do Senado.

Anno M. DCC XLIII.

Com todas as licenças neceſſarias.

আসসুম্পসাঁও-রচিত ব্যাকরণের নামপত্রের প্রতিলিপি

আস্‌সুম্প্‌সাওঁ-রচিত পুস্তকের ব্যাকরণ-অংশের দুটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

18 *Grammatica*

Elle fez, u coriasse, v. tini coriassen.
Plur. Nos fizemos, Amora coriassi.
Vos fizestes, Tora coriassos, v. coria-
ssis: v. Tomora coriasso
Elles fizerao. uara coriasse; v. Taha-
na coriassen.

Outro preterito perfeito.

Sing. Eu fiz. Ami corilaõ.
Tu fizeste. Tu corili, v. Tômi corilá
Elle fez u coriló, v. tini corilen.
Plur. Nos fizemos, Amora corilaõ.
Vos fizestes, Tora corili; v. Tomora
corilá
Elles fizeraõ, uara coriló; v. Tahana
corilen.

Preterito plusquam perfeito

Sing. Eu tinha feito, Ami coriasilam.
Tu tinhas feito. Tui coriassili; v. To-
mi coriassilá.
Elle tinha feito, u coriassilo; v. Tini
coriassilen.
Plur. Nos tinhamos feito, Amora coriassilam.
Vós tinheis feito, Tora coriassili; v.
Tomorá coriasilà
Elles tinhaõ feito Uara coriassilo; v.
Tahaná coriassilen.

Futuro perfeito

Sing. Eu farei, Ami coribo, v. corimum.
Tu faras, Tu coribi; v. Tomi coriba.
Ell

Bengala, e Portugueza. 19

Elle fara, u coribo, v coribé, v Tini
coriben, v coribeq
Plur Nos faremos Amora coribo, v corimu.
Vos fareis, Tora coribi, v Tomora
coribá.
Elles faraõ u coribo, v coribe: v.
Tini coriben, v coribeq

Em lugar deste futuro, uzao tambem muitas vezes do preterito imperfeito, Coritam ' *Quando a lin-guagem falla do conjunctivo, uzaõ do Indicativo; pondo o verbo em o tempo competente, ajuntan-do-lhe alguma prepoziçao ou adverbio dos que le-vao o verbo ao conjunctivo v. g. nesta oraçao; se eu fizessa huma caza nova, entao seria bem:* Zodi ami ec noa ghor coritam; tobe bhalo hoito. &c.

Imperativo.

Sing. Faze tu Tu cor: v. Tomi coro.
Faça elle, u coruc. v. Tini coruc.
Plur. Façamos nòs, Cori amora.
Fazeivos, Cor tora; v. coro to-
morá
Façaõ ellés, Uara v. Tahanâ coruc.
O futuro mandativo, be como o futuro acima.

Infinito.

Fazer, de fazer, para fazer. corité.

Gerundio.

De fazer, Coribar.

B ii *Parti-*

Reſto,	Baqui.
Reſpeito, i, por eſte reſpeito.	Ei caron; Ei orth.
Reſtituir,	Phiria dite.
Reſtituiçaõ,	Phiria deon.
Reſuſcitar,	Zia utthité.
Reſurreiçaõ dos mortos,	Zia utthon.
Retalho,	Qhan, Baqui.
Retardar,	Bilombo, Dirongó corité.
Reter o alheyo,	Porer mal raqhité, Gopto.
Ratificar;	Dhoraitè, Phiria cohité.
Retiro,	Ontor, Ghuchon.
Retirar-ſe,	Ontorité; Pharag hoite.
Retumbar,	Xobdo dite.
Retorno,	Phiria aixon.
Retroceder,	Pachuaité Phirité.
Retrete,	Balqhanà; Chup qhanà.
Retorta çouza,	Beca; Becaniá boſto.
Retrox,	Pacania rexom.
Revelar,	Gopto zanaité; Beêto corité.
Revelaçaõ;	Gopter zanan.

Re;

Rever, i, tornar aver,	Phiria deqhite.
Reverencia,	Bhorom.
Rever, i, irſe olicor.	C,huaité.
Rever-ſe no eſpelho,	Arxitè deqhitè.
Reverenciar, i, ter reſpeito.	Xeba corité.
Reverenciar,	Xebacorité; Bhoêti corité.
Reverdecer,	Taza hoite.
Revezada couza,	Phira, Ghura.
Revez	Ultta.
Revolta, i, bulha,	Zhogora, Bibad.
Revoltozo.	Zhogoraniá: Bibadhi.
Revolver,	Ulott; pulott corité
Rezaõ, i, cauza,	Caron.
Rezam, i, juſtiça.	Uchit.
Reza,	Zopon.
Rezar,	Zopite; Zopon corite.
Rezina,	Dhup.
Reſoluçaõ,	Niſtuc, Nirupon.
Reſolver-ſe,	Corar corité.
Reſoluto,	Xaoxi, Mordenà.
Reſumido,	Olpo.
Riba, i, arriba	Upor.
Ribançeira, i, borda do rio.	Par, Quinar, Cul.
Ribeiro,	Nala, Cala.

Rico.

আসসুম্প সাঁও-রচিত পুস্তকান্তর্গত পোর্তুগীস-বাঙ্গালা শব্দসূচি : প্রতিলিপি

নাম, সংখ্যাবাচক নাম, সপ্তগ্রহের নাম, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের নাম ("আগম শাস্ত্র ; পুরাণ শাস্ত্র ; ভাগবত ; গীতা ; তর্কশাস্ত্র ; ন্যায়শাস্ত্র ; জ্যোতিষ শাস্ত্র ; বৈদ্যক") ; ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্র (সংস্কৃতে) ; ঈশ্বরের গুণাবলী ; এবং সর্বশেষে সমোচ্চার্য্য বাঙ্গালা শব্দাবলী।

বিলাত পরিত্যাগের কিছু পূর্বে ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি এই বইয়ের ব্যাকরণ-অংশ (প্রথম ৪০ পৃষ্ঠা) সম্পূর্ণ নকল করিয়া লই। এই অনুলিখন যথাযথ ভাবে করা হইয়াছে,—মূল পুস্তকের মুদ্রিত পৃষ্ঠায় ছত্রগুলি যে শব্দে বা শব্দাংশে শেষ হইয়াছে, নকলেও ঠিক সেরূপটি রাখিয়াছি ; মূলে যেখানে যেরূপে পৃষ্ঠার শেষ, অনুলিখনেও পৃষ্ঠা শেষ সেখানেই করিয়াছি ; মূলের অক্ষর যেমন যেমন আছে (রোমান বা ইটালিক ছাঁদের বড়ো হাতের বা ছোটো হাতের), নকলে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তেমনিই রাখিয়াছি। নকল হইয়া যাইবার পর মূলের সঙ্গে আবার ভালো করিয়া মিলাইয়া লই। মূল পুস্তকের ছাপার নমুনা হিসাবে কয়েকটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র-ও আনিয়াছি। এই চিত্র এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল (পৃ. ২৬১)। প্রস্তুত পুনর্মুদ্রণ মূল পুস্তকের যথাযথ অনুকারী করিয়া ছাপানো হইয়াছে।

শব্দ-সংগ্রহ অংশ বিশেষ বড়ো, ইহার পুরা নকল লইতে পারি নাই। তবে বাঙ্গালা-পোর্তুগীস অংশ হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরিয়া প্রচুর শব্দ পোর্তুগীস প্রতিশব্দ সহ নকল করিয়া আনিয়াছি (দ্র. পৃ. ২৬২)। এইরূপ শব্দ গ্রহণ করিয়াছি যাহা আমার অজ্ঞাত, বা যাহার অর্থ আমরা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ জানি না। সমস্ত শব্দ-সংগ্রহটি প্রকাশ হওয়ার যোগ্য।···

পোর্তুগীস ভাষা আমার তেমন জানা নাই, ঐ ভাষা আয়ত্ত করিবার সংকল্প লইয়া কখনও পড়িতে বসি নাই। ফরাসির সঙ্গে অল্প একটু পরিচয় থাকায় লাতীন হইতে উদ্ভূত ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা পাঠ করায়, এবং পোর্তুগীস ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব একটু আলোচনার ফলে, পোর্তুগীসের সঙ্গে যে সামান্য একটু পরিচয় আমার জন্মিয়াছে তাহা এইরূপ বই পড়িয়া মোটামুটি ভাবে বুঝিলেও, অনুবাদের পক্ষে সে পরিচয় যথেষ্ট নহে। ১৯২২ সালে এই নকল লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা কাছে রাখিয়া দিই ; উদ্দেশ্য ছিল, অবসর-মতো পোর্তুগীস ভাষাটা একটু পড়িয়া লইয়া বইটি অনুবাদ করিয়া ফেলিব। এইরূপ অনুবাদ মাতৃভাষার ইতিহাস-অনুশীলনকারী বঙ্গভাষিগণের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক হইবে আশা ছিল। অবসরের অভাবে কয় বৎসর কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত Braganja Cunha ব্রাগান্‌সা কুঞা নামে একটি গোয়ানীস্‌ ভদ্রলোক, ইনি কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক ভাবে পোতু´গীসের অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। আমার সহকর্মী ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং ইংরেজি ও বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন ইঁহার নিকটে পোতু´গীস পড়িতে আরম্ভ করিলেন। অন্য কার্য্যভার থাকায় এই সুযোগ আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন বাবুকে আস্‌সুম্প্‌সাওঁ-এর ব্যাকরণের কথা আমি বলি। প্রিয়রঞ্জন বাবু ফরাসি ভাষা জানেন, পোতু´গীসও শিখিয়াছেন। বইখানি পোতু´গীস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রস্তাব করি। স্থির হইল যে তিনি এই বই অনুবাদ করিবেন, পরে আমরা উভয়ে মূলের সঙ্গে একবার মিলাইয়া দেখিব, তৎপরে আমি ভূমিকা লিখিয়া একত্রে ভূমিকা, মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিব। তদনুসারে শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন বাবু অনুবাদ করিয়াছেন, অনুবাদের কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই। আমরা মূল ও অনুবাদ মিলাইয়া দেখিয়াছি; যতদূর সম্ভব, তিনি মূল-ঘেঁষা অনুবাদ করিয়াছেন। জায়গায় জায়গায়, বিশেষতঃ ভূমিকাগুলিতে, মূল পোতু´গীসের বাক্যরীতি বড়োই জটিল, কিন্তু আমার মনে হয় মোটের উপর মূলের যথাযথ অর্থ ঠিক ভাবেই বাঙ্গালায় দেওয়া হইয়াছে।…

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' হইতে জানিতে পারা যায় যে Baval dexe অর্থাৎ 'ভাওয়াল দেশে' উক্ত পুস্তকের খ্রীষ্টান গুরু ও শিষ্যে কথোপকথন হইতেছে। যে বাঙ্গালা ঐ পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক বাঙ্গালা, দুই শত বৎসর পূর্বে ঢাকা জেলার ভাওয়াল অঞ্চলের ব্যবহৃত বাঙ্গালা। ব্যাকরণে আস্‌সুম্প্‌সাওঁ ঐ ভাষাই আলোচনা করিয়াছেন। এই ভাষা কিন্তু একেবারে মৌখিক ভাষা নহে। সাহিত্যের ভাষার, সাধু-ভাষার আধারের উপরও এই ভাষা অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত। দুই শত বৎসর আগেকার বাঙ্গালা পুঁথির বানান দেখিয়া অনুমান হয় যে, বিশেষ্যে কি ক্রিয়াপদে বাঙ্গালাদেশে প্রায় সর্বত্রই পদমধ্যস্থ ই-কারের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল; 'করিয়া' অর্থাৎ 'কর্‌-ই-আ' শব্দের মৌখিক রূপ, 'ক ই র্‌ আ' ও 'ক ই র্‌ য়া' এইরূপ হইয়া গিয়াছিল। আস্‌সুম্প্‌সাওঁ কিন্তু ক্রিয়াপদে মৌখিক ভাষার রূপ ধরিয়া তাঁহার রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা শব্দের বানান লেখেন নাই—তিনি আগেকার কালের প্রাচীন বাঙ্গালার বানান 'করিয়া'-কে অবলম্বন করিয়া-ই coria রূপেই লিখিয়াছেন, মৌখিক ভাষার উচ্চারণ

ধরিয়া তিনি উক্ত শব্দকে coira বা coirea (= 'কইর‍্যা') রূপে লিখেন নাই। চিঠিপত্রের গদ্যভাষার প্রাচীনতর বানানকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে, বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দে তিনি ই-কারের ব্যত্যয়াত্মক উচ্চারণ ধরিয়াই রোমান অক্ষরে বানান করিয়াছেন :—যথা 'কন্যা' = 'কন্য়া, কন্ইআ > কইন্যা, কইনা, coina'; 'বাসি বিয়া = বাইস বিয়া, বাঁস বিয়া = baix bia'; 'অভাগিয়া = obhaiguia'। বাঙ্গালা গদ্যের ভাষার বা সাধু-ভাষার বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াপদে প্রাচীনতর রূপাবলি সম্বন্ধে তাহার রক্ষণশীলতা—এই ব্যাপারটি মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যেরই জের হিসাবে উনবিংশ শতকের বাঙ্গালা গদ্য রচনাশৈলীতে রক্ষিত হইয়াছে।

পোর্তু´গীস পাদ্রিরা রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা লিখিবার একটি নিয়ম স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে Dominic de Souza-র সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। আস্‌সুম্প্‌-সাওঁ-র বইগুলির রোমান-বাঙ্গালা বর্ণবিন্যাস-রীতি বেশ সহজ ও কার্য্যকর, এবং বাঙ্গালার উচ্চারণকে মোটামুটি যথার্থ ভাবেই প্রকাশ করিবার উপযোগী। এই রীতি নিশ্চয়ই বহুদিনের চেষ্টার ফল। প্রথম যুগের পোর্তু´গীস পাদ্রিদের বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলন করিয়া, তাহাতে কী কী ধ্বনি আছে তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইয়াছিল। বাঙ্গালা বর্ণমালায় এবং বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চারিত ধ্বনি-সমষ্টিতে যে অসামঞ্জস্য বিদ্যমান, তজ্জন্য প্রথমটা নিশ্চয়ই তাঁহাদের কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইয়াছিল। কাজটি সহজ নহে; বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণমালার নির্দেশ, উচ্চারণ সম্বন্ধে বহু স্থলে আমাদের ভ্রমপথেই লইয়া যায়,—বর্ণমালার প্রভাব এড়াইয়া উচ্চারণের প্রকৃত স্বরূপটি বাহির করা বিশেষ সূক্ষ্ম-আলোচনা-সাপেক্ষ। বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করিবার পূর্বে পোর্তু´গীসদের গোয়ায় কোঙ্কণী-মারাঠীর সঙ্গে পরিচিত হইতে হইয়াছিল। কোঙ্কণী ভাষায় খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বৃহৎ একটি খ্রীষ্টান ফিরাঙ্গী-কোঙ্কণী সাহিত্য গড়িয়া উঠে, রোমান অক্ষরে কোঙ্কণী লেখা হইতে থাকে।* গোয়ায় কোঙ্কণী ভাষার ধ্বনিগুলির জন্য রোমান প্রত্যক্ষর পোর্তু´গীসেরা ঠিক করিয়া লন। ইহার দ্বারা বাঙ্গালায় আগত পাদ্রিদের পক্ষে কোঙ্কণীর মতোই আর একটি নবীন ভারতীয় আর্য্যভাষা বাঙ্গালার জন্য রোমান প্রত্যক্ষর নির্ণয় করা সহজ হইয়াছিল। কতকগুলি বিশিষ্ট ভারতীয় ধ্বনি—যেমন মূর্ধন্য বর্ণগুলির ধ্বনি—জানাইবার জন্য ইতিমধ্যেই কোঙ্কণীতে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; বাঙ্গালাতেও সেই ব্যবস্থার অনুসরণ করা হয়। ওলন্দাজ

Ketelaer-এর লেখা হিন্দুস্থানী ভাষার ব্যাকরণ* ১৭৪৩ সালে হলাণ্ডে লাইডেন নগরে ইংরেজ লেখক David Mills-এর সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণের হিন্দুস্থানী ভাষার রোমান প্রত্যক্ষরীকরণে কোনও বিশেষ শৃঙ্খলা নাই, ইহার তুলনায় পোর্তুগীস পাদ্রিদের বাঙ্গালা-রোমান বানানকে সুনিয়ন্ত্রিততার জন্য বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩২৩ সালে প্রকাশিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্ব' প্রবন্ধে,† পোর্তুগীস ভাষায় রোমান বর্ণমালার কিরূপ উচ্চারণ প্রচলিত, তদ্বিষয়ে, এবং সেই উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া আস্‌সুম্প্‌সাঁও ও তাঁহার পূর্বেকার পাদ্রিরা বাঙ্গালা ভাষার প্রত্যক্ষর নির্ধারণ কিরূপে করিয়া দিয়াছিলেন, ও এই প্রত্যক্ষর ব্যবহার কতটা কার্য্যকর, তদ্বিষয়ে সবিস্তর আলোচনা করা হইয়াছে (এই সম্পর্কে, বাঙ্গালা ও পোর্তুগীসের তুলনামূলক উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনা করা কৌতুককর হইতে পারে; এ সম্বন্ধে *The Origin and Development of the Bengali Language,* পৃঃ ৬২০-৬৩২-এ পোর্তুগীস ধ্বনিগুলি, বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত শতাধিক পোর্তুগীস শব্দে বাঙ্গালীর মুখে কিরূপ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে বিচার দ্রষ্টব্য)।... দুই শত বৎসর পূর্বেকার ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে প্রচলিত বাঙ্গালার উচ্চারণ বিষয়ে এই রোমান প্রত্যক্ষরীকরণপদ্ধতি বিশেষ আলোকপাত করে, এবং পুরাতন বাঙ্গালার উচ্চারণ সম্বন্ধে আমাদিগকে স্থির সিদ্ধান্তে পহুঁছিতে সাহায্য করে। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস লইয়া গবেষণার কার্য্যে দুই শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালার প্রাদেশিক উচ্চারণ ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে এতটা সুস্পষ্ট জ্ঞান বিশেষ উপযোগী।

.. ..

গ্রীস ও রুষ দেশ বাদ দিলে, আমাদের দেশে সংস্কৃতের মতো, সমগ্র ইউরোপখণ্ডে লাতীন ভাষা অধীত ও অধ্যাপিত হইত; সুতরাং অন্য ভাষার আলোচনায় লাতীন ব্যাকরণের রীতি-ই যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুসৃত হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়—আমাদের বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার আলোচনায় যেমন সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু

* এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 'The Oldest Grammar of Hindustani', Indian Linguistics, Grierson Felicitation Volume, Part IV, 1935.

† দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থের পৃঃ ১৫৮-১৮৪।

সংস্কৃত ভাষা এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি উভয়-ই পাদ্রি আস্‌সুম্প্‌সাওঁ-এর নিকট অজ্ঞাত ছিল; অপিচ, তখন বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা করিবার কথা বোধ হয় বঙ্গভাষী কাহারও মনেও হয় নাই, সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা বাঙ্গালা আলোচনায় ব্যবহারের কোনও সুযোগ হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতির সহিত পরিচয় থাকিলেও বাঙ্গালার মতন আধুনিক ভাষার বর্ণনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রের এবং নাম ক্রিয়াপদ নিষ্ঠা শতৃ-শানচ্‌ প্রত্যয় অব্যয়পদ প্রভৃতি বাক্যাংশের বিশ্লেষাত্মক সংজ্ঞা যথাযথ ব্যবহার করা একজন বিদেশীর পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইত। সংস্কৃত ব্যাকরণের সমস্ত পর্য্যায় এবং সূত্র বাঙ্গালার পক্ষে প্রযোজ্য নহে, সংস্কৃতের অনেক বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালায় মেলেও না, আবার বাঙ্গালায় এমন বহু পর্য্যায় ও রীতির উদ্ভব হইয়াছে যাহা সংস্কৃতে অজ্ঞাত। খাঁটি বাঙ্গালার ব্যাকরণ ঠিক সংস্কৃত আদর্শে হইতে পারে না। যাহা হউক, আস্‌সুম্প্‌সাওঁ লাতীনের ছাঁচে ঢালিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন।

লাতীনে পদের অন্ত্যধ্বনি বা বর্ণ (প্রাতিপদিক রূপ) এবং সুপ্‌ বিভক্তি ধরিয়া, সংস্কৃতেরই মতো, নামশব্দকে নানা শ্রেণীতে ফেলা হয়। আস্‌সুম্প্‌সাও বাঙ্গালার বিশেষ্য পদগুলিকে, স্বরান্ত ও হসন্ত, ষষ্ঠীতে '-র'- এবং '-এর'-প্রত্যয়-গ্রাহী চারি শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। লাতীন ভাষায় অধিকরণের জন্য বিশেষ প্রত্যয় নাই, এক-ই বিভক্তির দ্বারা করণ, অপাদান ও অধিকরণ দ্যোতিত হইয়া থাকে, এই কারককে লাতীনে Ablativus বা অপাদান কারক বলা হয়। বাঙ্গালা শব্দ-রূপে লাতীন ভাষার অনুরূপ ছয় বিভক্তি ধরা হইয়াছে, এবং অধিকরণ (Locative) স্থলে Ablative নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় এবং এখনও বিশেষ করিয়া উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের মৌখিক ভাষায় বহু স্থলে কর্তৃকারকে '-এ'- বিভক্তির প্রয়োগ আছে। আস্‌সুম্প্‌সাওঁ কিন্তু নিজব্যাকরণে শব্দ-রূপ পর্য্যায়ে এই 'এ' কারকে ধরেন নাই, পরে বাক্য-যোজনার পর্য্যায়ে প্রথম সূত্রে তাহা ধরিয়াছেন। কর্তৃকারকে এই এ-কারের বা '-এ'-বিভক্তির প্রয়োগ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর ভাষায় একটি লক্ষ্য করিবার জিনিস।

* এই প্রসঙ্গে কৌতূহলী পাঠক বর্তমান লেখকের Ananta Kakaba Priyolkar of Goa and the Portuguese Heritage of Goa and India প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিতে পারেন। (দ্রষ্টব্য Priyolkar Commemaration Volume, edited by Dr. Subhas Bhande, Bombay, April 1974, pp. 279-99)।

লিঙ্গ পর্য্যায়ে পুংলিঙ্গে eqtta dhormo purux (একটা ধর্ম পুরুষ) ও স্ত্রীলিঙ্গে eqtti xtri dhormi (একটী স্ত্রী ধর্মী) এই দুই প্রয়োগ বিবেচ্য। আজকালকার বাঙ্গালায় অনাদারে '-টা' প্রত্যয় হয়, এবং আদর ও ক্ষুদ্রতা জ্ঞাপন করিতে হইলে ' টা' '-টী' বা '-টি' রূপে পরিবর্তিত হয়। এই ঈ-কারান্ত (বা ই-কারান্ত) '-টী' '-টি' প্রত্যয় মূলে স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক প্রত্যয়, আধুনিক বাঙ্গালায় '-টী'-র (বা '-ঈ'-র) স্ত্রীলিঙ্গ দ্যোতনার শক্তি আর বিদ্যমান নাই (*The Origin and Developement of the Bengali Language, pp. 673, 686*) ; কিন্তু পুংলিঙ্গে 'একটা পুরুষ' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'একটী স্ত্রী' পাদ্রী আসসুম্প্‌সাওঁ-এর এইরূপ লেখা হইতে কি আমরা অনুমান করিতে পারি যে, দুই শত বৎসরের আগেকার বাঙ্গালায় '-টা' '-টী'-র মূল লিঙ্গগত পার্থক্য কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল? 'ধর্ম' শব্দের বিশেষণ প্রয়োগ, স্ত্রীলিঙ্গে 'ধর্মী' লক্ষ্য করিবার বিষয়; তথা স্ত্রীলিঙ্গের রূপ 'ভাগ্যমন্তী' এবং 'হিংসকা'।

সর্বনাম-পর্য্যায়—'আমি'-র সঙ্গে সঙ্গে 'মুই' পদের সাধারণ ব্যবহার ছিল। এতদ্বাচক 'ইহা'-অর্থে 'এয়া' ('এহা') ও 'এহি' লক্ষণীয়। অমু-বাচক 'উহা', -অর্থে একবচনে পাদ্রি সাহেব 'এ, এয়া, ইান'-কে 'ও, উই, উনি' এবং 'সে, তিনি'-র সহিত এক পর্য্যায়ে ধরিয়া গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। 'সে' এবং 'উহা, ও' বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে বহু স্থলেই সমার্থক (অমু-বাচক) সর্বনাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 'ইহা, এ' কখনও কুত্রাপি একপে 'সে' ও 'উহা'র সহিত একার্থক সর্বনাম রূপে মেলে না। সর্বনাম পর্য্যায়ে এবং তিঙন্ত পদের আলোচনায় দেখা যায় যে প্রথম পুরুষে সর্ব্বনামে সাধারণতঃ তদ্বাচক 'সে, তা' অপেক্ষা 'উ' (=উহা, ও, উনি) পদেরই প্রয়োগ অধিক। বহুবচনে পাদ্রি সাহেব 'ইহা'-কে 'উহা, ও' এবং 'সে'-র সহিত একার্থক বলিয়া ভুল করেন নাই। 'আপন' শব্দের ব্যবহার দ্রষ্টব্য। মধ্যম পুরুষে সম্ভ্রমে 'আপনি' (প্রাদেশিক বাঙ্গালায় 'আপনে') একমাত্র পদ ছিল; 'তুমি তোই', 'তুমি ওই', এইরূপ emphatic বা নিশ্চয়তা-জ্ঞাপক পদও সম্ভ্রমে ব্যবহার হইত। সম্ভ্রমার্থক মধ্যম পুরুষ জানাইবার জন্য 'আত্মন্‌' শব্দ হইতে জাত 'আপন' শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালায় খুব প্রাচীন কালে পাওয়া যায় না (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—*The Origin and the Development of the Bengali Language*, pp. 846-848)। বহুবচনে প্রথমা বিভক্তিতে 'তাহানা, ওয়ানা' (=তাঁহারা, উহারা; ষষ্ঠীর 'তাহান, উহান' হইতে উদ্ভূত) এবং 'সেয়ারা' (= তাহারা)—এহ পদগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয়। (ইহার রহস্য সম্বন্ধে, অর্থাৎ ষষ্ঠী বিভক্তির সঙ্গে

বহুবচনের বিভক্তির যোগ বা সম্পর্ক সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য *The Origin and Development of Bengali Language*, pp. 734-737)।

ক্রিয়াপদ সাধন।—তিঙন্ত পদের আলোচনায় অস্ত্যর্থক 'হ্' ধাতুর উত্তম ও মধ্যম পুরুষে ǒ (= 'ও' ? 'হো' ?) পদের প্রয়োগ দ্রষ্টব্য। অতীতে উত্তম পুরুষে—ilão (= 'ইলাউঁ, -ইলাঙ', আজকালকার '-ইলাম') প্রয়োগও লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনুজ্ঞায় 'তি' পদ এই প্রাদেশিক ভাষায় একটি বিশেষ বিভক্তি। এখনও কি ইহার প্রয়োগ ঢাকার বাঙ্গালায় পাওয়া যায় ? ইহার উৎপত্তি কী ? ('তি' = 'থি' —'স্থা'-ধাতুর কোনও শব্দ, বিভক্তি আকারে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে ?) 'আছি' ও 'আছে'-র সংক্ষিপ্ত 'ছে' রূপ দ্রষ্টব্য। 'আছিতাম', 'আছিত' ইত্যাদি পুরানিত্যবৃত্ত রূপ 'আছ্' ধাতুতে এখন আর দেখা যায় না।

বাক্য-যোজনা অংশে পাদ্রি আস্সুম্প্সাওঁ যে সূত্রগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি সমীক্ষা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির সহিত যে একটা মোটামুটি পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তবে অনেকগুলি বাক্য তিনি সম্ভবতঃ নিজেই রচনা করিয়া দিয়াছিলেন; হয়তো পোতু´গালে বসিয়া বাঙ্গালী সংশোধকের সাহায্য না পাইয়া এইরূপ করিয়াছিলেন, তাই এগুলিতে ফিরিঙ্গিয়ানা ভাব এবং কুত্রচিৎ ভুল আসিয়াও গিয়াছে। যথা—ze chai, taha cori (যে চাই, তাহা করি—পৃঃ ২২); zodi tomra xot carzio corite chao na ami o corimu (যদি তোমরা সৎ কার্য্য করিতে চাও না, আমিও করিমু—পৃঃ ২২); astha, axa, coruna, porinamer poth xocol (আস্থা, আশা, করুণা, পরিণামের পথ সকল—পৃঃ ২৪); xunilam, ze Induxtani cala loq xocol (শুনিলাম যে, ইন্দুস্থানী [হিন্দুস্থানী] কালা লোক সকল—পৃঃ ২৫)। এইরূপ কিম্ভূতকিমাকার বাঙ্গালা বাক্য-রচনা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইতেও প্রচুর বিদ্যমান।

এই অংশের কতকগুলি সূত্র কিন্তু বাক্য-যোজনার সূত্র নহে, বাস্তবিক পক্ষে সেগুলি পদ-সাধনেরই সূত্র। অপর Advertencias অংশে পদ-সাধন ও বাক্য-সাধন উভয় বিষয়ের সূত্র বিমিশ্রভাবে গ্রথিত হইয়াছে। বাঙ্গালার কারক-দ্যোতক postposition বা বিভক্তি-স্থানীয় শব্দাবলী প্রায় সমস্ত এই অংশে উল্লিখিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা বর্ণমালা সম্বন্ধে পাদ্রি সাহেবের উক্তি নিরতিশয় কৌতুককর, এবং এই সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব মধ্যযুগের খ্রীষ্টানী গোঁড়ামি- এবং ইউরোপীয় দম্ভ-

প্রস্তুত। তবে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পক্ষে বাঙ্গালা অক্ষর পরিচয় হওয়াটা যে বিশেষ কার্য্যকর তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষ কৌতুককর হইতেছে পাদ্রি সাহেবের এই বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্টিটা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদের একটা মূর্খতার পরিচয়; আর তাঁহার এই অভিমত যে, ইউরোপের সংস্কৃত-স্থানীয় লাতীন ভাষাকে ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মণদের হাতে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব ঘটিয়াছিল,—ইহা তাঁহার মনের অন্তর্নিহিত লাতীন জাতির শ্রেষ্ঠতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। বোধ হয় গ্রন্থকার ক্ষণেকের জন্য তাঁহার নিজ মাতৃভাষা পোর্তুগীসের জননী এবং তাঁহার রোমান কাথলিক ধর্মের দেব-ভাষা লাতীনকে পৃথিবীর তাবৎ ভাষার জননী ঠাহরাইয়া ফেলিয়াছিলেন,—এবং খ্রীষ্টান ধর্ম-পুস্তকের "পুরাতন-নিয়ম"-খণ্ডের ভাষা বিধায় খ্রীষ্টানী মতে জগতের মূল ভাষা, স্বর্গের ভাষা হিব্রুর কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়া তিনি এইরূপে স্বধর্মের এক লোক-প্রচলিত বিশ্বাস পালন না করিয়া প্রত্যবায়-ভাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন!

এইরূপে তাঁহার গ্রন্থের উপসংহার। মোটের উপর, যে সময়ে এই বই লেখা হইয়াছিল সেই সময়ের কথা ধরিলে ইহার নানা ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বইখানি ভালোই বলিতে হয়। ইহার সাহায্যে অন্ততঃ দুই তিন পুরুষ ধরিয়া ইউরোপীয়দের মধ্যে বাঙ্গালার প্রচার হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য; এবং এখন বঙ্গভাষার ইতিহাস আলোচনার জন্য এই বইয়ের যে বিশেষ মূল্য আছে তা স্বীকার্য্য।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আসুম্প্সাওঁ-এর বর্ণিত বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করিতে গেলে খালি এই ব্যাকরণটুকু যথেষ্ট নয়, সৌভাগ্যক্রমে আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার শব্দ-সংগ্রহ আছে, এবং 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' আছে। এই কাজ ভালো করিয়া করিতে গেলে ভাওয়াল অঞ্চলের আধুনিক ভাষার সঙ্গে, বিশেষতঃ সেখানকার বাঙ্গালী রোমান কাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার, গোয়া-প্রদেশের ভাষা কোঙ্কণী একটু জানা দরকার, একটু পোর্তুগীসও জানা দরকার (কারণ এই দুই ভাষার প্রভাব—বিশেষ করিয়া পোর্তুগীসের প্রভাব—এই ফিরাঙ্গী-বাঙ্গালার শব্দাবলীতে এবং বাক্যের ভঙ্গিতে আসিয়া গিয়াছে)।...

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর ভাষার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার স্থান ইহা নহে।*

* এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য বর্তমান পুস্তকের পৃঃ ১৪৬-৫৭।

এই ভাষায় যথেষ্ট ফিরিঙ্গিয়ানা দোষ আছে, কিন্তু গুণও যথেষ্ট আছে। যদিও সাধারণতঃ আক্ষরিক অনুবাদ হয় নাই, কেবল মূলের ভাবটি বাঙ্গালায় দেওয়া হইয়াছে, পোর্তুগীসের মূল-ঘেঁষা অনুবাদ করিবার চেষ্টায় তথাপি বহু বহু বাঙ্গালার বাক্যকে পোর্তুগীসের বাক্য-রীতির অনুয়ায়ী করিয়া উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে স্থানে স্থানে অর্থগ্রহে কষ্ট হয়। তারপর নানা শব্দ সাধারণতঃ যে ভাব প্রকাশ করে সেই ভাব প্রকাশ করিতে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় নাই—অনুবাদে এখানে পাদ্রি সাহেব কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, যেমন ভক্তি প্রেম বা দাম্পত্য-প্রণয় অর্থে 'দয়া' শব্দ, 'শাশ্বত জীবন' অর্থে 'জীবন অনন্ত সংখ্যা', 'শাশ্বত কাল' অর্থে 'সর্বকাল বিনে শেষে'। খ্রীষ্টানী ভাব-জগতের সহিত এবং খ্রীষ্টান রচনা-ভঙ্গির সহিত পবিচয় না থাকিলে এই বইয়ের ভাষা বহুস্থলে অবোধ্য হইয়া পড়ে। (প্রমাণ-স্বরূপ 'মাতা মেরীর নিকট প্রার্থনা' মন্ত্রটি দেখা যাইতে পারে)। কিন্তু এই সকল দোষ থাকিলেও, বহু স্থানে পাদ্রি সাহেব বেশ ঝরঝরে বাঙ্গালা লিখিয়াছেন। তাঁহার রচনা-শৈলী একেবারে কথাবার্তার অনুকারী; আস্তে আস্তে থামিয়া থামিয়া পড়িয়া গেলে, বিপরীত বাক্যরীতিও ততটা কানে ঠেকে না,—যে সব বাক্যাংশ সাধারণতঃ আমরা বাক্যের আদিতে বসাইয়া থাকি, সে সব বাক্যাংশ পরে আসিলেও মনে হয় যেন বাক্য মনের ভাবের গতি অনুসরণ করিয়া সহজভাবে প্রকাশিত হইতেছে, ধরিয়া ধরিয়া গুছাইয়া লইয়া তর্কবিদ্যানুমোদিত পন্থা অনুসারে সাধুভাষার ভঙ্গিকে অবলম্বন করিয়া কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হয় নাই। ছোটো ছোটো বাক্যে ঘরোয়া কথা পাদ্রি সাহেব যেখানে বলিয়াছেন, সেখানকার রচনা বাস্তবিকই প্রসাদগুণযুক্ত; 'মৃত্যুঞ্জয়ী' বাঙ্গালার সরল অংশগুলিকে এইরূপ অংশ স্মরণ করাইয়া দেয়॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুদিত 'পাদ্রি মনোএল্‌-দা-আসসুম্পসাম্‌-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থের শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত 'প্রবেশক' হইতে সংক্ষেপিত আকারে পুনর্মুদ্রিত।

অর্ধমাগধী

অর্ধমাগধী ভাষা প্রাকৃত-বিশেষ ; প্রাচীন ভারতের লোকভাষা-বিশেষের আধারের উপর গঠিত জৈন শাস্ত্রের ভাষা। ভারতবর্ষে আর্য্যভাষা নিম্নে প্রদর্শিত ধারা বা ক্রম-বিবর্তন অনুসারে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে :—[১] আদি ভারতীয়-আর্য্য —বৈদিক সংস্কৃতে এবং প্রাচীন সংস্কৃতে এই অবস্থার আর্য্য-ভাষার প্রতীক বা নিদর্শন বিদ্যমান। পরিবর্তন-ধর্ম অনুসারে, আদি ভারতীয়-আর্য্য ভাষা, [২] মধ্য ভারতীয়-আর্য্য ভাষায় রূপান্তরিত হইল ; এই মধ্য-যুগের ভারতীয়-আর্য্য ভাষার মধ্যে চারিটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। (বুদ্ধদেব ও মহাবীরস্বামীর কিছু পূর্ব হইতে ভারতীয়-আর্য্য ভাষার মধ্যযুগের আরম্ভ হয়, এইরূপ অনুমান করা যায়)। চারিটি স্তর যথা :—(ক) মধ্য ভারতীয়-আর্য্যের প্রারম্ভ হইতে আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্য্যন্ত ইহার প্রথম স্তর, পালি ও অশোক-অনুশাসনাবলীর ভাষা, এবং অশ্বঘোষ-রচিত নাটকের প্রাকৃত, এই স্তরের নিদর্শন-স্বরূপ বিদ্যমান। (খ) খ্রীঃ পূঃ ২৫০ হইতে খ্রীষ্টাব্দ ২০০ পর্য্যন্ত (আনুমানিক)—মধ্য ভারতীয়-আর্য্যের দ্বিতীয় স্তর ; বিভিন্ন প্রাচীন অনুশাসনের ভাষায় এই স্তরের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত রহিয়াছে ; (গ) খ্রীঃ ২০০-৬০০ (আনুমানিক)—মধ্য ভারতীয়-আর্য্যের তৃতীয় স্তর ; সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃতে, এবং জৈন শাস্ত্রগ্রন্থের ও জৈন এবং জৈনেতর অন্য সাহিত্যের প্রাকৃতে এই স্তর বিদ্যমান ; অর্ধমাগধী প্রাকৃত মুখ্যতঃ এই স্তরের মধ্যে পড়ে। (ঘ) খ্রীঃ ৬০০-১০০০ (আনুমানিক)—চতুর্থ স্তর, এই স্তরকে আধুনিক পণ্ডিতগণের মত অনুসারে 'অপভ্রংশ' বলা হয় ; শৌরসেনী ও অন্য অপভ্রংশ সাহিত্য এই স্তরের ভাষায় রচিত। তদনন্তর ভারতীয়-আর্য্য-ভাষার তৃতীয় অবস্থা।—[৩] নব্য বা আধুনিক ভারতীয়-আর্য্য যুগ মোটামুটি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ; বাঙ্গালা, অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী, পূর্বী-হিন্দী, পশ্চিমা-হিন্দী, পাহাড়ী, পূর্বী-পাঞ্জাবী, পশ্চিমা-পাঞ্জাবী, সিন্ধী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি আধুনিক আর্য্যভাষার উৎপত্তি ও আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ইহাদের গতি। আদি, মধ্য ও নব্য—ভারতীয়-আর্য্য ভাষার এই তিন অবস্থা বা যুগকে সংক্ষেপে যথাক্রমে 'সংস্কৃত', 'প্রাকৃত' ও 'ভাষা' যুগ বা অবস্থা বলা যাইতে পারে।

মধ্য বা 'প্রাকৃত' যুগের তৃতীয় স্তরের আর্য্যভাষাগুলিকে বিশেষ বা সংকীর্ণ

অর্থে 'প্রাকৃত ভাষা' বলা হয়। এই 'প্রাকৃত ভাষা'র বহু প্রকার বা রূপভেদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান এইগুলি—

(১) সংস্কৃত নাটকান্তর্গত ও জৈনেতর কাব্যের প্রাকৃত—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী ও মাগধী ইহাদের মধ্যে প্রধান বা উল্লেখযোগ্য।

(২) জৈন শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রাকৃত—অর্ধমাগধী (অথবা আর্ষ বা জৈন-প্রাকৃত), জৈন-মহারাষ্ট্রী, জৈন-শৌরসেনী।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈনগণের 'আগম' নামক প্রাচীন শাস্ত্র প্রধানতঃ অর্ধমাগধী প্রাকৃতে লিখিত। জৈনধর্মের অন্যতম গুরু মহাবীরস্বামী (জীবৎকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) মগধের অধিবাসী ছিলেন, মগধেই তাঁহার জন্ম ও নির্বাণলাভ হয়, এবং মগধদেশেই তাঁহার ধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়। তিনি তখনকার মগধের দেশভাষা আশ্রয় করিয়া শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন। প্রথমটায় তাঁহার বাণী শিষ্যগণের মুখে মুখেই প্রচারিত হইত, তাহাতে ঠিক মহাবীরস্বামীর মুখনির্গত ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই। পরে, সম্ভবতঃ মগধের ভাষাতেই, অথবা অনুরূপ কোনও প্রাচ্য লোক-ভাষাতে, মহাবীরস্বামীর ও তাঁহার কতকগুলি শিষ্যের উপদেশ ও জীবনী লিপিবদ্ধ হয়, এবং এই উপদেশ ও জীবনী অবলম্বন করিয়া জৈন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। পরবর্তী কালে, মহাবীরস্বামীর নির্বাণ-লাভের দুই শতক পরে, মগধে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ হয়, দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বহু জৈন সন্ন্যাসী মগধ দেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরী হন, অনেকে কর্ণাট দেশে গমন করেন। যে সন্ন্যাসীরা দেশ রহিয়া গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দুর্ভিক্ষ-জনিত দারুণ কষ্টে পড়িয়া আচার-ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন,—মহাবীরস্বামীর দেখাদেখি তৎশিষ্য সন্ন্যাসীরাও দিগম্বর হইয়া থাকিতেন, মগধের আচার-ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীরা বস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ভিক্ষের অবসানে কর্ণাট ও অন্য দেশ হইতে প্রবাসী সন্ন্যাসীরা মগধে প্রত্যাবর্তন করিয়া, এই আচার-ভ্রষ্টতা দেখিয়া বিচলিত হইলেন। ইতিমধ্যে জৈন সন্ন্যাসীরা মূল জৈন শাস্ত্রের বহু অংশ অল্পবিস্তর বা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যান, শাস্ত্র বহুশঃ নষ্ট হইয়া যায়। জৈন সংঘনেতা আচার্য্য স্থূলভদ্র (ইহার মৃত্যু ২৫২ খ্রীষ্টপূর্ব বৎসরে) পাটলিপুত্র নগরে সন্ন্যাসিগণের সমিতি আহ্বানপূর্বক সকলের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া জৈন আগমের একাদশ অঙ্গ স্থিরীকৃত করিয়া লন।

এইরূপে, মহাবীরস্বামীর নির্বাণের দুই শত বৎসরের মধ্যে জৈন শাস্ত্র অংশতঃ নষ্ট ও পুনরুদ্ধৃত হয়। পুনরুদ্ধারকালে তাহার মূল রূপ কিছু-না-কিছু বিকৃত

হইবারই কথা। ইতিমধ্যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতকে, জৈনগণ 'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। তদনন্তর, কয়েক শত বৎসর পরে, আবার মগধে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে শাস্ত্রজ্ঞ বহু সন্ন্যাসী গতাসু হন। তখন দেবর্ধিগণি (দেবড্‌ঢিগণি) নামক শ্বেতাম্বর সংঘনেতা, শাস্ত্রের পুনরায় লোপের আশঙ্কায় একটি জৈন পরিষৎ আহ্বান করেন। পশ্চিম ভারতে ইতিমধ্যে জৈনধর্ম প্রসার লাভ করায় সৌরাষ্ট্র দেশের বলভী নগরীতে এই পরিষৎ বসে। দেবর্ধিগণি সংগ্রহ ও সংশোধন করিয়া জৈন শাস্ত্র চিরতরে স্থির করিয়া দিবার প্রয়াস করেন। ৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে, মহাবীরস্বামীর নির্বাণের ৯৮০ বছর পরে, দেবর্ধিগণির সম্পাদকতায় জৈন শাস্ত্রের দ্বিতীয় শোধন ও সংরক্ষণ হয়।

দেবর্ধিগণির সংশোধিত ও সম্পাদিত জৈন শাস্ত্রেই অর্ধমাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়। জৈন ধর্মের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, 'পূর্ব' নামে পরিচিত প্রাচীন অথবা মূল শাস্ত্রগ্রন্থগুলি একেবারে লোপ পাইয়াছে। দেবর্ধিগণির সম্পাদিত শাস্ত্রে নানা যুগের গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে। কতক অংশ আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০ বৎসরের, ভদ্রবাহু-নামক জৈন সংঘ-নেতার রচিত; কতক অংশ আরও পরের—এমন কি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের। দেবর্ধিগণির নিজের হাতও এই সংশোধনে যথেষ্ট ছিল। আবার দেবর্ধিগণির পরেও শাস্ত্রের পরিবর্তন হইয়াছে—বিষয়বস্তুতে ও ভাষায়। সুতরাং খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাগধী বা প্রাচ্য ভাষায় মহাবীরস্বামীর উক্তি এই শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা-ভূমি হইলেও, ইহার ইতিহাস—বারবার ইহার লোপের ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা—ধরিলে, মূল ভাষা যথাযথ রক্ষিত হওয়া সম্ভবপর বলিয়া কেহ মনে করিবে না। মুখ্যতঃ দেবর্ধিগণির সময়ের পরিবর্তিত ও সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষার দ্বারা প্রভাবান্বিত বা বিকৃত প্রাচ্য ভাষাই এই শাস্ত্রে বিদ্যমান, এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

শাস্ত্রের বিষয়-বস্তু ও ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছিল—ভাষার পরিবর্তন অজ্ঞাত-সারেই হইয়াছিল। ভাষার প্রাচীন নামটি কিন্তু লুপ্ত হয় নাই। জৈন শাস্ত্র বা আগমের অন্তর্গত প্রাচীনতম অংশ সূত্র-গ্রন্থে একাধিক স্থলে উক্ত আছে যে, মহাবীরস্বামী 'অর্ধমাগধী' বা 'অদ্ধমাগহী' ভাষায় উপদেশ দিতেন (সমবায়ঙ্গ-সুয় বা সমবায়াঙ্গ সূত্র, ৯৮:—'ভগবং চ ণং অদ্ধমাগহীএ ভাসাএ ধম্মং আইক্‌খই'—এবং ভগবান্ অর্ধমাগধী ভাষায় ধর্ম প্রচার করিলেন; ওববাইয়-সুয় বা ঔপপাতিক

সূত্র ৫৬ :—'তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে অর্ধমাগহাএ ভাসাএ ভাসই' —তদনন্তর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর অর্ধমাগধী ভাষায় কথা বলেন)। ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃতকে মূলভাষা বা দেবভাষা বলিতেন ; তদনুরূপ সিংহলের বৌদ্ধেরা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষা পালিকেও মূলভাষা বলিতেন ; এবং জৈনেরাও মহাবীরস্বামীর মাতৃভাষা ও উপদেশের ভাষা এই অর্ধমাগধীকে মূলভাষা, ঋষিদের ভাষা বলিতেন ; মহাবীরস্বামীও তাঁহার ব্যবহৃত ভাষার মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য তাঁহার আগম-সূত্রেই বলিয়া গিয়াছেন—মহাবীরস্বামী এই আর্য্যভাষা অর্ধমাগধীতে কথা কহিতেন—যাহারা অর্ধমাগধী বলে ও ব্রাহ্মীলিপিতে লিখে তাহারাই আর্য্য —কিন্তু অর্ধমাগধীর এবং মহাবীরস্বামীর এমনই গুণ যে, যে-কোনও প্রাণী এই ভাষায় উপদেশ শুনিত, সে আর্য্যই হউক আর অনার্য্যই হউক, দ্বিপদই হউক আর চতুষ্পদই হউক, বন্য মৃগ বা গৃহপালিত পশু, অথবা পক্ষী বা সরীসৃপ, যাহাই হউক না কেন, হিত-শিব-সুখদ আপন আপন ভাষায় সে উপদেশ বুঝিতে পারিত। ('সাবিয় ণং অদ্ধমাগহা ভাসা, তেসিং সব্বেসিং আরিয়-ম-অণারিয়াণং অপ্পণো সুভাসাএ পরিণামেণং পরিণমই'—ওববাইয়-সুয় ৫৬ ; 'সাবি য় ণং অদ্ধমাগহী ভাসা ভাসিজ্জমাণী তেসিং সব্বেসিং আরিয়-ম্-অণারিয়াণং দুপ্পয়-চউপ্পয়-মিয়-পসু-পক্খি-সরীসিবাণং অপ্পপ্পণো হিয়-সিব-সুহদায় ভাসত্তাএ পরিণমই—সমবায়ঙ্গ সুয়, ৯৮)। জৈন পণ্ডিত নমিসাধু (খ্রীঃ ১০৬৯) রুদ্রট-কৃত কাব্যালংকারের ২.১২ শ্লোকের টীকায় প্রাকৃত শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে 'প্রাকৃত' অর্থে এমন ভাষা, যাহার প্রকৃতি বা মূল হইতেছে—ব্যাকরণ পড়ে নাই, জগতের এমন সমস্ত প্রাণীর সহজ ভাষা , অথবা 'প্রাক্ কৃত' বা সর্ব-প্রথম সৃষ্ট ভাষা বলিয়াই 'প্রাকৃত' এই নাম ; এই বলিয়া তিনি বচন তুলিয়াছেন,—আর্ষ-আগমে অর্থাৎ জৈন শাস্ত্রে যে অর্ধমাগধা নামে (প্রাকৃত) ভাষা পাওয়া যায় তাহাই দেবতাদের ভাষা, সুতরাং মূলভাষা ('সকলজগজ্জন্তূনং ব্যাকরণাদিভিরণাহিতসংস্কারঃ সহজো বচনব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ। তত্র ভবং সৈব বা প্রাকৃতম্। "আরিসবয়ণে সিদ্ধং দেবাণং অদ্ধমাগহা বাণী" ইত্যাদি বচনাদ্বা প্রাক্‌পূর্বং কৃতং প্রাকৃতং, বালমহিলাদি-সুবোধং সকলভাষানিবন্ধন-ভূতং বচনমুচ্যতে')। হেমচন্দ্র, চণ্ড প্রভৃতি প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ জৈন শাস্ত্রের অর্ধমাগধীকে 'আর্ষ্য' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

'অর্ধমাগধী' নামটি কত প্রাচীন, তাহা বলা যায় না। ইহা মহাবীরস্বামীর সময়ের হইতে পারে; তাঁহার অব্যবহিত পরের সময়ের, অথবা দেবর্ধিগণির কিছু পূর্বেকার কালেরও হইতে পারে। নমেটি তুলনামূলক ; মাগধীর স্বরূপ

অল্প-বিস্তর স্থিরীকৃত বা নির্ণীত হইবার পরে এই নাম দেওয়া হইয়াছিল নিশ্চয়ই। সাধারণতঃ ব্যাকরণকারদের মত-ই এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে গৃহীত হয়— অর্ধমাগধী ভাষায় মাগধীর পূর্ণ লক্ষণ পাওয়া যায় না বলিয়াই ইহার এই নাম। অভয়দেব-কৃত সমবায়ঙ্গ-সূত্রের টীকায় উক্ত হইয়াছে—'অর্ধমাগধী ভাষা যস্যাং র-সোর্ ল-শৌ মাগধ্যাম্, ইত্যাদিকং মাগধভাষালক্ষণং পরিপূর্ণং নাস্তি'—র ও স-য়ের যথাক্রমে ল ও শ হওন প্রভৃতি মাগধীভাষা-লক্ষণ যাহাতে পরিপূর্ণ রূপে মিলে না)। কিন্তু এই অমিল ধরিয়া 'অর্ধশৌরসেনী' নামও হইতে পারিত। শ্রীযুক্ত বনারসী দাস জৈন তাঁহার Ardhamagadhi Reaeer গ্রন্থে বলিয়াছেন (পৃঃ xli, xl.) যে, অর্ধমাগধী প্রথম হইতেই মাগধীর আধারে গঠিত মিশ্রভাষা ছিল, আজকাল পাঞ্জাবে অমৃতসর অঞ্চলে ব্রাহ্মন পণ্ডিত এবং শিখ গ্রন্থী ও সাধুদের কেহ কেহ ধর্মোপদেশ দিবার সময়ে যেমন হিন্দী-মিশাল পাঞ্জাবী বা পাঞ্জাবী-মিশাল হিন্দী ব্যবহার করেন, তেমনি সম্ভবতঃ মহাবীরস্বামী মগধের ভাষার সহিত মধ্যপ্রদেশের ও অন্য প্রান্তের বহুল-প্রচলিত ভাষাবলীর কিছু কিছু মিশ্রণ করিয়া বহুজন-বোধ্য মিশ্রভাষায় উপদেশ দিতেন, এবং মাগধীর সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধ ছিল বলিয়া এই ভাষার নাম হয় "অর্ধমাগধী" বা অধা-মাগধী। অবশ্য এইরূপ ভাষার মিশ্রণ ভারতবর্ষে বিরল নহে - ভোজপুরী, পূর্বী-হিন্দী, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষার সহিত সাধু-হিন্দীর মিশ্রণ প্রচুর দেখা যায়।

আধুনিক ইউরোপীয় ভারত-বিদ্যাবিদ্‌গণের মতে, শূরসেন বা মধ্যদেশ (দিল্লী-মীরাট-মথুরা-কনোজ অঞ্চল) এবং মগধদেশের মধ্যস্থিত আর্য্যাবর্তের অংশে—অযোধ্যা-অঞ্চলে—কথিত লোক-ভাষার উপরে অর্ধমাগধী প্রতিষ্ঠিত। সুপ্রাচীন-কালে, বুদ্ধ ও মহাবীরের পূর্বে, উত্তর-ভারতে আর্য্য লোক-ভাষার তিনটি রূপভেদ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়—(১) উদীচ্য—পশ্চিম ও উত্তর পাঞ্জাবে, (২) মধ্যদেশীয়, ও (৩) প্রাচ্য। ক্রমে (৩) প্রাচ্য ভাষার দুই রূপভেদ দাঁড়াইয়া যায়—(৩। ক) পশ্চিমী প্রাচ্য—ইহা কোশলের ভাষা, এবং (৩। খ) পূর্বী প্রাচ্য—মগধের ভাষা। প্রাচ্যের এই দুই প্রকার-ভেদ অশোকের যুগ হইতেই ব্রাহ্মী লিপির লেখে দেখা যায়। (৩। ক) ও (৩। খ)-র মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল এই—সংস্কৃতের 'শ, ষ, স' (৩ | ক)-তে দন্ত্য 'স'-রূপে মিলে, কিন্তু (৩ | খ)-তে তালব্য 'শ'-রূপে। গির্নার, মানসেহ্‌রা, শাহবাজগঢ়ী ও কতকটা কালসীর ভাষা বাদে, অশোকের অনুশাসনাবলী (৩ | ক) ভাষাতে রচিত। অশ্বঘোষের সংস্কৃত নাটকে (৩ | ক) ও (৩ | খ) দুই-ই পাওয়া যায়। পরে (৩ | ক) অর্ধমাগধী এবং

(৩ | খ) মাগধী প্রাকৃতে পরিণত হয়; বিষয়টি নিম্নলিখিত বংশচিত্র হইতে পরিস্ফুট হইবে :—
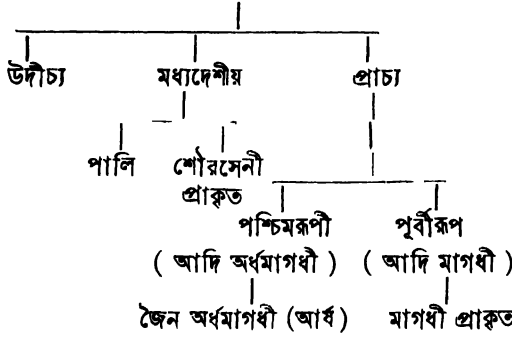
শৌরসেনী প্রাকৃতের বিকারে আধুনিক ব্রজ-ভাষা (মথুরা অঞ্চলে প্রচলিত), কনোজী, বুন্দেলী, হিন্দুস্থানী, সাধু-হিন্দী প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। অর্ধমাগধীর বিকারে অবধী প্রভৃতি "পূর্বী"-হিন্দী, এবং মাগধীর বিকারে, বাঙ্গালা, অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী হইয়াছে। বুদ্ধদেবের ভাষা, মহাবীরস্বামীর মতো এই প্রাচ্য প্রাকৃতই ছিল - খুব সম্ভব ইহার পশ্চিমী রূপ; পরে তাঁহার বাণী বিভিন্ন কথ্য ভাষায় ও সংস্কৃতে অনূদিত হয়। পালিভাষা এইরূপ একটি অনূদিত রূপের ভাষা মাত্র, এবং ইহা মধ্যদেশীয় ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত—প্রাচ্য অর্থাৎ মাগধী বা অর্ধমাগধীর উপরে নহে।*

অর্ধমাগধী ভাষার ভালো বা প্রাচীন ব্যাকরণ নাই। ভরতনাট্যশাস্ত্রে (খ্রীষ্টীয় ২য় শতক?) অর্ধমাগধীর উল্লেখ আছে মাত্র (১৭।১৪), এবং এইটুকু বলা হইয়াছে যে ভৃত্য, রাজপুত্র (অর্থাৎ রাজপুত বা সিপাহী) এবং শ্রেষ্ঠী অর্থাৎ বাণিয়ারা নাটকে অর্ধমাগধী বলিবেন। কিন্তু এক অশ্বঘোষ-রচিত নাটক (খ্রীষ্টীয় ১ম শতক) ভিন্ন অন্যত্র অর্ধমাগধী-লক্ষণাক্রান্ত প্রাকৃত পাওয়া যায় না। বররুচির 'প্রাকৃত-প্রকাশ' গ্রন্থে মহারাষ্ট্রী, পৈশাচী, মাগধী ও শৌরসেনীর কথা আছে, কিন্তু অর্ধমাগধীর উল্লেখও নাই। বররুচির মূল গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের হইতে পারে। চণ্ড (আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) যে প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি 'আর্ষ' প্রাকৃতেরই বর্ণনা দিয়াছেন; কিন্তু এই 'আর্ষ'

* দ্রষ্টব্য The Origin and Development of the Bengali, Language, Part 1, Introduction, pp. 54-59.

প্রাকৃত জৈন আগমের প্রাকৃত হইতে বহু বিষয়ে ভিন্ন; হর্নলে (Hoernle) মনে করিয়াছিলেন যে মহারাষ্ট্রী ও অর্ধমাগধী মিলাইয়া 'আর্ষ' উদ্ভূত হয়; তিনি চণ্ডের 'আর্ষ' প্রাকৃতকে অর্ধমাগধীর প্রাচীনতর রূপভেদ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। চণ্ডের ব্যাকরণে পরবর্তী জৈন প্রাকৃতের মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, সব রকম প্রাকৃতের মিশ্রণ দেখা যায়। রুদ্রট (অষ্টম-নবম শতক), রাজশেখর, ভোজ ও ধনঞ্জয় (তিনজনই দশম শতকের)—ইঁহারা কেহই অর্ধমাগধীর নামও করেন নাই। হেমচন্দ্র (১০৮৮-১১৭২) স্বীয় ব্যাকরণের প্রাকৃত-বিষয়ক অংশে অর্ধমাগধীর আলোচনা করেন নাই—কেবল একটি সূত্রে এইটুকু বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, আর্ষ প্রাকৃতে রূপ-বাহুল্য বিদ্যমান।

জৈন আগমের ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া, নূতন করিয়া অর্ধমাগধীর ব্যাকরণ গড়িয়া তুলিতে হয়। পিশেল্ (Pischel) তাঁহার বিরাট প্রাকৃত ব্যাকরণে এই প্রয়াস করিয়াছিলেন। লাহোরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনারসী দাস জৈন আগমের ভাষা অলোচনা করিয়া অর্ধমাগধীর একখানি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। অর্ধমাগধী গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভাষা সর্বত্র এক নহে; ব্যাকরণ-হিসাবে আয়ারঙ্গ-সুয় (আচারাঙ্গ-সূত্র), সুয়-গড়ঙ্গ-সুয় (সূত্রকৃতাঙ্গ-সূত্র) প্রভৃতি একাদশ অঙ্গগুলি মূল অর্ধমাগধীর রূপ অনেকটা বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু দ্বাদশ উপাঙ্গ, ছেদ-সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থগুলির ভাষা মহারাষ্ট্রী শৌরসেনী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাকৃতের সহিত একটু বেশি মিশ্রিত।

[ক] অর্ধমাগধী প্রাকৃতের লক্ষণ

[১] ধ্বনি- ও বর্ণ-বিষয়ক

সাধারণ প্রাকৃতের মতো 'ঋ ৠ ঌ' নাই; 'এ ও'-র হ্রস্ব রূপও আছে এবং হ্রস্ব 'এ ও' বহুশঃ 'ই উ' রূপে লিখিত হয়। শব্দমধ্যে একক অবস্থিত 'ক, গ, চ, জ, ত, দ' যেখানে লুপ্ত হয়, লোপের স্থান পূরণ করিয়া প্রায়শঃ 'য়' আসে; এই 'য়'-কে 'য়-শ্রুতি' বলে, এবং য-শ্রুতি হইতেছে অর্ধমাগধী প্রাকৃতের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য, যথা :—'শোক—সোঅ—সোয়; নগর—নঅর —নয়র; মৃগ—মিঅ —মিয়; কাচ—কাঅ—কায়; বচন—বঅণ—বয়ণ; রাজা—রায়া; রজনী —রয়ণী; শত—সয়; পাদ—পায়', ইত্যাদি। মহাপ্রাণ বর্ণগুলি বহুস্থলে অবিকৃত দেখা যায়। 'ট, ড'-স্থানে 'ড', 'ঠ, ঢ'-স্থানে 'ঢ', 'প, ব'-স্থানে অন্তঃস্থ 'ব' পাওয়া যায়। অর্ধমাগধীতে 'র, ল' দুই-ই বিদ্যমান, কিন্তু মাগধীতে কেবল 'ল', এবং মাগধীতে কেবল তালব্য 'শ' আছে, কিন্তু অর্ধমাগধীতে মাত্র

দন্ত্য 'স'—এই দুই বিষয়ে এই দুই প্রকার প্রাকৃতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অর্ধমাগধীতে মূর্ধন্য 'ল' (বৈদিক 'ল') নাই।

সংযুক্ত বর্ণের পরিণতি সাধারণ প্রাকৃতের ন্যায়,—যথাসম্ভব সমীকরণ দেখা যায়। বহুস্থলে আবার আধুনিক ভারতীয়-আর্য্য ভাষার মতো দ্বিরবস্থিত ব্যঞ্জনের একটির লোপ ও পূর্বস্বরের দীর্ঘীকরণ দেখা যায়। যথা—'শীর্ষ—সিস্‌স সীস ; দীর্ঘ—দিগ্‌ঘ—দীঘ—দীহ ; জিহ্বা—জিব্‌ভা—জীভা—জীহা'। প্রাকৃতে এইরূপ 'ভাষা'-র অনুকারী পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন। অর্ধমাগধীতে 'ও' বহুস্থলে 'য়'-তে (য়-শ্রুতিতে) পর্য্যবসিত হইয়াছে, যথা—'আত্মা—অত্তা—আতা—আআ—অয়া ; সূত্র—সুত্ত—সুত—সূঅ—সূয় , গাত্র—গত্ত গাত—গাঅ—গায় ; রাত্রি—রত্তি—রাতি—রাই, রাঈ, সপ্ততি— সত্তডি, সত্তরি—সতরি—সয়রি, সয়রী' ; ইত্যাদি। এই প্রকার দ্বিত্ব 'ত্ত'-এর লোপ অর্ধমাগধীর ধ্বনি-প্রগতির একটি বিশিষ্ট ও অ-ব্যাখ্যাত রহস্য। সন্ধিতে দুই স্বরের মধ্যে অর্ধমাগধীতে অনেক সময়ে ম-কারের আগম দেখা যায় ; যথা—'অন্ন+অন্ন= অন্নমন্ন (অন্য+অন্য), দীহ+অদ্ধা=দীহমদ্ধা (দীর্ঘ+অধ্বন্) ; গোণ+আই= গোণমাই (=গবাদি) ; আহার+আইণি=আহারমাইনি (আহারাদীনি)'।

[২] রূপ বা সুপ্‌-তিঙ্‌-বিষয়ক

শব্দরূপ—অ-কারান্ত পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনে, '-এ' এবং '-ও', উভয় প্রকার প্রত্যয় মিলে ; মাগধীতে মাত্র '-এ' ; সংস্কৃত 'দেবঃ'—অর্ধমাগধী 'দেবে, দেবো'। অর্ধমাগধীর বিশিষ্ট রূপ হইতেছে এইগুলি ;—চতুর্থীতে ষষ্ঠীর প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, তদ্ব্যতীত একবচনে সংস্কৃত '-আয়' প্রত্যয়ের অনুরূপ '-আএ' প্রত্যয় মিলে ; সংস্কৃত 'দেবায়', অর্ধমাগধী 'দেবাএ, দেবস্‌স'। পঞ্চমীতে একবচনে 'দেবাৎ, দেবতঃ'='দেবা, দেবাও', বহুবচনে 'দেবেভ্যঃ'='দেবহিংতো'। সপ্তমীর একবচনে '-এ' ও '-অংসি' প্রত্যয়দ্বয় আছে, '-অংসি' অর্ধমাগধীর নিজস্ব প্রত্যয় ; 'দেবে'=দেবে, 'দেবংসি'—সর্বনাম সপ্তমীর একবচনের '-অস্মিন্' প্রত্যয়ের বিশেষ্যের রূপ হিসাবে প্রসারের ফলে ইহার উদ্ভব।

অন্য শব্দরূপের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই, প্রায়শঃ অন্য প্রাকৃতের অনুরূপ। বিশেষণ ও বিশেষণের তারতম্যের বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নাই—যথারীতি প্রাকৃতানুমোদিত, এবং অর্ধমাগধীর ধ্বনিবিকারের অনুমোদিত পরিবর্তন দৃষ্ট হয়।

সংখ্যাবাচক কতকগুলি রূপ লক্ষণীয় ; 'এক=এগ, এক্ক ; দ্বি=দো ;

একাদশ = এক্কারস, ইক্কারস ; দ্বাদশ = দুবালস (বিশুদ্ধ অর্ধমাগধী রূপ), বারস (গুজরাট অঞ্চলের প্রাকৃত হইতে লব্ধ রূপ) ; পঞ্চদশ = পন্নরস ; পঞ্চবিংশতি = পণবীসং ; উনবিংশতি = এগুণবীস, অউণবীস(ই) (তদ্রূপ কেবল উন-স্থলে 'একোন = এগূণ') ; ইত্যাদি। ক্রমসংখ্যাবাচক—'প্রথম = পঢম, পঢমিল্ল ; দ্বিতীয় = বিইয়, বীয়, দোচ্চ ; তৃতীয় = তইয়, তচ্চ' ; ইত্যাদি। '-ম' প্রত্যয় খুবই ব্যবহৃত হয়। ½ 'অড্ঢ, অদ্ধ' ; ১½ = 'অড্ঢাইজ্জ' ; ৩½ 'তদ্ধুড্ঢ'—লক্ষণীয়। গণিত সংখ্যা জানাইতে '-খুত্ত' প্রত্যয় (= সংস্কৃত 'কৃত্বঃ')অতিশয় সাধারণ।

সর্বনামে বিশেষ কতকগুলি রূপ আছে ; 'অহম্' = 'হং, অহং' ; 'ত্বম' = 'তুমং তং' ; 'যুষ্মে বা যুয়ং' = 'তুম্হে, তুব্ভে' ; স্ত্রীলিঙ্গে 'তৎ' শব্দের প্রাতিপদিক রূপ 'তী' , -এগুলি লক্ষণীয়।

ক্রিয়াপদ—আদি ভারতীয়-আর্য্য ভাষার (অর্থাৎ সংস্কৃতের) এই কয়টি ল-কার বা কাল-দ্যোতক রূপ বিদ্যমান :—(১) লট্ বা বর্তমান ; (২) আগম-বিরহিত লুঙ্ ও লঙ্-এর মিশ্রিত বিকার = অতীত ; (৩) লৃট্ বা ভবিষ্যৎ—লৃট্-এ অনেকগুলি অনিয়ন্ত্রিত রূপ বিদ্যমান দেখা যায় ; (৪) লোট্ বা অনুজ্ঞা ; এবং (৫) বিধিলিঙ্—ক্রিয়ার ইচ্ছা বা দ্যোতক প্রকার-ভেদ ;—এই কয়টি মাত্র পাওয়া যায়। লুঙ্ ও লঙ্-কে মিলাইয়া গঠিত যে অতীত কাল রূপ এই প্রাকৃতে ব্যবহৃত হয়, তাহা এই প্রাকৃতের প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। লিট্-এর প্রতিরূপ নাই। অতীতের ক্রিয়ার জন্য ক্ত-প্রত্যয়যুক্ত রূপ (নিষ্ঠা) বহুশঃ কর্মণি ও কর্তরি প্রযুক্ত হয় ; যথা—'সঃ গতঃ' = 'সে গএ' বা 'সো গও' ; 'তেন অন্নং খাদিতম্' = 'তেণং অণ্ণং খাইয়ং'। আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদে পার্থক্য নাই।

ণিজন্ত রূপ বিদ্যমান ; কিন্তু অনেক স্থলে ণিজন্ত, এবং সাধারণ ক্রিয়ার রূপে মিশ্রণ বা একীকরণ ঘটিয়াছে। ণিজন্তের প্রত্যয় '-ব' বা '-আব'—সংস্কৃত '-আপ' হইতে, অণিজন্তার্থক বহু ধাতুতে প্রসারিত হইয়াছে।

কর্মবাচ্যের ক্রিয়া কেবল লট্-তেই পাওয়া যায় , '-ইজ্জ' প্রত্যয় দ্বারা (এবং ক্বচিৎ কর্মবাচ্যের মূল প্রত্যয় '-য়'-র সহিত মিলিত হইয়া ধাতুর ব্যঞ্জন বর্ণের সমীকরণ দ্বারা কর্মবাচ্য দ্যোতিত হয় ; যথা—'সুণই—সুণিজ্জই' (= শৃণোতি—শ্রূয়তে) , 'লহই—লব্ভই' (= লভতে—লভ্যতে) ; ইত্যাদি।

'শতৃ, শানচ্, ক্ত, ক্তবৎ, তব্য, অনীয়, য' প্রভৃতি ক্রিয়া-জাত বিশেষণ-দ্যোতক প্রত্যয়গুলির বিকৃতিময় রূপ বহুল প্রচলিত। শতৃ এবং শানচ্ উভয়-ই এক-ই ধাতুর উত্তর শতৃ-অর্থে প্রযুক্ত হয় ; যথা—'চিট্ঠন্ত, চিট্ঠমাণ = তিষ্ঠন্ ; চরন্ত,

চরমাণ'; ইত্যাদি। এই প্রয়োগ প্রাকৃতের সাধারণ নিয়মের মতো, তবে কতকগুলি রূপের বৈশিষ্ট্য আছে। 'ক্তাচ্, যপ্' প্রত্যয়দ্বয় (অসমাপিকা ক্রিয়া-দ্যোতক)—ইহাদের নানা প্রতিরূপ অর্ধমাগধীতে ব্যবহৃত হয়; যথা, '-ইত্তা, -এত্তা (গচ্ছিত্তা = গত্বা, করেত্তা = কৃত্বা),-ইত্তাণং (পাসিত্তাণং = * পশ্যিত্বান), -উণং, -ইউণং (দাউণং = দত্তা), -ইত্তু (বন্ধিত্তু = বন্ধয়িত্বা)'; ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি বিশিষ্ট রূপও মিলে; যথা 'কিচ্চা (কৃত্বা + -কৃত্য), নচ্চা (= জ্ঞাত্বা + -জ্ঞায়); চিচ্চা (= ত্যক্ত্বা + -ত্যজ্য); নিসম্ম (= নিশম্য); পরিণায় (= পরিজ্ঞায়)', ইত্যাদি।

'-তুমুন' প্রত্যয়ের স্থানে 'ইওএ, -উং, -ইউং', যথা—'করিওএ, কাউং (= কর্তুম্); গচ্ছিওএ (= গন্তুম্); পাসিউং (= *পশ্যিতুম্)'; ইত্যাদি।

কৃৎ ও তদ্ধিত—অন্য প্রাকৃতের অনুরূপ। বিশেষ লক্ষণীয়—'-ইল্ল' প্রত্যয়, স্বার্থে বিশেষণের সহিত ব্যবহৃত হয়; যথা—'দাহিণ—দাহিণিল্ল (= দক্ষিণ); বাহির—বাহিরিল্ল (= বাহ্য); গাম—গামিল্ল, গামেল্লগ (= গ্রামিল, গ্রামিলক = গ্রাম্য)'; ইত্যাদি।

[৩] বাক্য-রীতি-বিষয়ক

সাধারণতঃ গদ্য বাক্য-রীতি হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক আর্য্য ভাষার অনুরূপ; কর্তা বাক্যের প্রথমে, ও ক্রিয়া শেষে বসে। পদ্যে বাক্যস্থ পদের কোনও নির্দিষ্ট ক্রম নাই।

অর্ধমাগধীর নিদর্শন:

[ক] গদ্য—বিবাগসুয় (বিপাকসূত্র) হইতে—

"তেণং কালেণং তেণং সময়েণং মিয়গামে (= মৃগগ্রাম) ণামং ণয়রে (= নগর) হোত্থা (= ছিল)। তস্স ণং মিয়গামস্স ণয়রস্স বহিয়া (= বাহিরে) উত্তরপুরত্থিমে (= উত্তরপুরস্থ) দিসোভাএ (= দিগ্ভাগে) চংদপায়বে (= চন্দনপাদপ) ণামং উজ্জাণে (= উদ্যান) হোত্থা। তত্থ ণং সুহমস্স জক্খস্স (= সুধর্ম যক্ষের) জক্খায়য়ণে (= যক্ষায়তন, মন্দির) হোত্থা। তত্থ ণং মিয়গামে ণয়রে বিজএ (= বিজয়নাম) রায়া (= রাজা) পরিবসই (বাস করেন)। তস্স ণং বিজয়স্স খত্তিয়স্স মিয়া (= মৃগা) ণামং দেবী (= রাণী) হোত্থা। তস্স ণং বিজয়স্স খত্তিয়স্স পুত্তে (= পুত্র), মিয়াএ দেবীএ অত্তএ (= আত্মজ) মিয়াপুত্তে (= মৃগাপুত্র) ণামং দারএ (= দারক, বালক) হোত্থা, জাইঅংধে (= জাত্যন্ধ), জাইমূএ (= মূক),

জাইবহিরে (=বধির), জাইপংগুলে, হুংডে (=বিকৃতরূপ) য় (-চ), বায়বে (=বাতযুক্ত) য়। ণত্থি ণং তস্‌স দারগস্‌স হৃত্থা বা পায়া (=পাদ) বা কন্না (=কর্ণ) বা অচ্ছী (=চোখ) বা ণাসা বা, কেবলং অংগোবংগাণং (=অঙ্গপ্রত্যঙ্গের) আগিইমিত্তে (=আকৃতিমাত্র) হোত্থা। তথ ণং সা মিয়া দেবী তং মিয়াপুত্তং দারগং রহস্‌সিয়ংসি (=গোপন) ভূমিঘরংসি (ভূমিগৃহে) রহস্‌সি এণং (=গোপনে) ভত্তপাণেণং (=ভাত ও জল দ্বারা) পডিজাগরমাণী বিহরই ॥"

[খ] পদ্য—সূয়গডংগস্‌সুয় (সূত্রকৃতাঙ্গ-সূত্র) হইতে—

"গন্থং বিহায় ইহ সিক্‌খমাণো উট্‌ঠায় সুবম্ভচেরং বসেজ্জা। উবায়কারী বিণয়ং সুসিক্‌খে জে ছেয়এ বিপ্‌পমায়ং ন কুজ্জা ॥ নেতা জহা অন্ধকারংসি রাও মগ্‌গং ন জাণাতি অপস্‌সমাণে সে সূরিয়স্‌স অব্‌ভুগ্‌গমেণং মগ্‌গং বিয়াণাই পাগসিয়ংসি। এবং তু সেহে হি অপুট্‌ঠধম্মে ভদ্দং ন জাণাই অবুজ্‌ঝমাণে। সে কোবি এ জিণবয়ণেণ পচ্ছা, সূরোদয়ে পাসতি চক্‌খুণেব ॥"

[খ] অর্ধমাগধী সাহিত্য

শ্বেতাম্বর জৈন আগমের বাহিরে অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষায় লেখা অন্য সাহিত্য নাই। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকগণের মত অনুসারে অশোকের পূর্বী-প্রাকৃতে লেখা অনুশাসনাবলী, প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা অন্য কতকগুলি লেখ (ভারহুৎ সাঁচী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত) এবং অশ্বঘোষ-রচিত নাটকের তালপত্রের পুঁথির মধ্য-এশিয়াতে প্রাপ্ত ছিন্ন কতকগুলি অংশে দৃষ্ট দুই চারি ছত্র প্রাকৃত বাক্য—এগুলিকেও প্রাচীন অর্ধমাগধী বলিয়া ধরিতে হয়। প্রচলিত আগম বা সিদ্ধান্ত বা শ্বেতাম্বর জৈনশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ এই—

[১] দ্বাদশ অঙ্গ, তন্মধ্যে শেষটি বিলুপ্ত

(১) আচারাঙ্গ (আয়ারংগ)—ভিক্ষুগণের আচারবিষয়ক গ্রন্থ। দুই খণ্ডে বিভক্ত প্রথম খণ্ডই প্রাচীনতর। এই গ্রন্থের প্রাচীনতম টীকা রচনা করেন শীলাঙ্কাচার্য্য (খ্রীঃ নবম শতক)

(২) সূত্রকৃতাঙ্গ (সূয়গড়ংগ)—জৈন এবং জৈনেতর দার্শনিক মতের বিচার। এখানি অতি দুরূহ গ্রন্থ। প্রাচীনতম টীকা—শীলাঙ্কাচার্য্য-রচিত। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হর্ষকুলকৃত একটি টীকাও আছে। (১) ও (২)-তে প্রাকৃত, অর্ধমাগধী গদ্য ও পদ্যের প্রাচীনতম ও শুদ্ধতম নিদর্শন পাওয়া যায়।

(৩) স্থানাঙ্গ (ঠাণংগ)—দর্শনবিষয়ক দুরূহ গ্রন্থ। দশ 'ঠাণ' (স্থান) অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত।

(৪) সমবায়াঙ্গ (সমবায়ংগ)—দর্শনবিষয়ক।

(৫) বিবাহ-প্রজ্ঞপ্তি (বিয়াহপন্নত্তি) বা ভগবতীসূত্র—৪১ শতক (সম) -তে বিভক্ত। ১-২০ শতকে মহাবীর স্বামী ও তচ্ছিষ্য ইন্দ্রভূতির কথোপকথন, এবং ২১-৪১ শতক মহাবীর স্বামীর জীবন-সংক্রান্ত আখ্যায়িকায় পূর্ণ।

(৬) জ্ঞাতাধর্মকথা (ণায়াধম্মকহাও) ধর্মোপাখ্যানাবলী।

(৭) উপাসকদশা (উবাসগদসাও)- মহাবীরস্বামীর দশজন গৃহী শিষ্যের সম্বন্ধে উপাখ্যান। প্রথম পরিচ্ছেদে গৃহীর জীবনের আদর্শ বর্ণিত।

(৮) অন্তকৃতদশা (অন্তগডদসাও) জীবন্মুক্ত কতিপয় মহাপুরুষের চরিত্র।

(৯) অনুত্তরোপপাতিকদশা (অনুত্তরোববাইয়দসাও)—অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ—সিদ্ধপুরুষ রচিত।

(১০) প্রশ্নব্যাকরণানি (পণ্হাবাগরণাইং)—এই গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ভাষাও অনেকাংশে পৃথক্। সংসার ও কর্মনিবৃত্তি-বিষয়ক।

(১১) বিপাকসূত্র (বিবাগ-সূয়) কর্মবিপাক অর্থাৎ পাপপুণ্যের ফলবিষয়ক।

(১২) দৃষ্টিবাদ (দিট্ঠিবায়)—অধুনা লুপ্ত।

[২] দ্বাদশ উপাঙ্গ (উবংগ)—এগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক :

(১) ঔপপাতিক (ওববাইয়)—মহাবীরস্বামীর চম্পানগরে আগমন, রাজা কুণিয়ের ও অন্যান্য জনগণের সমক্ষে উপদেশ, বিভিন্ন চরিত্রের নরনারীর পারলৌকিক অবস্থা (উপপাত) সম্বন্ধে ইন্দ্রভূতির প্রশ্ন।

(২) রাজপ্রশ্নীয় (রায়পসেনইয়)—সূর্য্যাভা নামক দেবযোনির কথা, এবং রাজা প্রদেশী ও কেসিকুমারের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার।

(৩) জীবাজীবাভিগম—জীব ও অজীব বিষয়ে বিচার। ইহাতে জম্বুদ্বীপের বর্ণনা আছে।

(৪) প্রজ্ঞাপনা (পন্নবণা)—জীব-বিষয়ে বিচার।

(৫) জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি (জম্বুদ্দীব-পন্নত্তি)—জম্বুদ্বীপের বর্ণনা—অতীত ও ভবিষ্যৎ পুরাণের বর্ণনা

(৬) চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি (চংদপন্নত্তি) ও (৭) সূর্য্য-প্রজ্ঞপ্তি (সূরিয়পন্নত্তি) —জ্যোতিষবিষয়ক।

(৮) কল্পিকা (কপ্পিয়া)—রাজা সেণিয়ের পুত্রগণের আখ্যান।

(৯) কল্পাবতংসিকা (কপ্পাবদংসিয়াও)—রাজা সেণিয়ের পৌত্রগণের কথা।

(১০) পুষ্পিকা (পুপ্‌ফিয়াও)—মহাবীরস্বামীর সেবক কতকগুলি দেব ও দেবীর পূর্ব-জন্মের চরিত্র।

(১১) পুষ্পচূলিকা (পুপ্‌ফচূলআও)—(১০)এর-মতো।

(১২) বৃষ্ণি-দশা (বণ্‌হিদসাও)—অরিষ্টনেমি কর্তৃক দ্বাদশ বৃষ্ণি-বংশীয় রাজপুত্রকে দীক্ষাদানের কথা।

[৩] ছেদসূত্র—

এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির তাদৃশ প্রচার নাই, জৈন যতিগণের মধ্যেই এগুলি মুখ্যতঃ নিবদ্ধ। এগুলি ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি বিষয় লইয়া। দুই তিনখানি ইউরোপে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৪] মূল সূত্র—

(১) উত্তরাধ্যয়ন (উত্তরজ্‌ঝয়ণা)—অর্বাচীন গ্রন্থ, মহাবীরস্বামীর শেষ উপদেশ-বিষয়ক, আচার্য্য ভদ্রবাহু কর্তৃক খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে রচিত বলিয়া কথিত। গ্রন্থটি ৩৬ অধ্যায়ে সমাপ্ত, প্রায় সমস্তটাই পদ্যে। উপদেশ, চরিত, এবং নানা মতবাদ বিষয়ক। অনেকগুলি উপাখ্যান ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রেও পাওয়া যায়। বহু শ্লোক মহাভারত ও বৌদ্ধ ধম্মপদ এবং জাতকের শ্লোকের সঙ্গে মিলে।

(২) আবশ্যক (আবস্‌সয়)—ভিক্ষু ও গৃহী উভয় শ্রেণীর জৈনধর্মের পাঠের জন্য শ্লোকের সংগ্রহ।

(৩) দশবৈকালিক (দসবেয়ালিয়) - আচারাঙ্গের আধারের উপরে রচিত—ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আচার-বিষয়ক।

(৪) পিণ্ডনির্য্যুক্তি (পিণ্ডণিজ্জুত্তী)—যতি ও সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাগ্রহণ বিধি।

(৫) প্রকীর্ণ (পইন্ন) গ্রন্থ—মুখ্যতঃ যতিদিগের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে রচিত কতকগুলি পুস্তক।

(৬) নন্দীসূত্র—মোক্ষজ্ঞান ও মহাবীরস্বামীর উত্তরকালীন আচার্য্যগণের স্তুতি-বিষয়ক শ্লোক-সংগ্রহ ; জ্ঞান-বিচার, এবং জৈন-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর সূচী।

(৭) অনুযোগদ্বার সূত্র (অণুওগদার)—জৈন ন্যায় এবং নানা বিদ্যা ও প্রকীর্ণ বিষয় লইয়া এই গ্রন্থ।

বিশ্বকোষ,
দ্বিতীয় সংস্করণ,তৃতীয় ভাগ, ১৩৪৪।

'সুহ্মক বাঙ্গলা'

ষট্‌ত্রিংশ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ*

এবারকার বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন পশ্চিম-বাঙ্গলার পশ্চিম-সীমানার প্রত্যন্ত অঞ্চল এই ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক গঠনে এবং ইহার সাম্প্রতিক পরিপোষণে এই অঞ্চলের লক্ষণীয় দান আছে। পশ্চিম-রাঢ়ভূমির অন্তর্গত পশ্চিম-মেদিনীপুরের সংলগ্ন ধলভূম ও সিংহভূম, পশ্চিম-বাঁকুড়ার সংলগ্ন বীরভূম ও মানভূম, এবং উত্তররাঢ়ভূমি বীরভূমের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত বিহার প্রদেশের সাঁওতাল পরগণা ও হাজারীবাগের পূর্ব অংশ—এই সমস্ত অঞ্চল, রাঢ়খণ্ডেরই অধীন -ভাষায় ও সংস্কৃতিতে বৃহৎ-বঙ্গেরই অংশ। বৃহৎ-বঙ্গের অংশ হইলেও, এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার পশ্চিমেই বিহার-প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট-নাগপুর—চাঁইবাসা, কোল্‌হান্, রাঁচি, হাজারীবাগ ও পালামৌ জেলা, এবং মধ্য-প্রদেশের সরগুজা জেলা—এইগুলি লইয়া 'ঝাড়খণ্ড' অঞ্চল—বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত উত্তর-রাঢ়ভূমির এবং "সুহ্ম" বা "সুব্‌ভ" অর্থাৎ দক্ষিণ-রাঢ়ভূমির 'সামন্ত' বা সীমান্ত অথবা প্রত্যন্ত অঞ্চল—সেখানকার মুখ্য আদিবাসীরা বাঙ্গালীর কাছে 'সামন্ত-পাল', 'সামন্তৱাল' বা 'সাঁওঁতাল' (অথবা 'সাঁওতাল') নামে পরিচিত। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, অসুর, বীর-হড়, জুআঙ প্রভৃতি কোল-জাতীয় আদিবাসী, তথা দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর কুড়ুঁখ বা ওরাওঁ এবং মালের্ বা মাল-পাহাড়ী আদিবাসী—ইহারাই এই ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসী—এই ঝাড়খণ্ড ইহাদের নিজের দেশ। আর্য্যভাষী মগহিয়া মৈথিল ভোজপুরী বাঙ্গালী এবং ছত্তিসগঢ়ীদের চাপে পড়িয়া ইহারা এখন নিজেদের মাতৃভূমিতেই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে, এই দেশের প্রতি তাহাদের জাতি- বা বংশ-গত দাবির সম্বন্ধে সচেতন হইয়া, তাহারা এখন ভারত-রাষ্ট্রের মধ্যে 'ঝাড়খণ্ড' নামে একটি স্বতন্ত্র ও নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে পরিচালিত নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন দেখিতেছে—যদিও নানা দিক্ হইতে তাহার পথে অনপনেয় বাধা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, সে অন্য কথা।

* চৈত্র সংক্রান্তি ১৩৭৯, ১৩ই এপ্রিল ১৯৭৩, মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে প্রদত্ত ভাষণ

কোল ও দ্রাবিড (দ্রমিড) জাতিদের দ্বারা অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ড অঞ্চল হইতে আগত রাঢ় অঞ্চলে উপনিবিষ্ট সাঁওতাল প্রভৃতি কোল-জাতির মানুষের প্রভাবে পড়িয়া, পশ্চিম-বীরভূম, বাঁকুড়া, মানভূম বা পুরুলিয়া, এবং পশ্চিম-বর্ধমান ও পশ্চিম-মেদিনীপুর—ঝাড়গ্রাম ও ধলভূম—ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে, ভাষায় ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে, সমগ্র বঙ্গভাষী প্রদেশের এক অখণ্ড অংশ হইয়াও, কতকগুলি বিষয়ে কিছুটা পার্থক্য লাভ করিয়াছে, একটা স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গালীর জীবনচর্য্যা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে, কোল ও দ্রাবিড জাতির এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কিরাত জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত কিছু-কিছু উপাদান আছে, ইহা সর্ববাদিসম্মত। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভাবে আর্য্য-পূর্ব যুগের এই অনার্য্য-ভাষী দ্রমিড, নিষাদ (বা কোল) এবং কিরাত (বা মোঙ্গোল) জাতির মানুষের নিকট হইতে লব্ধ উপাদান যাহা পাওয়া যায়, নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষজ্ঞগণ তাহার অল্প-স্বল্প অনুসন্ধান ও আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। বাঙ্গলা দেশে আর্য্য-ভাষী ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ সমাজের উদ্ভবের পূর্বে, সমগ্র বাঙ্গলা-দেশের মধ্যে দ্রমিড, নিষাদ ও কিরাত জাতির যে প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহার পরে সাম্প্রতিক কালেও আবার এই-সমস্ত জাতির মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গলা-দেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতির, ভাষার, রীতি-নীতির মধ্যে যে অল্প-স্বল্প পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, তাহা পশ্চিম-মেদিনীপুরের মতো সাঁওতাল-অধ্যুষিত স্থানেও পাওয়া যাইবে। এই অঞ্চলের সাঁওতালগণ অবশ্য সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নহে, কিন্তু সংখ্যায় নগণ্যও নহে। বিগত দুই-তিন পুরুষ ধরিয়া স্থানীয় সাঁওতালগণকে আর 'আদিবাসী' পর্য্যায়ের নিতান্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ বলিয়া অবহেলা করিতে পারা যায় না। গ্রামীণ জীবনে, আদিবাসী সাঁওতাল কৃষিজীবী এবং সাধারণ হিন্দু কৃষিজীবী, ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করিবার কিছু নাই, উভয়েরই জীবনের মান এবং জীবনযাত্রা-পদ্ধতি অনেকটা এক-ই হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেবল সাঁওতালগণ অনেকটা বঙ্গভাষী হইয়া গেলেও নিজেদের মধ্যে তাহাদের মাতৃভাষা এখনও ভুলে নাই—মাতৃভাষার চর্চা করিতে বিশেষ ব্যগ্র। কিছুটা বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার প্রভাবে পড়িয়াও, এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনে বাহ্যতঃ অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইলেও, নিজেদের বিশিষ্ট রীতি-নীতি সম্বন্ধে, ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে, এবং নাচ প্রভৃতি ব্যাপারে ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে, সাঁওতাল জনসাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে এখনও বিশেষভাবে সচেতন রহিয়াছে, সাঁওতালী সমাজ-জীবনকে সানন্দ

আগ্রহের সহিত এখনও তাহারা ধরিয়া আছে। যে-সকল সাঁওতাল ধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছে, ইউরোপীয় মিশনারিদের অনুগ্রহে তাহারা যে-সব সুবিধা সুযোগ পাইয়া শিক্ষায় ও কাজ-কর্মের ব্যাপারে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে, অ-খ্রীষ্টান সাঁওতালগণ সংহতি-শক্তির অভাবে এবং প্রবল-শিক্ষিত জনের নেতৃত্বের অভাবে তাহা হইতে অনেক সময়ে বঞ্চিত। তথাপি সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির মর্য্যাদায় এখন গৌরববোধের সহিত প্রতিষ্ঠিত এই-সকল সাঁওতাল—ইঁহাদের মধ্যে নামতঃ খ্রীষ্টানও অনেকে আছেন—উচ্চ শিক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন, বৃত্তি-বিষয়ে সরকারের আনুকূল্য লাভ করিতেছেন, এবং সরকারী চাকুরিতে—বিশেষতঃ কতকগুলি পেশায় (যথা ফৌজী পুলিসে ও সেনাবাহিনীতে) প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি সহৃদয় সাঁওতাল, শিক্ষিত ভদ্রসন্তান, সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতিতে কায়েম থাকিয়া সাঁওতালী ভাষার সাহিত্যিক পরিবর্ধনে সচেষ্ট হইয়াছেন, এবং মুখ্যতঃ বাঙ্গলা সাহিত্যের দৃষ্টান্তে, গল্পে কবিতায় নিবন্ধে এক আধুনিক সাঁওতাল সাহিত্য সৃজন করিতেছেন। সাঁওতাল চিত্তের যে রসোত্তীর্ণ প্রকাশ, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাঁওতালী গীতিকবিতায় সার্থকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—সাঁওতাল পরম্পরাগত সাঁওতাল জীবন-চর্য্যার যে-সব মনোহর চিত্র রবীন্দ্রনাথের মতো দরদী কবিকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেই প্রাচীন সাঁওতালী শৈলীর এক নবীন যুগোপযোগী প্রকাশ, নূতন ভাবে এই-সব সাঁওতালী কবিতায় দেখা যাইতেছে। এই অভিনব সাঁওতালী সাহিত্যের বিকাশ, বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতেছে—এবং প্রায় পাঁচ লাখ সাঁওতালী-ভাষী মানবের দ্বারা সৃষ্ট নূতন যুগের এই সাহিত্য বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে গড়িয়া উঠিতেছে, সেই সাহিত্যের অন্যতম সর্জনা-কেন্দ্র হইতেছে এই পশ্চিম-মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল।

বাঙ্গলা লিপিতে মুদ্রিত এই আধুনিক সাঁওতালী সাহিত্য, সমগ্রভাগে ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙ্গলার, এবং বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরের, একটি স্বকীয় দান। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ঝাড়খণ্ডে সাঁওতাল-পরগণা জেলার দুমকার নিকটে বেনাগড়িয়া গ্রামে স্কাণ্ডিনেভীয় লুথারান খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রচার-কেন্দ্রের ছাপাখানা হইতে, স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারি A. Skrefsrud স্ক্রেফ্‌স্‌রুড্‌, "হড়্‌কো-রেন্‌ মারে-হাপ্‌ড়াম্‌কো-রেআঃক্‌ কাথা" অর্থাৎ "হড় বা সাঁওতাল জাতির পূর্ব-পুরুষদের ইতিকথা" এই নামে একখানি অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ রোমক লিপিতে ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। এই বই হইতেই আধুনিক কালে সাঁওতালদের জাতীয় সাহিত্যের পত্তন আরম্ভ হইল বলা যায়। 'কলেয়ান' বা

কল্যাণ-গুরু নামে একজন প্রাচীন সাঁওতাল জ্ঞানবৃদ্ধকে ডাকিয়া মিশনারি সাহেব তাঁহার মুখ হইতে সাঁওতালী পুরাণ-কথা এবং সামাজিক রীতি-নীতির কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লয়েন। বহুদিন ধরিয়া এই বই ইংরেজিতে বা অন্য কোনও ভাষায় অনূদিত হয় নাই, কিন্তু সাঁওতাল ভাষা শিখিয়া লইয়া অনেকে এই বই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। অবশেষে ১৯৪২ সালে বিখ্যাত সাঁওতাল-ভাষাবিৎ P. O. Bodding বডিং-এর করা ইংরেজি অনুবাদ Sten Konow স্তেন্ কনৌ সাহেবের সম্পাদনায় নরওয়ে-দেশের Oslo অস্‌লো নগরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পরে এই বই ভারত-সরকারের জনগণনার সচিব শ্রীঅশোক মিত্র আই-সী-এস্ মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ হাঁস্‌দাঃক্ নামে একজন শিক্ষিত সাঁওতাল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ভারতীয় সাহিত্যের এই মূল্যবান্ আকর-গ্রন্থ, কোল-জাতির ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক বেদ ও পুরাণ একাধারে যাহাকে বলা যায়, তাহার প্রকাশের কৃতিত্ব উত্তর-ঝাড়খণ্ডের দুমকা অঞ্চলের কল্যাণ-গুরুর এবং নরওয়ে হইতে আগত পাদ্রি A. Skrefsrud সাহেবের। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের প্রায় সতেরো কিংবা আঠারো বৎসর পরে, ধলভূম ও পশ্চিম-মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে, রামদাস টুডু মাঝি নামে এক জ্ঞানী সাঁওতাল পণ্ডিত নিজের আগ্রহে, অনুরূপ আর একখানি পুস্তক সংগ্রহ ও রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপাইয়া প্রকাশ করেন আনুমানিক ১৯০৪ কিংবা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে—"খেরবাল্‌বাংসা ধারাম-পুথি" (অর্থাৎ "খেরওয়াল বা সাঁওতাল বংশের বা জাতির ধর্মপুস্তক")। এই বইয়ের একখানি মাত্র মুদ্রিত পুস্তক ঘাটশিলায় ১৯৪৬ সালে আমি শ্রীযুক্ত ঠাকুরপ্রসাদ মুর্মু ও শ্রীযুক্ত ডোমনচন্দ্র হাঁস্‌দাঃক্ এই দুইজন সাঁওতাল ছাত্রের আনুকূল্যে দেখিতে পাই। ধলভূমের রাজা শ্রীজগদীশচন্দ্র দেও ধবলদেব বাহাদুরের ম্যানেজার স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের উৎসাহে এই প্রায়-অপ্রাপ্য বইয়ের একটি নূতন সংস্করণ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটশিলা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে আমি একটি ভূমিকা লিখিয়া দেই। কিন্তু নানা কারণে, বিশেষতঃ বঙ্কিমবাবুর অতি শোচনীয় আকস্মিক অকাল-মৃত্যুর জন্য, ঐ বইয়ের প্রচার হয় নাই। অধুনা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুহৃদ্ ভৌমিকের আগ্রহে ও চেষ্টায় ইহার তৃতীয় সংস্করণ ও তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে এই ঝাড়গ্রাম হইতেই। রামদাস টুডু ধলভূম-রাজ্যের প্রজা ছিলেন, কাড়ুয়াকাটা গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার এই ধর্ম-পুস্তক নিজের আঁকা ছবিতে পূর্ণ এবং নানা বিষয়ে এই বই

কল্যাণ-গুরুর পুস্তক অপেক্ষা পূর্ণতর, যদিও ইহাতে হিন্দু ধর্ম ও পুরাণ-কথার প্রভাব আরও অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই নূতন সংস্করণ বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশিত হইলে, আর্য্য-অনার্য্য নির্বিশেষে ভারতীয়-সংস্কৃতি-বিষয়ক সাহিত্যের ক্ষেত্রে, নূতন করিয়া রামদাস টুডু মাঝির এই অতি উপযোগী পুস্তক প্রকাশের কৃতিত্ব ঝাড়গ্রাম লাভ করিবে। রামদাস টুডুর দৃষ্টান্তে সাঁওতাল জাতির সামাজিক জীবন ও রীতি এবং ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান লইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাপারে গভীর বিচার- ও অনুভূতি-শীল একজন বিশিষ্ট সাঁওতাল চিন্তানেতা, শ্রদ্ধেয় মিত্রবর শ্রীযুক্ত নায়েকে মঙ্গলচন্দ্র সরেন, ভূতপূর্ব এম-এল-এ (পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা), সাঁওতাল ভাষায় কতকগুলি গান ও অন্য রচনা প্রকাশিত করিয়াছেন—ইঁহার নিবাসস্থান এই মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের নিকটবর্তী শিলদা ডাকঘরের অধীন আতোঢুয়া পাহাড়ী গ্রাম হইতে (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে)। ইঁহার এই সাহিত্যিক কৃতি মেদিনীপুরের আদিবাসী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এখন সাঁওতাল সাহিত্য ও সংস্কৃতির কতকগুলি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে—সাঁওতাল-পরগণায়, ধলভূমে, পশ্চিম-মেদিনীপুরে, হাওড়ায়, হুগলী জেলার খানাকুল ও রাধানগর অঞ্চলে, উত্তরবঙ্গে এবং কলিকাতায়। সাঁওতালীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ ও অনুকরণ হইতেছে, ছোটো গল্প ও নাটক বাহির হইতেছে, সাঁওতালী যাত্রা অভিনীত হইতেছে। ভারতের অন্যতম প্রাচীনতম ভাষা-গোষ্ঠীর একটি সংখ্যা বহুল ভাষা নূতন করিয়া সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত হইয়া, সমগ্রভাবে ভারত-সংস্কৃতির গৌরব বর্ধন করিয়া চলিবার পথ ধরিয়াছে—এ বিষয়ে মেদিনীপুরের কৃতিত্ব লক্ষণীয়।

বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে ভাষণ দিতে আসিয়া, আদিবাসী সাঁওতাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি লইয়া কিছু আলোচনা করিতে বসা, 'ধান ভানিতে শিবের গীত' বলিয়া মনে হইতে পারে। এই অপ্রাসঙ্গিকতার একটু কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিয়াছি—ভারতের সর্ব-ভাষাশ্রিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মূলে ও বিকাশে উভয়েই এক, ইহা-ই প্রতিপাদনের আকাঙ্ক্ষা।

মেদিনীপুরের ভাগীরথী-তীর-সন্নিকটস্থ তমলুক নগর সুপ্রাচীন কাল হইতে পূর্ব-ভারতে একটি বিখ্যাত বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-খণ্ডে পোতযোগে গমনাগমনের জন্য এই তমলুক বন্দর, যাহার প্রাচীন নাম ছিল 'তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত, দামলিপ্ত' প্রভৃতি, সমগ্র ভারতের পক্ষে

অন্যতম প্রধান পূর্ব দ্বার স্বরূপ ছিল। ইহার দক্ষিণ-পূর্বে হিজলী অঞ্চল, সাগরাশ্রিত দক্ষিণ-রাঢ়ের উপকূলে একটি প্রধান স্থান ছিল; এবং 'কাঁথি' অর্থাৎ 'কাঁথ' বা 'কন্থা' অর্থাৎ Rampart বা 'দুর্গপ্রাকার' এই নামে যাহার পূর্বতন প্রাধান্য এখনও সূচিত হইতেছে, সেই দক্ষিণ হইতে রাঢ় ও গৌড়-বঙ্গদেশে প্রবেশের জন্য দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত প্রধান দ্বারপথ এই নগর, কর্ণগড় ও মেদিনীপুর প্রভৃতির অভ্যুত্থানের বহু পূর্বে একটি মুখ্য নগর ছিল বলিয়া অনুমান হয়। মধ্য-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ়ের তুলনায় দক্ষিণ-রাঢ় বা মেদিনীপুর অঞ্চল প্রাচীন ও মধ্য যুগে বিশেষ অরণ্য-সঙ্কুল ছিল বলিয়াই মনে হয়—'ঝাড়খণ্ড' অর্থাৎ বৃক্ষ- বা অরণ্যানী-আবৃত দেশের, ধলভূম ও ময়ূরভঞ্জের যেন এক পূর্ব দিকের বিস্তার ছিল এই মেদিনীপুর। ওদিকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও চন্দ্রকোণা এবং এদিকে ঘাটাল মাহিষাদল ও তমলুকের পথ ধরিয়া, এখনকার মেদিনীপুরের দক্ষিণে দাঁতন ও বালেশ্বর হইয়া, বালেশ্বর ভদ্রক ও কটকের পথে পুরী ও আরও দক্ষিণে যাওয়া, ইহা-ই ছিল মেদিনীপুর অঞ্চলের সঙ্গে বাহিরের জগতের মুখ্য সংযোগ-পথ। দেশ অরণ্যসঙ্কুল, দক্ষিণ হইতে উড়িয়া তেলুগু কানাড়ী ও তামিল জাতির মানুষের উত্তর-পূর্ব ভারতে গৌড়-বঙ্গে যাতায়াতের প্রধান পথ—যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়াই এই-সমস্ত দক্ষিণের মানুষের আগমন হইত। তবে তীর্থযাত্রা এবং অল্প-স্বল্প ব্যবসায় উপলক্ষে মেদিনীপুর দিয়া গৌড়-বঙ্গ এবং কাশী ও গয়া অঞ্চল হইতে ও ঝাড়খণ্ড হইতে লোকের যাতায়াত হইত, এবং বঙ্গভাষী জাতির মধ্যে বিলীয়মান আদিবাসী সাঁওতাল প্রভৃতি যাহারা আসিয়া এখানে বাস করিত, বেশির ভাগ তাহাদের দ্বারা অধ্যুষিত ও অরণ্যসঙ্কুল ও বিপৎসঙ্কুল দেশ বলিয়া, ভাগীরথী-তীরের লোকেরা, মধ্য- ও উত্তর-রাঢ়ের শুদ্ধ বঙ্গভাষী লোকেরা, মধ্য- ও পশ্চিম-মেদিনীপুরে বেশি করিয়া উপনিবিষ্ট হয় নাই।

এতদ্ভিন্ন, ইহাও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, এখনকার মেদিনীপুর জেলা পুরাপূরি খাঁটি বাঙ্গলা-ভাষী জেলা নহে। জেলার সর্বত্রই অবশ্য শুদ্ধ সাধু ও চলিত বাঙ্গলা পঠিত লিখিত ও কথিত হইলেও, ভাগীরথী-তীরের শুদ্ধ চলিত-ভাষা মাত্র জেলার উত্তর-পূর্ব অংশে কথ্য ভাষা-রূপে প্রচলিত। তমলুকের পূর্বে, মেদিনীপুর শহরের দক্ষিণে, নারায়ণগড় ও সবং পর্যন্ত অঞ্চলে যে বিশিষ্ট ধরনের বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত, তাহার নাম-করণ হইয়াছে South-Western Bengali 'দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা'। গৌড়-বঙ্গের ভাষা যে কয়টি মুখ্য শ্রেণীতে পড়ে—যথা, রাঢ়ীয়, গৌড়ীয়, বারেন্দ্র, কামরূপীয়, কাছাড়-শ্রীহট্টীয়, পট্টিকেরীয় বা কুমিল্লা-অঞ্চলীয়,

বঙ্গদেশীয় বা বঙ্গাল, চট্টগ্রামীয় বা চট্টলীয়, এবং সমতটীয় বা দক্ষিণ-বঙ্গীয়—মেদিনীপুরের এই 'দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা' এগুলির একটিরও মধ্যে আসে না। ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডে, স্বল্পসংখ্যক জনের মধ্যে সীমায়িত বাঙ্গলার এই উপভাষাটির কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; এবং মনে হয়, এই উপভাষা স্বতন্ত্র ভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে—একদিকে বাঙ্গলা-অসমিয়া, অন্যদিকে উড়িয়া, এই দুইয়ের একটিরও অন্তর্ভুক্ত ইহাকে বলা যায় না। মেদিনীপুরের এই স্বতন্ত্র কথ্য ভাষার কোনও প্রতিষ্ঠিত নাম নাই। পূর্ব-ভারতের প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বাঙ্গলার এই উপভাষাকে 'সুহ্ম' অর্থাৎ দক্ষিণ-রাঢ়ের সঙ্গে যোগ রাখিয়া, **সুহ্ম-দেশীয়** অথবা **সুহ্মক বাঙ্গলা** এই নাম দিয়া ইহার স্বতন্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করা যায়। জিজ্ঞাস্য—এই 'দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা'র কেন্দ্র-স্থল 'সবং' অঞ্চল—এই নামের মধ্যে কি 'সুহ্ম' শব্দ লুকাইয়া আছে? 'সুহ্ম = সুব্‌ভ; সুহ্মাঙ্গ = সুব্‌ভঙ্গ', পরে 'সোবঙ্গ, সবং'?

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যর জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের সংকলিত Linguistic Survey of India-তে এই বিশিষ্ট বাঙ্গলা উপভাষার প্রথম আলোচনা প্রকাশিত হয়—মেদিনীপুর জেলার মধ্য-ভাগে, মেদিনীপুর থানার দক্ষিণে, সমগ্র সবং থানার উত্তরে, নারায়ণগড়ে, পশ্চিম পাঁশকুড়া থানায়, এবং পশ্চিম তমলুক ও পশ্চিম নন্দিগ্রাম থানায়—প্রধানতঃ কৈবর্ত বা মাহিষ্য শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত এই উপভাষা। ১৯০৩ সালের হিসাবে, জন-সংখ্যায় সাড়ে-তিন লাখ মাত্র লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল এই লোকভাষা, এখন হয়তো আরও কমিয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সেক্রেটারি, বিদ্বান্, কবি ও গুণী কৃষ্ণকিশোর আচার্য্য মহাশয় (স্বনামধন্য অধ্যাপক ও নাট্যশিল্পী শিশিরকুমার ভাদুড়ী ছিলেন ইহার দৌহিত্র) এই উপজাতি সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন (Linguistic Survey of India, Vol V, Part 1, Specimens of the Bengali and Assamese Languages, Calcutta 1903: পৃষ্ঠা ১১ এবং ৩৯ সংশ্লিষ্ট দুইখানি মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই ভাষার একটি বিশেষ মূল্যবান্ নিদর্শন, মহীপাল মধ্য-বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলোকনাথ বসু কর্তৃক রচিত 'গ্রাম্য উপন্যাস', 'সোনার পাথর-বাটি' (নূতন সংস্করণ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) তে পাওয়া যাইবে। বইখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত। এই প্রায়-অপ্রাপ্য বই একখানি সংগ্রহ করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। সুখের বিষয়, এই স্থানীয় বাঙ্গলার বইখানির মূল্য বুঝিয়া বইখানির প্রথম খণ্ডটি তিনি ছাপাইয়া দিয়াছেন, ও ইহার

ভাষা-ভিত্তিক আলোচনাও কিঞ্চিৎ করিয়াছেন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১৯২৬ সাল, পৃঃ ১৩-৩৭)। বাঙ্গলা ভাষার আলোচনায় ইহা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন। আমার **The Origin and Development of the Bengali Language** গ্রন্থে (১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে দুই খণ্ডে প্রকাশিত, ১৯২৬ সালে পুনর্মুদ্রিত, ১৯২৬ সালে অতিরিক্ত তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত) এই 'সুহ্মক' বাঙ্গলার বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা করিতে পারি নাই। মেদিনীপুর জেলার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ বাঙ্গলা ভাষার এই স্বতন্ত্র শাখার পূর্ণ আলোচনার অভাবে, বাঙ্গলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। আশা করি যে বিজন-বাবু আরও বড়ো করিয়া মেদিনীপুরের এই উপভাষার আলোচনা করিবেন। ইহা ভিন্ন, জেলার অন্যত্র শুদ্ধ বাঙ্গলা অপেক্ষা শুদ্ধ বা মিশ্রিত উড়িয়া সমধিক প্রচলিত—বিশেষতঃ কাঁথি মহকুমায় ও উড়িষ্যার সংলগ্ন অন্য সর্বত্র। এবং পশ্চিম-মেদিনীপুরে 'মাহাতো' সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী, ও সাঁওতাল-ভাষীও প্রচুর। উড়িয়া-ভাষী মেদিনীপুরীরা সকলেই বাঙ্গলা জানেন, ইস্কুলে বাঙ্গলা পড়েন, নিজেদের বাঙ্গালী বলেন, এবং ইহাদের সমাজ উড়িষ্যার অনুরূপ সমাজ হইতে বহু স্থানেই পৃথক্। তথাপি উড়িয়ার প্রসার এত অধিক যে মেদিনীপুরের দক্ষিণ ও পশ্চিমের লোকেরা সাগ্রহে উড়িয়া পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, এবং মধুসূদন জানা মহাশয়ের কাঁথি-নগরস্থ বিখ্যাত 'নীহার প্রেস' হইতে বাঙ্গলা অক্ষরে, প্রচুর উড়িয়া সাহিত্যগ্রন্থ, ধর্মবিষয়ক ছোটো খোটো বই, এবং জগন্নাথ দাস-রচিত সমগ্র ভাগবত-পুরাণ ও অন্য প্রধান গ্রন্থ মেদিনীপুরের লোকেদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। এবং বাঙ্গলা অক্ষরে নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত এই-সমস্ত উড়িয়া গ্রন্থ হইতে প্রাচীন উড়িয়া সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সুযোগ আমার যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিয়াছিল।

এই-সব কারণে, এক পূর্ব-মেদিনীপুর ভিন্ন অন্যত্র বাঙ্গলা সাহিত্য সৃষ্টির তেমন সুযোগ মধ্য-প্রাচীন যুগে ছিল না। বাঙ্গলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানকার সাহিত্য-গৌরব ততটা লক্ষণীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর একটি ভাষার উন্নতি-বিধানেও মেদিনীপুরের হাত ছিল। হিন্দীর বিখ্যাত কবি সূর্য্যকান্ত ত্রিপাঠী (উপনাম 'নিরালা'—১৮৯৭ ১৯৬১) আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে ১৯৩৫ সালের দিকে একটি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন, যাহা হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'ছায়াবাদ' নামে পরিচিত। মেদিনীপুরের মহিষাদল-রাজ্যের পশ্চিমা-ব্রাহ্মণ রাজবংশের ক্ষুদ্র সেনায়, উন্নাও জেলা হইতে আসিয়া তাঁহার পিতা

কর্ম গ্রহণ করেন, এবং ঐখানেই কবির জন্ম হইয়াছিল। প্রায় সারা জীবন তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন, মেদিনীপুরেই খুব ভালো করিয়া বাঙ্গলা শিখেন, রবীন্দ্রনাথের ভাব শিষ্য হইয়া তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, এবং আধুনিক হিন্দী কাব্যজগতে একটি অভিনব রবীন্দ্র-রীতি প্রবর্তন করেন, যাহার প্রভাব হিন্দী জগতে হইয়াছিল সুদূর-প্রসারী।

বাঙ্গলা ভাষার স্বকীয় বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ ঘটিতেছিল খ্রীষ্টীয় ১০০০ এবং ইহার দুই-এক শতক পূর্ব হইতেই। ঐ সময়ে মাগধী প্রাকৃতের বিবর্তনে উদ্ভূত মাগধী অপভ্রংশ, আধুনিক ভোজপুরী মৈথিল মগহী, বাঙ্গলা অসমিয়া এবং উড়িয়ার সাধারণ আদিম রূপ হিসাবে, কাশী মিথিলা মগধ, রাঢ় সুহ্ম, গৌড় সমতট বঙ্গ, বরেন্দ্র কামরূপ, শ্রীহট্ট পট্টিকেরা চট্টল, এবং বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সংযোগ-ভূমিতে ও উড়িষ্যায় প্রসৃত হয়। এই-সমগ্র প্রাচী অঞ্চল জুড়িয়া এক সাধারণ সংস্কৃতির ক্ষেত্র; তখন ভোজপুরী মৈথিল-মগহী বাঙ্গলা-অসমিয়া-উড়িয়া তাহাদের পৃথক্ সত্তা প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক্ হইতে এই প্রাচী অঞ্চল, ভারতে ও ভারতের বাহিরে এক বিশিষ্টতাময় গৌরবের স্থান অর্জন করে। মেদিনীপুর-অঞ্চল প্রাচীন তমলুক নগরকে আশ্রয় করিয়া এই গৌরবে অংশ গ্রহণ করে, ইহার পরিবর্ধন করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মধ্য ভাগে ও দ্বিতীয়ার্ধে তমলুক অঞ্চল বৌদ্ধ তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি মুখ্য কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়, চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের বর্ণনা হইতে তাহা জানা যায়। তাহার পূর্বে বৌদ্ধ পালি সাহিত্য ও গ্রীক ভৌগোলিকদের লেখা হইতে তমলুকের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথাও জানিতে পারি। তবে বাঙ্গলা উড়িয়া মৈথিল প্রভৃতি আধুনিক-আর্য্য-ভাষার পত্তনের বা স্থাপনার যুগে, যখন বাঙ্গলা ও উড়িয়ার মধ্যে পার্থক্য ততটা লক্ষণীয় ছিল না, তখন মেদিনীপুর-অঞ্চলের ভাষা যে উভয় প্রকারের মাগধী অপভ্রংশ-জাত মিশ্র আর্য্য ভাষাব ক্ষেত্র ছিল, তাহা এখনকার অবস্থা দেখিয়া অনুমান করা যায়। অরণ্যসঙ্কুল, প্রচুর পরিমাণে সাঁওতাল প্রভৃতি কোল আদিবাসীদের বাসভূমি বলিয়া, ঝাড়খণ্ডের মতো এ অঞ্চলেও বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। কখনও-কখনও মেদিনীপুর জেলা, বিশেষ ভাবে ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ, উড়িষ্যার অংশ বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিতেন; তবে স্থানীয় লোক এ সম্বন্ধে কখনও সচেতন বা সরব হন নাই, সহজেই তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল ভাগীরথী-তীরের দেশ ও বর্ধমান,

বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ার প্রতি। এই গৌড়-বঙ্গের সাংস্কৃতিক হাওয়া সুদূর ঝাড়খণ্ডে, এবং মেদিনীপুরেও গিয়া পহুঁছিয়াছিল—গৌড়-বঙ্গের সংস্কৃতির বিশিষ্টতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই। চৈতন্যদেবের প্রভাবে গৌড়-বঙ্গের যে সভ্যতা ও চিন্তাধারার, সাহিত্যের, ও সংগীত এবং অন্য সুকুমার কলার উদ্ভব এবং প্রসার আরম্ভ হইল, তাহা মেদিনীপুরের উচ্চ স্তরের এবং নিম্ন স্তরের জনগণ অক্লেশেই গ্রহণ করিলেন। মেদিনীপুরের জীবন-চর্য্যা গৌড়-বঙ্গেরই অচ্ছেদ্য অংশ হইয়া গেল। 'মেদিনীপুর' নামটি কবে সর্বজন-গৃহীত হইল, তাহা জানা যায় না। সংস্কৃত রূপ ধারণ করিলেও, বাঙ্গলা দেশের ও ভারতের অন্য বহু ভৌগোলিক ও জাতিবাচক নামের মতো, এই নামেরও পিছনে কোনও অজ্ঞাতমূল অনার্য্য কোল-জাতীয় নাম ঢাকা পড়িয়া আছে বলিয়া মনে হয়। বঙ্গভাষী অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলের মতো মেদিনীপুরের লোকসাহিত্যেও সেই এক-ই জিনিস পাই—কৃষ্ণলীলার গান, বৈষ্ণব নাম ও রসকীর্তন, হর-পার্বতীর গান, কালী-কীর্তন, এবং ঝুমুর গীত, টুসুর গান, ভাদুর গান প্রভৃতি নানা প্রকারের লোক-সংগীত ইত্যাদি। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন হইতে মেদিনীপুর ঝাড়খণ্ড অঞ্চলেও পহুঁছায়, এবং কোথাও কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্যামানন্দ দাস (মৃত্যু আনুমানিক ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে) মেদিনীপুরের অন্তর্গত দণ্ডেশ্বর গ্রামে আসিয়া বাস করেন, ইনি বৃন্দাবনে গিয়া নরোত্তম দাস ও শ্রীনিবাসের সঙ্গ লাভ করেন, বৈষ্ণব-তত্ত্ব লইয়া কতকগুলি নিবন্ধ-কাব্য রচনা করেন, এবং গৌড়ীয় পদকর্তা মহাজনদের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন—বাঙ্গলা বৈষ্ণব সাহিত্যে ইঁহার উচ্চ স্থান স্বীকৃত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মেদিনীপুরের ভূমিতেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। ষোডশ শতক হইতেই এইরূপে মেদিনীপুর বাঙ্গলার প্রবর্ধমান সাহিত্য-ধারার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। মেদিনীপুরের বঙ্গ-সাহিত্য-সাধকদের মধ্যে আর দুই জন বড়ো সাহিত্যিকের নাম করিতে হয়—একজন, 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্যের এবং অন্য গ্রন্থের রচয়িতা রামেশ্বর চক্রবর্তী। ইনি ১৬৩২ শকাব্দে (১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে) 'শিবায়ন' রচনা করেন। মেদিনীপুরের অন্তর্গত বরদা পরগণার যদুপুর গ্রামে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। পরে ইনি মেদিনীপুর শহরের সন্নিকটস্থ কর্ণগড়ে আসিয়া বাস করেন। আর একজন বড়ো বাঙ্গালী লেখক, প্রথম যুগের বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের একজন প্রধান প্রবর্তক ও বাঙ্গলা

ভাষায় প্রথম (?) ব্যাকরণের রচয়িতা* (আনুমানিক ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ), বাঙ্গলা-সাহিত্য-রচনায় শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারিদের সহযোগী ও অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা, এবং কলিকাতার ফোর্ট-উইলিয়াম-কলেজের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক ও লেখক, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইঁহার প্রধান রচনা হইতেছে, 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'রাজাবলি' (১৮০৮), 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' (১৮১৭) এবং 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' (১৮৩৩)। ইঁহার জীবনকাল ঠিকমতো জানিতে পারা যায় নাই। ইঁহার সেবায় বঙ্গভারতী বিশেষভাবে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছেন, আধুনিক বাঙ্গলা গদ্য ভাষার প্রতিষ্ঠায় ইনি ছিলেন সব্যসাচী।

মেদিনীপুরের সাহিত্যিক ও অন্যবিধ অবদানের সঙ্গে আর একজন বিরাট পুরুষের নাম গৌরবের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে—তাহা হইতেছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১)। ইঁহার জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম জন্মকালে হুগলী জেলার অধীনস্থ ছিল, পরে ঐ গ্রামকে মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইনি বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরের অধিবাসিগণেরও গর্বস্থল হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষী কর্মোপলক্ষে মেদিনীপুরের অধিবাসী রূপে বাস করিয়াছিলেন, ও এইভাবে মেদিনীপুরও তাঁহাদের গৌরবের অংশ-ভাক্ হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মেদিনীপুরের অংশ-গ্রহণ এই সংগ্রামকে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। ক্ষুদিরাম বসু হইতে আরম্ভ করিয়া দেশমাতার উদ্ধারের জন্য যে-সমস্ত পুণ্যশ্লোক আত্মত্যাগী বীরের আত্মবলিদানে মেদিনীপুর ও ভারতভূমি পবিত্র হইয়াছে, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁহাদের স্মরণ করি, তাঁহাদের প্রণাম করি।

মেদিনীপুরের ভাগ্যবান্ জমীদার-কুলের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহ-দাতা অনেকেই রহিয়াছেন। যেমন নাড়াজোল জমীদার-বংশ। যেমন এই ঝাড়গ্রামের মল্লরাজ-বংশ—এই রাজবংশের রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব—যিনি বঙ্গ-সাহিত্য প্রচারে নানা ভাবে সক্রিয় সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন, এবং

* দ্রষ্টব্য 'জিজ্ঞাসা'-প্রকাশিত লেখকের 'মনীষী স্মরণে' প্রবন্ধ-সংগ্রহের প্রথম প্রবন্ধ "ব্যাকরণকার রামমোহন"-এর পাদটীকা, পৃঃ ১।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে প্রকাশ করাইবার জন্য অর্থানুকূল্য করিয়াছেন—পরিষদের সত্যকার হিতৈষী বান্ধব হইয়াছেন। সমগ্র বঙ্গভাষী জনগণের পক্ষে, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা যে, রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব এই ষট্‌ত্রিংশ বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহী বলিয়া, চিল্কিগড়ে যাঁহাদের প্রাসাদ ও কেন্দ্র, সেই ধলভূম-মহারাজ ধবল-দেব বংশও পরিচিত।

উপস্থিত ছত্রিশতম বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা লাভ-লোকসানের খতিয়ান, অন্ততঃ সংক্ষেপে পেশ করা, হয়তো সভাপতির অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে কেহ বা চাহিবেন, সাহিত্যের আদর্শ এবং বাঙ্গলার সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি ও সার্থকতা সম্বন্ধে 'সারগর্ভ' আলোচনা। এই-সমস্ত বিষয় এবং অনুরূপ বিষয় লইয়া কার্য্যকর বা উপযোগী আলোচনা করার পিছনে থাকা চাই—সাহিত্য-বিষয়ে লেখকের কারয়িত্রী এবং ভাবয়িত্রী উভয়বিধ প্রতিভা, সাহিত্য-ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার বোধ ও সুবিবেচনা, এবং জনগণ সমক্ষে উপস্থাপিত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রীতি ও অনুরাগ-প্রসূত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান। এই সমস্ত যোগ্যতার অধিকারী না হইলে, সাহিত্য-বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা হইবে মাত্র। ব্যক্তিগত ভাবে আমি সুদৃঢ় ভাবে নিবেদন করিতে চাহি যে, এইরূপ যোগ্যতার অধিকারী আমি নহি। এইজন্য করিয়া আমি বলিয়া থাকি যে আমি সাহিত্যিক নহি, যাঁহারা সাহিত্যসৌধ রচনা করিয়া ভাষা-সরস্বতীকে মহীয়সী করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের অনুগামী একজন "মাটি-কাটা মজুর", সামান্য বাক্-তত্ত্বের আলোচক মাত্র। পরিতাপের সঙ্গে একথা স্বীকার করিব যে, আধুনিক সাহিত্যের অনেক কিছু আমার বোধগম্য নহে। শিল্পে আজকাল যেমন বাস্তবিকতার বিরোধী Modernism বা অতি-আধুনিকতা এবং Abstract Art অর্থাৎ "নিগূঢ়রূপ প্রদর্শন" অথবা "রূপ-সার" কল্পনা দেখা দিতেছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও যাহা আমি ধরিতে ছুঁইতে বা বুঝিতে সমর্থ হই নাই, তেমনি সাহিত্যেও এই Ultra-modernism ও Abstractism কোনও কোনও ক্ষেত্রে দোর্দণ্ড-প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। বিশেষতঃ কবিতা এবং কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। নিশ্চয়ই এখনকার বাঙ্গলা সাহিত্যে বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়াছেন, দিতেছেন এবং দিতে থাকিবেন-ও। কিন্তু "বয়োধর্ম্মেণ

বুদ্ধিভ্রংশঃ”—সর্বক্ষেত্রে আমি তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে অপারক, এইরূপ নিগূঢ় তত্ত্বের কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যাঁহারা করিয়া থাকেন সেইরূপ প্রস্তাবকদের কাছে আমাকে তুষ্ণী অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হয়। “উটের মত হ'ল রজনী”, “মানুষের আলজিভ কেটে দিয়ে অত্যন্ত আবেগে, প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ে পুঁতে যাই আনন্দের গাছ”, “সন্ধ্যা হ'লে অন্ধকারে চামচিকে, বাদুড়ের খেলা —দেখে দেখে এ অভ্যাস মজ্জাগত যাদের, তারাই—দুবেলা উকুন বাছে কাছাকাছি আরশোলা ওড়ে”, “শুয়োরের বাচ্চা হ'তে শখ হয়, তাইতো এখনো—সার্ডিন মাছের তেলে মাছ ভাজা এখন অরুচি”,—প্রভৃতি ভাবগভ ছত্রের অর্থ বা দ্যোতনা, ব্যর্থ আকুলতার সঙ্গে চিন্তা করি—এর চেয়ে আরও নিবিড় দেহ-ধর্ম-বিষয়ক, আরও ভাবগম্ভীর লাইনের অভাব নাই, —সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বিচার বা আলোচনা বা মূল্যায়ন আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা হইবে।

বাঙ্গালীর আর সব কিছু গিয়াছে, বা যাইতেছে—কেবল অবশিষ্ট আছে তাহার ভাষার সাহিত্যিক গৌরব। এই গৌরবকে জীয়াইয়া রাখিবার চেষ্টার বিরাম নাই। এবং আমাদের এই দুর্দিনেও একটা আত্মপ্রসাদের কথা—কাঁটা-বনের মধ্যে একটি মিষ্টি ফলের মতো—এই যে, অন্ততঃ গদ্য সাহিত্যে—গল্পে উপন্যাসে উপাখ্যানে নিবন্ধে রস-রচনায়—বাঙ্গালী তাহার আত্মিক সত্তাকে এখনও একেবারে হারাইয়া ফেলে নাই। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে বঙ্কিম রবীন্দ্র শরতের অনুগামীদের পক্ষে যাহা অযোগ্য বলিয়া মনে হইবে না, এমন কথা-সাহিত্য আমরা এখনও সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি, এবং অতি সাম্প্রতিক-কালের জীবিত ও পরলোকগত কথাকার ও নিবন্ধকারের মধ্যে অক্লেশে ১৫/২০ জনের নাম করিতে পারা যাইবে, যাঁহাদের রচনা পৃথিবীর যে-কোনও প্রৌঢ় ও উচ্চকোটীর সাহিত্যের পক্ষেও গৌরবের বলিয়া স্বীকৃত হইবে। ছেড়া চাটাইয়ের উপরে শুইয়া লাখ টাকার স্বপন দেখার মতো আমরা এখন বিগত খ্রীষ্টীয় শতকের—উনবিংশ শতকের—মধ্যভাগে যে-সমস্ত বড়ো-বড়ো সাহিত্যিক শিল্পী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও অন্য মনীষীর আবির্ভাবে কলিকাতা ও বাঙ্গলা-দেশ ধন্য হইয়াছে - খ্রীষ্টীয় ১৮৪০ হইতে ১৮৭৫ পর্য্যন্ত যে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক স্বর্ণ-যুগের অধিকারী মহাকালের প্রসাদে আমরা হইতে পারিয়াছি, এখন সেই মহাপুরুষদের দান স্মরণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে প্রায় প্রতিবৎসর একটি বা একাধিক করিয়া শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান করিয়া, জাতীয় পূর্ব-স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার

চেষ্টা করিতেছি। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে, পৃথিবীর ইতিহাসে, মানব-জাতির সাহিত্যের ও সংস্কৃতির বিবর্তনে, মাত্র তিনটি বিভিন্ন দেশে তিনটি বিভিন্ন কালে এই অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল—এত অল্প সময়ে বিস্ময়কর ভাবে এতগুলি করিয়া বিরাট মনীষীর আবির্ভাব—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, শাশ্বতচিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহাদের প্রভাব সমগ্র বিশ্বমানবকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে—যথা, (১) পেরিক্লেসের সময়ের খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে আথেনাই বা আথেন্স নগরীতে, (২) রানী এলিজাবেথের সময়ের, ষোড়শ শতকের লণ্ডনে ও ইংলাণ্ডে, এবং শেষ (৩) ইংরেজ আমলে ১৮০০ হইতে ১৮৭৫ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতায় ও বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে। আমার মনে হয়, জাতি হিসাবে ইহাই আমাদের চরম দান—ভারতকে, এশিয়াকে সমগ্র জগৎকে ॥

পরিশিষ্ট

ক. স্বরসংগতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি ৩০১

খ. মহাপ্রাণ বর্ণ ৩২১

গ. অন্য কতকগুলি ভাষার ব্যাকরণের সহিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের তুলনাত্মক আলোচনা ৩৩৮

ঘ. বাঙ্গলা ভাষার রূপ-বিবর্তন ৩৮৭

পরিশিষ্টের পৃষ্ঠা ৩৬৫ হইতে ৩৮৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, বর্ধন প্রেস, ৮/৪এ কাশী ঘোষ লেন,

কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

স্বরসংগতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি

বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি আছে, তদ্দ্বারা আধুনিক বাঙ্গালার (বিশেষতঃ চলিত-ভাষার) রূপ, স্বর-ধ্বনি বিষয়ে অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির সাধারণ রূপ হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকারের হইয়া গিয়াছে। গত ছয় সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা স্বরধ্বনির বিকার বা বিকাশ এই উচ্চারণ-রীতিগুলিকেই অবলম্বন করিয়া হইয়াছে। সংস্কৃতে এইরূপ বিশেষ রীতি একেবারেই অজ্ঞাত, সুতরাং এবম্প্রকার উচ্চারণ-রীতির আলোচনা সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ করেন নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণে সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অনুকরণ হইয়া থাকে বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ-রচয়িতারা বাঙ্গালার নিজস্ব এই উচ্চারণ-রীতির ও তদবলম্বনে বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতির আলোচনা-বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষার পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার গতি সম্যগ্‌ভাবে প্রণিধান করিতে হইলে, এবং বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে আগত অর্ধ-তৎসম (অর্থাৎ বিকৃত বা অশুদ্ধরূপে উচ্চারিত ও পরিবর্তিত সংস্কৃত) শব্দগুলির পরিবর্তনের ধারা হৃদয়ংগম করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষার এই বিশেষ উচ্চারণ-নিয়ম কয়টির সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক। এই-সকল নিয়ম মৎপ্রণীত *The Origin and Development of the Bengali Language* পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে (প্রথমখণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৪-৪০২, এবং অন্যত্র)। উপস্থিত প্রবন্ধে সেই সব বিষয়ের বহুল-ভাবে পুনরবতারণা করিবার উপযোগিতা নাই। আলোচিত উচ্চারণ-রীতির মধ্যে কতকগুলির উপযোগী বর্ণনাত্মক নাম বাঙ্গালায় নাই—অন্ততঃ আমি পাই নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দাবলীর মধ্যে এই উচ্চারণ-রীতির নাম নাই; কারণ, সংস্কৃতে এইরূপ রীতির আলোচনা হইবার অবকাশ-ই হয় নাই; এবং বাঙ্গালী ব্যাকরণকারদিগের মধ্যেও কেহ নূতন নাম সৃষ্টি করিয়াও দেন নাই। ইউরোপের ভাষাতত্ত্ববিদ্যায় কিন্তু এই সকল উচ্চারণ-সূত্রের পরিচায়ক সংজ্ঞা ইংরেজি, ফরাসি, জর্মান প্রভৃতি ভাষায় নির্ধারিত হইয়া আজকাল সাধারণ-ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতে হইলে এইরূপ সংজ্ঞার আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালার

এই উচ্চারণ-রীতির পরিচায়ক কতকগুলি সংজ্ঞা বা নাম প্রস্তাব করিতেছি। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত সংজ্ঞা বা নাম বা পারিভাষিক শব্দগুলি নিখিল ভারতে সর্বত্র গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্য সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে—হিন্দী উড়িয়া পাঞ্জাবী গুজরাটী মারহাট্টী এবং তেলুগু কানাড়ী তামিল মালয়ালম প্রভৃতি ভারতের তাবৎ সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষায় আবশ্যক-মতো ব্যবহারের যোগ্য। বিষয়টিকে সুবোধ্য করিবার জন্য উপর্যুল্লিখিত উচ্চারণ-রীতিগুলির একটু আলোচনা অপরিহার্য্য হইবে।

সাধু বা প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দের ধাতুর মূল স্বরধ্বনির নানাবিধ পরিবর্তন দেখা যায়। এই সব পরিবর্তনকে নিম্নলিখিত কয়টি পর্য্যায়ে বা শ্রেণীতে ফেলা যায়। যথা :—

[১] (চলিত-ভাষায়, অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর উভয় তীরস্থ ভদ্র মৌখিক ভাষায় ও তাহার আধারের উপর স্থাপিত নূতন সাহিত্যের ভাষায়, নিম্নে আলোচিত উচ্চারণ-রীতি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান।) যথা—'দেশী'>'দিশি'; 'ছোরা', হ্রস্বার্থে 'ছোরী' স্থানে 'ছুরী'; 'ঘোড়া', স্ত্রীলিঙ্গে 'ঘোড়ী' স্থলে 'ঘুড়ী'; 'দে' ধাতু—'আমি দেই' স্থলে 'দিই' বা 'দি', কিন্তু 'সে দেএ' স্থলে 'দেয়' (=ছায়); 'শো' ধাতু—'আমি শোই' না হইয়া 'আমি শুই', কিন্তু 'সে শোয়'; 'শুন্' ধাতু—'আমি শুনি', কিন্তু 'সে শুনে' স্থলে 'সে শোনে'; 'কর্' ধাতু—'আমি ক-রি' স্থলে 'কোরি', কিন্তু 'সে করে'—এখানে অ-কার ও-কারে পরিবর্তিত হয় নাই; 'বিলাতী'>'বিলেতি'>'বিলিতি'; 'উড়ানী' >'উড়ুনি'; সংস্কৃত 'শেফালিকা' > প্রাকৃত 'শেহালিআ' > অপভ্রংশ 'শেহলিঅ'> বাঙ্গালা 'শিউলি'; ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন, 'একটা, দুইটা, তিনটা' > 'এক্টা, দু-টা, তিন্টা' > 'একটা (=অ্যাক্টা), দুটো, তিনটে'; ইচ্ছা'>'ইচ্ছে'; 'চিঁড়া'>'চিঁড়ে'; 'মিথ্যা' > 'মিথ্যে'; 'ভিক্ষা'> 'ভিক্ষে'; 'পূজা'>'পূজো'; 'মূলা'> 'মূলো'; 'তুলা'>'তুলো'; ইত্যাদি।

[২] (দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তন পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় আজকাল সাধারণ, কিন্তু এক সময়ে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশেরই কথ্য ভাষার লক্ষণ ছিল। শব্দের মধ্যকার বা অন্তের ই-কার বা উ-কারের, পূর্বাবস্থিত এবং আশ্রিত ব্যঞ্জনের পূর্বেই আসিয়া যাওয়া এইরূপ পরিবর্তনের বিশেষত্ব।) (পূর্ব-বঙ্গের কতকগুলি উপভাষা ব্যতীত অন্যত্র সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে উ-কার ই-কারে রূপান্তরিত

হইয়া যায়)। যথা—'আজি, কালি'>'আইজ্, কাইল্'; 'গ্রন্থি'>'গণ্ঠি' > 'গাঁঠি' > 'গাঁইট্'; 'সাধু' > 'সাউধ্, সাইধ্'; 'রাখিয়া' >'রাইখ্যা'; 'সাথুআ'>'সাউথুআ' > সাইথুআ; 'করিতে'>'কইর্‌তে'; 'করিয়া'> 'কইর‍্যা'; 'হরিয়া'>'হইর‍্যা'; 'জলুআ'>'জউলুআ, জইলুআ'; 'চক্ষু'> 'চখু'>'চুউখ্, চইখ্'; ইত্যাদি।

[৩] তৃতীয় প্রকারে পরিবর্তন পশ্চিম-বঙ্গের, বিশেষতঃ ভাগীরথী নদীর তীরের এবং উহার আশ-পাশের স্থানসমূহের চলিত-ভাষায় বিশেষ প্রবল। বঙ্গের বহু অঞ্চলে এইরূপ পরিবর্তন এখনও একেবারে অজ্ঞাত—বিশেষ করিয়া পূর্ব-বঙ্গের কথ্য-ভাষায়, এবং কচিৎ পশ্চিম-বঙ্গের সুদূর-প্রান্তের ভাষায়। এই পরিবর্তন হইতেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তনের আরও একটু প্রসার। শব্দের মধ্যে বা অন্তে অবস্থিত ই-কার বা উ-কার পূর্বে আনীত হইলে, এই পরিবর্তনে তাহা পূর্বের স্বরবর্ণের সহিত মিশিয়া যায় ও তাহার রূপ বদলাইয়া দেয়। যথা—'আজি, কালি'>'আইজ্, কাইল্'>'এজ্, কেল্' (প্রাচীন গ্রাম্য উচ্চারণ, কলিকাতার আশে-পাশে চব্বিশ-পরগনায় হুগলীতে ৮০/১০০ বৎসর পূর্বে প্রচলিত ছিল—'আলালের ঘরের দুলাল'-এ 'বাহুল্য' অর্থাৎ বাহাউল্লা নামে যে মুসলমান পাত্রটির কথা আছে, তাহার ভাষায় এই প্রকারের রূপ প্যারীচাঁদ মিত্র ধরিয়া গিয়াছেন,—শিক্ষা ও সাধু-ভাষার প্রভাবে এই প্রকারের উচ্চারণ এখন আর স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত একাক্ষর শব্দে শ্রুত হয় না); 'চারি' > 'চাইর্' > 'চের্', যথা 'চাইরের পাঁচ' > 'চেরের পাঁচ' = $\frac{৪}{৫}$; 'গাঁঠি' > 'গাঁইট্' > 'গেঁট্'— যথা 'মনে মনে গেঁট দিচ্ছে', 'গেঁটের কড়ি'; 'সাধু' > 'সাউধ্' > 'সাইধ্' > 'সেধ্'—যথা 'পাঁচ দিন চোরের, একদিন সেধের'; 'রাখিয়া' > 'রাইখ্যা' > 'রেখ্যা' > 'রেখে'; 'সাথুআ' > 'সাউথুআ' > 'সাইথুআ' > 'সেথো'; 'করিতে'> 'কইর্‌তে' > 'ক'র্‌তে' = 'কোর্‌তে'; 'করিয়া' > 'কইর‍্যা' > 'ক'র‍্যা'>'ক'রে' = 'কোরে'; 'হরিয়া'> 'হইর‍্যা' >'হ'র‍্যা' > 'হ'রে' = 'হোরে'; 'জলুআ' >'জউলুআ'> 'জইলুআ'> 'জ'লো' = 'জোলো'; 'চক্ষু'>'চখু'> 'চউখ্', 'চইখ্'>'চোখ্'; ইত্যাদি।

চলিত-ভাষার প্রভাবে এই ধরনের পরিবর্তনের ফল, বহু রূপ, সাধু-ভাষাতেও আসিয়া গিয়াছে: যথা—'ছালিয়া'>'ছাইল্যা'>'ছেলে'; 'মাইয়া' > 'মায়্যা'>'মেয়ে'; 'থাকিয়া'>'থাইক্যা'> 'থেকে'; 'জলুয়া' >'জ'লো'; 'জালিয়া' > 'জেলে'; ইত্যাদি।

[৪] (চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন অন্য ধরনের—প্রথম তিন প্রকারের পরিবর্তন সংস্কৃতে অজ্ঞাত, কিন্তু চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন সংস্কৃতে মিলে। সংস্কৃত মৌলিক 'চল্' ধাতুর ক্রিয়া 'চলতি' হইতে বাঙ্গালা ক্রিয়া 'চলে'—এই 'চলে' ক্রিয়ার ধাতু 'চল্' মৌলিক ধাতু ; সংস্কৃত ণিজন্ত 'চালি' ('চল্+-ই') ধাতুর ক্রিয়া 'চালয়তি' হইতে বাঙ্গালা ক্রিয়া 'চালে'—এই 'চালে' ক্রিয়ার ধাতু 'চাল্' কিন্তু বাঙ্গালায় প্রযোজক ধাতু নহে, মৌলিক ধাতু।) (বাঙ্গালা মৌলিক 'চাল্' ধাতুর প্রযোজক রূপ 'চালা' > 'চালায়'।) সংস্কৃত মৌলিক 'পত্' ধাতুর ক্রিয়া 'পততি' হইতে বাঙ্গালা ক্রিয়া 'পড়ে'—এই 'পড়ে' ক্রিয়ার ধাতু 'পড়্' মৌলিক ধাতু ; সংস্কৃত ণিজন্ত 'পাতি' ('পত্+-ই') ধাতুর ক্রিয়া 'পাতয়তি' হইতে বাঙ্গালা ক্রিয়া 'পাড়ে'—এই 'পাড়ে' ক্রিয়ার ধাতু 'পাড়্' কিন্তু বাঙ্গালায় প্রযোজক ধাতু নহে, মৌলিক ধাতু। (বাঙ্গালা মৌলিক 'পাড়্' ধাতুর প্রযোজক রূপ 'পাড়া' > 'পাড়ায়'।) এখানে অবস্থাগতিকে পড়িয়া ধাতুর মূল স্বরধ্বনির স্বতঃই পরিবর্তন ঘটিয়াছে—'চল্'—'চাল্', 'পড়্'—'পাড়্'।

এক্ষণে উপর্যুক্ত চারি প্রকারের পরিবর্তন-রীতির অন্তর্নিহিত কারণ বা প্রেরণাটি কী, তাহা বুঝিয়া, বাঙ্গালায় ইহাদের কাহার কী নাম দেওয়া সমীচীন হইবে, তাহার বিচার করা যাউক।

[১] প্রথম প্রকারের পরিবর্তন শব্দ-মধ্যস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বা সংগতি আনিবার চেষ্টায় ঘটিয়াছে। 'দেশী'>'দিশি'—এখানে প্রথম অক্ষরের এ-কার, পরবর্তী অক্ষরের ঈ-কারের (ই-কারের) প্রভাবে, পরবর্তী ই-ধ্বনির সহিত সংগতি রাখিবার চেষ্টায়, নিজেই ই-কারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ই (ঈ)-র উচ্চারণে জিহ্বা মুখবিবরের অগ্রভাগে প্রসৃত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বে উঠে ; এ-কারের বেলায়, উর্ধ্বে উঠে না, একেবারে নিম্নেও নামে না, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। বাঙ্গালা উচ্চারণে, পরবর্তী ই-কারের আকর্ষণের ফলে, পূর্ববর্তী এ-কারের উচ্চারণের সময়েই, এ-কারের স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ই-কারের স্থানে জিহ্বা উত্তোলিত হইয়া পড়ে ; ফলে, এই এ-কারের সহজেই ই-কারে পরিবর্তন ঘটে। উ-কার এবং ও-কার উচ্চারণে জিহ্বা মুখবিবরের ভিতরের দিকে বা পশ্চাদ্ভাগে আকর্ষিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে অধরোষ্ঠ সংকুচিত হইয়া বৃত্তাকার ধারণ করে ; মুখাভ্যন্তরে আকর্ষিত জিহ্বা উ-কারের বেলায় উচ্চে উঠে, ও-কারের বেলায় মধ্যভাগে থাকে, এবং

অ-কারের বেলায় নিম্নে অবস্থান করে। 'ঘোড়া' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-প্রত্যয়-জাত 'ঘোড়ী' শব্দের উচ্চারণে, প্রথম অক্ষরের ও-কার পরবর্তী অক্ষরের ঈ-কারের প্রভাবে পড়ে, ইহার দ্বারা আকর্ষিত হয়; এবং ঈ- বা ই-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান উচ্চে হয় বলিয়া, ও-কারও উচ্চে আনীত হয়; ফলে ইহার উ-কারে পরিবর্তন 'ঘুড়ী'। তদ্রূপ—'করে, করা' পদে, এ-কার জিহ্বার মধ্য-অবস্থান-জাত, আ-কার জিহ্বার অধঃ-অবস্থান-জাত; এই জন্য ইহাদের প্রভাবে বা আকর্ষণে পড়িয়াও অ-কার নিম্নেই থাকে, উচ্চে উঠিয়া নিজ রূপ বদলায় না; কিন্তু 'ক-রি' = 'কোরি', এখানে ই-কার উচ্চারণ করিবার সময়ে জিহ্বা উচ্চে উঠে, তাই ইহার আকর্ষণে ক-এর অ-কারও কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়, ও-কারে পরিবর্তিত হয়। তদ্রূপ 'কর্-উক্', 'ক-রুক্' = 'কোরুক্'—এখানে ক-এর অ-কার, 'উক্'-এর উ-কারের আকর্ষণে উচ্চে উঠিয়া ও-কার হইয়া গিয়াছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রের দ্বারা স্বরবর্ণ উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে; এবং এই চিত্রের সাহায্যে, কী করিয়া উচ্চাবস্থিত জিহ্বার দ্বারা উচ্চারিত 'ই, উ'-র প্রভাব বা আকর্ষণে এ-কার ই-কার হয়, অ-কার ও-কার হয়, বা ও-কার উ-কার হয়, এবং এই প্রকারের নানা পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বাঙ্গালা শব্দের অভ্যন্তরস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা টান বা আকর্ষণ পড়ে। ফলে, উচ্চাবস্থিত স্বর 'ই, উ'-র প্রভাবে মধ্যাবস্থিত স্বর 'এ, ও' এবং নিম্নাবস্থিত স্বর 'আ, অ'—যথাক্রমে 'ই, উ' এবং 'এ, ও'-তে পরিবর্তিত হয়; এবং মধ্যাবস্থিত স্বর 'এ, অ্যা' তথা 'ও', 'অ'-র প্রভাবে পড়িয়া, উচ্চে আকর্ষিত হইতে পারে না; 'অ'-র প্রভাবহেতু উচ্চাবস্থিত স্বর 'ই, উ' মধ্যস্থানে নামিয়া আসিয়া, যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' হইয়া যায়। উঁচু নীচুকে উঁচুতে টানে, নীচু উঁচুকে নীচে নামাইয়া লয়—ইহা-ই হইতেছে এই প্রভাবের মূল কথা। এই অনুসারে বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের ও অন্যান্য পদের রূপের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষায় ধাতুতে স্বরধ্বনি

'অ ই উ এ ও' [ɔ, i, u, e, o]

থাকিলে, প্রত্যয়ে বা বিভক্তিতে যদি 'ই, উ' [i,u] আইসে, তাহা হইলে পূর্বোল্লিখিত ধাতুর স্বরধ্বনি চলিত-ভাষায় যথাক্রমে

বাঙ্গালা স্বরবর্ণের উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বাদি বাগ্‌যন্ত্রের সমাবেশ
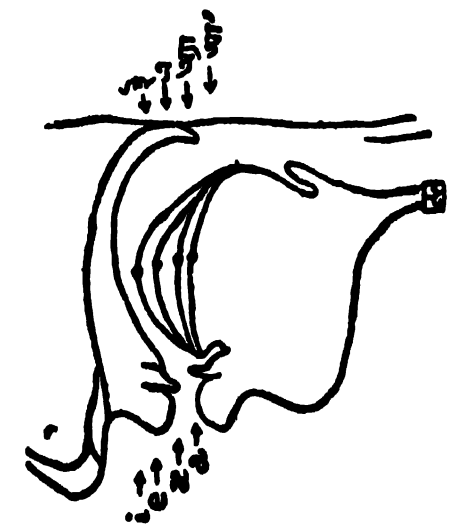
জিহ্বা সম্মুখভাগে দন্তের দিকে প্রসৃত করিয়া
উচ্চারিত স্বর-ধ্বনি—
[ই, এ, অ্যা, আ'—i, e, æ, a]
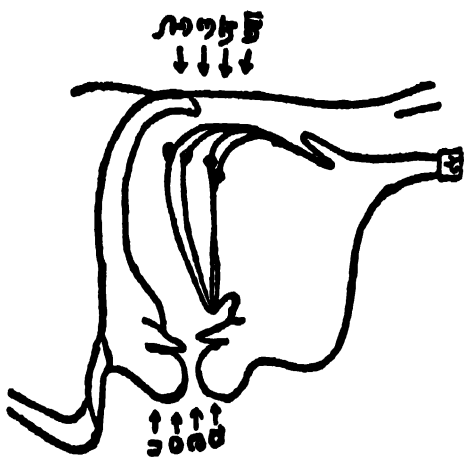
জিহ্বা পশ্চাতে কণ্ঠের দিকে আকর্ষিত করিয়া
উচ্চারিত স্বর ধ্বনি—
[আ, অ, ও, উ= ɑ, ɔ, o, u]

'ও ই উ এ (ই) উ' [o, i, u, e (i), u]

রূপে অবস্থান করে ; এবং

প্রত্যয়ে বা বিভক্তিতে 'এ (বা য়), আ, অ, ও' [e (ĕ), a, ɔ, o] আসিলে, চলিত-ভাষায় ধাতুর স্বর যথাক্রমে

'অ এ ও অ্যা (এ) ও [ɔ, e, o, æ (e), o]

রূপে অবস্থান করে। যথা—

'চল্' ধাতু—'চল্'+'-অহ'='চলহ, চলো' ; 'চল্'+'-এ'='চলে' ; 'চল্'+'-আ'='চলা' ; 'চল্'+'-অন্ত'='চলন্ত' ; কিন্তু 'চল্'+'-ই'='চলি'='চোলি'; 'চল্'+'-উক্'='চলুক্'='চোলুক্' ;

'কিন্' ধাতু—'কিন্'+'-এ'='কিনে'='কেনে' ; 'কিন্'+'-অহ'='কিনহ' ='কেন' (তুমি ক্রয় কর) ; 'কিন্'+'-আ'='কিনা'>'কেনা' ; কিন্তু—'কিন্' +'-ই'='কিনি' ; 'কিন্'+'-উক্'='কিনুক্' ;

'শুন্' ধাতু—'শুন্'+'-এ'='শোনে' ; 'শুন্'+'-অহ'='শুনহ'>'শুন'> 'শোনো' (=তুমি শ্রবণ কর) ; 'শুন্'+'-ই'='শুনি' ; 'শুন্'+'-উক্'= 'শুনুক' ; 'শুন্'+'-আ'='শুনা'>'শোনা' ;

'দেখ্' ধাতু—'দেখে'='দ্যাখে' (এ >অ্যা, e>æ) ; 'দেখহ'>'দেখ'= 'দ্যাখো' ; 'দেখি, দেখুক' ; 'দেখা'='দ্যাখা' ;

'দে' ধাতু—'দেয়'='দ্যায়' ; 'দেই'='দিই' ; 'দেঅহ>দেও>দ্যাও', পরে 'দাও' ; 'দেউক—দিউক>দিক্' ; 'দেআ'='দেওয়া' ;

'শো' ধাতু—'শোয় ; শোও ; শো-ই>শুই ; শুক্ ; শোয়া'।

পরবর্তী স্বরধ্বনির আকর্ষণে বা তাহার সহিত সংগতি রক্ষার জন্য যেমন প্রাগবস্থিত স্বরের পরিবর্তন হয়, তেমনি ইহার বিপরীতও ঘটিয়া থাকে,— অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরেরও পরিবর্তন হয়। যথা—'বিনা' >'বিনে' (ই-র আকর্ষণে আ-কারের উচ্চে এবং মুখের সম্মুখভাগে আনয়ন, ফলে এ-কারে পরিবর্তন) ; তদ্রূপ 'ইচ্ছা—ইচ্ছে, চিন্তা—চিন্তে, হিসাব—হিসেব, গিয়া—গিয়ে, দিয়া—দিয়ে, বিলাত—বিলেত' ; ইত্যাদি। এবং পূর্ববৎ অগ্রগামী উ-র প্রভাবে পরস্থিত আ-কারের ও-তে পরিবর্তন ঘটে ; যথা— 'পূজা—পূজো, ধূনা—ধূনো, সুহা > সুআ—সুও, দুহা> দুআ—দুও, জুআ (=জুয়া)—জুও' ইত্যাদি।

এই পরিবর্তন-ধর্ম-হেতু, বাঙ্গালার পূর্ণ-রূপ শব্দগুলি (খাঁটি বাঙ্গালা, তৎসম

ও বিদেশী) চলিত-ভাষায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যথা—'বিলায়তী > বিলাতী > বিলেতী > বিলিতি ; পিঠালী > পিঠলী > পিঠোলী > পিঠুলি ; উড়ানী > উড়োনী > উড়ুনি ; উনানী > উনোনি > উনুন ; সন্ন্যাসী = সন্নিয়াসী > সোন্নেসী > সন্নিসি ; কুড়ালী > কুড়োলী > কুড়ুলি > কুড়ুল ; মাদল + -ঈ = মাদলী > মাদোলি > মাদুলি ; উৎসর্গ > উচ্ছোগ্গ > উচ্ছুগ্গু ; নিরামিষ্য > নিরামিষ্যিয় > নিরেমিষ্যি, নিলেমিষ্যি > নিলিমিষ্যি (গ্রাম্য, স্ত্রী-লোকের ভাষায়)' ; ইত্যাদি।

এইরূপ পরিবর্তন-রীতিকে কী নাম দেওয়া যায় ? প্রাচীন বাঙ্গালা হইতেই ভাষায় ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় ; যথা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—'চোর—চোরিণী' হইতে 'চুরিণী', 'কোয়েলী' হইতে 'কুয়িলী', 'ছিনারী'-র পার্শ্বে 'ছেনারী', 'পুড়ি-র পার্শ্বে 'পোড়া', ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্তন অন্য ভাষায়ও পাওয়া যায়। যেমন, তুর্কীতে at 'আৎ' মানে ঘোড়া, at-lar 'আৎ-লার্' = 'ঘোড়াগুলি' ; ev 'এভ্' মানে বাড়ি, ev-ler 'এভ্-লের্' মানে 'বাড়িগুলি' ; এখানে at শব্দে আ-ধ্বনি থাকায় বহুবচনের প্রত্যয়েও আ-ধ্বনি আসিল, প্রত্যয়টি -lar রূপে সংযুক্ত হইল ; এবং ev শব্দে এ-ধ্বনি থাকায় প্রত্যয়ের রূপ হইল এ-কার-যুক্ত -ler। উরাল-গোষ্ঠীয় ভাষায়, আল্তাই-গোষ্ঠীয় ভাষায় (তুর্কী যাহার অন্তর্গত), তেলুগু প্রভৃতি কতকগুলি দ্রাবিড় ভাষায়, এবং অন্যত্র এই রীতি মিলে। এই পরিবর্তন আবার স্বরের উচ্চারণকে কেবল নিম্ন হইতে উচ্চে বা উচ্চ হইতে নিম্নে আনয়ন করিয়া-ই হয় না—জিহ্বাকে অগ্রভাগ হইতে পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ হইতে সম্মুখভাগে আনয়ন করিয়া, ও অধরোষ্ঠকে প্রসৃত বা বৃত্ত করিয়াও হইয়া থাকে—এবং ফলে ওষ্ঠদ্বয়কে প্রসৃত করিয়া উচ্চারিত 'উ' 'ও' 'অ'-র এবং অধরোষ্ঠকে সংকুচিত ও বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারিত 'ই' 'এ' 'অ্যা'-র বিকারে নানা প্রকার অদ্ভুত স্বরধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে ; সে-সকল স্বরধ্বনি আমাদের ভাষায় সাধারণতঃ অজ্ঞাত, এবং আবশ্যক-মতো রোমান বর্ণমালায় ö ü ä y ɯ প্রভৃতি নানা অক্ষরের সাহায্যে সেগুলি দ্যোতিত হয়।

এইরূপ পরস্পরের প্রভাবে জাত স্বরধ্বনির পরিবর্তনকে ইউরোপীয় ভাষা-তত্ত্ববিদ্গণ Vocalic Harmony বা Harmonic Sequence বলিয়াছেন (জর্মানে Vokal-harmonie, ফরাসিতে Harmonie vocalique বা Assimilation vocalique)। বাঙ্গালায় এই রীতির নাম স্বরসংগতি দেওয়া হউক, এই প্রস্তাব করিতেছি।

একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার—যেখানে আদ্য অ-কার নিষেধবাচক, সেখানে ইহার উচ্চারণ 'অ'-ই থাকে, স্বরসংগতি হয় না ; যথা—'অ-তুল' (কিন্তু নাম অর্থে 'ওতুল'), 'অ-সুখ', 'অ-ধীর', 'অ-স্থির', 'অ-দিন' (কিন্তু 'অতিথি'-র উচ্চারণ 'ওতিথি'), ইত্যাদি। এই পার্থক্যটুকু ধরিতে না পারিয়া, চলিত-ভাষা ব্যবহারের সময়ে অনেকেই, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ-বাসিগণ, ভুল করিয়া 'ও' উচ্চারণ করেন।

[২] দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তনের প্রকৃতি লইয়া খুঁটিনাটি আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা এক প্রকারের বর্ণ-বিপর্যয়—ই-কার বা উ-কার, ব্যঞ্জনের পরে বিদ্যমান থাকিয়াও, আবার ব্যঞ্জনের পূর্বে আইসে ; যেমন 'কালি' >'কাইল্‌', 'সাধু'>'সাউধ্‌'। কিন্তু ইহা কেবল শুদ্ধ বর্ণ-বিপর্যয় নহে—এক হিসাবে ইহা আগম, বা পূর্বাভাস-হেতুক আগমও বটে ; যেমন, 'সাথুআ'> 'সাউথুআ' : এখানে 'থু'-এর 'উ' রহিযা গেল, ওদিকে 'থ'-এর পূর্বেও উ-কার আসিয়া গেল। তদ্রূপ, 'করিয়া'>'কইর‍্যা' : এখানেও 'রি'-র ই-কার একেবারে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া 'র'-এর আগে চলিয়া গেল না, 'র'-এর আগে পূর্বাভাসের মতো ই-কার আসিয়া গেল—উভয় স্থানেই ই-কার রহিল। সুতরাং কেবল অবিমিশ্র বর্ণ-বিপর্যয় অথবা ই-কার (বা উ-কার) আগম বলিলে চলে না। 'পূর্বাভাস-আগম' বলিলে কতকটা ব্যাখ্যা হয় বটে ; সংস্কৃতে এইরূপ পূর্বাভাসাত্মক আগম দেখা যায় না, কিন্তু সংস্কৃতের স্বসস্থানীয় অবেস্তার ভাষাতে ইহা মিলে : যথা, সংস্কৃতে 'গিরি' = অবেস্তায় 'গইরি' (<মূল প্রাচীন-ঈরানীয় রূপ '*গরি') ; সংস্কৃতে 'গচ্ছতি'—অবেস্তায় 'জসইতি' (<মূল প্রাচীন-ঈরানীয় রূপ '*জসতি') ; সংস্কৃতের 'সর্ব', অর্থাৎ 'সর্‌উঅ'—অবেস্তায় 'হউর্‌ব' অর্থাৎ 'হউর্‌উঅ' (<মূল প্রাচীন-ঈরানীয় রূপ '*হর্‌ব = হর্‌উঅ')। ভারতবর্ষে বৈদিকের বিকারে জাত প্রাকৃতেও কচিৎ এইরূপ পূর্বাভাসাত্মক ই- ও উ-বর্ণের ব্যত্যয় বা বিপর্যয় হইত, তাহারও প্রমাণ আছে : যথা—সংস্কৃত 'কার্য্য = কার্‌ইঅ' শব্দ প্রাকৃত অর্ধ-তৎসমরূপে '*কাইর্‌অ', '-কাইর্‌অ'>'*কাইর'-তে প্রথম রূপান্তরিত হয়, পরে অন্তঃসন্ধি করিয়া দাঁড়ায় '*কাইর>কের'—ষষ্ঠীবাচক প্রত্যয়-হিসাবে প্রাকৃতে এই 'কের'-পদ প্রচলিত হয় ; 'পর্যন্ত = পর্‌যন্ত = পর্‌ইঅন্ত = পরিঅন্ত> *পইরন্ত> পেরন্ত' ; 'পর্ব' = 'পর্‌ব = পর্‌উঅ' > '*পউর্‌উঅ >*পউর>পোর', ইত্যাদি দুই-চারিটি পদ প্রাকৃতে পাওয়া যায়, এবং এগুলি এই পূর্বাভাসাত্মক বিপর্যয়ের বা আগমের ফল।

ইউরোপের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বরধ্বনির এই প্রকার গতির নামকরণ করিয়াছেন Epenthesis (ফরাসিতে Epenthése)। শব্দটি গ্রীক ভাষার একটি প্রাচীন শব্দ। গ্রীকে ইহার অর্থ ছিল কেবলমাত্র 'আগম', এবং এই প্রকার পূর্বাভাসাত্মক আগমকেও জানাইবার জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হইত : যথা—bainō, পূর্বরূপ *baniō ; leipō, পূর্বরূপ *lepiō ; eimi, পূর্বরূপ emmi, তৎপূর্বে *esmi ; ইত্যাদি। অক্স্‌ফোর্ড ডিক্‌শনরির মতে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই শব্দ প্রথম ইংরেজি ভাষায় কেবল 'আগম' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখন ভষাতত্ত্ব-বিদ্যায় এই শব্দের প্রধান অর্থ—the transference of a semi-vowel to the syllable preceding that in which it originally occurred—পূর্ব-স্থিত অক্ষরে অন্তঃস্থ বর্ণের আনয়ন। গ্রীক Epenthesis শব্দটি ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বে এখন বেশ চলিয়া গিয়াছে। 'পূর্বাভাসাত্মক ধ্বনিবিপর্য্যয়' বা ধ্বন্যাগমকে স্বল্পাক্ষর সুখোচ্চার্য্য একপদময় নামের দ্বারা বাঙ্গালায় অভিহিত করিতে হইলে, গ্রীক Epenthesis শব্দের অনুরূপ একটি শব্দ গ্রীকের স্বস্থানীয় ভাষা আমাদের সংস্কৃতে থাকিলে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয় ; এবং সংস্কৃতে এরূপ শব্দ বিদ্যমান না থাকিলে, গ্রীক শব্দটির ধাতু ও প্রত্যয় ধরিয়া অনুরূপ সংস্কৃত ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগে নূতন একটি শব্দ তৈয়ার করিয়া লইতে পারা যায়। গ্রীক Epenthesis পদটি কর্তৃকারকের একবচনের রূপ, ইহার বিশ্লেষ এই—epi (উপসর্গ)+en (উপসর্গ)+thesi-(শব্দ) ; thesi-শব্দ আবার the (থে) ধাতুতে -si- প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন, ইহার উত্তর, -s বিভক্তি যুক্ত হইয়া Epenthesis। epi উপসর্গের অর্থ 'উপরে', 'অধিকন্তু' (upon, in addition to) ; en-এর অর্থ 'ভিতরে' ; এবং thesi-অর্থে 'স্থাপন', বা 'রক্ষণ'। গ্রীক epi-র প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ হইতেছে 'অপি' ;—'উপরে' অর্থে 'অপি' উপসর্গের প্রয়োগ হইত, 'নিকটে, সংযোগে, অধিকন্তু, অভ্যন্তরে'—এই সকল অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত ; 'অধিকন্তু'—এই অর্থে এই উপসর্গের অব্যয়-রূপে ব্যবহারও আছে ; বৈদিক সংস্কৃতে 'ধা'-ধাতুর সঙ্গে 'অপি' ব্যবহৃত হইয়া 'অপিধান' এবং 'অপিধি' এই দুই পদ বিদ্যমান ছিল—যাহাদের অর্থ 'আবরণ' ; 'অপি' উপসর্গ আবার সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া 'পি' রূপ ধারণ করিয়াছিল—যথা—'অপিধান—পিধান' ; 'অপি'+'নহ' = 'পিনহ' ; ইত্যাদি। en-এর প্রতিরূপ শব্দ সংস্কৃতে নাই ; en-এর অর্থ 'ভিতরে' ; ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইবে 'নি' (যেমন—'নি-হিত, নি-বাস',

ইত্যাদি); গ্রীক ধাতু the-র প্রতি-রূপ হইতেছে সংস্কৃত ধাতু 'ধা', এবং -si-প্রত্যয়ের সংস্কৃত প্রতিরূপ '-তি'; thesi = 'ধিতি'; বৈদিক ভাষায় 'ধিতি' পাওয়া যায়, লৌকিক সংস্কৃতে ইহার রূপ হয় 'হিতি'। তাহা হইলে দাঁড়ায় epi-en-thesi-s = **অপি-নি-হিতিঃ** (গ্রীক -s বিভক্তি = সংস্কৃত -স্‌', 'ঃ'); পূর্বাভাসাত্মক আগম বা বিপর্যয়কে অতএব **অপিনিহিতি** বলা যাইতে পারে;—'উপরে বা অধিকন্তু অভ্যন্তরীণ সংস্থাপন'—এইরূপ অর্থ এই নব-সৃষ্ট শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইবে; এই মৌলিক অর্থের দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ অনায়াসে দ্যোতিত হইতে পারে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে প্রচলিত Epenthesis শব্দের সহিত ইহার ধ্বনি- ও সাধন- এবং অর্থ-গত সমতাও পাওয়া যাইবে। 'অপিনিহিতি'-র বিশেষণে 'অপিনিহিত' শব্দ (epenthetic অর্থে) প্রযুক্ত হইতে পারিবে।

[৩] তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন অপিনিহিতির প্রসারেই ঘটিয়া থাকে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অপিনিহিতির ফলে যে 'ই' বা 'উ' আগে চলিয়া আইসে, তাহা পূর্বের অক্ষরে অবস্থিত 'অ' বা 'আ' বা অন্য স্বরের পার্শ্বে বসিয়া, তাহার সঙ্গে একযোগে diphthong অর্থাৎ সংযুক্ত-স্বর বা সন্ধ্যক্ষর সৃষ্টি করে;—যেমন, 'রাখিয়া' > 'রাইখ্যা'—এখানে সংযুক্ত-স্বর 'আই'; 'করিয়া' > 'কইর্যা'—এখানে সংযুক্ত-স্বব 'অই' (স্বরসংগতির নিয়মে 'অই'-এর 'অ' ও-কারে পরিবর্তিত হয়, ফলে উচ্চারণে 'ওই'); 'দীপবৃক্ষ-' > 'দীবরুক্‌খ-' > 'দিঅরুখা' > 'দিঅউরুখা'—'দেউরুখা' (এখানে সংযুক্ত-স্বর 'এউ') > 'দেইরুখো' > 'দেরুখো'; 'মাছুআ' > 'মাউছুআ' (এখানে সংযুক্ত-স্বর 'আউ') > 'মাইছুআ' (এখানে 'আউ'-এর 'আই'-তে পরিবর্তন) > 'মেছো'; ইত্যাদি। এই সকল সংযুক্ত-স্বরের দ্বিতীয় অঙ্গ 'ই' (মূল 'ই', এবং উ-কারের পরিবর্তনে জাত 'ই'), পূর্ব-স্বরের সহিত সন্ধি-যোগে মিশিয়া যায় ('রাইখ্যা' > 'রেখ্যা' > 'রেখে'; 'মাউছুআ' > 'মাইছো' > 'মেছো'), কিংবা লুপ্ত হইয়া যায় ('দেউরুখা' > 'দেইরুখো' > 'দে'রুখো'; 'কইর্যা' > 'ক'র্যা' > 'ক'রে')। অ-কারের পরে এই অপিনিহিত 'ই' আসিলে, ইহার লোপ-ই সাধারণ; কিন্তু পূর্বস্থিত অ-কারকে ও-কারে পরিবর্তন করিয়া দিয়া, এই অপিনিহিত 'ই' নিজ প্রভাব-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যায়। য-ফলার 'য' (= ইঅ)-তে যে ই-ধ্বনি বিদ্যমান আছে, তাহা মধ্যযুগের বাঙ্গালায় (ও মধ্যযুগের উড়িয়ায়) অপিনিহিত হইয়া উচ্চারিত হইত; যথা—'সত্য = সত্তিঅ > সইত্তিঅ, সইত্ত; পথ্য = পৎথিঅ > পই-

থিঅ > পইথ ; বাহ্য = বাহ্ঝিঅ > বাইঝ্ঝ (মধ্যযুগের উড়িয়ায় 'বাহিজ'); যোগ্য = যোগ্‌গিঅ > যোইগ্‌গিঅ > যোইগ্‌গ'। আধুনিক বাঙ্গালায় এইরূপ অপি-নিহিত য-ফলা বিদ্যমান আছে,—পূর্ব-বঙ্গের বাঙ্গালায় ইহার অস্তিত্ব এখনও লুপ্ত হয় নাই (যেমন 'সত্য > সইত্ত, পথ্য > পইথ ; বাহ্য = বাইঝ্ঝ ; যোগ্য = যোইগ্‌গ')। চলিত-ভাষায় য-ফলা-জাত এই ই-কার, হয় একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, এবং লোপের পূর্বে স্বরসংগতি-অনুসারে পূর্ববর্তী মূল অ-কারকে ও-কারে, এবং মূল ও-কারকে উ-কারে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে; নয় প্রথমে অপিনিহিত হইয়া পরে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু নিজ পূর্ব স্থানে পূর্ণ ই-কারে পরি-বর্তিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা—'সত্য = সত্তিঅ > সইত্তিঅ > সইত্ত > (১) সোইত্ত, (২) সোইত্তিঅ > (১) সোত্তো (শোত্তো), (২) সোত্তি ('শোত্তি'—'সত্যি'-রূপে লিখিত হয়); পথ্য = পংথিঅ > পইংথিঅ, পইংথ > (১) পোইংথ, (২) পোইথিঅ > (১) পোথো, (২) পোথি (= পথ্যি); বাহ্য = বাঝিঅ, বাইঝ্ঝ > (১) বাঝো, (২) বাঝি, বাঝে ; যোগ্য = যোগ্‌গিঅ > যোইগ্‌গিঅ, যোইগ্‌গ > (১) যোইগ্‌গ, (২) যোইগ্‌গি > (১) যোগ্‌গো, (২) যুগ্‌গি' ; ইত্যাদি। 'ক্ষ'-র উচ্চারণ পুরাতন বাঙ্গালায় ছিল 'খ্য' ('ক্ষ' = এই সংযুক্ত অক্ষরের নাম বা বর্ণনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়—'ক-যে মূর্ধন্য-ষ-য়ে খিঅ') এবং 'জ + ঞ' = 'জ্ঞ'-এর উচ্চারণ ছিল 'গঁ্য' ; উচ্চারণে য-ফলা আইসে, এবং এই য-ফলাও সত্যকার য-ফলার মতো কার্য্য করে; যথা—'লক্ষ্য = লখ্য = লক্‌খিঅ > লইক্‌খিঅ, লইক্‌খ > লোক্‌খি (কলিকাতার 'গ্রাম্য' উচ্চারণে—'সাত লোক্‌খি টাকা'), লোক্‌খো ; রক্ষা = রক্‌খিআ > রইক্‌খিআ, রইক্‌খ্যা > রোক্‌খ্যা, রোক্‌খে, রোক্‌খা ; আজ্ঞা = আগঁ্যা = আগ্‌গিঁআ > আইগ্‌গিঁআ, আইগ্‌গঁ্যা > এঁগ্‌গেঁ, আঁগ্‌গেঁ, আগ্‌গাঁ' ; ইত্যাদি।

পুরাতন বাঙ্গালার পূর্ণ-রূপ শব্দ এই অপিনিহিত ও তদনন্তর এই প্রকারের পরিবর্তনে নূতন আকার ধারণ করিয়া বসিয়াছে; যেমন—'বৎসরূপ > বচ্ছরূব > বচ্ছরূঅ > বাছরূ, বাছরু > *বাছউর্ > *বাছোউর্ > *বাছুউর, বাছুর ; কামরূপ > কামরূব > কাঁরূঅ > কাবঁরূ, কাবঁরু > *কাবঁউর্ > *কাবোঁউর্ > *কাবঁউর, কাবঁর—বাঙ্গালা পুঁথিতে কাঙুর (কাঙুর- কামিখ্যা), সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর লেখায় Caor' ; ইত্যাদি।

অপিনিহিত ই-কার বা উ-কারের প্রভাবে পূর্ব-স্বরের পরিবর্তন—ইহা-ই আমাদের আলোচ্য তৃতীয় প্রকারের স্বরধ্বনি-বিকারের মূল কথা; ইহা

বাঙ্গালার বাহিরে অন্যান্য কোনও-কোনও আর্য্য-ভাষায় মিলে। যেমন ছোটো নাগপুরে প্রচলিত ভোজপুরিয়াতে 'কাটি, মারি' (= কাটিয়া, মারিয়া)> 'কাইট্, মাইর্'; পশ্চিমা পাঞ্জাবীতে ইহা পাওয়া যায়: 'জঙ্গচ' (জঙ্গল) শব্দের প্রথমাতে 'জঙ্গচ>*জঙ্গউচ্ >জঙ্গুচ্', সপ্তমীতে 'জঙ্গচি>*জঙ্গইচ >জঙ্গিচ্'; গুজরাটীতেও ক্বচিৎ মেলে: যেমন, 'ঘরি (= গৃহে)>*ঘইর্> ঘের'। এতদ্ভিন্ন সিংহলীতে এইরূপ পরিবর্তন খুব সাধারণ।

ভারতের বাহিরের বহু ভাষাতেও এই পরিবর্তন দেখা যায়। Indo-European ইন্দো-ইউরোপীয় (আদি-আর্য্য) ভাষার Germanic জর্মানীয় শাখার ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে এই প্রকারের ধ্বনি-বিকার খুব-ই সাধারণ, এবং এই ভাষা-গুলিতেই এই ধ্বনি-বিকারের প্রথম আলোচনা হইয়াছিল। ইংরেজি ও জর্মান ভাষায় এই রীতির বহুল প্রয়োগ ঘটিয়াছিল। কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যাইবে। প্রাচীন-ইংরেজি * Franc-isc> Frencsc (isc-এর i ই-কারের অপিনিহিতি, *Fraincsc রূপে পরিবর্তন, পরে i ই-কারের প্রভাবে পড়িয়া a আ-কারের e এ-কারে পরিণতি)> আধুনিক-ইংরেজি French; প্রাচীন-ইংরেজি একবচনে mann (= মানুষ), বহুবচনে *man-n-iz, তাহা হইতে *manni, *mainn > menn, আধুনিক ইংরেজি man—বহুবচনে men; fōt (= পা)—বহুবচনে *fōt-iz—পরে fœt, তাহা হইতে fēt, আধুনিক foot—feet; প্রাচীনতম-ইংরেজি * haria (হারিয়া-সেনা)>প্রাচীন-ইংরেজি here (= হেরে; এখন এই শব্দটি লুপ্ত); তদ্রূপ brother—brether (brethren), জর্মানের Bruder—Brüder (Brueder), food—feed প্রভৃতি বহুবচনের ও ক্রিয়ার রূপের উদ্ভব এই নিয়মে।

এই ধ্বনি-পরিবর্তন বা বিকারের কী নাম দেওয়া যায়? জর্মান ভাষায় ইহা প্রথম আলোচিত হয়, এবং জর্মান পণ্ডিতেরা ইহার একটি বেশ নামকরণ করিয়াছেন; Klopstock ক্লপ্‌ষ্টক্ কর্তৃক খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে এই নাম সৃষ্ট হইয়া প্রথম ব্যবহৃত হয়। নামটি হইতেছে Umlaut (উম্‌-লাউৎ); এই জর্মান শব্দটি ইংরেজিতেও বহুশঃ গৃহীত হইয়াছে; ইংরেজিতে আর একটি নাম ব্যবহৃত হয়—Vowel Mutation (ফরাসিতে Mutation vocalique)। Umlaut শব্দটি জর্মান উপসর্গ um-কে (যাহার অর্থ, 'চতুর্দিকে, অভিতঃ, প্রতি, উপরে', এবং সংস্কৃত 'অভি' উপসর্গ হইতেছে যাহার

প্রতিরূপ), ধ্বনিবাচক শব্দ Laut-এর সহিত যুক্ত করিয়া Umlaut শব্দের সৃষ্টি ; মোটামুটি অর্থ, 'ঘুরিয়া পরিবর্তিত ধ্বনি'। ঐই Umlaut শব্দের আধারের উপর ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ আমরা সহজেই গড়িয়া তুলিতে পারি। আধুনিক জর্মান Laut বিশেষ্য শব্দ ; Laut-এর ইংরেজি প্রতিরূপ হইতেছে loud (বিশেষণ শব্দ) ; Laut, loud এই উভয়েরই আদি জর্মানিক মূল রূপ হইতেছে *hluda বা *xluðáz (খ্.লুধ্.জ্.) এবং ইহার আদি ইন্দো-ইউরোপীয় মূল হইতেছে *klutós (ক্লুতোস্)—সংস্কৃতে যাহার পরিণতি হইতেছে śrutás (śrutáḥ 'শ্রুতঃ') ; শব্দটির ধাতু হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীয় *kleu বা *klu = সংস্কৃতে śru 'শ্রু'। Um-laut-এর উপসর্গ ও ধাতু-প্রত্যয় ধরিয়া ইহার সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে 'অভি-শ্রুত' ; যথা—
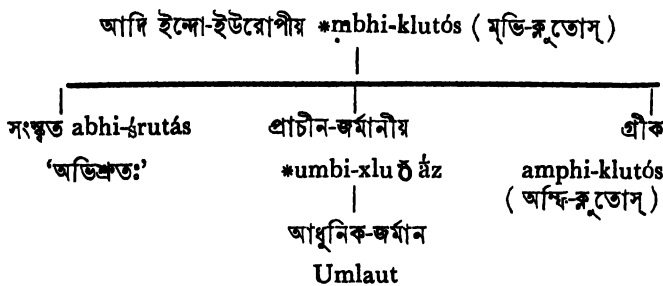
'অভিশ্রুত' কিন্তু সংস্কৃতে ব্যাকরণের সংজ্ঞা-সূচক পদ নহে, ইহার রূঢ়ি অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে 'বিখ্যাত'। 'অভি+শ্রু' ধাতুর অর্থ হইতে 'সম্যক্ রূপে শোনা', এবং এই অর্থে 'অভিশ্রবণ, অভিশ্রাব, অভিশ্রুত্য' পদগুলির প্রয়োগ আছে। আলোচ্য ধ্বনি-বিষয়ক বিকারকে বুঝাইবার জন্য, Umlaut-এর আক্ষরিক প্রতিরূপ শব্দ 'অভিশ্রুত' ব্যবহার না করিয়া, ইহার অন্তর্গত প্রত্যয় ক্ত-টিকে বদলাইয়া ক্তি-প্রত্যয়যুক্ত **অভিশ্রুতি** শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভালো হয়, এবং আমি এই নব-প্রযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিতে চাহি। 'শ্রুতি' শব্দ উচ্চারণ-তত্ত্বে পূর্বেই ভারতীয় বৈয়াকরণগণ-কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে ; যথা জৈন প্রাকৃতের 'য়-শ্রুতি' ('বচন>বঅণ>বয়ণ', 'মদন>মঅণ,ময়ণ',—দুই উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনির মধ্যে য়-কারের আগম)। এইরূপ য়-শ্রুতি বাঙ্গালাতেও আছে—যথা 'কেতক>কেঅঅ>কেয়া', ক্বচিৎ 'কেওয়া = কেয়া'; এবং য়-শ্রুতির

অনুরূপ 'ব-শ্রুতি'-ও প্রাকৃতে ও আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলিতে আছে—যেমন, 'কেতক-ট->কেঅঅড-> কেবঅড-> কেবড-=কেওড়া', ইত্যাদি। ভারতীয় ব্যাকরণে 'য়-শ্রুতি' আছে, ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে 'ব-শ্রুতি'-ও মিলে, এবং পারিভাষিক শব্দ 'ব-শ্রুতি'ও চলিবে ; 'অভিশ্রুতি'তে তদ্রূপ কোনও আপত্তি হইতে পারে না। 'অভি'-উপসর্গ দিয়া উচ্চারণ-তত্ত্বের আর একটি সংজ্ঞা প্রাতিশাখ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে—'অভিনিধান'—পদের অন্তে হলন্ত বা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে সংস্কৃতে একটি বৈশিষ্ট্য আসিত, সেই বৈশিষ্ট্য এই শব্দ-দ্বারা দ্যোতিত হইত।

[৪] চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন—ধাতুর মূল স্বরবর্ণকে অবলম্বন করিয়া। এই পরিবর্তনের মূল বাঙ্গালায় মিলে না—প্রাকৃতের মধ্য দিয়া ভারতের আদি আর্য্যভাষায় (সংস্কৃতে) ইহার মূল পাওয়া যায়। যেমন—'চলে<চলই<চলদি <চলতি ; চালে < চালেই<চালেদি<চালেতি< *চালয়্তি<চালয়তি ; চল<চলঃ ; চাল<চালঃ ; টুটে<টুটই<টুট্টই<টুট্টদি<টুট্টতি <ত্রুট্যতি ; তোডে<তোডই<তোডেই<তোডেদি<তোডেতি<তোটেতি<তোটয়তি <ত্রোটয়তি (টুট্<ত্রুট্ ; তোড্<ত্রোট্ ; মন্<মান ; দিশা—দেশ (<দিশ্, দেশঃ' ; ইত্যাদি। ধাতু-নিহিত স্বরধ্বনির এই প্রকারের পরিবর্তন, বাঙ্গালায় সাধারণতঃ সহজে ধরা যায় না,—'চল—চাল', 'পড—পাড' প্রভৃতি কতক-গুলি শব্দে 'অ—আ'-র অদল-বদল যেখানে দেখা যায়, সেখানে ছাড়া অন্যত্র স্বর-সংগতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি আসিয়া প্রাচীন ধাতু-গত স্বরধ্বনির নিয়মিত পরিবর্তনকে উলট-পালট করিয়া দিয়াছে। হিন্দী প্রভৃতি অন্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষাতেও এই পরিবর্তন দেখা যায় ; যথা—'মর্না >মার্না, খিঁচনা>খেঁচনা, তপ্না>তাব্না (তপ্যতে—তাপয়তি>তপ্পই—তাবেই > তপে—তাবে), জল্না—বার্না (জলতি—জ্বালয়তি>জলই—বালেই >জলে—বারে), নিকল্না—নিকাল্না, কাট্না—কট্না, পাল্না—পল্না' ; ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায়, এই পদ্ধতি-অনুসারে ধাতুস্থ স্বরধ্বনির নূতন রূপ গ্রহণ করা আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিতে আর জীবন্ত রীতি নহে—প্রাকৃত হইতেই এই রীতির ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

ধাতুর স্বরধ্বনির বিভিন্ন রূপ গ্রহণ সংস্কৃত ভাষার কিন্তু একটি বিশিষ্ট রীতি। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এই রীতিকে পূর্ণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন,

এবং 'গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ',— এই তিনটি সংজ্ঞা-দ্বারা এই পরিবর্তনের ধারাকে অভিহিত করিয়াছেন।

নিম্নে গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কার্য্য প্রদর্শিত হইতেছে—

ধাতু (সরল বা মূল রূপ)	গুণ	বৃদ্ধি	সম্প্রসারণ
বদ্ ধাতু	বদ্ (বদতি, বশংবদ)	বাদ্ (অনুবাদ)	উদ্ (অনূদিত)
যজ্ ধাতু	যজ্ (যজতি, যজ্ঞ)	যাজ্, যাগ্ (যাজক, যাগ, যাজ্ঞিক)	ইজ্ (ইজ্যা, *ইজ্‌তি >ইষ্টি)
বিদ্ ধাতু—বিদ্-(বিদ্যা)	বেদ্ (বেদ্)	বৈদ্ (বৈদ্য)	
শ্রু ধাতু	শ্রউ = শ্রব্, শ্রো (শ্রবণ, শ্রোতা)	শ্রৌ = শ্রাউ, শ্রাব্ (শ্রাবক, শ্রৌত)	
দুহ্ ধাতু—দুহ্-, দুঘ্- (দুগ্ধ)	দোহ্ দোঘ্ (দোহন, দোগ্ধা)	দৌহ্, দৌঘ্ (দৌগ্ধ)	
নী ধাতু—নী-(নীতি)	নই = নয়্, নে (নয়ন, নেতা)	নৈ = নাই, নায়্ (নৈতিক, নায়ক)	
ধৃ ধাতু—ধর্-, ধৃ- (ধৃতি)	ধর্ (ধরণ, ধরা)	ধার্ (ধারণ)	
কৢপ্ ধাতু—কৢপ্- (কৢপ্তি)	কল্প্ (কল্পনা)	কাল্প্ (কাল্পনিক)	

ধাতুর স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণাত্মক পরিবর্তন সংস্কৃতের ন্যায় ভারতের বাহিরের তাবৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মিলে। এইরূপ পরিবর্তন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যথা—

গ্রীকে—

péda (= পাৎ, পাদ) pṓda pōs epi-bd-ai

dérkomai (*দর্শামি) dédorka (= দদর্শ) é-drakon (= অদর্শম্)

tithēmi (= দধামি) thōmos (= ধামঃ) thetós (= হিতঃ)

লাতীনে—

fidō (= বিশ্বাস করি) foedus fidēs (বিশ্বাস),

dō (দদামি) dōnum (দানম্) datus (দত্তঃ)

canō (গান করি)	cecini (আমি গাহিলাম)	cantus (গান)

গথিকে—

bindan (=bind বন্ধ্ ধাতু)	band	bundum	bundans
bairan (=bear ভৃ ধাতু)	bar	bērum	baúrans
saíxwan (=see সচ্ ধাতু)	saxw	sēxwum	saíxwans (x=h)
lētan (=let)	laílōt	laílotum	lētans

ইংরেজিতে—

bind	bound	bounden	
bear	bore	born	
see	saw	seen	
sing	sang	sung	song

প্রাচীন-আইরীশে—

tíng (আমি যাই)	techt (গমন)
melim (চূর্ণ করি)	mlith (চূর্ণ করা)
saidid (ব্যবস্থা করে)	síd (সন্ধি, মিত্রতা)
il (বহু)	uile (সকল)
lín (সংখ্যা)	lán (পূর্ণ)

প্রাচীন-স্লাবে—

vedō (নয়ন করি)	(voje-)	voda	vĕs = ved-som pro-važdati = vadjati
tekō (দৌড়াই)	tokŭ	točiti	tĕxŭ = teksom pre-tĕkati, ras-takati

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতুর মূল স্বর অবিকৃত থাকিত না, নানা অবস্থায় তাহার পরিবর্তন ঘটিত। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বাট বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া গবেষণা ও আলোচনার পর এই পরিবর্তনের ধারাটি নির্ণয় করিয়াছেন। এই ধারায় অন্তর্নিহিত সূত্রটিরও বহু বিচার করা হইয়াছে। ধাতুর-স্বরধ্বনির যে সকল পরিবর্তন দেখা যায়, সেগুলির গ্রহন-সূত্রটি হইতেছে এই :—প্রত্যয় বা বিভক্তির দ্বারা যুক্ত হইয়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু,

পদ-রূপে ব্যবহৃত হইবার কালে stress accent বা শ্বাসাঘাত এবং pitch accent বা উদাত্তাদি স্বরের প্রভাবে পড়িত, এবং সেই ধাতুর অভ্যন্তরীণ মূল স্বরধ্বনি, প্রসারে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ও প্রকৃতিতে অর্থাৎ উচ্চারণ-স্থানের পরিবর্তনে নব নব রূপ ধারণ করিত, এবং কচিৎ-বা শ্বাসাঘাতের একান্ত অভাবে লুপ্ত হইয়াও যাইত, যথা,—

মূল্ ধাতু ed (= সংস্কৃত 'অদ্')—প্রকৃতি-গত বা গুণ-গত পরিবর্তনে হইল od ; তদনন্তর এই দুইটি হ্রস্ব রূপ, মূল-রূপে গৃহীত ed ও তদ্বিকার-জাত od, ইহাদের উভয়ের প্রসারে হইল দীর্ঘ ēd, ōd ; এবং শ্বাসাঘাতের একান্ত অভাবে, মূল স্বরধ্বনির লোপের ফলে, মাত্র -d রূপ লইয়া দাঁড়াইল ; ফলে, ধাতুর বিভিন্ন রূপ হইল এই,—

ed od ēd ōd -d

আদি ইন্দো-ইউরোপীয়ের e, o, a, এই তিনটি হ্রস্ব ধ্বনি সংস্কৃতে একটি মাত্র রূপ a বা অ-কারে পর্যবসিত হয়, এবং তদ্রূপ ইন্দো-ইউরোপীয় দীর্ঘ ē ō ā-ও সংস্কৃতে মাত্র দীর্ঘ ā বা আ-কারে পর্যবসিত হয় ; সুতরাং—

হ্রস্ব ed-, od-এর স্থলে সংস্কৃতে দাঁড়াইল ad = 'অদ্', ও দীর্ঘ ēd-, ōd-এর স্থলে সংস্কৃতে দাঁড়াইল ād = 'আদ্' ; এইরূপে 'অদ্' ধাতুর ফল হইল, 'অদ্-' (গুণ), 'আদ্-' (বৃদ্ধি) ও '-দ্-' (লোপ), যথা—

'অদ্-তি = অত্তি', 'অদ্-অন-ম্ = অদনম্' ; 'অদ্-ন- = অন্ন' ; 'আদ' (লিট্) ; 'অদ্'>'-দ্'+'-অন্ত্' (শতৃ) = 'দন্ত্' (যাহা খাদন ক্রিয়া করে)।

গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ—এক সূত্রে এই তিনটিকে গ্রথিত করিয়া দেখিলে, প্রত্যয়ের ও ধাতুর স্বরধ্বনির পরিবর্তনের সমস্ত ব্যাপারটি সহজবোধ্য হইয়া পড়ে। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু যেখানে নিজের মূল রূপে থাকে, এবং যেখানে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, কিন্তু প্রসার বা দীর্ঘীকরণ হয় না, সেইরূপ স্থলে সংস্কৃতে আমরা 'গুণ' পাই ; আর যেখানে ইহার নিজ মূল প্রকৃতির বা পরিবর্তিত প্রকৃতির প্রসার বা দীর্ঘীকরণ পাই, সেইরূপ স্থলে সংস্কৃতে পাই 'বৃদ্ধি' ; এবং যেখানে ধাতুর মূল স্বরের লোপ, ও ফলে 'য় র ল ব' (অর্থাৎ 'ই+অ, ঋ+অ, ঌ+অ, উ+অ') -স্থলে যেখানে 'য়্ র্ ল্ ব্' বা 'ই, ঋ, ঌ, উ' পাই, সংস্কৃতে সেখানকার এই পরিবর্তনকে বলে 'সম্প্রসারণ'। আদি ইন্দো-ইউরোপীয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে বুঝা যায় যে, ইহা-ই হইল গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মূল কথা।

সমগ্র ব্যাপারটিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে না দেখিয়া, গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এইরূপ আলাহিদা আলাহিদা নাম না দিয়া, একটি ব্যাপক সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। ইউরোপে এইরূপ ব্যাপক নামকরণ হইয়াছে, এবং একাধিক শব্দ জর্মান, ইংরেজি ও ফরাসিতে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮১৯ সালে জর্মান ভাষাতত্ত্ববিৎ Jakob Grimm য়াকোব গ্রিম্ জর্মান ভাষার প্রথম আধুনিক ভাষাতত্ত্বানুসারী ব্যাকরণ লিখেন। তখন তিনি এই স্বর-পরিবর্তনের নাম করিবার জন্য জর্মান ভাষায় (এই প্রবন্ধে প্রাগালোচিত Umlaut শব্দের অনুরূপ) একটি শব্দ সৃষ্টি করেন—সে শব্দটি হইতেছে Ablaut; উপসর্গ ab-এর সঙ্গে পূর্ববর্ণিত laut শব্দের যোগ। Ab উপসর্গের ইংরেজি প্রতিরূপ হইতেছে off, ও সংস্কৃত প্রতিরূপ 'অপ'। সম্পূর্ণ শব্দটির সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে 'অপশ্রুত', কিন্তু Umlaut-এর প্রতিরূপ-হিসাবে যেমন 'অভিশ্রুত' না ধরিয়া, 'অভিশ্রুতি'কে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তদ্রূপ এখানেও অপশ্রুত না বলিয়া **অপশ্রুতি**-ই গ্রহণ করিতে চাই। ধাতুর মূল স্বরধ্বনির—মূল শ্রুতির—অপ-গমন বা বিকার,—ইহা-ই হইবে 'অপশ্রুতি'র ধাতুগত অর্থ; প্রাকৃত ব্যাকরণের 'য়-শ্রুতি', তদবলম্বনে প্রযুক্ত 'ব-শ্রুতি', এবং নব-সৃষ্ট 'অভি-শ্রুতি'র পার্শ্বে এই 'অপশ্রুতি' শব্দ, ধ্বনি- বা উচ্চারণ-গত পরিবর্তনের সংজ্ঞা-হিসাবে, সহজ ভাবেই এক পর্য্যায়ের হইয়া দাঁড়াইবে। Ablaut বা অপশ্রুতির অন্য কয়েকটি নাম যাহা ইউরোপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হইতেছে ইংরেজি Vowel Alternance, বা স্বরের নিয়ন্ত্রিত আগমন বা পরিবর্তন, ফরাসিতে Alternances vocaliques; কিন্তু ইংরেজিতে Ablaut শব্দটিও বহুশঃ গৃহীত হইয়া গিয়াছে; এবং এতদ্ভিন্ন, Ablaut-এর গ্রীক প্রতিশব্দ দিয়া একটি শব্দ ভাষাতাত্ত্বিকেরা ব্যবহার করিতেছেন, বিশেষতঃ ফরাসীরা, যাঁহারা জর্মান Ablaut শব্দ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, অথচ Alternance vocalique অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত নাম চাহেন; ab-এর গ্রীক প্রতি-রূপ apo, এবং laut-এর গ্রীক প্রতি-শব্দ phōnē, এই দুই মিলাইয়া, গ্রীক Apophōneia, তাহা হইতে লাতীন Apophonia শব্দ কল্পনা করিয়া, এই Apophonia শব্দকে ইংরেজিতে Apophony এবং ফরাসিতে Apophonie রূপে ভাঙিয়া প্রয়োগ করিতেছেন। যাহা হউক, সংস্কৃত শব্দ 'অপশ্রুতি'-দ্বারা বাঙ্গালা প্রভৃতি আমাদের ভারতীয় ভাষায় কাজ চলিবে, এরূপ আশা করা যায়। 'চল্—চাল্', 'টুট্—তোড়্', 'দিশা—দেশ', 'পড়্—পাড়্', প্রাচীন বাঙ্গালার 'বিজু (=বিদ্যুৎ)

—বেজ (= বৈদ্য)'—এই প্রকারের স্বরবৈচিত্র্যকে অতএব ইন্দো-ইউরোপীয় 'অপশ্রুতি'-র ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন স্বরধ্বনি-ঘটিত অন্য যে সকল রীতি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, সেগুলির নাম বিদ্যমান আছে ;—যথা, লোপ ও আগম (আদ্য, মধ্য, অন্ত্য), এবং স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis)। এগুলি লইয়া আলোচনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে প্রস্তাবিত **স্বরসংগতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি** ও **অপশ্রুতি** বাঙ্গালা ভাষায় চলিতে পারিবে কি না, সুধীবর্গ তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন ॥

প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩৩৬, ৩য় সংখ্যা), পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪০) পুনর্মুদ্রিত হয়। বর্তমান পুনর্মুদ্রণে দুই-এক স্থানে সামান্য সংশোধন করা হইয়াছে।

মহাপ্রাণ বর্ণ

এই প্রবন্ধে চৌকা বন্ধনীর [ ] মধ্যে যে রোমান অক্ষরে ও রোমানের আধারে প্রস্তুত নূতন অক্ষরে বাঙ্গালা ও অন্য ধ্বনিগুলি লিখিত হইয়াছে, সেই অক্ষরগুলি International Phonetic Association-এর বর্ণমালার। অক্ষরগুলি কোন্ কোন্ ধ্বনির প্রতীক, তাহা নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে :—

: = স্বরধ্বনির দীর্ঘতা-জ্ঞাপক : 'তারা' [t*a*r*a*], 'তার' [t*a*:r]।

∼ = সানুনাসিকতা-জ্ঞাপক : 'বাস' [b*a*:ʃ], 'বাঁশ' [b*ã*:ʃ]।

a = সাধারণ বাঙ্গালা আ-কারের ধ্বনি : 'রাম' [r*a*:m]।

a = পূর্ব-বঙ্গের 'কা'ল' (কল্য)-তে যে আ-কারের ধ্বনি মিলে ; যথা— 'কাল' (= সময়, মৃত্যু, কৃষ্ণবর্ণ) = [k*a*:l] ; কিন্তু 'কা'ল' (= কল্য) = [ka:l] ('কাল, কাইল' [kaⁱl, kail] হইতে)।

æ = পশ্চিম-বঙ্গের 'এক, ত্যাগ, পেঁচা' প্রভৃতি শব্দের স্বরধ্বনি : [æ:k, tæ.g, pæ̃:cʃ*a*]।

b = ব ; c = প্রাচীন আর্য্যভাষার (বৈদিকের) চ-কারের ধ্বনি, কতকটা ক্য = ky-র মতো শুনায় ; শুদ্ধ plosive বা stop অর্থাৎ স্পৃষ্ট ধ্বনি—তালব্য অঘোষ অল্পপ্রাণ ; ch = বৈদিক 'ছ'।

cʃ = পশ্চিম-বাঙ্গালার 'চ'-এর ধ্বনি—তালব্য অঘোষ অল্প-প্রাণ affricate অর্থাৎ ঘৃষ্ট ; cʃh = পশ্চিম-বাঙ্গালার 'ছ' = chh।

ç = জর্মান ich শব্দের ch-এর ধ্বনি = বৈদিক 'শ'।

d = দ ; ḍ = ড ; dɦ = ধ ; ḍɦ = ঢ ; *d* = ইংরেজি d, দন্তমূলীয় ; dˀ = পূর্ব-বঙ্গের 'ধ', ḍˀ = পূর্ব-বঙ্গের 'ঢ'।

e = পশ্চিমবঙ্গের এ-কার ; 'দেশ, ক্ষেত, কেবল' [de:ʃ, khe:t, kebȯl] ; ɛ = পূর্ব-বঙ্গের এ-কার—[dɛ:ʃ, khɛ:t, kɛbɔl]।

f = দন্তোষ্ঠ্য অঘোষ, উষ্ম ধ্বনি, ইংরেজি f.।

g = গ ; gɦ = ঘ ; gˀ = পূর্ব-বঙ্গের 'ঘ'।

ɣ = ফার্সী غ অক্ষরের ধ্বনি, ঘোষবৎ উষ্ম 'ঘ.'।

h = অঘোষ 'হ', ইংরেজির h = সংস্কৃতের বিসর্গ ; যথা, ইংরেজি happy = [hæpi], hat = [hæ*t*]।

ɦ = সংস্কৃত ও বাঙ্গালার ঘোষবৎ 'হ' ; যথা, বাঙ্গালা 'হাত' = [ɦa:t], 'হাট' = [ɦa:ṭ] ।

i = ই, ঈ ; j = 'য়', ইংরেজির y ।

ɟ = প্রাচীন সংস্কৃতের শুদ্ধ তালব্য স্পর্শ-ধ্বনি, বৈদিক 'জ', কতকটা গ্য = gy-র মতো ধ্বনি ।

ʝʒ = পশ্চিম-বাঙ্গালার 'জ'-এর ধ্বনি ; ঘৃষ্ট তালব্য ঘোষ-ধ্বনি ; ʝʒɦ = পশ্চিম-বঙ্গের 'ঝ' ।

k = ক ; kh = খ ; k? = হ-কারের প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের 'ক' ।

l = ল ; m = ম ; n = ন ; o = ও ; ǒ = ও-ঘেঁষা অ ।

p = প ; ph = 'ফ = প্‌হ', হিন্দীর মতো ; p? = হ-কারের প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের 'প' ।

r = বাঙ্গালার 'র' ; ɹ = দক্ষিণ-ইংরেজি চলিত ভাষার উষ্ম ঘোষবৎ r ।

s = সংস্কৃতের দন্ত্য 'স', পূর্ব-বঙ্গের 'ছ', ফার্সীর س ث ص ।

ʃ = বাঙ্গালার 'শ, ষ, স' ; ʃ̣ = সংস্কৃতের মূর্ধন্য 'ষ' ।

t = ত ; th = থ ; ṭ = ট ; ṭh = ঠ , *t* = ইংরেজি t, দন্তমূলীয় ; t?, ṭ? = হ-কারের প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের 'ত' ও 'ট' ।

u = উ, ঊ ; v = দন্ত্যোষ্ঠ্য ঘোষবদ্‌ উষ্ম ধ্বনি, ইংরেজির v ।

w = ইংরেজির w, 'উঅ্‌' ।

x = ফার্সী خ-র ধ্বনি, অঘোষ উষ্ম 'খ.' ।

z = বাঙ্গালা 'মেজদা' [mezd*a*] শব্দে শ্রুত ধ্বনি, ইংরেজির z ফার্সীর ز ذ ض ظ ।

ẓ বা ɹ̣ = তামিল ভাষায় প্রাপ্ত ধ্বনি—মূর্ধন্য ʃ̣ (ষ)-এর ঘোষবদ্‌ রূপ ।

? = কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি (glottal stop) ।

ɸ = প্রচলিত বাঙ্গালা 'ফ'-এর ধ্বনি ; ওষ্ঠ্য অঘোষ উষ্ম ।

β = প্রচলিত বাঙ্গালা 'ভ'-এর ধ্বনি ; ওষ্ঠ্য ঘোষবদ্‌ উষ্ম ।

ʒ = ফরাসি j-র ধ্বনি, ঘোষবৎ তালব্য উষ্ম (ইংরেজি pleasure শব্দে শ্রুত zh-বৎ s-এর ধ্বনি = plezhăr = [plɛʒə(ɹ)]) ।

ɔ = বাঙ্গালা অ-কার ; তুলনীয়, ইংরেজি call, law [kʰɔ:l, lɔ:] ।

ʌ = সংস্কৃতের : সংবৃত অ-কার, হিন্দীর অ-কার, ইংরেজি cut, son শব্দের স্বরধ্বনি = [kʰʌ*t*, sʌn] ।

ə = হিন্দীর অতি-হ্রস্ব অ-কার ; যথা—‘রতন’ [rʌtən] ; ইংরেজির ago, China, Russia, India প্রভৃতির a (= [əgou, tʃainə, rʌʃə, indiə]).

§ ১। ভারতীয় বর্ণমালায়, বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে ‘মহাপ্রাণ বর্ণ’ বলে : ‘খ, ঘ; ছ, ঝ; ঠ, ঢ; থ, ধ; ফ, ভ’—এইগুলি মহাপ্রাণ বর্ণ। প্রাতিশাখ্য-কারগণ এগুলির উচ্চারণের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; আধুনিক ভারতে এগুলির উচ্চারণ লুপ্ত হয় নাই। অল্পপ্রাণ স্পর্শবর্ণের (অর্থাৎ বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের) উচ্চারণ-কালে, শ্রূয়মাণ উষ্মা বা প্রাণ বা শ্বাসবায়ুর যুগপৎ নির্গমন ঘটিলে, সোষ্ম বা মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনির উদ্ভব হয়। ক্-এর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বা শ্বাসবায়ু বা উষ্মা নির্গত হইলে, দাঁড়াইল ‘ক্+প্রাণ’ = ‘খ্’ ; তদ্রূপ ‘গ্+প্রাণ’ = ‘ঘ্’।

এই প্রাণ বা উষ্মা বা শ্বাসবায়ু যখন সহজ ও স্বাধীন ভাবে নির্গত হয়—কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরস্থ glottal passage বা কণ্ঠনালীমুখের মধ্য দিয়া চালিত হইয়া, উন্মুক্ত মুখ-বিবরে কোথাও ব্যাহত বা বাধা-প্রাপ্ত না হইয়া বাহির হইয়া যায়,—তখন ইহা আমাদের কর্ণে হ-কার এবং বিসর্গের ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয় : কণ্ঠনালীর মধ্যস্থিত vocal chords বা অধরোষ্ঠ-স্বরূপ পেশীর আকর্ষণের ফলে, glottal passage বা কণ্ঠনালী-মুখের সংবার বা রোধ ঘটিলে, নির্গমনশীল শ্বাসবায়ুর দ্বারা আহত হইয়া উক্ত vocal chords বা কণ্ঠনালীস্থ পেশীগুলির মধ্যে vibration বা ঝঙ্কৃতি হয়, এবং তাহার ফলে, ঘোষ-ধ্বনি হ-কারের উৎপত্তি ঘটে ; এবং কণ্ঠনালীর মধ্যস্থিত glottal passage বা মুখ-প্রণালীর বিবার বা মুক্তি ঘটিলে, vocal chords-এর পেশীগুলির আকর্ষণের কারণ থাকে না, নির্গমনশীল শ্বাসবায়ু নিরুপদ্রবে বাহিরে চলিয়া আইসে, কোনও ঝঙ্কৃতি শ্রুত হয় না,—তাহার ফলে অঘোষ হ-কারের উৎপত্তি ঘটে।

এই অঘোষ হ-কারই হইতেছে স্বাধীন বিসর্গের মূলধ্বনি, যেস্থলে এই বিসর্গকে পূর্বগামী স্বরধ্বনির আশ্রয়-স্থানভাগিত্ব বা অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। ইংরেজির h হইতেছে এইরূপ অঘোষ হ-কার ; আমাদের ভারতীয় ঘোষবৎ হ-কার হইতে ইহা পৃথক্। শুদ্ধ প্রাণ বা উষ্মা বা শ্বাসবায়ু, যদি অঘোষ বিসর্গ ও ঘোষ হ-কার রূপে বহির্গত হইতে না পারে—মুখের মধ্যে জিহ্বার অথবা মুখের বাহিরে ওষ্ঠদ্বয়ের সমাবেশের ফলে ইহার নির্গমন যদি ব্যাহত হইয়া যায়, তাহা হইলে যে ধ্বনি শুনা যায়, সেই ধ্বনি হইতেছে

জিহ্বাদির সমাবেশ অনুসারে বিভিন্ন বর্গের spirant বা fricative অর্থাৎ উষ্মধ্বনি। সহজ ভাবে বিনির্গত হ-কার,—অর্থাৎ অঘোষ [h] এবং ঘোষবৎ [ɦ]-এর পরিবর্তে, আমরা তখন পাই—[x, ɣ ; ʃ, ʒ ; ʃ̣, ẓ বা ɹ̣ ; s, z ; θ, ð ; f, v ; ɸ, β] প্রভৃতি বিভিন্ন উচ্চারণ-স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন ভিন্ন উষ্ম ধ্বনি। পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির (এবং কচিৎ পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির) উচ্চারণের প্রভাবে পড়িয়া, অর্থাৎ এইরূপ স্বরধ্বনির (অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির) উচ্চারণে জিহ্বার অবশ্যম্ভাবী সমাবেশের প্রভাবে পড়িয়া এইরূপ শুদ্ধ বিসর্গ বা হ-কার, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয় প্রভৃতি উষ্ম ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া যায় : যেমন, [ah, aɦ>ax, aɣ ; ih, iɦ>iç, ij, বা iç, iʒ ; uh, uɦ>uɸ, uβ], ইত্যাদি। কণ্ঠ্য, ওষ্ঠ্য এবং তালব্য প্রভৃতি এই সকল বিশিষ্ট উষ্ম ধ্বনি হইতেছে বিশুদ্ধ কণ্ঠনালীজাত উষ্মধ্বনি বা প্রাণধ্বনি অঘোষ 'ঃ' [h] ও ঘোষবৎ 'হ' [ɦ]-এর রূপভেদ।

স্পর্শবর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত করিতে যে প্রাণ বা উষ্মার বা শ্বাসবায়ুর আবশ্যকতা হইয়া থাকে, তাহা কেবল মাত্র সহজ 'অঘোষ হ্'—'ঃ' (অঘোষ 'ক্ চ্ ট্ ত্ প্'-এর সহিত), অথবা সহজ 'ঘোষবৎ হ' (ঘোষবৎ 'গ্ জ্ ড্ দ্ ব্'-এর সহিত)। অতএব,—

অল্পপ্রাণ অঘোষ 'ক্ চ্ ট্ ত্ প্' [k c ṭ t p]-এর সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীয় 'অঘোষ প্রাণ বা উষ্মা [h]' যোগ করিয়া, অঘোষ মহাপ্রাণ 'খ্ ছ্ ঠ্ থ্ ফ্' [kh ch ṭh th ph]-এর উৎপত্তি হয় ; এবং তদ্রূপ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ 'গ্ জ্ ড্ দ্ ব্' [g ɟ ḍ d b]-এর সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীয় 'ঘোষবৎ প্রাণ বা উষ্মা [ɦ]' যোগ করিয়া ঘোষবৎ মহাপ্রাণ 'ঘ্ ঝ্ ঢ্ ধ্ ভ্' [gɦ ɟɦ ḍɦ dɦ bɦ]-এর উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

ভারতীয়-আর্য্য-ভাষায় আদি যুগ হইতে এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি বিদ্যমান ; এগুলি মূল আর্য্য-ভাষার বিশিষ্ট ধ্বনি। সেই হেতু, আর্য্য ভাষার জন্য প্রাচীন কালে ভারতে প্রথম যখন বর্ণমালার উদ্ভব হইল, তখন পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর দ্বারা এই বিশিষ্ট ধ্বনিগুলি দ্যোতিত হইল। তাহার ফলেই আমরা প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন নাগরী, বাঙ্গালা, শারদা, তেলুগু-কন্নড, গ্রন্থ প্রভৃতি আধুনিক বর্ণমালাগুলিতে 'খ, ঘ, ছ, ঝ' প্রভৃতি পৃথক্ দশটি মহাপ্রাণ বর্ণ পাই। পরবর্তী কালে যখন মুসলমানদের আমলে ফার্সী লিপির সাহায্যে ভারতীয় ভাষা হিন্দুস্থানী প্রভৃতি প্রথম লিখিত হইল, তখন মহাপ্রাণ বর্ণগুলির

প্রকৃতি সহজেই বিশ্লেষ করিয়া লইয়া, অল্পপ্রাণধ্বনি-ব্যঞ্জক ‘ক, গ, চ, জ, ত, দ্’ প্রভৃতিতে হ-কার যোগ করিয়া লেখা হইল—کھ گھ چھ جھ تھ دھ ‘ক্‌হ্‌ (খ), গ্‌হ্ (ঘ), চ্‌হ্ (ছ), জ্‌হ্ (ঝ), ত্‌হ্ (থ), দ্‌হ (ধ)’ ইত্যাদি। প্রাচীন লাতীনেরা যে রীতিতে গ্রীকের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে রোমান বর্ণমালায় লিখিত (প্রাচীন গ্রীক x = খ, ϕ = ফ, θ = থ, রোমানে যথাক্রমে ch, ph, th), সেই রীতির অনুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় রোমান অক্ষরে, আমাদের মহাপ্রাণ ‘খ, ঘ, ছ, ঝ, থ, ধ’ প্রভৃতির স্থানে ইংরেজেরা kh, gh, ch (chh), jh, th, dh প্রভৃতি লেখার ব্যবস্থা করিয়া লইল।

§ ২। মহাপ্রাণ ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ করিতে হইলে, অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনির অনুগামী এই কণ্ঠনালীর উষ্ম-ধ্বনিরও স্পষ্ট এবং শ্রুতিগম্য উচ্চারণ করা আবশ্যক। হ-কারের উচ্চারণ ভাষায় বিশুদ্ধ ভাবে বিদ্যমান না থাকিলে, এইরূপ মহাপ্রাণ স্পর্শ-বর্ণগুলির উচ্চারণ করা যে কঠিন হইয়া উঠে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক ভারতে বহু শতাব্দী ধরিয়া মৌখিক ভাষার বিকারের বা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সংস্কৃত বা ভারতের আদি-আর্য্য-ভাষার প্রাচীন উচ্চারণ-রীতি সর্বত্র সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। ‘সংস্কৃত’, উচ্চারণ-পরিবর্তন বা উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে, ‘প্রাকৃত’ হইয়া দাঁড়াইল। উচ্চারণের এই ব্যত্যয়, বা বিকার অথবা পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, এক স্বাভাবিক বিকাশ-ধর্মের ফলে ; কারণ, প্রতি পুরুষে বা বংশ-পীঠিকায়, ভাষা অলক্ষিত ভাবে একটু একটু করিয়া বদলায়। অনেক সময়ে এই বদলানো এত সূক্ষ্মভাবে ঘটে যে, দুই তিন পুরুষেও সাধারণ লোকে তাহা ধরিতে পারে না। অপর, উচ্চারণের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল, নানা অনার্য্য-ভাষী জাতি কর্তৃক আর্য্য-ভাষা গ্রহণের ফলে ; আর্য্য-ভাষার ধ্বনি-রীতি অনার্য্যের অভ্যস্ত ছিল না, আর্য্য-ভাষা অনার্য্যভাষীর দ্বারা গৃহীত হইতে থাকিলে, অনার্য্য-ভাষার বহু ধ্বনি, বহু উচ্চারণ-রীতি এই আর্য্য-ভাষায় আসিয়া যায়। ভারতবর্ষে যে লক্ষ লক্ষ অনার্য্য-ভাষী আর্য্য-ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল, সেরূপ অনুমান করিবার পক্ষে অনেক কারণ আছে। এইরূপে প্রাকৃত যুগেই সংস্কৃত ভাষায় ভাঙন ধরিয়াছিল —বাহ্যতঃ উচ্চারণে, এবং অভ্যন্তরীণ ভাবে শব্দে, ব্যাকরণে, ও বাক্য-রীতিতে। পরে আরও ধরে। আদি-আর্য্য-ভাষার তথা প্রাকৃত যুগের উচ্চারণ-রীতি কিরূপ ছিল, তাহা সর্বত্র স্পষ্ট ভাবে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, আদি-আর্য্য উচ্চারণ-রীতি

বহুস্থলে অনপেক্ষিত ভাবে পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হইয়াছে। এইরূপ পরিত্যাগ বা পরিবর্তন যে কত প্রাচীন কালে ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্ণয় করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য।

§৩। বাঙ্গালা ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির (এবং হ-কারের) অবস্থান আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এগুলির যথাযথ উচ্চারণ-বিষয়ে সমগ্র গৌড়-বঙ্গদেশ (অর্থাৎ রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, চট্টল) এক নহে। এই বর্ণগুলির দুই প্রকারের উচ্চারণের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। এক প্রকারের উচ্চারণ পশ্চিম-বঙ্গে ('গৌড়দেশে') শুনা যায়; অন্য প্রকারের উচ্চারণ পূর্ব-বঙ্গে ('বঙ্গদেশে') মিলে। উত্তর-বঙ্গে (বরেন্দ্র-ভূমিতে ও কামরূপে) পূর্ব-বঙ্গের প্রভাব আজকাল সমধিক ভাবে বিদ্যমান, কিন্তু উচ্চারণ-বিষয়ে এক সময়ে উত্তর-বঙ্গ রাঢ়ের সহিত সমান ছিল বলিয়া অনুমান হয়। আমরা 'গৌড়' ও 'বঙ্গ'—এই দুই প্রদেশের বিশিষ্ট উচ্চারণ আলোচনা করিব।

§৪। গৌড়ের মহাপ্রাণ বর্ণগুলির উচ্চারণ-সম্বন্ধে বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু বলিব না, অন্যত্র এ বিষয়ে সবিস্তর আলোচনা করিয়াছি। গৌড়ে হ-কারের উচ্চারণ বলবৎ আছে—শব্দের আদিতে, ঘোষবৎ 'হ'-কে আমরা যথাযথ উচ্চারণ করিয়া থাকি; যেমন—'হয়, হাত, হিত, হে, হোম, হুকুম, হিন্দু (হিঁদু)' [ɦɔe̯, ɦɑ:t, ɦi:t, ɦe:, ɦo:m, ɦukum, ɦindu বা ɦĩdu]। শব্দের মধ্যে ঘোষবৎ 'হ' দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং সাধারণতঃ কথিত ভাষায় লুপ্ত হয়: যথা, 'ফলাহার > ফলাআর > ফলার [phɔlɑɦɑr > phɔlɑɑr > phɔlɑr, ɸɔlɑr]; পুরোহিত > পুরোইত্ > *পুরুইত্ > পুরুত্ [puroɦit > puroit > puruit > purut]; বাহাত্তর > বাআত্তর [bɑɦɑttɔr> bɑɑttor]; পহুঁছা > পঁহুছা > পঁউছা, পৌঁছা [pɔhũcʃhɑ> pɔ̃hucʃhɑ> põucʃhɑ]; বহূ > বহু > বউ, বৌ [bɔɦu: > boɦu > bou]; মহু > মৌ [mɔɦu > mou]; সহি > সই, সৈ [ʃɔɦi > ʃoi]; দহি > দই, দৈ [dɔɦi > doi]'। শব্দের অন্তে ঘোষবৎ 'হ' [ɦ] গৌড়ে পাওয়া যায় না—লুপ্ত হয়; অথবা শেষে স্বরবর্ণ আনা হয়, এবং এই স্বরবর্ণের আশ্রয় পাইয়া 'হ' পূর্ণ-ভাবে অবস্থান করে; যেমন—'সাধু > সাহু > সাহ > সাহ্ > সা বা সাহা [sɑ:dɦu > ʃɑ·ɦu > ʃɑ:ɦɔ > ʃɑ:ɦ> ʃɑ:, ʃɑɦɑ]; ফার্সী শাহ্ > শা, শাহা [ʃɑ:h > ʃɑ:, ʃɑhɑ]; অষ্টাদশ > অট্ঠারহ—হিন্দী অঠারহ্ [ʌṭhɑ:rʌɦ], বাঙ্গালা আঠারো [ɑṭhɑro]'; ইত্যাদি।

অঘোষ 'হ' [h]—অর্থাৎ বিসর্গ—গৌড়ের ভাষায় হর্ষ-বিস্ময়াদি-বাচক অব্যয় শব্দে, কেবল শব্দের অন্তে, শুনা যায়; যেমন—'আঃ, এঃ, ইঃ, ওঃ, উঃ' [ah, eh, ih, oh, uh] ইত্যাদি; আবার এই ধ্বনি, আশ্রিত স্বরধ্বনির প্রকৃতি-অনুসারে, বিকল্পে বিভিন্ন উষ্ম ধ্বনিতেও পরিবর্তিত হইতে পারে: 'আখ্., এশ্., ইশ্., ওফ্., উফ্.' [ax, eç, iç বা iʃ, oɸ, uɸ], ইত্যাদি।

স্পর্শ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির মধ্যে, 'ফ ভ' সাধারণতঃ ওষ্ঠ্য উষ্ম ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; 'ফল' = [phɔ:l] না হইয়া [ɸɔ:l], বা [fɔ:l]; 'প্রফুল্ল' [prɔphullɔ]-স্থানে [proɸullo, profullo]; 'ভয়' = [bhɔĕ]-স্থলে [βɔĕ]; 'উভয়' = [ubɦiɔĕ]-স্থলে [uβɔĕ] বা [uvɔĕ]; 'অভিভাবক'—[obɦiibɦabɔk]-স্থলে [oβiβabòk, ovivabók]; 'লাভ' = [la bɦi] না হইয়া [la:β, la:v]। 'ফ ভ' ভিন্ন অন্য মহাপ্রাণ বর্ণ (খ ঘ, ছ ঝ, ঠ ঢ, থ ধ) পশ্চিম-বঙ্গের উচ্চারণে শব্দের আদিতে অবিকৃত থাকে, এইরূপ অবস্থায় এগুলি স্পষ্ট উচ্চারিত হইয়া থাকে—মহাপ্রাণের বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ অল্পপ্রাণ স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে অঘোষ বা ঘোষবৎ হ-কারের উচ্চারণ) এখানে পূরাপূরি বিদ্যমান আছে; যেমন—'খায় [khaĕ], ক্ষতি [khoti] (অথবা 'ক্ষেতি' [kheti]), খাঁ [khã:], ঘা [gɦia:], ঘুম [gɦiu:m], ঘ্রাণ [gɦira:n], ছয় [cʃhɔĕ], ছানা [cʃhana], ঝাউ [ɟʒɦiau], ঝড় [ɟʒɦiɔ:r], ঝাঁক [ɟʒɦiã:k], ঠাকুর [ṭhakur], ঠিকা [ṭhika], ঢাক্ [ḍɦia:k], ঢোল [ḍɦio:l], থালা [thala], থ'লে [thole], ধান [dɦia:n], ধর্ম [dɦiɔrmò], ধ্রুব [dɦirubò]', ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের অন্তে এই মহাপ্রাণগুলি আসিলে, বা শব্দের মধ্যে অন্য ব্যঞ্জন-ধ্বনির পূর্বে আসিলে, ইহাদের প্রাণ-অংশটুকু অর্থাৎ আনুষঙ্গিক হ-কার (অঘোষ বা ঘোষবৎ), আর উচ্চারিত হয় না,—কেবল অল্পপ্রাণ স্পর্শ-ধ্বনিই শুনা যায়; এক কথায় এই অবস্থায় উচ্চারণে ইহারা অল্পপ্রাণ বর্ণেই পরিবর্তিত হয়; যথা—'মুখ = মুক্ [mu:kh > mu:k], রাখ = রাক্ [ra:kh > ra:k], রাখিতে > রাখ্‌তে = রাক্‌তে [rakhite > rakhte > rakte], দেখিতে > দেখ্‌তে = দেক্‌তে [dekhite > dekhte > dekte], বাঘ = বাগ্ [ba:gɦi > ba:g], বাঘকে < বাগ্‌কে = বাক্‌কে [bagɦike > bagke > bakke], মাছ = মাচ্ [ma:cʃh > ma:cʃ], মাছটা = মাচ্‌টা [macʃhṭa > macʃṭa], সাঁঝ = সাঁজ্ [ʃã:ɟʒɦi > ʃã:ɟʒ], সাঁঝ-সকাল = সাঁজ্-সকাল্ [ʃã:ɟʒɦi-ʃɔkal > ʃã:ɟʒ-ʃckal], কাঠ = কাট্ [ka:ṭh > ka:ṭ], ষাঠি > ষাট্ [ʃaṭhi > ʃa:ṭ], অষ্ট > অট্‌ঠ > আঠ >

আঢ্ [a:ṭhɔ>a:ṭ], রাঢ>রাড্ [ra:ṛfi>ra:ṛ]—('ড ঢ' শব্দের মাঝখানে বা শেষে থাকিলে 'ড় ঢ়' হইয়া যায়), হাথ>হাত্ [fia:thɔ> fia:t], পথ=পত্ [pɔ:th>pɔ:t], বাঁধ=বাঁদ্ [bã:dfi>bã:d], সাধিতে =সাধ্তে=সাদ্তে > সাত্তে [ʃadfiite>ʃadfite>ʃadte>ʃatte]' ইত্যাদি। শব্দের অভ্যন্তরে দুই স্বরধ্বনির মধ্যে অবস্থান করিলে গৌড়ে অনেক স্থলে, বিশেষতঃ রাঢ়ে, মহাপ্রাণ বর্ণগুলি রক্ষিত হয়; কিন্তু ভাগীরথীর দুই ধারের দেশে, ভদ্র চলিত-ভাষায়, এক্ষেত্রেও মহাপ্রাণ বর্ণ শুনা যায় না। অঘোষ মহাপ্রাণ হইলে শব্দের অভ্যন্তরে উচ্চারিত হইতে পারে, কিন্তু অতি মৃদুভাবে, মোটেই জোর দিয়া নহে: যেমন—'দেখা, আছে, ক'র্ছে, মিছা>মিছে, কাঠা, কথা [dækha, acʃhe, korcʃhe, micʃha>micʃhe, kaṭha, kɔtha]'—সাধারণতঃ ইহাদের উচ্চারণ করা হয় 'দ্যাকা, আচে, ক'চ্চে, মিচে, কাটা, কতা [dæka, acʃe, kocʃcfe, micʃe, kaṭa, kɔta]'; তবে 'দ্যাখা [dækha],আছে, ক'চ্ছে, মিছে, কাঠা, কথা' -ও অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু ঘোষবৎ মহাপ্রাণ সাধারণতঃ পূরাপূরি বা বিশুদ্ধভাবে শুনা যায় না: যেমন—'বাঘের, বাঘা' [bagfier, bagfia]; যদি কেহ কলিকাতা অঞ্চলে 'বাগ্হের, বাগ্হা' [bag-fier, bag-fia] বলে, তাহা হইলে লোকে 'রেঢো টান' ধরিয়া ফেলিবে—'বাগের, বাগা' [bager, baga]—এইরূপ অল্পপ্রাণ উচ্চারণই স্বাভাবিক। তদ্রূপ 'বাঁঝা=বাঁজা [bãjʒfia>bãjʒa], মাঝুয়া >মেজো [majʒfiua>mejʒo], দৃঢ=দ্রিঢ়ো [driṛfiɔ>driṛo], বাধা= বাদা [badfia>bada], বাঁধা=বাঁদা [bãdfia>bãda]'।

গৌড় বা পশ্চিম-বঙ্গ সম্বন্ধে অতএব বলা যায়—

১। হ-কার এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি শব্দের আদিতে সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয়। শব্দের অভ্যন্তরে বা অন্তে হ-কারের লোপ এবং মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণে আনয়নই সাধারণ, তবে ক্বচিৎ বিকল্পে অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হইতে পারে। সাধু-ভাষার পাঠে, বা সজ্ঞান ও সচেষ্ট সাধু-ভাষা-অনুমোদিত উচ্চারণে অবশ্য 'হ' [fi] বা ঘোষবদ্ মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে।

২। অঘোষ 'হ' [h]—বিসর্গ—শব্দের অন্তে শুনা যায়, এবং এই অঘোষ 'হ'-ই অঘোষ মহাপ্রাণের—'খ ছ ঠ থ ফ'-এর অঙ্গীভূত হইয়া বিদ্যমান [k-h, cʃ-h, ṭ-h, t-h, p-h]।

এতদ্ভিন্ন 'ন(ণ), ম, র, ল' উচ্চারণে ইহাদের পরে হ-কার আসিলে, এই হ-কারকেও সাধারণতঃ বর্জন করা হয়—যেখানে সচেষ্ট উচ্চারণ করা হয়, সে অবস্থা ছাড়া। যথা—'চিহ্ন=চিন্নো [cʃifinʌ>cʃinfiɔ > cʃinno], মধ্যাহ্ন=মোদ্ধ্যান্নো [mʌdfija:finʌ>mɔdfija:nfiɔ > mɔidfieanfiɔ > moddfiænno], অপরাহ্ণ=অপোরান্নো [ʌpʌra:fiṇʌ> ɔpɔranfio > ɔporanno], ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্‌মণ> ব্রাম্‌হণ =ব্রাম্মোন [bra:fimʌṇʌ > bra:mfiɔṇɔ>brammon], ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্‌ম>ব্রাম্‌হ=ব্রাম্মো [brafimɔ >bramfiɔ > brammo], পূর্ব-বঙ্গে 'ব্রাম্ম্য' = bra'mmò], গর্হিত= গোর্‌হিৎ, গোর্‌রিৎ [gərfiit>gorrit], আহ্লাদ=আহ্‌লাদ > আল্‌হাদ= আল্লাদ্‌ [a:filadʌ > a:lhad>allad], প্রহ্লাদ = প্রহ্‌লাদ > প্রল্‌হাদ> প্রোল্লাদ্‌, প্রেল্‌হাদ > প্রেল্লাদ্‌ > পেল্লাদ্‌ [prʌfila:dʌ > prɔlfiad - prollad, prelfiad> prellad, pellad], ইত্যাদি।

গৌড়ের ভাষাকে পশ্চিমের হিন্দীর সহিত তুলিত করিলে দেখা যায় যে, হিন্দী এ বিষয়ে গৌড়ের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষণশীল। হিন্দীতে সব ক্ষেত্রেই—কি আদিতে, কি মধ্যে, কি অন্তে—হ-কার [fi] এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি অটুট থাকে; যথা—বাঙ্গালা 'বোনাই' [bonai], হিন্দী 'বহনোঈ' [bæhno:i:]; বাঙ্গালা 'বউ, বৌ' [bou], হিন্দী 'বহু' [bʌfiu:]; বাঙ্গালা 'তের' [tæro], হিন্দী 'তেরহ্' [te:rʌfi, te:rʌfiɔ].

§ ৫। এক্ষণে বঙ্গের (অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের) মৌখিক বা কথ্য ভাষায় এই ধ্বনিগুলির যে উচ্চারণ শুনা যায়, তাহার আলোচনা করা যাউক। পশ্চিম-বঙ্গের সাধারণ অধিবাসীর ধারণা এই যে, পূর্ববঙ্গ-বাসিগণ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারেন না, এবং ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে অল্পপ্রাণ করিয়াই উচ্চারণ করেন—'ঘ ঝ ঢ ধ ভ'-কে অবিমিশ্র 'গ জ ড দ ব' বলিয়া থাকেন। চ-বর্গীয় বর্ণগুলির তালব্য উচ্চারণ—অর্থাৎ [cʃ, cʃh, ɟʒ, ɟʒh]-স্থলে দন্ত্য উচ্চারণ—[ts, s, dz বা z]; এবং 'ড ঢ়' (ṛ, ṛfi)-স্থলে 'র' [r]; এইগুলির, ও ঘোষ মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণ উচ্চারণ; তথা হ-কারের লোপ; এই সমস্ত পূর্ব-বঙ্গের ভাষার বা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই মহাপ্রাণগুলিকে যে কেবল মাত্র অল্পপ্রাণ করিয়া লওয়া হয় না, এবং হ-কারের লোপ-সাধন মাত্র হয় না, ইহা প্রত্যেক পূর্ববঙ্গ-বাসী জানেন। আসল কথা এই যে—কণ্ঠনালীতে জাত উষ্ম ধ্বনি হ-কারের পরিবর্তে অন্য

একটি ধ্বনি পূর্ব-বঙ্গে ব্যবহৃত হয়, এবং মহাপ্রাণ বর্ণে অবস্থিত অঘোষ বা ঘোষ উষ্মা বা প্রাণ অথবা শ্বাসবায়ু, অর্থাৎ কিনা হ-কারের স্থানে, এই নবীন ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়; অথবা এই ধ্বনির উচ্চারণের উপযোগী কার্য্য মুখের মধ্যে ঘটে। এই ধ্বনিটি হইতেছে, কণ্ঠনালীর মুখে অবস্থিত মুখদ্বার-স্বরূপ পেশীগুলির স্পর্শ ও ঝটিতি বিচ্ছেদের ফলে জাত এক প্রকার স্পর্শ-ধ্বনি—glottal stop বা 'কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনি'।

কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া নিঃশ্বাসবায়ু যখন বহির্গত হয় তখন তাহা কোথাও বাধা প্রাপ্ত না হইলে, স্বরধ্বনির উৎপত্তি হয়। মুখ-মধ্যে নির্গমন-পথ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলে, মুখ-বিবরে সঙ্কোচ-স্থানের অবস্থান-অনুসারে বিভিন্ন উষ্ম ধ্বনির উদ্ভব হয়। মুখ-বিবরের অভ্যন্তর-স্থিত বায়ু-নির্গমন-পথকে জিহ্বার দ্বারা পূর্ণ ভাবে বা আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া দিতে পারা যায়। আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায়, বায়ু যখন জিহ্বার দুই পার্শ্বস্থিত উন্মুক্ত স্থান দিয়া নির্গত হয়, তখন ল-কারের ধ্বনির উদ্ভব হয়। জিহ্বাকে মুখের ঊর্ধ্বভাগে স্পর্শ করাইযা মুখপথকে সম্পূর্ণ ভাবে বদ্ধ করা যায়; এবং অধর ও ওষ্ঠ উভয়কে মিলিত করণানন্তর মুখ বদ্ধ করিয়াও এই মুখপথ অবরুদ্ধ করা যায়। নির্গমনশীল বায়ু রোধস্থানে আসিয়া জমে, এবং জিহ্বাকে ঝটিতি নামাইয়া লইলে বা অধরোষ্ঠকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, রুদ্ধ বায়ু হঠাৎ দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া সবেগে বহির্গত হইবার চেষ্টা করে, তখন একটা explosion বা ফট্‌-কার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে 'ক্‌ গ্‌, চ্‌ জ্‌, ট্‌ ড্‌, ত্‌ দ্‌, প্‌ ব্‌' প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী 'স্পর্শ-ধ্বনি' শ্রুত হয়। কিন্তু মুখপথ রুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে নাসাপথ উন্মুক্ত থাকিলে, রোধের অবস্থান-অনুসারে নাসিক্য-ধ্বনি 'ঙ্‌ ঞ্‌ ণ্‌ ন্‌ ম্‌' (ŋ ñ ṇ n m)-এর উৎপত্তি হয়।

স্পর্শ-ধ্বনির উদ্ভবে জিহ্বা এবং অন্য বাগ্‌যন্ত্রের পূর্ণ স্পর্শ, এবং মুখপথের রোধ আবশ্যক। মুখ-বিবরে জিহ্বা-দ্বারা, বা মুখদ্বারে অধরোষ্ঠের সহায়তায় যেরূপ রোধ হয়, তদ্রূপ রোধ কণ্ঠনালীর ভিতরেও হইয়া থাকে; এবং এই রোধ বা স্পর্শের ফলে, সেখানে যে স্পর্শ-ধ্বনির উদ্ভব হয়, তাহা বহু ভাষায়, 'ক, গ, ত, দ, প, ব'-এর মতো একটি বিশিষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চলিত বাঙ্গালায়—গৌড়ের ভাষাতেও—ইহা দুর্লভ নহে। কাশিবার সময়ে, যখন কণ্ঠনালীপথের পেশী-দ্বারা নালীপথের দ্রুত রোধ ও উন্মোচন ঘটে, তখন আমরা সকলেই এই কণ্ঠনালী-জাত স্পর্শ-ধ্বনি উচ্চারণ

করিয়া থাকি। এই ধ্বনির জন্য ইউরোপীয় ধ্বনিতত্ত্ববিদ্‌গণ ['] বা [ˀ] এইরূপ একটি অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা বাঙ্গালায় ['] (উদ্ধার-চিহ্ন) অথবা [⁓] (ইলেক-চিহ্ন) ব্যবহার করিতে পারি। এই ধ্বনির জন্য অক্ষরটি থাকিলে, সাধারণ কাশির ধ্বনি যাহা আমরা কানে শুনি, তাহাকে বানান করিয়া লেখা যায়—[ˀahhə ˀafiɔ] = 'আঃহ্বা 'আহা। এই ধ্বনি আরবীতে 'হাম্‌জ.া' বা আলিফ হাম্‌জ.া' নামে একটি বিশিষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনি [ء] বলিয়া স্বীকৃত; যেমন—رأس, سائل, تأمل, قرآن, مأت, ماء = ra's, sā'il, ta'ammul, qur'an, ma'ata, mā' ইত্যাদি। জর্মান ভাষায় শব্দের আদিতে এই ধ্বনি খুবই পাওয়া যায়—জর্মানে যেখানে কোনও শব্দের প্রারম্ভে অন্য কোনও ব্যঞ্জন-ধ্বনি থাকে না, তখন সেখানে এই কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনি আসে—জর্মান ভাষায় স্বরাদি শব্দ নাই: যেমন—auch, Abend, echt, Ihre, Ehe, und, Uhr, Onkel, Ohl, Oesterreich = [ˀaux ˀa:bent, ˀeçt, ˀi:rə, ˀe:hə, ˀunt, u:r, ˀɔŋkl, ˀo·l, ˀostεr-raiç] ইত্যাদি।

পূর্ব-বঙ্গে হ-কারের বদলে যে এই ধ্বনিই ব্যবহৃত হয়, হ-কারের লোপ হয় না, ইহা একটু কান পাতিয়া শুনিলেই গৌড়িয়া লোকও বুঝিতে পারিবে। যথা—'হাইল > 'আইল্ [fiail > ˀail] ; হয় > 'অয় [fiɔĕ > ˀɔĕ] ; হাত > 'আত [fia:t > ˀa:t] ; হাতী > 'আতী, 'আত্তী [fiati > ˀati, ˀatti] ; হাঁটিয়া > 'আইট্যা [fiãṭia > ˀaiṭε] ; হিন্দু > 'ইন্দু fiindu > ˀindu ; হুঁকা, হু া > 'উকা, 'উক্কা [fiũka, fiuka > ˀuka ˀukka] ; হানি > 'আনি [fiani > ˀani] ; ইত্যাদি।

§৬। মহাপ্রাণ স্পর্শ-বর্ণগুলির উচ্চারণ লইয়া পূর্ব-বঙ্গে সর্বত্র ঐক্য নাই, তবে সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, মহাপ্রাণ বর্ণ ঘোষবৎ হইলে, ইহার সঙ্গেকার হ-অংশকে কণ্ঠনালীয় স্পর্শতে পরিবর্তিত করা বঙ্গের (অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের) প্রাচীন কথ্য ভাষার রীতি ছিল, এবং এই রীতি এখনও সর্বত্র প্রচলিত আছে। যথা—'ঘা' অর্থাৎ 'গ্‌হা' স্থলে 'গ্'া' [gfia: < gˀa:] ; 'ঢাক্' অর্থাৎ 'ড্‌হাক্' স্থলে 'ড্'াক্' [ḍa:k > ḍˀa:k] ; 'ধান' অর্থাৎ 'দ্‌হান্' স্থলে 'দ্'ান্' [dfia:n > dˀa:n] ; 'ভাত' অর্থাৎ 'ব্‌হাত্' স্থলে 'ব্'াত্' [bfia:t > b'a:t] ; 'মধ্য' অর্থাৎ 'মদ্‌ধ্য > মদ্‌ধিয় > মদ্-দ্‌হিয়' স্থলে 'মইদ্-দ্‌হিয়', তাহা হইতে 'মইদ্-দ্'ইঅ, ম্'অইদ্দ' [mɔ̃dfijɔ > mɔiddfijɔ > mɔidd'jɔ, mˀoiddɔ] ; 'আঘাত'

অর্থাৎ 'আগ্‌হাৎ' স্থলে 'আগ্'াৎ' 'আগাৎ' [agɦat>ag'at, ʔagat]; ইত্যাদি।

কিন্তু অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শ-ধ্বনি শব্দের আদিতে থাকিলে, মহাপ্রাণ রূপেই উচ্চারিত হইত; যথা—'খাওয়া [khaŏa]; ঠাকুর [ṭhakur]; থোয় [thoĭ]; ফল [phɔːl]'। শব্দের মধ্যে অবস্থানে 'খ, ঠ, থ, ফ' কোনও স্থলে মহাপ্রাণ-রূপেই রক্ষিত হইয়া আছে,—যেমন 'পাখা, আঠা, কথা' [pakha, aṭha, kɔtha] কিন্তু কোনও কোনও স্থলে, এইরূপ শব্দের মধ্যে অবস্থান সত্ত্বেও এগুলির কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্রিত হইয়া যাইবার প্রমাণ আছে।

§ ৭। স্পর্শ-বর্ণ বা অন্য কোনও বর্ণ, উষ্ম-ধ্বনি অঘোষ বা ঘোষবৎ হ-কারের পরিবর্তে এইরূপে কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনির সহিত সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইলে, বাঙ্গালায় তাহার কী নাম দেওয়া যাইবে? ইংরেজিতে ইহাদের নামকরণ করা হইয়াছে—Implosive বা Recursive, বা Consonants with Glottal Closure, বা Consonants with accompanying Glottal Closure. Implosive-এর বাঙ্গালা করা যাইতে পারে 'অভ্যন্তর-স্পৃষ্ট', Recursive-এর 'পুনরাবৃত্ত'; এবং শেষোক্ত দুইটি ব্যাখ্যাময় ইংরেজি অভিধার বাঙ্গালা করা যাইতে পারে—'কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র' বা 'কণ্ঠনালীয়-স্পর্শানুগত'। প্রথম ও তৃতীয় নাম দুইটি শ্রুতমাত্রেই এই প্রকার ব্যঞ্জন-ধ্বনির বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিয়া দেয়। এই দুইটি নাম আমরা আপাততঃ ব্যবহার করিতে পারি।

§ ৮। পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় মহাপ্রাণ-ধ্বনির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি ব্যঞ্জন-বর্ণের ধ্বনি-পরিবর্তনের আলোচনা একটু আবশ্যক হইবে :—

ক। দুই স্বরের মধ্যস্থিত 'ক', অঘোষ উষ্ম কণ্ঠ-ধ্বনিতে—জিহ্বামূলীয় বিসর্গের ধ্বনিতে—পরিবর্তিত হইয়া যায়; যথা—'ঢাকা—ড্'াখ.া' [ḍɦaka>ḍʔaxa]। আবার এই অঘোষ 'খ.' [x], ঘোষবদ্ 'ঘ.' [gʰ]-এতেও পরিণত হয়। এবং ক্বচিৎ এই 'ঘ.' [gʰ] আবার ঘোষ 'হ' [ɦ]-কাররূপে দৃষ্ট হয় : 'ঢাকা' = [ḍʔagʰa, ḍʔaɦa)।

খ। 'চ, ছ, জ' [cʃ, cʃh, ɟʒ] যথাক্রমে [ts, s, dz] হয়।

গ। দুই স্বরের মধ্যস্থিত 'ট', ঘোষ 'ড'-এ পরিণত হয়; যথা,

'ছুটী'=পশ্চিম-বঙ্গে [cʃhuti], পূর্ব-বঙ্গে [suḍi]; ট-জাত এই 'ড' কখনও ড়-কার হইয়া যায় না।

ঘ। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে—চট্টলে, ত্রিপুরায়—আদ্য ত-কার থ-কার-ভাব প্রাপ্ত হয়।

ঙ। চট্টল, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টে স্পর্শ 'ক' ও 'প' [k, p], যথাক্রমে উষ্ম 'খ.' ও 'ফ.' [x, ɸ] অর্থাৎ জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় বিসর্গের ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়; যেমন 'কালীপূজা' [kɑlipuɟʒɑ]= [xɑliɸudza]। ময়মনসিংহ ও বরিশালের বাঙ্গালাতেও আদ্য প-কারের এইরূপ উচ্চারণ শুনা যায়।

চ। আদ্য ও স্বরবেষ্টিত 'শ, ষ, স' [ʃ]—হ-কার [ɦ] হইয়া যায়। ইহা পূর্ব-বঙ্গের ভাষার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাধু-ভাষার প্রভাবে বহু স্থলে 'শ' [ʃ]-এর ধ্বনি সংরক্ষিত বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

§ ৯। পূর্ব-বঙ্গের ভাষায়, শব্দের আদিতে অঘোষ মহাপ্রাণ অবিকৃত থাকে; ঘোষবদ্ মহাপ্রাণ, ঘোষবদ্ কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র অল্পপ্রাণ হইয়া যায়; এবং হ-কার [ɦ], কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-ধ্বনিতে—[ʔ]-তে পরিবর্তিত হয়।

শব্দেব মধ্যে যদি মহাপ্রাণ ধ্বনি বা হ-কার থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ সেই মহাপ্রাণের স্থলে কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র অল্পপ্রাণ, এবং হ-কারের স্থলে কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনি আইসে; এবং পরে, এই অল্পপ্রাণের সহিত যুক্ত কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনি, ও হ-কারজাত শুদ্ধ কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনি, নিজ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, শব্দের আদ্য অক্ষরে আসিয়া উচ্চারিত হয়। আদ্য অক্ষরে প্রথম ধ্বনি স্বরবর্ণ থাকিলে, ইহা সেই স্বরবর্ণের পূর্বে বসে; এবং ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে, ঐ ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত মিলিত হইয়া নূতন অভ্যন্তর-স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের সৃষ্টি করে। নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলি হইতে বিষয়টা বোধগম্য হইবে।

'পাখা=পাক্‌হা > পাক্'া=প'াকা [pakha > pakʔa > pʔaka], ফ.'াকা [ɸʔaka]; দুঃখ=দুক্‌খ=দুক্-ক্‌হ=দুক্-ক্'অ=দ্'উক্‌ক [duhkhʌ> dukkhɔ>dukkʔɔ > dʔukkɔ]; পুথি=পুত্'ই = প্'উতি [puthi> putʔi>pʔuti]; কথা = কত্'আ = ক্'অতা [kɔtha> kɔtʔa>kʔɔta]; কথ্-বেল=ক্'অদ্-বেল্ [kɔth-bel>kʔɔdbel]; মেথর=মেত্'অর্=ম্'এতর্

[methɔr > metʔɔr > m'ɛtɔr]; চিঠি=চিট্'ই=চ'ইডি [ɔʃiṭhi> cʃiṭʔi > tsʔiḍi; কাঁঠাল=কাঁট্হাল=কাট্'আল=ক্'আডাল kāṭhal > kaṭʔal > kʔaḍul]; পাঁঠা=পাঁট্হা=পাট্'আ=প্'আডা, ফ্'আডা [pāṭha >paṭʔa>pʔaḍa, ɸʔaḍa]; উঠন=উট্হন=উট্'অন='উডন [uṭhɔn> uṭʔɔn > ʔuḍɔn]; লাঠি=লাট্হি=লাট্'ই=ল্'াডি [laṭhi > laṭʔi > lʔaḍi]; তখ্তা=তক্হ্তা=তক্'তা=ত'অক্তা [tɔkhta> tɔkʔta > tʔɔkta]'; ইত্যাদি।

তদ্রূপ,—'অন্ধ > অন্দ্হ > অন্দ্'অ > 'অন্দ্অ, 'অন্দ (ɔndɦɔ > ɔndʔɔ > ʔɔndɔ; অধ্যক্ষ > অইদ্-দ্'অক্খ='অইদ্দক্ক [ɔdɦjɔkkhɔ > ɔiddʔɔkkʔɔ > ʔoiddɔkkɔ); আভ=আব্হ্=আব্'='আব্ (a:bɦ > a:bʔ > ʔa:b); আধা=আদ্হা=আদ্'আ='আদা (adɦa > adʔa > ʔada); কাঁধ=কান্দ্'=ক্'ান্দ্ [kã:dɦ=ka:ⁿdʔ > kʔa:ⁿd]; বাঘ= বাগ্হ্=বাগ্'=ব্'াগ্ [ba:gɦ>ba:gʔ > bʔa:g]'; তদ্রূপ, 'ভাগ=ব্'াগ্ [bɦa·g>bʔa:g]; গাধা=গাদ্হা=গাদ্দ'া=গ্'াদা [gadɦa>gadʔa> gʔada]; বুদ্ধি=ব্উদ্দি [buddɦi>bʔuddi]; দীঘী > দিগি' > দি'গি [digɦi >digʔi>dʔigi]; জিহ্বা=জিব্ভা=জি'ব্বা, জে'ব্বা (জ=dz) [ɟʒibbɦa >dzibbʔa > dzʔibba, dzʔebba]; দুধ=দ্'উদ্ [du:dɦ> dʔu:d]; মেঘ=ম্'এগ্ [me:gɦ>mʔɛ:g]; লাভ=লাব্'=ল্'াব্ [la:bɦ> la:bʔ > lʔa:b]; সভা=স্'অবা [ʃɔbɦa>ʃʔɔba]; সাঁঝ = স্'ান্জ [ʃã:ɟʒɦ=ʃa:ndzʔ ÷ ʃʔa:ⁿdz]; দেঢ়=দেড়্'=দ্'এড্ [de:ṛɦɔ=de rʔ >dʔɛ:r]'। 'ডাহিন > ডা'ইন্=ড্'াইন্ [ḍaɦin > ḍaʔin >ḍʔain]; তহবিল=ত-'অবিল্=ত্'অবিল্ [tɔɦɔbil>tcʔɔbil> tʔobil]; ডাহুক= ডা'উক্>ড্'াউক্ (ḍaɦuk>ḍaʔuk > ḍ'auk]; বহিন্=ব'ইন্=ব্'অইন্, ব্'উইন্ [bɔɦin>bɔʔin>bʔoin, bʔuin]; বাহির্=বা'ইর্= ব্'াইর্ [baɦir > baʔir > bʔair]; শহর=শ'অর্=শ্'অঅর্, শ'অর্ (ʃɔɦɔr >ʃɔʔɔr>ʃʔɔɔr, ʃʔɔ:r]; মহল=ম্'অঅল্ [mɔɦɔl>mʔɔɔl]; সাহস= শা'অশ্='শ্াওশ্ [ʃaɦɔʃ>ʃaʔɔʃ>ʃʔaoʃ]; বাহুল্য=বা'উইল্ল=ব্'াউইল্ল [baɦulijɔ > baʔuillɔ > bʔauillɔ]; সন্দেহ=স্'অন্দেঅ [ʃɔndeɦɔ> ʃɔndeʔɔ>ʃʔɔndeɔ]'; ইত্যাদি।

হ-কারের বা মহাপ্রাণের উষ্ম-অংশের বিকারে জাত কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-

ধ্বনিকে শব্দের আদিতে এইরূপে আগাইয়া দেওয়া, পূর্ব-বঙ্গের কথিত ভাষায় একটি আশ্চর্য্য বা লক্ষণীয় রীতি।

§১০। পূর্ব-বঙ্গের ভাষায়, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের প্রাণ বা উষ্মার পরিবর্তে কণ্ঠনালীয় স্পর্শধ্বনির আগমনের ফলে, সংস্কৃতে অজ্ঞাত, নূতন কতকগুলি কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র, বা কণ্ঠনালীয়-স্পর্শানুগত, অথবা অভ্যন্তর-স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভব ঘটিয়াছে: যথা—ক' গ', চ' (=ts') জ' (=dz'), ট' ড', ত' দ', ন', প' ব', ম', র', ল', শ'। এগুলি পূর্ব-বঙ্গের সাধারণ ক গ, চ (ts) জ (dz), ট ড, ত দ, ন, প ব, ম, র, ল, শ হইতে পৃথক্, এবং ইহাদের যথাযথ উচ্চারণের উপর পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় শব্দের অর্থ নির্ভর করে; যথা—

'কান্দ্' [ka:ⁿd] =কাঁদ্, কিন্তু 'কাঁধ'=ক'ান্দ্ (ক্'আন্দ্) [kˀa:ⁿd];
'গা' [ga:] =দেহ, কিন্তু 'ঘা'=গ'া (গ্'আ) [gˀa:];
'গুরা' [gura] =গোরা, কিন্তু 'ঘোড়া'=গু'রা (গ্'উরা) [gˀura];
'জর' [dzɔ:r] =জ্বর, কিন্তু 'ঝড'=জ'র (জ্'অর) [dzˀɔ:r] (জ=dz);
'ডাইন' [ḍain] =ডাকিনী, কিন্তু 'ডাহিন' (=দক্ষিণ)=ডা'ইন (ড্'আইন্) [ḍˀain];
'তারা' [tara] =নক্ষত্র; 'তাহারা' (সাধু-ভাষার)=ত'ারা (ত্-আরা) [tˀara];
'দান' [da:n] =দান; 'ধান'=দ'ান (দ্'আন) [dˀa:n];
'পাকা' [paka] =পক্ব; 'পাখা'=প'াকা (প্'আকা) [pˀaka];
'বাত' [ba:t] =বাত-ব্যাধি; 'ভাত'=বা'ত (ব্'আত্) [bˀa:t];
'মৈদ্দ' [moiddɔ]=মদ্য; 'মধ্য'=মৈ'দ্দ,' (ম্'অইদ্দ) [mˀoiddɔ];
'আইল্' [a:il] =ক্ষেত্রের আলি; নৌকার 'হাইল'='আইল্ [ˀail]; ইত্যাদি।

§ ১১। মহাপ্রাণ বর্ণের বা হ-কারের বিকারে পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় যেখানে কণ্ঠনালীয়-স্পর্শধ্বনি-মিশ্র ব্যঞ্জনবর্ণ বা কণ্ঠনালীয় স্পর্শ আইসে, সেখানে সংশ্লিষ্ট অক্ষরে স্বরাঘাত ঘটে, এবং স্বরও উদাত্তে উঠে। ইহা একটি বিশেষ নিয়ম। যথা—'তার গাঅৎ (বা 'ক'ান্দে) 'গ'া 'ঐছে বলি হেতে কান্দে' [tar gaɔt ('kˀaⁿde) 'gˀa: ˀoise boli hete kaⁿdẽ] (=তার গায়ে বা কাঁধে ঘা হ'য়েছে ব'লে সে কাঁদে); 'পরা' [pɔra]=পড়া, পতন, কিন্তু 'পঢ়া>'প'রা' ['pˀɔra]=পাঠ করা; ইত্যাদি।

§ ১২। এইরূপ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালা দেশে—পূর্ব-বঙ্গে—কত দিন হইল আসিয়াছে? এ বিষয়ে কেহ প্রাচীন উচ্চারণ লক্ষ্য করেন নাই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের, এমন কি শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণ গৌড়িয়া লোকের কাছে তামাশার বিষয় ছিল। কবিকঙ্কণের সময়ে পূর্ব-বঙ্গে শ-স্থলে 'হ' বলিত—'শুকুতা—হুকুতা'; অনুমান হয়, মূল হ-কার কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-বর্ণে পরিণত না হইলে শ-কার (অর্থাৎ 'শ, ষ, স') নূতন করিয়া হ-কার হইত না; অন্যথা মূল হ-কার এবং শ-জাত নবীন হ-কার লইয়া ভাষায় ধ্বনি-বিষয়ে অনিশ্চিততা এবং দুর্বোধ্যতা আসিয়া যাইত। হ-কারের কণ্ঠনালীয় স্পর্শে পরিণতি স্বীকার করিলে, মহাপ্রাণগুলির পরিবর্তনও স্বীকার করিতে হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকেও পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় যে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক হইবে না।

এই বৈশিষ্ট্য সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন, এবং হয়তো পূর্ব-বঙ্গে আর্য্য-ভাষার প্রচারের সময় হইতেই ভাষায় এইরূপ উচ্চারণ-রীতি প্রবেশ করিয়াছে। ভোটগণ (অর্থাৎ তিব্বতীরা) কাশ্মীর-অঞ্চল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ-ধর্ম প্রথমে গ্রহণ করে, কিন্তু পরে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে তিব্বতীদের ঘনিষ্ঠ যোগ হয়—তিব্বতীরা বাঙ্গালা দেশের শিক্ষকদের মানিয়া লয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের একখানি প্রাচীন তিব্বতী পুঁথিতে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র উদ্ধৃত আছে, তাহাতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ তিব্বতী অক্ষরে লিখিত আছে; এই পুঁথিতে যেরূপ বর্ণবিন্যাস আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে [ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ]-এর [গ', জ', ড', দ', ব'] উচ্চারণ-ই যেন তখন তিব্বতীরা শিখিয়াছিল,—পুঁথিখানিতে পরবর্তী কালের মতো এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে তিব্বতী অক্ষরে $\frac{\text{গ জ ড দ ব}}{\text{হ হ হ হ হ}}$ রূপে লিখিবার প্রয়াস করা হয় নাই, অন্য উপায় অবলম্বিত হইয়াছে (Joseph Hackin—*Formulaire Sanscrit-tibétain du Xe siècle*, Paris, 1924)। ইহা কোথাকার উচ্চারণ? বাঙ্গালার অংশ-বিশেষেরই উচ্চারণ বলিয়া মনে হয়। কারণ অন্য কতকগুলি সংস্কৃত অক্ষরের উচ্চারণ যাহা দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির দ্বারা বাঙ্গালা দেশেরই বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়, —যথা—'ঋ'-র উচ্চারণ 'রি', অন্তঃস্থ 'ব' ('ৱ')-এর অর্থাৎ [w β বা v]-র স্থলে বর্গীয় 'ব' [b] পড়া, এবং 'ক্ষ'-র উচ্চারণ 'খ'-রূপে লেখা।

সুতরাং, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের ঈদৃশ অ-সংস্কৃত উচ্চারণ, সুপ্রাচীন যুগেই, বাঙ্গালা ভাষার মাতা- বা মাতামহী-স্থানীয়া প্রাকৃতের পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত রূপ-ভেদে আসিয়া থাকা অসম্ভব নহে।

§ ১৩। পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণের সহিত এই বিষয়ে আশ্চর্য্য মিল পাওয়া যায় ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের অনেকগুলি আধুনিক আর্য্য-ভাষায়—গুজরাটীতে, রাজস্থানীতে, দখ্‌নী-হিন্দুস্থানীতে এবং কতকগুলি পাহাড়ী ভাষায়; এবং § ১১-তে উল্লিখিত হ-কারের পরিবর্তন-জাত কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-ধ্বনির সহযোগে স্বরের যে উদাত্ত-ভাব পূর্ব-বঙ্গে পাওয়া যায়, তদনুরূপ ব্যাপার পাঞ্জাবীতে-ও মিলে। এই সমস্ত বিষয় অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি (দ্রষ্টব্য Recursives in New Indo-Aryan প্রবন্ধ, *Bulletin of the Linguistic Society of India*, Lahore, 1929)।[১] ভিন্ন ভিন্ন আধুনিক আর্য্য-ভাষায় এই প্রকারের সাদৃশ্য পৃথক পৃথক রূপে ও স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়।

মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের এইরূপ বিপর্য্যয় বা বিকার আধুনিক ভারতীয় আর্য্য-ভাষায় একটি লক্ষণীয় বিষয়; এবং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান নিতান্ত আবশ্যক॥

অন্য কতকগুলি ভাষার ব্যাকরণের সহিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের তুলনা

ঐতিহাসিক কথা

সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী

সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন ভারতের সাহিত্যের ভাষা, ভারতের নিজস্ব সভ্যতার বাহন, ভারতীয় উপ-মহাদেশের হিন্দু জনগণের এবং আংশিক-ভাবে ভারতেব বাহিরের বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী জনগণের ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা—এক কথায়, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট এবং স্বকীয় "জাতীয়" ভাষা। ভারতে উপনিবিষ্ট আর্য্যেরা যে ভাষা বা উপ-ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন, তাহার মার্জিত সাহিত্যিক রূপ আমরা পাই বেদ-গ্রন্থগুলিতে। "বৈদিক" ভাষা, অথবা "বৈদিক সংস্কৃত", বা "ছান্দস", ভারতে আর্য্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।

তৎপরে, যীশু খ্রীষ্টের জন্মের অর্ধ-সহস্রক পূর্বে, পাঞ্জাব ও গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ অন্তর্বেদিতে প্রচলিত আর্য্য-ভাষার তথা বৈদিক সাহিত্যের ভাষার আধারের উপরে "লৌকিক সংস্কৃত" প্রতিষ্ঠিত হয়। পাণিনি কর্তৃক এই ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম স্থিরীকৃত হয়—পাণিনির সময় (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক?) হইতে, প্রায় তাবৎ সংস্কৃত লেখক এই ব্যাকরণ মানিয়া আসিতেছেন। বৈদিক ভাষা লৌকিক সংস্কৃত অথবা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতর রূপ। বৈদিক ও সংস্কৃত, এই দুইটি ভারতের "আদি আর্য্য"-যুগের ভাষার নিদর্শন—এ দুইটিকে "আদি ভারতীয়-আর্য্য" ভাষা বলা যায়। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্রাহ্মণ উপনিষদ্, সূত্রগ্রন্থ, মহাভারত রামায়ণ পুরাণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া, পরে অশ্বঘোষ, ভাস, শূদ্রক, কালিদাস, বাণভট্ট, বিষ্ণুশর্মা, শঙ্করাচার্য্য, রাজশেখর, সোমদেব প্রভৃতি নানা কবি ও অন্য লেখকের হাতে, সংস্কৃত সাহিত্য তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া পুষ্টি লাভ করিয়া আসিতেছে।

লোক-মুখে প্রাচীন ভারতে আর্য্য ভাষার পরিবর্তন ঘটিল, ভাষা নূতন আকার ধারণ করিল। এই নূতন আকারের ভাষার নাম "মধ্য অবস্থার আর্য্য-ভাষা" বা "মধ্য-আর্য্য", অথবা "প্রাকৃত"। প্রদেশ-ভেদে প্রাকৃতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। কতকগুলি প্রাকৃত আবার সাহিত্যে প্রযুক্ত হইতে থাকে;

তন্মধ্যে একটি প্রাকৃত হইতেছে "পালি"। এই পালি-ভাষা, মথুরা উজ্জয়িনী অঞ্চলের লোক-ভাষার একটি সাহিত্যিক রূপ—বুদ্ধদেব মগধের ও কাশী অঞ্চলের যে প্রাকৃত বলিতেন, তাহা হইতে ইহা পৃথক্। বুদ্ধদেবের উপদেশ অবলম্বন করিয়া পালি-ভাষায় একটি বড়ো সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। বাঙ্গালা দেশের চট্টলে, এবং সিংহলে, ব্রহ্মে, কম্বোজে ও থাই দেশে (শ্যামরাজ্যে) বৌদ্ধগণ এই পালি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন। অধুনা ভারতবর্ষে পালির পুনঃপ্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

অবিরত পরিবর্তনের ফলে, খ্রীষ্টীয় ৬০০-র পরে প্রাকৃতগুলি যে অবস্থায় আসিয়া পহুঁছিল, তাহাকে "অপভ্রংশ" বলে। খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিকে, এখন হইতে ৯০০ বা ১,০০০ বৎসর পূর্বে, বিভিন্ন প্রাদেশিক অপভ্রংশের বিকারে, আধুনিক "ভাষা"-গুলির উৎপত্তি হইল—হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দূ), বাঙ্গালা, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের "আধুনিক আর্য্য" বা "নবীন ভারতীয়-আর্য্য" ভাষার প্রতিষ্ঠা ঘটিল।

সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী—এগুলি এক-ই ভাষা-গোষ্ঠীর বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত; ভারতের এক-ই আর্য্য-ভাষার প্রাচীন বা আদি রূপ হইতেছে বৈদিক সংস্কৃত, মধ্য রূপ প্রাকৃত ও পালি, এবং আধুনিক, নবীন বা নব্য রূপ বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী প্রভৃতি। পরস্পরের মধ্যে ধারাবাহিক যোগ-সূত্র থাকা সত্ত্বেও, বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলিতে সংস্কৃত ও পালি যুগের আর্য্য-ভাষার অনেক জিনিস লোপ পাইয়াছে, অনেক নূতন রীতি আসিয়াছে, অনার্য্য ও বিদেশী ভাষা হইতে অনেক নূতন শব্দ ও ধারা গৃহীত হইয়াছে। মোটের উপরে, ব্যাকরণে—উচ্চারণে, শব্দ- ও ধাতু-রূপে, ও বাক্য-রীতিতে—এবং শব্দ-সম্ভারে, প্রাচীন যুগের আর্য্য-ভাষা বৈদিক সংস্কৃতের তুলনায়, বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী প্রভৃতি আধুনিক ভাষা একেবারে নূতন বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ৯০০ হইতে ১২০০-র মধ্যে রচিত, "চর্য্যাপদ" নামে পরিচিত, কতকগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গানে আমরা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই। তৎপূর্বে বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব ছিল না; উত্তর-বিহারের মৈথিলী, দক্ষিণ-বিহারের মগহী, পশ্চিম-বিহারের ভোজপুরিয়া, উড়িষ্যার উড়িয়া ও আসামের অসমিয়া প্রভৃতি ভাষা হইতে পৃথক্ বাঙ্গালা ভাষা তখন নিজ রূপ গ্রহণ করে নাই—"মাগধী অপভ্রংশ" যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে এমন একটি প্রাকৃত-ভাষার মধ্যে, ঐ ভাষাগুলির সঙ্গে, বাঙ্গালা ভাষাও নিহিত

ছিল; খ্রীষ্টীয় ৭০০।৮০০-র দিকে মাগধী অপভ্রংশ পূর্ব-ভারতে প্রচলিত ছিল—এই ভাষা ছিল বাঙ্গালা অসমিয়া উড়িয়া, মৈথিলী মগহী এবং ভোজপুরিয়ার মাতৃস্থানীয়।

হিন্দুস্থানীর (হিন্দী-উর্দূ'র) উদ্ভবও ঐ সময়ে হয়—মধ্য দেশ অর্থাৎ পশ্চিম-উত্তর-প্রদেশ এবং পূর্ব-পাঞ্জাবে প্রচলিত "শৌরসেনী অপভ্রংশ" হইতে; হিন্দুস্থানীর উপরে আবার পাঞ্জাবী ভাষার প্রভাবও যথেষ্ট পড়িয়াছিল। পাঞ্জাবের ও দিল্লী অঞ্চলের ভাষা লইয়া, দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌দের আমলে, দিল্লী-শহরে হিন্দুস্থানী ভাষার সৃষ্টি হইতে থাকে। সমগ্র উত্তর-ভারতে এই হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার হয়; ইহার ফলে, পাঞ্জাবী (পাঞ্জাব), ব্রজভাষা (মথুরা), অবধী (অযোধ্যা), ভোজপুরিয়া (কাশী) প্রভৃতি বিবিধ প্রান্তিক কথ্য ভাষা, যেগুলি সাহিত্যেও ব্যবহৃত হইত, সেগুলির প্রতিষ্ঠাও সংকুচিত হইতে থাকে। উত্তর-ভারত হইতে পাঠান ও মোগল যুগে যে-সকল মুসলমান ও হিন্দু দক্ষিণ-ভারতে যুদ্ধাদি উপলক্ষ্যে গিয়াছিল, তাহারা দক্ষিণেও এই হিন্দুস্থানী ভাষাকে স্থাপিত করে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে, ভারতীয় মুসলমানদের হাতে, হিন্দুস্থানী ভাষাতে ফার্সী সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য-রচনা হইতে থাকে; ঐ সময়ে আরবী বা ফার্সী বর্ণমালায় মুসলমান লেখকেরা হিন্দুস্থানী ভাষা প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ফার্সী অক্ষরে লেখা ও ফার্সী-শব্দ-বহুল মুসলমানী হিন্দী ও হিন্দুস্থানী, "উর্দূ" নামে দাঁড়াইয়া যায়। উত্তর-ভারতের হিন্দুরা নাগরী লিপিতে ব্রজভাষা অবধী প্রভৃতি ভাষা লিখিত, তাহারাও নাগরী লিপিতে হিন্দুস্থানী লিখিতে আরম্ভ করিল। ফলে, এক-ই হিন্দুস্থানী ভাষার দুইটি রূপ দাঁড়াইয়া গেল—মুসলমানী রূপ "উর্দূ," এবং হিন্দু রূপ "হিন্দী"। ক্রমে-ক্রমে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে, বাঙ্গালাপ্রদেশকে এবং আসাম উড়িষ্যা মহারাষ্ট্র গুজরাট সিন্ধু-প্রদেশকে বাদ দিয়া, সমগ্র হিন্দুস্থান বা উত্তর-ভারতের মুসলমানদের মধ্যে, এবং কোনও-কোনও স্থানে হিন্দুদের মধ্যেও, "উর্দূ" সাহিত্যের ভাষা-রূপে গৃহীত হইল। উর্দূ অবিসংবাদিত-ভাবে উত্তর-ভারতের মুসলমানদের সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ভাষা হইয়া গিয়াছে বলিয়া, বাঙ্গালার মুসলমান সমাজেও উর্দূ'র কিছু প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হিন্দুস্থানী ভাষা, যাহা হিন্দী আর উর্দূ'র সাধারণ রূপ, উত্তর-ভারতের লোকে সর্বত্রই বুঝিতে ও কতক-কতক বলিতে পারে, এবং দক্ষিণ-ভারতেও ইহার প্রসার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে; এই

জন্য অনেকে হিন্দুস্থানী ভাষাকে সমগ্র ভারতের "রাষ্ট্র-ভাষা" বলিয়া স্বীকার করেন। ভারতবর্ষে সংখ্যায় হিন্দুরা বেশি বলিয়া, হিন্দুদের হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ নাগরীতে লেখা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল হিন্দী-ভাষা) আজকাল বেশি প্রচার লাভ করিতেছে।

ফার্সী

প্রাচীন কালে পারস্যদেশে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা আমাদের বৈদিক সংস্কৃতের সহোদরা-স্থানীয়। প্রাচীন পারস্যের ভাষা দুই মূর্তিতে মিলে: (ক) প্রাচীন পারস্যের ধর্মগ্রন্থ 'অবেস্তা'-তে, এবং (খ) প্রাচীন পারস্যের কতকগুলি শিলালিপিতে ও অন্য লেখে। শিলালিপিতে প্রাপ্ত প্রাচীন-পারসীক ভাষা এবং অবেস্তা ভাষা, উভয়েরই সঙ্গে সংস্কৃতের (বিশেষতঃ বৈদিক সংস্কৃতের) খুবই মিল আছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-র দিকে ও উহার দুই শত বৎসর পরে পর্য্যন্ত, প্রাচীন পারসীক শিলালেখের সময়; অবেস্তার 'গাথা' নামে প্রাচীন অংশগুলি, পারস্যের ঋষি Zarathushtra জ.রথু শ্.ত্র (সংস্কৃতে 'জরদুষ্ট্র') কর্তৃক লিখিত, সেগুলির সময় আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব।

"প্রাচীন-পারসীক" পরিবর্তিত হইয়া "মধ্য-পারসীক"-এ রূপান্তরিত হইল; মধ্য-পারসীকের একটি নাম "পহ্লবী"। (যেমন ভারতে সংস্কৃতের পরে প্রাকৃত।) পহ্লবীতে অবেস্তার অনুবাদ হয়, এবং অন্য সাহিত্যও রচিত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্য-ভাগে, মুসলমান-ধর্মাবলম্বী আরবেরা পারস্য-দেশ জয় করে; তখন হইতে আরবদের চেষ্টায় পারস্যের লোকেরা আস্তে-আস্তে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিতে থাকে, এবং পারস্যের ভাষায় আরবী ভাষার প্রভাবও আসিয়া পড়ে। পারসীকেরা তাহাদের প্রাচীন লিপি বর্জন করিয়া, আরবী লিপি গ্রহণ করিল, ভাষায় বিস্তর আরবী শব্দও গ্রহণ করিল। পারস্য-ভাষা নূতন এক পর্য্যায়ে পড়িল—এই "নবীন-পারসীক" বা "ইস্‌লামীয় পারসীক"-এর পত্তন হইল খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষের কয় শতকে। এই নবীন-পারসীক বা ইস্‌লামীয় পারসীকের অন্য নাম "ফার্সী" ভাষা অথবা "ঈরানী" ভাষা। এই ভাষাতে ধীরে-ধীরে একটা খুব বড়ো দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিল।

খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিকে মধ্য-এশিয়া হইতে আগত ও আফগানিস্থানে উপনিবিষ্ট তুর্কী-জাতীয় লোকেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে থাকে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম অর্ধেই প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত তুর্কীদের করায়ত্ত হইয়া যায়। এই তুর্কীরা ছিল ধর্মে মুসলমান; তাহারা ধর্মানুষ্ঠানে আরবী মন্ত্র

পড়িত, ঘরে বলিত তুর্কী ভাষা; কিন্তু রাজকার্য্যের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা হিসাবে, ইহাদের সুসভ্য ঈরানী প্রজাদের ভাষা ফার্সী ভাষাই ইহারা ভারতে ব্যবহার করিত। তুর্কীদের ভারতে আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে ফার্সী ভাষাও ভারতে আনীত হয়, এবং ভারতের মুসলমান তুর্কী রাজ্যের রাজকীয় ভাষা রূপে ফার্সী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটায় হিন্দী ও অন্য দেশ-ভাষায় সরকারী হিসাব-পত্র রাখা হইত; পরে সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে এই কার্য্যে কেবল ফার্সী-ই ব্যবহৃত হইতে থাকে। যে-সকল উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় হিন্দু মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন তাঁহারা, এবং হিন্দু রাজ-কর্মচারীরা, ও হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে অনেকে, রাজভাষা বলিয়া ফার্সী শিখিতে লাগিলেন। হিন্দু সভ্যতা ও পারস্য হইতে আনীত পারস্যের মুসলমান সভ্যতা, উভয়ে মিলিয়া, ভারতীয় সভ্যতার একটি অভিনব বিকাশ—"ভারতীয় মুসলমান সভ্যতা"—রূপে আত্মপ্রকাশ করিল, এবং সেই সভ্যতার বাহন হইল ফার্সী ভাষা। ভারতের বহু মুসলমান ও হিন্দু লেখক ফার্সী ভাষায় ইতিহাস ও কাব্য প্রভৃতি লিখিয়াছেন। পারস্যের সূফী মতবাদ, হিন্দু বেদান্ত-দর্শনের অনুরূপ চিন্তা-মার্গ; এই সূফী দর্শন-দ্বারা অনুপ্রাণিত ফার্সী ভাষায় নিবদ্ধ কবিতা সমগ্র মানবজাতির একটি বড়ো সম্পদ্।

ফার্সী, আমাদের সংস্কৃত পালি বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী প্রভৃতিরই মতো আর্য্য-ভাষা; পারস্য-দেশের এখনকার নাম 'ঈরান' শব্দের অর্থ 'আর্য্যদের (দেশ)'—আধুনিক ফার্সী 'ঈরান' < মধ্য-পারসীক 'এরান্' < প্রাচীন-পারসীক 'অইর্যানাম্' = সংস্কৃত 'আর্য্যাণাম্'। কেবল আধুনিক ফার্সীর বর্ণমালা আরবী হইতে লওয়া, এবং আধুনিক ফার্সীতে অনেক আরবী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। ফার্সীর ব্যাকরণ অতি সরল; বহু বিষয়ে এই ভাষার ব্যাকরণের রূপগুলি সংস্কৃতকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইংরেজি

ইংলাণ্ডে ইংরেজ জাতির মধ্যে এই ভাষার উদ্ভব হয়। মূলে ইহা আমাদের সংস্কৃত ও ফার্সীর সহিত সম্পৃক্ত, Indo-European ইন্দো-ইউরোপীয় অথবা আর্য্য-বংশের ভাষা। ইংরেজির প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকের কতকগুলি লেখাতে। ঐ সময়ে ইংরেজির যে অবস্থা, তাহাকে Old English বা "প্রাচীন ইংরেজি" বলা হয়। "প্রাচীন ইংরেজি"র আর একটি নাম Anglo-Saxon। তখন হইতেই ইংরেজিতে একটি উঁচু দরের

নিম্নে প্রদত্ত বংশ-তালিকা হইতে সংস্কৃত পালি বাঙ্গালা ফার্সী ইংরেজি প্রভৃতির পরস্পরের সম্পর্ক বুঝা যাইবে :
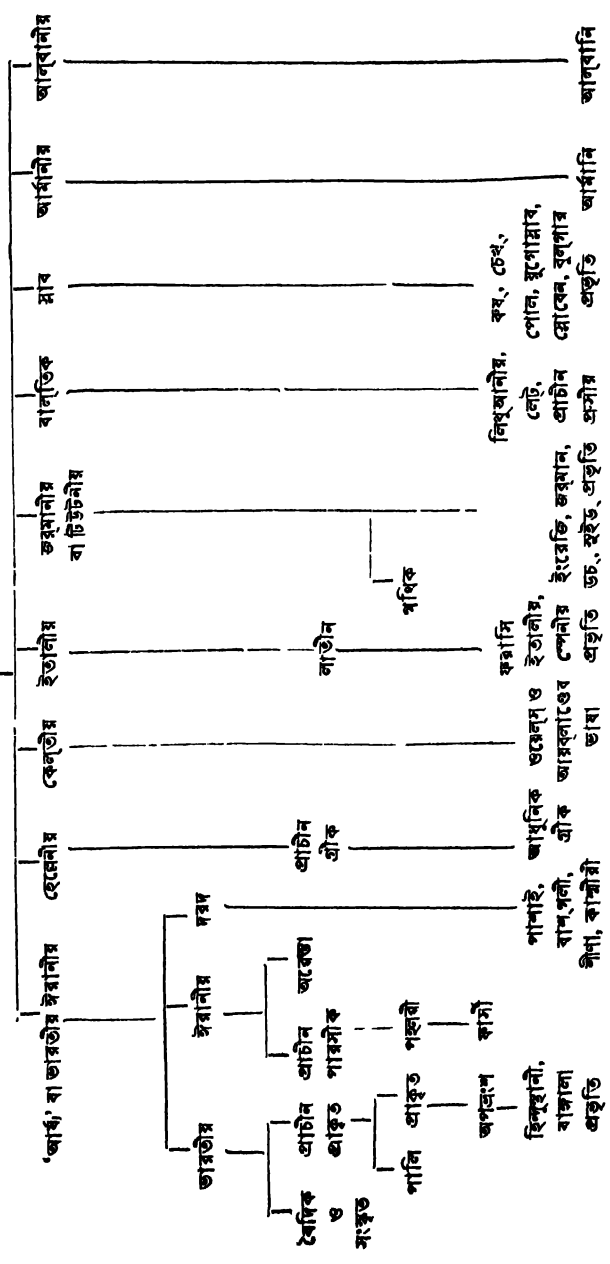
সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স হইতে আগত ফরাসি -ভাষী নরমান-জাতি ইংলাণ্ড জয় করে। তখন হইতে ফরাসি ভাষার প্রভাব ইংরেজির উপরে খুব বেশি করিয়া পড়িতে থাকে। ইউরোপের প্রাচীন সুসভ্য গ্রীক ও রোমান জাতি-দ্বয়ের ভাষা গ্রীক ও লাতীন ইউরোপে এখন আমাদের দেশে সংস্কৃতের মতো পঠিত হয়, এবং বাঙ্গালার উপরে যেমন সংস্কৃতের প্রভাব পড়িয়াছে, সেইরূপ ইংরেজির উপরে লাতীন ও গ্রীকের প্রভাব বিশেষ-রূপে পড়িয়াছে। ব্যবসায়-, উপনিবেশ-, এবং রাজ্য-বিস্তার-উপলক্ষ্যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া চারি শত বৎসর ধরিয়া, ইংরেজ জাতি পৃথিবীর বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, ইংরেজদের সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজি ভাষাও নানা দেশে নীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন পৃথিবীর বহু অংশে কেবল ইংরেজি ভাষা-ই ব্যবহৃত হইতেছে (যেমন আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউ-জি-লাণ্ড)। আন্তর্জাতিক ভাষা-হিসাবে ইংরেজির প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীর তাবৎ ভাষার মধ্যে প্রথম। ইংরেজির প্রভাবে পড়িয়া নানা দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের ভাষাগুলিরও বিশেষ পরিবর্তন ঘটিতেছে।

আরবী

এই ভাষার সহিত আমাদের সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী ফার্সী ইংরেজি প্রভৃতি আর্য্য-ভাষার কোনও সম্বন্ধ নাই—ইহা পৃথক্ একটি ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ইহার ব্যাকরণ-গত রীতি ও ইহার মৌলিক শব্দাবলী একেবারে আলাহিদা। আরবী ভাষা মূলতঃ উত্তর- ও মধ্য-আরবদেশের অধিবাসীদের ভাষা ছিল—দক্ষিণ-আরবের লোকেরা আরবীর-ই ভগিনী-স্থানীয় "হিম্‌য়ারী" বা "সাবী" নামক অন্য এক প্রকার ভাষা বলিত। মুসলমান-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নবী মোহম্মদের মাতৃভাষা ছিল আরবী। মুসলমান ধর্মের প্রধান শাস্ত্র-গ্রন্থ 'কোরান' এই ভাষায় রচিত। মোহম্মদের পূর্বে আরবদের মধ্যে অতি মনোহর এক কাব্য-সাহিত্য বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন প্রাক্-মুসলমান যুগের এই কাব্য-সাহিত্যের বহু নিদর্শন এখনও রক্ষিত আছে। এই-সব কাব্যে, এবং কোরানে, আরবী ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা পাই (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক), আর পাই দুই-চারিটি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শিলালেখে (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক)। আরব দিগ্বিজয় ও মুসলমান-ধর্মের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে, কোরানের ভাষা বলিয়া, আরবীর চর্চা সিরিয়া ও ঈরানের নব-দীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে বিস্তৃত

হইল। আরবী ভাষায় প্রথমটায় পূর্বোল্লিখিত কাব্য-সাহিত্য এবং কোরান-গ্রন্থ ভিন্ন আর কোনও সাহিত্য ছিল না, কোনও জ্ঞান-বিজ্ঞানও ছিল না। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বগ্‌দাদ শহরে আব্বাস-বংশীয় খলীফা বা সম্রাট্‌গণের রাজত্বের পত্তনের কাল হইতে, ঈরানী, ইরাকী, সিরীয ও অন্যজাতীয় মুসলমান পণ্ডিত ও সাহিত্যিক-গণের সহযোগিতায়, আরবী ভাষাতে ক্রমে একটি খুব বড়ো দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিল; এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহিত্য-গঠন-কার্য্যে খাঁটি আরবদের হাত খুব কম ছিল। আরবী ভাষা ক্রমে এক দিকে পশ্চিমে স্পেন ও মগ্‌রেব (মরক্কো) এবং অন্য দিকে মধ্য-এশিয়া এবং ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডে—সমগ্র উত্তর- ও মধ্য-আফ্রিকায়, স্পেনে, এবং পশ্চিম-এশিয়ায়—প্রাচীন ও মধ্য-যুগের জ্ঞানের অদ্বিতীয় ভাণ্ডার হইয়া দাঁড়াইল।

মুসলমান-ধর্মের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে, ভারতেও আরবী ভাষার আগমন হইল। সমগ্র মুসলমান জগতে আরবী বচন বা মন্ত্র পাঠ করিয়া বিধি-মতো উপাসনা সম্পাদিত হয় বলিয়া, এবং আরবী কোরান-গ্রন্থের ভাষা বলিয়া, মুসলমান-মাত্রই আরবীকে পবিত্র ভাষা বলিয়া মনে করেন, ও সাধ্যমতো ইহার চর্চায় প্রয়াসী হন।

আরবী যে-যে দেশের জন-সাধারণের মাতৃ-ভাষা (যেমন আরব-দেশে হাদ্রামৌৎ, য়মন্, হেজাজ., নজদ, ইরাক, শাম বা সিরিয়া, পালেস্তীন, মিসর ও সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা), সেই-সেই দেশে আরবী লোক-মুখে বিশেষ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন আরবী ভাষা কোরানে ও প্রাচীন সাহিত্যেই নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যে আরবীর চর্চা হয়, তাহা প্রাচীন আরবী। ধর্মের ভাষা ও মুসলমান জগতের সংস্কৃতির প্রধান বাহন বলিয়া, বঙ্গদেশের মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে অনেকে আজকাল আরবী পড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, বহু আরবী শব্দ, ফার্সীর মারফৎ, বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে।

বিভিন্ন বর্ণমালা

এখন হইতে দুই হাজার বৎসরেরও আগে যে লিপি প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহার নাম "ব্রাহ্মী লিপি"। মহারাজ অশোকের অনুশাসনে (খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৫০, আনুমানিক) ঐ লিপি পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই ইহাতে লিখিত হইত। অশোক এবং মৌর্য্যবংশীয়

রাজাদের আগেকার কালের এমন আব কোনও লেখা পাওয়া যায় না, যাহার পাঠোদ্ধার করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। খুব সম্ভব এই ব্রাহ্মী লিপি-ই হইতেছে ভারতের আর্য্য-ভাষা সংস্কৃত প্রভৃতির আদি বা প্রাচীনতম লিপি।

ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি ঠিক-মতো জানা যায় নাই। এতাবৎ অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করিতেন, ইহা প্রাচীন ফিনীশিয়ার লিপি হইতে উদ্ভূত। এখন কেহ-কেহ মনে করেন, সিন্ধুদেশে ও দক্ষিণ-পাঞ্জাবে মোহন-জো-দড়ো ও হড়প্পায় প্রাচীন ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে লিপি পাওযা গিযাছে, তাহা হইতে ব্রাহ্মী লিপি উদ্ভূত হইযাছে।

ব্রাহ্মী লিপি সবল, বর্ণের মাথার মাত্রা-বেখা নাই, ব্যঞ্জন-বর্ণের গায়ে "া, ি, ী, ু, ূ" প্রভৃতিব অনুরূপ স্বর-চিহ্ন লাগানো হইত। কতকগুলি ব্রাহ্মী বর্ণ এই প্রকারের :—

ꟸ=অ, ∴=ই, ∟=উ, ᐊ=এ; +=ক, ߊ=খ, ∧=গ; d=চ, ε=জ, ⊬=ঝ, h=ঞ; (=ট, O=ঠ, ⅃=ড, ⌶=ণ; ʎ=ত, ⊙=থ, ♭=দ, D=ধ, ⊥=ন; ᒐ=প, □=ব, ⊣=ভ, ∀=ম; ⅃=য, ⟆|=র, δ=ব; ᖗ=স; ইত্যাদি।

ব্রাহ্মী লিপির ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে, পববর্তী যুগে, ভারতেব বিভিন্ন অংশে নানা প্রাদেশিক লিপির উদ্ভব হয, এবং আধুনিক ভাবতীয় লিপি —যথা, নাগরী ও তাহারা বিকারে কায়থী ও গুজবাটী, নেওযারী, বাঙ্গালা, মৈথিলী, উড়িয়া, শাবদা, গুরুমুখী, লাণ্ডা, মোড়ী, তেলুগু-কানাড়ী, গ্রন্থ, তমিল্, মালয়ালম্, সিংহলী—এবং ভারতের বাহিরের প্রাচীন মধ্য-এশিয়াব কতকগুলি ভাষার লিপি—ভোট বা তিব্বতী, মোন্ ও বর্মী, কম্বোজীয় ও শ্যামী, যবদ্বীপীয় প্রভৃতি কতকগুলি লিপি—এ সমস্ত ব্রাহ্মী লিপির বিকারের ফল। প্রাচীন যুগের অক্ষর যেমন যেমন বদলাইয়া আসিতেছিল, সংস্কৃত প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষাগুলিও তেমন তেমন ঐ পরিবর্তিত বা পরিবর্তনশীল অক্ষর বা লিপিতে লিখিত হইয়া আসিতেছিল।

নাগরী বা দেব-নাগরী লিপিতে আজকাল সংস্কৃত বই ছাপা হয়, সেই জন্য অনেকে মনে করেন যে, নাগরী-ই হইতেছে সংস্কৃতের স্বকীয় লিপি, এবং যেমন সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব, তেমনি নাগরী লিপি হইতে বাঙ্গালা লিপিরও উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা ঠিক নহে।

(অ আ ই উ এ ও ং) //অ ঊ ঐ//

(ক খ গ ঘ)//(খ গ)// (চ ছ জ ঝ ঞ)

(ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন)

(প ফ ব ভ ম য় র ল ব=ব্র)

(শ ষ স হ) (ळ)(ঃ)

(ক কং কা কি কী কু কূ কে কৈ কো কৌ)

//ক্ক//

(ক্য ক্র ক্ল ক্ব ক্ষ=ক্ষ স্ব স্ত র্স,স্র ম্হি র্প,প্র ব্রা

(ধংম — ইংদ পিয়দসী — শ্রমণ ণী নো)

প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি

নাগরী ও বাঙ্গালা পরস্পর ভগিনী-স্থানীয়—উভয়-ই ব্রাহ্মী হইতে স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত। নাগরীর আদি-স্থান হইতেছে গুজরাট, রাজস্থান ও পশ্চিম-হিন্দুস্থান। পূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তত্তৎ স্থানীয় লিপি-ই সংস্কৃত লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত—সমগ্র ভারত জুড়িয়া নাগরীর প্রচলন একেবারেই ছিল না। ইংরেজ আমলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় সংস্কৃতের পক্ষে অত্যাবশ্যক নিখিল-ভারতীয় লিপি হিসাবে নাগরীকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে—এইরূপে বিগত সওয় শ' বৎসরের ভিতর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে, সংস্কৃতের জন্য লিপি-গত ঐক্য আসিয়া গিয়াছে—যদিও উড়িয়া, বাঙ্গালা, তেলুগু, গ্রন্থ, মালয়ালম্ প্রভৃতি বর্ণমালায় এখনও প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত বই মুদ্রিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মী-লিপির অন্তর্নিহিত রীতিটি নাগরী ও বাঙ্গালাতে অপরিবর্তিত রূপে বিদ্যমান আছে। এই বর্ণমালার বর্ণগুলি সাজাইবার কৌশল হইতেছে অপূর্ব ধ্বনি-বিচারের পরিচায়ক। সংস্কৃতের ধ্বনিগুলিকে অবলম্বন করিয়া এই বর্ণমালা সৃষ্ট হইয়াছিল। সংস্কৃতের কতকগুলি ধ্বনি এখনকার প্রচলিত ভাষায় লুপ্ত ; আবার বহু স্থলে নূতন ধ্বনির উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং, প্রাচীন ব্রাহ্মীর পরিবর্তিত রূপ বাঙ্গালা ও নাগরী বর্ণমালা দুইটিতে, এখন বাঙ্গালা ও হিন্দীর সমস্ত ধ্বনির যথাযথ প্রতীক বা পরিচায়ক অক্ষর নাই—বিভিন্ন নূতন উপায়ে এই সব অভিনব ধ্বনিকে লিখিতে হয়। যেমন বাঙ্গালায় বাঁকা "এ"-ধ্বনি "অ্যা, া, এ', প্রভৃতির দ্বারা লিখিত হয়।

হিন্দুস্থানী নাগরীতেই লিখিত হয়—বিশেষ করিয়া হিন্দুস্থানীর হিন্দী রূপ। কিন্তু উত্তর- ও দক্ষিণ-ভারতের মুসলমান লেখকেরা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক হইতে উর্দু বা মুসলমানী হিন্দুস্থানীকে ঈষৎ-পরিবর্তিত ফার্সী বর্ণ-মালাতেই লিখিয়া আসিতেছেন।

ইংরেজির বর্ণমালা লাতীন হইতে ঈষৎ-পরিবর্ধিত রূপে গৃহীত। প্রাচীন ইংরেজিতে বানান অনেকটা তখনকার দিনের উচ্চারণ ধরিয়াই করা হইত ; কিন্তু নানা কারণে পরবর্তী কালে ইংরেজি উচ্চারণ এবং ইংরেজি বানানের মধ্যে সর্বত্র সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না।

আরবী বর্ণমালা ফার্সী ভাষাতে গৃহীত হইয়াছে ;—আরবীতে নাই অথচ ফার্সীতে আছে, কেবল এমন কতকগুলি ধ্বনির জন্য নূতন অক্ষর, ফার্সীর জন্য গৃহীত আরবী বর্ণমালায় জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

আরবী বর্ণমালা, মূলে সিরীয় বর্ণমালা হইতে গৃহীত, এবং এই সিরীয় বর্ণমালা প্রাচীন ফিনীশীয় বর্ণমালার অর্বাচীন বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপ মাত্র। আরবী লিপি ডাহিন হইতে বামে লিখিত হয়। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই—কারণ বহু প্রাচীন বর্ণমালাতে ডাহিন হইতে বামে ও বাম হইতে ডাহিনে লিখিবার রীতি ছিল। আরবী বর্ণমালার বৈশিষ্ট্য—ইহাতে স্বর-বর্ণের স্থান অত্যন্ত গৌণ; বর্ণগুলি সব-ই ব্যঞ্জন-ধ্বনির নির্দেশক, স্বর-বর্ণের জন্য পৃথক্ অক্ষর নাই—কেবল কতকগুলি স্বর-চিহ্ন আছে, এই স্বর-চিহ্নগুলি আমাদের মাত্রা বা ফলার মতো ব্যঞ্জন-বর্ণের উপরে বা নীচে বসে।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা

বাঙ্গালা ভাষায় যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রথমে সংস্কৃতের জন্য তৈয়ারী হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষাতে সংস্কৃতের কতকগুলি ধ্বনি লোপ পাইলেও, সেগুলির জন্য যে-সব বর্ণ আছে সেগুলিকে বর্ণমালা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই; যেমন—"ঋ, ৠ, ঌ; ঞ, ণ; ষ, স"। আবার অনেক অক্ষরের নূতন উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে—যেমন "ফ, ভ", সংস্কৃতে ছিল p+h, b+h, কিন্তু বাঙ্গালাতে f, v-জাতীয় উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে। অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ ছিল "উঅ", অন্তঃস্থ য-এর "ইঅ"; এখন এই দুইটি "ব" (=b) ও "জ" (=j) হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি সংস্কৃত সংযুক্ত-বর্ণ বাঙ্গালায় অন্য-রূপে উচ্চারিত হয়; যথা—"ক্ষ"=সংস্কৃতে 'ক্‌ষ', বাঙ্গালায় 'খ্য'; "জ্ঞ"=সংস্কৃতে 'জ্‌ঞ', বাঙ্গালায় 'গ্যঁ'; "হ্য"=সংস্কৃতে 'হ্‌য়', বাঙ্গালায় 'জ্ঝ (ঝ্য)'; "হ্ম"=সংস্কৃতে 'হ্‌ম', বাঙ্গালায় 'ম্‌হ'; "হ্ল"=সংস্কৃতে 'হ্‌ল', বাঙ্গালায় "ল্‌হ"; ইত্যাদি। বাঙ্গালার "বাঁকা এ" সংস্কৃতে নাই; বাঙ্গালাতে z-এর উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে—আমরা "জ" অক্ষর দিয়াই উহাকে লিখিয়া থাকি। পূর্ববঙ্গের ভাষাতে আবার চ-বর্গের এবং "ঘ ঝ ঢ ধ ভ হ"-এর নূতন উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতে বিভিন্ন স্বর-ধ্বনির পরিমাণ (হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য) নির্দিষ্ট ছিল; বাঙ্গালাতে সেরূপ নির্দিষ্ট নাই।

সন্ধি

উচ্চারণ সহজ করিবার জন্য সন্ধির ব্যবস্থা। সংস্কৃতে সন্ধির খুঁটিনাটি লেখাতে বা বানানে প্রদর্শিত হয়। বাঙ্গালাতেও সন্ধি আছে, তবে তাহার

রীতি পৃথক্, এবং বাঙ্গালায় উচ্চারণে শুনা গেলেও, সন্ধি প্রায় লেখা হয় না (যেমন, "মেঘ+ক'রেছে"=উচ্চারণে [মেক্‌কোরেচে]; "পাঁচ+শ'"= [পাঁশ্‌-শো])। মূর্ধন্য "ণ" ও মূর্ধন্য "ষ"-এর উচ্চারণ বাঙ্গালায় না থাকায়, খাঁটি বাঙ্গালা শব্দে ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধানের পাট নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় কতকগুলি উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য—স্বর-সংগতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, য়-শ্রুতি, ব়-শ্রুতি, হ-কারের দৌর্বল্য প্রভৃতি—সংস্কৃতে অজ্ঞাত।

বাঙ্গালা বল বা শ্বাসাঘাতের রীতিও সংস্কৃত হইতে পৃথক্। বাঙ্গালায় শব্দের বা বাক্যাংশের আদ্য অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। বৈদিক সংস্কৃতে স্বর গানের সুরের মতো ছিল; পরবর্তী সংস্কৃতে সাধারণতঃ শব্দের মধ্যে স্থিত দীর্ঘ স্বরে শ্বাসাঘাত পড়ে।

শ ব্দ - রূ প

সংস্কৃতে বাঙ্গালার "টা টি টুকু, খান খানা খানি, গাছ গাছা" প্রভৃতি "পদাশ্রিত নির্দেশক" (Article) নাই।

সংস্কৃতে তিনটি লিঙ্গ—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। ব্যাকরণের প্রত্যয়-অনুসারে সংস্কৃতে বিশেষ্যের লিঙ্গ নির্ণীত হয়, অর্থ-অনুসারে (অর্থাৎ, শব্দটি প্রাণি-বাচক কি অপ্রাণি-বাচক, পুং-বাচক কি স্ত্রী-বাচক তাহা বিচার করিয়া) নহে। আ-কারান্ত বলিয়া "লজ্জা, লতা" স্ত্রীলিঙ্গ, "বৃক্ষ, ক্রোধ" অ-কারান্ত বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ নহে। বাঙ্গালাতেও তিনটি লিঙ্গ স্বীকৃত হয়—কিন্তু প্রত্যয় দেখিয়া শব্দের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় না। খাঁটি বাঙ্গালায় স্ত্রীত্ব-বাচক কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয় আছে; যেমন—"-ঈ, -আনী", ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষাতেও, সংস্কৃত শব্দের বেলায়, ক্বচিৎ সংস্কৃত রীতিতে অপ্রাণি-বাচক শব্দকেও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ধরা হয়।

শব্দের প্রত্যয় ধরিয়া, বিভিন্ন কারকে, সংস্কৃত শব্দের রূপ নানা ভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকে; যেমন—"লতা" শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে "লতায়াঃ", "মাতৃ" শব্দের "মাতুঃ", "চন্দ্র" শব্দের "চন্দ্রস্য", "মনস্" শব্দের "মনসঃ"; বাঙ্গালাতে কিন্তু এক-ই প্রকারের বিভক্তি লিঙ্গ-নির্বিশেষে সব শব্দের-ই উত্তর আসে; যেমন—"লতা-র, মাতা-র (বা মা-য়ের, মা-র), বাবা-র, চন্দ্রে-র (বা চাঁদে-র), মনে-র", ইত্যাদি—সর্বত্রই একমাত্র "-র" বা "-এর" বিভক্তি।

সংস্কৃতে তিনটি বচন—একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন; বাঙ্গালাতে দ্বিবচন নাই। সংস্কৃত শব্দের প্রত্যয় ও লিঙ্গ ধরিয়া বহুবচনের বিভক্তি যুক্ত হয়; যথা—

"মানব—মানবঃ (১মা একবচন)—মানবাঃ (১মা বহুবচন) ; সখি—সখা (১মা একবচন)—সখায়ঃ (১মা বহুবচন) ; সাধু—সাধুঃ (১মা একবচন)—সাধবঃ (১মা বহুবচন) ; ফল—ফলম্ (১মা একবচন)—ফলানি (১মা বহুবচন) ; সুমনস্—সুমনাঃ (১মা একবচন)—সুমনসঃ (১মা বহুবচন)" ; ইত্যাদি। বাঙ্গালাতে এরূপ নহে ; বহুবচনের বিভক্তি "-রা, -এরা" উচ্চ-জাতির প্রাণি-বাচক সকল প্রকারের বিশেষ্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সমাস-দ্বারা বহুত্ব জ্ঞাপনের রীতি সংস্কৃতে থাকিলেও, ইহা বাঙ্গালার একটি বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—"গণ, কুল > গুলা, সকল, সমূহ" প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় বহুত্ব বুঝাইতে বিশেষ্যের সহিত প্রত্যয়ের মতো বহুশঃ ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃতে বিভক্তি-নিষ্পন্ন ছয়টি 'কারক' আছে। বাঙ্গালার কারকগুলি সংখ্যায় অত নহে। কতকগুলি বাঙ্গালা কারক বিভক্তি-যোগে হয়, এবং কতকগুলি অনুসর্গ-রূপে ব্যবহৃত স্বতন্ত্র পদের যোগে নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ অনুসর্গের প্রয়োগ (Use of Post-positions) বাঙ্গালা ও আধুনিক বা নবীন ভারতীয়-আর্য্য ভাষাগুলিকে, প্রাচীন আর্য্য-ভাষা সংস্কৃত হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে।

বিশেষণ-পদ যে বিশেষ্য-পদের সহিত অন্বিত, উহার (অর্থাৎ বিশেষ্যের) অনুসরণে, বিভিন্ন কারকে ও বচনে বিশেষণের রূপে পরিবর্তন করা সংস্কৃত ভাষার নিয়ম। বাঙ্গালা ভাষাতে তাহা হয় না—বিশেষণ সর্বত্রই অবিকৃত থাকে ; কেবল কোথাও সংস্কৃতের অনুকরণে স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষ্যের বিশেষণে স্ত্রী-বাচক প্রত্যয় বসে।

তারতম্য-প্রকাশের রীতি দুইটি ভাষায় পৃথক্।

সর্বনাম

গৌরবে বহুবচনের প্রয়োগ হইতে উৎপন্ন কতকগুলি সর্বনামের গৌরবে প্রয়োগ বাঙ্গালাতে দেখা যায়, সংস্কৃতে উহা অজ্ঞাত ; যথা—"এ—ইনি ; সে—তিনি ; তাহার—তাঁহার" ; ইত্যাদি।

ক্রিয়া-পদ

কাল, বাচ্য এবং ভাব বা প্রকার (Mood), সংস্কৃতে প্রত্যয়ের ও বিভক্তির সাহায্যে দ্যোতিত হয়, বাঙ্গালাতে কিন্তু বহু স্থলে বিশ্লেষ আসিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালার ক্রিয়াতে সংস্কৃতের মতো পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ নাই।

সংস্কৃতের ধাতুর পরে কোনও-কোনও কাল-রূপে এবং প্রকার-ভেদে বিশেষ-

বিশেষ প্রত্যয় যুক্ত হয়; এই প্রত্যয়গুলিকে "বিকরণ" বলে; যথা—"অস্-ধাতু—অস্-তি, অস্তি (=আছে); ধাতুর অভ্যাস (বা ধাতুর আদ্য ব্যঞ্জনের ও আদ্য স্বরের দ্বিত্ব) করিয়া, হু-ধাতু>জুহু, জুহো—জুহো-তি (=হোম করে); দা-ধাতুর দ্বিত্ব করিয়া, দদ্—দদা-তি (=দেয়)"—এগুলিতে বিকরণ যুক্ত হইল না; কিন্তু, "ভূ ধাতু, বিকারে ভব্—ভব্+অ+তি=ভবতি (=হয়); অশ্ ধাতু—অশ্+না+তি=অশ্নাতি (=খায়); দীব্ ধাতু—দীব্+য+তি=দীব্যতি (=খেলে); চুর্ ধাতু—চোর্+অয়+তি=চোরয়তি (=চুরি করে)"—এই ক্রিয়াগুলিতে, "-অ-, -না-, -য-, -অয়-", এই-সব বিকরণ যুক্ত হইল। এই সমস্ত বিকরণ ধরিয়া, সংস্কৃতের ধাতুগুলিকে দশটি "গণ" বা শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়। বাঙ্গালাতে এরূপ রীতি নাই—বিকরণের পাট বাঙ্গালায় নাই—বাঙ্গালার ধাতুর পক্ষে একটি-মাত্র "গণ" আছে বলা যায়।

সংস্কৃতে ক্রিয়ার তিনটি বচন আছে—বাঙ্গালায় ক্রিয়ার বচন-ভেদ নাই; যথা—"চলতি—চলতঃ—চলন্তি" (=সে চলে, তাহারা দু'জনে চলে, তাহারা অনেকে চলে)।

সংস্কৃতে ক্রিয়ার গৌরব-বাচক বিশেষ রূপ নাই; বাঙ্গালায় মধ্যম ও প্রথম পুরুষে তাহা আছে; যেমন—"তুই চলিস্, তুমি চলো, আপনি চলেন; সে চলে, তিনি চলেন"।

সংস্কৃতে ব্যাকরণকারগণ সংস্কৃতের কাল ও ভাব বা প্রকারকে এক সঙ্গে ধরিয়া, এগুলিকে দশটি পর্য্যায়ে বা বিভাগে ফেলিয়াছেন; যথা—

ধাতুর বিকরণ-যুক্ত (অর্থাৎ পরিবর্তিত) রূপে 'তিঙ্' (অর্থাৎ কাল-, ভাব-, পুরুষ- ও বচন-দ্যোতক প্রত্যয়) যোগ করিয়া সৃষ্ট বিভিন্ন কাল ও ভাব বা প্রকার—

১। লট্—সাধারণ বর্তমান (নির্দেশক বর্তমান—Indicative Present)।

২। লোট্—অনুজ্ঞা বা বর্তমান অনুজ্ঞা (Imperative Present; বৈদিক ভাষায় এই অনুজ্ঞা অধিকন্তু লিট্ বা অতীতেও পাওয়া যায়)।

৩। লঙ্—নির্দেশক বা সামান্য অতীত—অনদ্যতনী, অর্থাৎ আজ বা সম্প্রতি হইয়াছে এমন ক্রিয়ায় (Imperfect)।

৪। লিঙ্ (বিধিলিঙ্ ও আশীর্লিঙ্)—ইচ্ছা-জ্ঞাপক বর্তমান (Optative Present) ও আশীর্বাদ-জ্ঞাপক (Benedictive)।

৫। লিট্—অভ্যাস (বা ধাতুর আদ্য ব্যঞ্জন ও স্বরের দ্বিত্ব) করিয়া রচিত অতীত—পরোক্ষে অর্থাৎ চোখের বাহিরে ঘটিত অতীতের ক্রিয়া-নির্দেশক (Indicative Perfect; "দদর্শ" < "দৃশ্" ধাতু = 'দেখিয়াছে')।

[লিট্—অন্য ধাতুর সহযোগে সৃষ্ট পরোক্ষ অতীত (Periphrastic Perfect: "দর্শয়ামাস, দর্শয়াম্বভূব, দর্শয়াঞ্চকার" = 'দেখাইয়াছিল')।]

৬। লুঙ্—নির্দেশক অতীত—হ্যস্তনী, অর্থাৎ গতকল্য বা বহু-পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে (Aorist)।

৭। লৃট্—নির্দেশক সামান্য ভবিষ্যৎ (Simple Future Indicative)।

৮। লৃঙ্—সম্ভাব্য (Conditional)।

৯। লুট্—ধাত্বন্তর-সাহায্যে গঠিত নির্দেশক ভবিষ্যৎ (Future by Periphrasis)।

১০। লেট্—Subjunctive—বৈদিক ভাষাতে, বর্তমান ও অতীতে পাওয়া যায়।

সংস্কৃতে দুইটি অতীত কাল-রূপে ক্রিয়ার পূর্বে অ-কারের ("ভূত-করণ" প্রত্যয়ের) আগম হয়—লঙ্ ও লুঙ্-এ; যথা—"গম্ ধাতু—অ-গচ্ছৎ (লঙ্), অ-গমৎ (লুঙ্); দা ধাতু—অ-দদৎ (লঙ্), অ-দাৎ (লুঙ্)"।

বাঙ্গালার কাল- ও ভাব-(বা প্রকার-)প্রদর্শনের রীতি একেবারে অন্য ধরনের। বাঙ্গালার কাল-রূপের সঙ্গে সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরেজির কাল-রূপেরই অধিক মিল আছে।

খাঁটি বাঙ্গালাতে নিষ্ঠা ও শতৃ প্রত্যয়ের প্রয়োগ কতকটা সংকীর্ণ; যেমন—সংস্কৃতে "কৃতং কর্ম" বা "কৃতং কার্য্যম্", উড়িয়াতে "কলা কাম", কিন্তু বাঙ্গালাতে "যে কাজ করা হইয়াছে" ("করা কাজ"-ও চলিতে পারে); "ধাবন্ অশ্বঃ", বাঙ্গালাতে "যে ঘোড়া দৌড়াইতেছে" ('দৌড়ন্ত ঘোড়া' বাঙ্গালাতে চলে না; কিন্তু 'ঘুমন্ত খোকা', 'চলন্ত গাড়ি', প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর মাত্র এইরূপ প্রত্যয় পাওয়া যায়)।

বাঙ্গালার যৌগিক ক্রিয়া সংস্কৃতে অজ্ঞাত।

সংস্কৃতে প্রত্যয়-বিভক্তি-যোগে ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য হয়, বাঙ্গালাতে অন্য ক্রিয়ার সাহায্যে বিশ্লেষ-মূলক পদ্ধতিতে ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য হয়; যথা—"কুত্র স্থীয়তে" = কোথায় থাকা হয়; "পুস্তকং পঠ্যতে" = বই পড়া হয়।

অব্যয়

বাঙ্গালাতে সংস্কৃতের অনুরূপ কর্মপ্রবচনীয় নাই; আছে অনুসর্গ (Post-position)-রূপে ব্যবহৃত কতগুলি অসমাপিকা ও অন্য পদ।

বাক্য-রীতি

বাক্যস্থিত পদসমূহেব অবস্থান-ক্রম বাঙ্গালাতে অনেকটা সুনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু সংস্কৃতে সুপ্ (শব্দ-রূপ) ও তিঙ্ (ক্রিয়ার রূপ)-গুলি বলবৎ থাকায়, পদের অবস্থান ততটা সুদৃঢ় নিযম অনুসারে নির্দিষ্ট নহে। সংস্কৃতে "নরো ব্যাঘ্রং হন্তি", "হন্তি নরো ব্যাঘ্রম্", "নরো হন্তি ব্যাঘ্রম্", "ব্যাঘ্রং হন্তি নরঃ", "ব্যাঘ্রং নরো হন্তি", "হন্তি ব্যাঘ্রং নরঃ"— যে কোনও প্রকারে ইচ্ছা, পদগুলি সাজানো যায়, কিন্তু বাঙ্গালাতে "মানুষ বাঘ মারে" বলিলে যাহা বুঝাইবে, "বাঘ মানুষ মারে" বলিলে তাহার উল্‌টা বুঝাইবে।

বাক্য-রীতিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগের বাহুল্য বাঙ্গালাতে লক্ষণীয়; প্রাচীন সংস্কৃতে অসমাপিকা ক্রিয়ার এত অধিক প্রযোগ দেখা যায় না, যদিও প্রাকৃতের ও আধুনিক আর্য্য-ভাষার অনুসরণের ফলে পরবর্তী সংস্কৃতে ইহা খুবই সাধারণ।

শব্দাবলী

প্রাচীন ভাষা বলিয়া, সংস্কৃত মোটের উপরে স্বাবলম্বী ভাষা—বেশির ভাগ শব্দই ইহার স্বকীয়, খাঁটি সংস্কৃত ধাতু- ও প্রত্যয়- যোগে গঠিত। তথাপি সংস্কৃতে কিয়ৎ পরিমাণে অন্য ভাষার শব্দ প্রবেশ করিয়াছে : (১) অনার্য্য-ভাষার শব্দ—যথা, "অণু, কপি, কাল, পূজা, ঘোটক, শব, তিন্তিডী, হেরম্ব" প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, এবং "কদলী, কম্বল, কার্পাস, কন্দ, বাণ, পণ, তাম্বূল" প্রভৃতি অস্ট্রিক ভাষার শব্দ; (২) বিদেশী শব্দ—যথা; "পরশু (সুমেরীয়); মনা (আসিরীয়-বাবিলীয়); যবন, হোরা, কেন্দ্র, দ্রম্য, সুরঙ্গ, খলীন (গ্রীক); পিক, দীনার (রোমক বা লাতীন); কীচক = 'এক প্রকারের বাঁশ', চীন (প্রাচীন চীনা); মুদ্রা, পুস্তক, মিহির (প্রাচীন- ও মধ্য- পারসীক)"।

বাঙ্গালায় বিদেশী শব্দের সংখ্যা আরও বেশি; ফার্সী (আরবী ও তুর্কী ধরিয়া) প্রায় ২,৫০০, পোর্তুগীস প্রায় ১১০, এবং ক্রম-বর্ধমান ইংরেজি ও অন্য ইউরোপীয় শব্দ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং শব্দদ্বৈত (বা পদদ্বৈত), ও অনুকার- বা প্রতিধ্বনি-শব্দ বাঙ্গালা ভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—সংস্কৃতে অনুকার-শব্দের বাহুল্য নাই, প্রতিধ্বনি-শব্দ অজ্ঞাত।

ইংরেজি ও বাঙ্গালা

বর্ণমালা ও ধ্বনি

ইংরেজির বর্ণমালা লাতীন হইতে গৃহীত। ইহার অন্তর্নিহিত রীতি বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে একেবারে পৃথক্। লাতীনে "চ, জ, শ" প্রভৃতি কতকগুলি ধ্বনি ছিল না—এগুলি প্রাচীনতম ইংরেজিতেও ছিল না। পরে এই-সব ধ্বনি ইংরেজিতে আসিয়া গেলে, একাধিক অক্ষর মিলিত করিয়া, লাতীন ও প্রাচীন-ইংরেজিতে অজ্ঞাত সেই সকল ধ্বনির প্রকাশ করিবার চেষ্টা হয়। প্রাচীন-ফরাসি ভাষার প্রভাবও ইংরেজি ভাষার উপরে বিশেষ ভাবে পড়ে, সেই জন্য অনেক স্থলে আবার ফরাসির বানান-পদ্ধতি ইংরেজিতে অনুসৃত হয়। এই-সব কারণে, ইংরেজিতে ch বা tch বা t = "চ"; dj, j, dg, ক্বচিৎ g = "জ"; sh, -ti- = "শ"; এইরূপ বিভিন্ন বর্ণ মিলিয়া এক-একটি ধ্বনি লিখিবার রীতি ইংরেজিতে দেখা যায়। প্রাচীন- ও মধ্য-ইংরেজি, লাতীন, প্রাচীন- ও আধুনিক-ফরাসি—এই কয়টি ভাষার বানান ও উচ্চারণের ঘাত-প্রতিঘাত ইংরেজিতে দেখা যায়, এবং ইহাই হইতেছে আধুনিক ইংরেজি বানানের ও উচ্চারণের মধ্যে আসামঞ্জস্যের প্রধান কারণ।

ইংরেজি ভাষার ধ্বনি-সমষ্টি, বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি-সমষ্টি অপেক্ষা কম সমৃদ্ধ নহে; ইংরেজি স্বর-ধ্বনির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বাঙ্গালা অপেক্ষা অনেক বেশি।

একাধিক ধ্বনির জন্য এক-ই অক্ষরের ব্যবহার—যেমন a-দ্বারা ছয়টি বিভিন্ন ধ্বনির প্রকাশ,—যথা, cat [ক্যাট্—'অ্যা'], pass [পাস্—'আ'], case [কেয়্স্—'এয়্'], call [কল্—'অ'], China [চায়্ন্—'অ্য'], care [কেয়ার্—'এঁয়া']; এবং এক-ই ধ্বনির জন্য একাধিক প্রকারের বর্ণবিন্যাস—যেমন, "এয়্" এই সংযুক্ত স্বরের জন্য a (dame), ai (maid, train), ay

ইংরেজির ব্যঞ্জন-ধ্বনি		কণ্ঠ্য	তালব্য	দন্তমূলীয় (জিহ্বাগ্র ও দন্তমূল)	দন্ত্য	দন্তৌষ্ঠ্য	ওষ্ঠ্য
স্পৃষ্ট অল্প-প্রাণ	অঘোষ (আদিতে ঈষৎ-প্রাণযুক্ত)	k=ক (c, cc, ck, k, kk, qu, cqu, ch)		t=ট. (=t, tt, th)			p=প (p, pp)
	ঘোষ	g=গ (g, gu, gh)		d=ড. (=d, dd)			b=ব (b, bb)
ঘৃষ্ট	অঘোষ		tsh=চ (ch, tch, ci, t)				
	ঘোষ		dzh=জ (j, dj, dg, gi, ge, d)				
নাসিক্য	ঘোষ	ng=ঙ (ng, n)		n=ন (n, nn)			m=ম (m, mb, mm)
পার্শ্বিক (ঘোষ)	দন্তমূলীয়			l (=l, ll : আদ্য ল)			
	কণ্ঠীকৃত (velarised)			l (l, ll : অন্ত্য l, যথা—well, feel, felt, wild)			
কম্পন-জাত (trilled)	ঘোষ			r=র (r, rr : স্কটলাণ্ডের ইংরেজিতে)			
উষ্ম	অঘোষ	h= ঃ (hand, hat, high)	sh=শ (sh, sch, ch, ti)	s=স (s, ss, sce, sci, ce, ci)	th=থ. (thin three)	f=ফ. (f, ff, gh)	
	ঘোষ	h=হ (per-haps, behind)	zh=ঝ. (s—measure, pleasure ; ge—rouge)	z=জ. (z, s) , r (উষ্ম র)	dh=ধ. (then, this)	v=ভ. (v)	
অর্ধস্বর	ঘোষ		y=য় (y, i, u)				w=ব (w)

(way, say), eigh (weigh), ao (gaol) প্রভৃতি। এই দুইটি রীতি, ইংরেজি লিপির দুইটি বিশেষ অবগুণ।

ইংরেজির কতকগুলি ব্যঞ্জন-ধ্বনি বাঙ্গালায় নাই। ইংরেজিতে স্পৃষ্ট অল্পপ্রাণ ধ্বনি k, t, p, শব্দের আদিতে থাকিলে, "খ, ঠ, ফ"-এর মতো মহাপ্রাণবৎ উচ্চারিত হয়। ইংরেজির দন্তমূলীয় t, d বাঙ্গালায় নাই,—বাঙ্গালায় "ট, ড" মূর্ধন্য ধ্বনি। ইংরেজির ch, j বাঙ্গালার "চ, জ" হইতে উচ্চারণে কিছু পরিমাণে পৃথক—ইংরেজির "চ, জ" কতকটা যেন t-sh, d-zh-এর সমাবেশে গঠিত। ইংরেজিতে দুই প্রকারের ল-ধ্বনি আছে: এক প্রকারের "ল", শব্দের আদিতে উচ্চারিত হয়, ইহা বাঙ্গালা ল-এর মতো (যেমন law, learn প্রভৃতি শব্দে)—এই ল-ধ্বনির ইংরেজি নাম clear l; অন্য প্রকারের "ল", শব্দের শেষে বা শব্দ-মধ্যে ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হয় (যথা—well, feel, health)—এই ল-ধ্বনিকে ইংরেজিতে dark l বলে—এই dark l যেন কতকটা u- বা w-মিশ্র, ইহাকে velarised অর্থাৎ "কণ্ঠ্যীকৃত" ধ্বনি বলা হয়। ইংরেজিতে ঘোষবৎ sh বা শ-কার আছে—zh—measure, pleasure শব্দের ধ্বনি (=mezhar, plezhar; এগুলি mezar, plezar নহে); ইংরেজির উষ্ম r ধ্বনি; ইংরেজি উষ্ম th ধ্বনি (thin, then—এই দুই শব্দের দুই প্রকার ধ্বনি, "থ., ধ.")—এগুলি বাঙ্গালায় অজ্ঞাত। ইংরেজির w-ধ্বনি কতকটা উ-কার ঘেঁষা, বাঙ্গালাতে এই ধ্বনিও নাই।

ইংরেজির স্বর-ধ্বনি নিম্নলিখিত-রূপ (ধ্বনিগুলি ধ্বনি-নির্দেশক International Phonetic Association-এর বর্ণমালায় লিখিত হইতেছে):—

i (হ্রস্ব ই=i, y); i: (দীর্ঘ ঈ, বা ইয়্=e, ea, ee, eo, æ, ie); e (হ্রস্ব এ=e, eh); æ (হ্রস্ব 'অ্যা'-ধ্বনি=a); *a*: (=কণ্ঠ্য দীর্ঘ আ=a); ɔ (হ্রস্ব অ-এর ধ্বনি=o); ɔ: (দীর্ঘ অ-এর ধ্বনি=au, aw, oa); o (হ্রস্ব ও-কারের ধ্বনি=o); u (হ্রস্ব উ=u, oo); u: (দীর্ঘ উ, বা উব্=u, oo, ou); ʌ (বিবৃত অ-কারের ধ্বনি, অ', hut, cut-এর u-এর ধ্বনি); ə (হ্রস্ব অর্ধবিবৃত অ, অঁ—ago, Russia শব্দদ্বয়ের a-এর-ধ্বনি); ə: (দীর্ঘ অর্ধবিবৃত অ=অ'—clerk, her, bird-এর স্বর-ধ্বনি)।

এই কয়টি সরল স্বর ব্যতীত, ইংরেজিতে কতকগুলি সন্ধি-স্বর (diphthong) আছে; যথা—ei (এয়্ বা এই=ai, ei, ey); au (আউ বা অ্যাও=

ou, ow, ough) ; ou (ওউ বা ওব্‌ = o, ough) ; eə (এঅ = e, ere) ; iə (ইঅ = i, ire) ; uə (উঅ = u, ur, oor) ; ইত্যাদি। সাধু-ইংরেজির এই-সমস্ত হ্রস্ব-, দীর্ঘ- ও সন্ধি-স্বর ধরিয়া, ১৮টি স্বর-ধ্বনি ইংরেজিতে বিদ্যমান ; এগুলির বানান-সম্পর্কে ইংরেজিতে বড়োই অনিয়ম দেখা যায়।

ইংরেজির ʌ (hut), ə (her), ə: (hurt)—এই ধ্বনিগুলি, এবং সন্ধি-স্বরগুলি বাঙ্গালায় নাই।

ইংরেজি দীর্ঘ-স্বর সর্বদাই দীর্ঘ থাকে, বাঙ্গালার মতো বাক্যাংশের মধ্যে পড়িয়া নিজ দীর্ঘত্ব বর্জন করে না। ইংরেজির শ্বাসাঘাত সাধারণতঃ বাঙ্গালার মতো শব্দের আদ্য অক্ষরেই পড়ে, কিন্তু বাক্যের মধ্যে কোনও শব্দের শ্বাসাঘাতের বিলোপ হয় না। শ্বাসাঘাতের অভাব হইলে, ইংরেজির স্বর-ধ্বনি, বাক্য-মধ্যে অতি-হ্রস্ব অর্ধবিবৃত অঁ (= ə)-তে আনীত বা পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে ;—বাঙ্গালায় এরূপ হয় না, শ্বাসাঘাত না পাইলে মূল স্বর-ধ্বনি একেবারে লুপ্ত হয়, কিন্তু বিকৃত হয় না। ইংরেজিতেও বহু স্থানে শ্বাসাঘাতের অভাবে স্বর-ধ্বনি লুপ্ত হয়।

ইংরেজিতে স্বর-ধ্বনির অনুনাসিকত্ব হয় না—"ই, অ্যাঁ, অঁ, আঁ" প্রভৃতির মতো স্বরের আনুনাসিক ধ্বনি ইংরেজিতে একেবারেই নাই।

ইংরেজিতেও সন্ধি আছে—তবে সেই সন্ধি লেখায় প্রদর্শিত হয় না ; যথা—do + not + you = don'tyou উচ্চারণে "ডোন্‌টিউ, ডোন্‌চ্যু" ; nature = পুরাতন উচ্চারণে natyur = "নাট্যুর্‌," তাহা হইতে আধুনিক "নেচর্‌, নেয়্‌চ" ; ইত্যাদি।

শব্দ-রূপ

ইংরেজির মতো Definite ও Indefinite Article-এর পাট বাঙ্গালায় নাই, কিন্তু "টা, টি, টুকু, খানি, খানা, গাছা, গাছি" প্রভৃতি নির্দেশক-দ্বারা Definite Article-এর কাজ বাঙ্গালায় চলে, এবং "এক, একটা, একটি, একজন" ইত্যাদি শব্দ-দ্বারা Indefinite Article-এর ভাব প্রকাশিত হয়।

ইংরেজির লিঙ্গ-ভেদের রীতি বাঙ্গালার-ই মতো—স্বাভাবিক নিয়ম-অনুসারে পুরুষ-জাতি, স্ত্রীজাতি ও ক্লীব-জাতির বিশেষ্যের পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ হয় (সংস্কৃতের মতো প্রত্যয় ধরিয়া লিঙ্গ নির্ধারিত হয় না)। ইংরেজিতে কতকগুলি শব্দে বিশেষ স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হয়—যথা, -ess ; কিন্তু মোটের উপরে, স্ত্রীলিঙ্গ-দ্যোতক প্রত্যয়ের ব্যবহার ইংরেজিতে বাঙ্গালা অপেক্ষা কম

(বাঙ্গালায় "-ঈ" [বা "-ই"], "-ইনী, -ইন,-নী,-আনী,-উনি" প্রত্যয়, এবং সংস্কৃত হইতে গৃহীত "-আ, -ঈ" প্রভৃতি প্রত্যয়)।

বাঙ্গালার মতো ইংরেজিতেও দুইটি-মাত্র বচন। ইংরেজিতে বহুবচনে -s, -es প্রত্যয় ভিন্ন, বহুবচন-দ্যোতক শব্দ জুড়িয়া দিবার রীতি অজ্ঞাত বলিলেও হয় (যথা, farmer—farmers ; ক্বচিৎ farming folk, farmer people বহুবচন-অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু এইরূপে বহুবচন সাধিত হয় না)। ইংরেজিতে কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দের সাধারণ-রীতি-বহির্ভূত বহুবচনের রূপ আছে ; যেমন—men, oxen, children, kine, sheep, mice, lice প্রভৃতি ; বাঙ্গালায় এই ধরনের শব্দ নাই।

ইংরেজি case-এর মধ্যে, বিভক্তি-যোগে মাত্র genetive case বা সম্বন্ধ-পদ হয় ; যথা—boy, boy's, বহুবচনে boys, boys' ; সুতরাং, বাঙ্গালায় বিভক্তির সংখ্যা, সংস্কৃতের চেয়ে কম হইলেও, ইংরেজির চেয়ে বেশি। ষষ্ঠী ব্যতীত অন্য বিভক্তির জন্য ইংরেজিতে শব্দের পূর্বে কতকগুলি অব্যয় বসে—to, at, in, from ; সম্বন্ধ-পদে of, ইত্যাদি। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ও ইংরেজির মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায় ; এইরূপ অব্যয় বা "উপ-সর্গ" (Pre-position), ইংরেজিতে শব্দের পূর্বে বসে ; বাঙ্গালায় কিন্তু শব্দের পরেই (কোনও-কোনও ক্ষেত্রে শব্দটিতে বিভক্তি যুক্ত করিয়া), যেগুলিকে "অনুসর্গ" (Post-position) বলা হইয়াছে, সেগুলি বসে ; যেমন "ঘর হইতে, ঘর থেকে, হাত দিয়া, হাতে করিয়া, লোকের কাছ থেকে', ইত্যাদি।

বিশেষণ

ইংরেজিতে বিশেষণের লিঙ্গ পরিবর্তিত হয় না, খাঁটি বাঙ্গালাতেও হয় না : good boy, good girl, বাঙ্গালায় "ভালো ছেলে, ভালো মেয়ে"। (কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাবে বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় ক্বচিৎ সংস্কৃত শব্দের সংস্কৃত বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হয় ; যেমন—"সুন্দর বালক, সুন্দরী বালিকা"।) বিশেষণের তারতম্য-প্রকাশের জন্য ইংরেজিতে দুই রীতি—সংস্কৃতের "-ঈয়স্, -ইষ্ঠ" ও "-তর,-তম" প্রত্যয়ের অনুরূপ -er, -est প্রত্যয়-যোগে ; আর অন্য রীতি হইতেছে, পৃথক রূপে প্রযুক্ত বিশেষণের বিশেষণ more—most এবং less বা lesser—least যোগ করিয়া। বাঙ্গালায় এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিয়ম—বিশেষণটিকে অবিকৃত রূপে রাখিয়া, উপমান-বাচক পদটিকে সম্বন্ধ-

পদের রূপে কিংবা বিভক্তিহীন রূপেপ্রয়োগ করিয়া, তাহার পরে "চেয়ে, হইতে, থেকে, অপেক্ষা" প্রভৃতি অনুসর্গ ব্যবহার করিয়া তারতম্য প্রকাশিত হয়।

সংখ্যা-বাচক শব্দে—"প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়" স্থানে first, second (বা other), third ভিন্ন ইংরেজির আর সমস্ত ক্রম-বাচক শব্দ, সংখ্যা-বাচক শব্দ -th প্রত্যয় জুড়িয়া দিয়া গঠিত হয় : fourth, ninth, hundredth ইত্যাদি। বাঙ্গালায় অনুরূপ "-ইয়া" (বা "-এ'") প্রত্যয় এখন লুপ্ত ; ক্রম-বাচক সংখ্যার জন্য চলিত-বাঙ্গালায় "-র,-এর" বিভক্তি যুক্ত হয়। সাধু-বাঙ্গালায় সংস্কৃত ক্রম-বাচক শব্দগুলিও ব্যবহৃত হয়।

দশের পর হইতে বিভিন্ন শতকের অন্তর্গত সংখ্যা-বাচক শব্দগুলি, বাঙ্গালায় পরস্পর হইতে পৃথক্—প্রত্যেকটি আলাহিদা প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, এবং এগুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত বিশেষ আকার-গত সাদৃশ্য নাই ; ইংরেজিতে কিন্তু দশক-বাচক শব্দের পরে এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যা-বাচক শব্দ জুড়িয়া দিয়া, বিভিন্ন দশকের অন্তর্গত সংখ্যাগুলির জন্য শব্দ গঠিত হয় ; যেমন—বাঙ্গালায় "পঞ্চাশ—একান্ন, তিপ্পান্ন, চুয়ান্ন, পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন, সাতান্ন, আটান্ন, উনষাট'—এগুলির প্রত্যেকটি-ই স্বতন্ত্র ; ইংরেজি-মতে হইলে "পঞ্চাশ—পঞ্চাশ-এক (fifty-one), পঞ্চাশ-দুই (fifty-two),…পঞ্চাশ-পাঁচ (fifty-five),… পঞ্চাশ-নয় (fifty-nine)", এইরূপ হইত।

সর্বনাম

গৌরবে মধ্যম-পুরুষ ও প্রথম-পুরুষের বিভিন্ন রূপগুলি বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য—"তুই, তুমি, আপনি ; সে, তিনি ; ও, উনি ; এ, ইনি"। এরূপ পার্থক্য ইংরেজিতে নাই (কেবল thou—you-এর পার্থক্য আগে ইংরেজিতে ছিল—এখন thou প্রায় অপ্রচলিত)।

সর্বনাম-জাত সম্বন্ধ-পদের দুইটি রূপ ইংরেজিতে আছে—এক, বিশেষণ (attributive), ইহা পদের পূর্বে বসে (যথা, *my* book, *your* hat, *his* pencil) ; আর দুই, বিধেয় রূপ (predicative), ইহা পদের পরে বসে (যথা, the book is *mine*, the hat is *yours*, the pencil is *his*)। বাঙ্গালায় ঠিক এরূপটি নাই।

ক্রিয়া

ক্রিয়ার কাল-নির্দেশের প্রণালী-বিষয়ে ইংরেজি ও বাঙ্গালার মধ্যে লক্ষণীয়

মিল আছে। ক্রিয়ার প্রকার বা ভাব (Mood), এবং কর্মবাচ্য-গঠন, উভয় ভাষায় এক-ই প্রণালী অনুসারে হয়—"তবে, যদি, যেন" প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয় পদের সাহায্যে প্রকার-নির্দেশ এবং বিশ্লেষাত্মক-পদ্ধতিতে কর্মবাচ্য-গঠন (যেমন 'করা হয়', 'পড়া হয়')। ইংরেজিতে ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য পৃথক্ ধরা হয় না—কেবল কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যই ধরা হয়।

Auxiliary Verb বা সহায়ক-ক্রিয়ার (shall, will) যোগে ভবিষ্যৎ-নির্দেশ, ইংরেজির একটি বিশেষ নিয়ম। এতদ্ভিন্ন must, ought, would, should প্রভৃতির যোগে, ক্রিয়ায় কাল- ও প্রকার-গত সূক্ষ্মতা ইংরেজিতে পাওয়া যায়; বাঙ্গালায় কোনও-কোনও স্থলে সে সকল সূক্ষ্মতা অজ্ঞাত বা অনির্দিষ্ট, অথবা সেগুলিকে নির্দেশ করা কঠিন।

একটি বিষয়ে ইংরেজির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—ধাতু-রূপ ধরিলে, ইংরেজি ক্রিয়াগুলি Strong Verbs ও Weak Verbs, এই দুই বিভাগে বিভক্ত। ইংরেজিতে Simple Past ও Past Participle-এ ধাতুর মূল স্বরের পরিবর্তন Strong Verb-এর লক্ষণ: sing—sang—sung. এই রীতি আদিম আর্য্য যুগের, ইহার নাম "অপশ্রুতি"; সংস্কৃতেও ইহা বিদ্যমান—"করোতি—চকার—কৃত=কর—কার—কৃ"। ইংরেজিতে কতকগুলি ধাতুতে এই প্রাচীন রীতি অটুট আছে, ইহা বাঙ্গালায় এখন আর জীবিত নাই। -d, -ed, বা -t প্রত্যয় করিয়া Past ও Past Participle গঠন করা Weak Verb-এর লক্ষণ—ইংরেজি ও ইংরেজির ভগিনী-স্থানীয় ডচ, জর্মান ও স্কাণ্ডিনেভীয় ভাষাগুলিতে এই রীতি দেখা যায়: love—loved (আধুনিক ইংরেজিতে এই -d, -ed, -t প্রত্যয় হইয়া দাঁড়াইলেও, মূলে ইহা ছিল do ধাতুর প্রত্যয়ান্ত রূপ—যেন, love+did হইতে love-d। তুলনীয় সংস্কৃতের অতীত রূপে—"করোতি—কারয়ামাস, কারয়াম্বভূব, কারয়াঞ্চকার")। Weak Verb-এর অনুরূপ ক্রিয়া বাঙ্গালায় অজ্ঞাত—সর্ব্বত্রই বাঙ্গালায় "-ইল" ও "-আ" (বা "-আনো") প্রত্যয় যুক্ত হয়। কতকগুলি ইংরেজি ক্রিয়া আবার Irregular বা অনিয়ন্ত্রিত—এগুলিতে -d, -ed, -t যোগ হয়, আবার ক্রিয়ার ধাতুও নানা কারণে (প্রাচীন ইংরেজির অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি এবং অপশ্রুতির জন্য) পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; যেমন—sell—sold; work—wrought; think—thought; catch—caught; ইত্যাদি।

ইংরেজিতে মধ্যম-পুরুষ ও প্রথম-পুরুষের ক্রিয়ার বর্তমানে বচন-ভেদ

আছে—thou lovest—you love; he loves—they love; বাঙ্গালায় ক্রিয়ার বচন-ভেদ নাই।

বাঙ্গালার মতো ইংরেজিতেও কতকগুলি অসম্পূর্ণ ক্রিয়া আছে go—went—gone; am—was—been (=সংস্কৃত "অস্—বস্—ভূ" ধাতু)।

যৌগিক ক্রিয়া বাঙ্গালা ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাবলীর বৈশিষ্ট্য—ইংরেজিতে ঠিক এইরূপ নাই। যেমন, ইংরেজি rub off=বাঙ্গালা "মুছিয়া-ফেলা"। এস্থলে লক্ষণীয় যে, বাঙ্গালাতে মূল ক্রিয়াটির অসমাপিকা রূপের ('মুছিয়া') সহিত সহায়ক ক্রিয়া রূপে অন্য একটি ধাতুর ('ফেল্') সমাপিকা ক্রিয়া-রূপ ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ইংরেজিতে মূল ক্রিয়াটির সহিত একটি adverb (rub *off*) বা adverb রূপে প্রযুক্ত pre-position ব্যবহৃত হয়, কোনও auxiliary verb-এর ব্যবহার হয় না।

বাক্য-রীতি

এই বিষয়ে ইংরেজি ও বাঙ্গালায় বহু পার্থক্য দেখা যায়। ইংরেজি বাঙ্গালার মতো বিভক্তি-বহুল ভাষা নহে, এই জন্য বাক্যের পদ-ক্রম ইংরেজিতে বিশেষ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত। নিম্ন-লিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষণীয়—

১। বাঙ্গালা ক্রম—কর্তা+সম্প্রদান+কর্ম+ক্রিয়া; ইংরেজি ক্রম—কর্তা+ক্রিয়া+কর্ম+সম্প্রদান; যথা—"রাম গোপালকে টাকা দিল"=Ram gave money to Gopal.

২। ইংরেজিতে ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়ার পরে বসে, বাঙ্গালায় পূর্বে; যথা—he runs fast; he ate slowly="সে জোরে ছুটে', বা 'সে দ্রুত দৌড়ায়'; 'সে ধীরে-ধীরে খাইল"।

৩। অনেকগুলি সমাপিকা-ক্রিয়া-যুক্ত সরল বাক্য ইংরেজিতে and-যোগে পর পর বসিতে পারে, বাঙ্গালায় সেখানে সাধারণতঃ অসমাপিকা-ক্রিয়ার-ই প্রয়োগ হয়, সমাপিকা-ক্রিয়ার প্রয়োগ যথা-সম্ভব কম করা হয়।

৪। ইংরেজিতে সংগতি-বাচক সর্বনাম who, which, that প্রভৃতির দ্বারা সরল ও যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করিবার দিকে প্রবণতা আছে। বাঙ্গালাতে কর্তৃপদের বা কর্তৃপদ-স্থানীয় সর্বনামের পুনরাবৃত্তি হয়; যথা—the man who had called yesterday will come again="যে-লোকটি কাল আসিয়াছিল, সে-লোকটি (কিংবা সে) আবার আসিবে"।

৫। ইংরেজির Sequence of Tenses – বাঙ্গালায় এই রীতি অনুসৃত হয় না।

৬। ইংরেজিতে Direct এবং Indirect Narration দুই-ই বেশ চলে; বাঙ্গালায় প্রত্যক্ষ উক্তির (Direct Narration-এর) প্রতি-ই পক্ষপাত দেখা যায়।

৭। অস্ত্যর্থক ক্রিয়া, যাহা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে Copula বা সংযোজকের কাজ করে, তাহা বাঙ্গালায় বহুশঃ উহ্য থাকে—ইংরেজিতে Copula স্পষ্ট উল্লিখিত হয়, যথা—he is my brother="সে আমার ভাই"।

৮। প্রশ্ন-সূচক বাক্যে ও নঞর্থক বাক্যে ইংরেজিতে Auxiliary Verb 'to do'-এর ব্যবহার আছে—বাঙ্গালায় এইরূপ রীতি অজ্ঞাত।

শব্দাবলী

ইংরেজিতে নিজস্ব ধাতু- ও প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু বিদেশী শব্দ অজস্র ইংরেজি ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে—এখন ইংরেজিতে খাঁটি শব্দের সংখ্যার চেয়ে বিদেশী ভাষার শব্দের সংখ্যা ঢের বেশি। জর্মান ভাষা এ বিষয়ে ইংরেজি অপেক্ষা রক্ষণশীল। ইংরেজি আবশ্যক ও অনাবশ্যক ভাবে সহস্র সহস্র শব্দ লাতীন এবং (লাতীন হইতে জাত) ফরাসি ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে : এতদ্ভিন্ন, শত শত গ্রীক শব্দ, এবং ইতালীয়, স্পেনীয়, জর্মান প্রভৃতি ইউরোপের নানা ভাষার শব্দ, তথা পৃথিবীর তাবৎ ভাষার শব্দ, ইংরেজি আত্মসাৎ করিয়াছে। ইংরেজি এখন একপ্রকার 'সর্বগ্রাসী' ভাষা। ইংরেজ জাতি বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাই বিশ্বের সমস্ত ভাষা হইতে আবশ্যক-মতো নূতন নূতন শব্দ যেমন ইংরেজিতে গৃহীত হইতেছে, তেমনি অন্য তাবৎ ভাষাতেও ইংরেজির প্রভাব পড়িতেছে। কিন্তু এখনও উচ্চ-ভাবের শব্দের জন্য ইংরেজিকে লাতীন ও গ্রীকের দ্বারস্থ হইতে হয়—ইংরেজি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নিজের উপর আস্থা হারাইয়াছিল, নিজে আবশ্যক-মতো শব্দ সৃষ্টি করিবার শক্তি পরিহার করিয়া, লাতীন ও ফরাসির দুয়ারে ভিক্ষা করিত, তাই এমনটি হইয়াছে। ইংরেজির নিকট-জ্ঞাতি জর্মান ভাষা কিন্তু নিজ স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়াছে, তাই জর্মান ভাষায় 'স্বদেশী' শব্দ খুবই বেশি; যেমন—ইংরেজির (লাতীন শব্দ) century-কে জর্মানে

বলে Jahr-hundert (খাঁটি ইংরেজি শব্দ হইলে হইত year-hundred 'শত-অব্দ'); (ফরাসি হইতে গৃহীত) hotel-কে বলে Gast-haus (ইংরেজিতে হইত guest-house); (গ্রীক) telephone-কে বলে Fern-sprecher (ইংরেজিতে হইত far-speaker); (লাতীন) expansion-কে বলে Aus-breitung (ইংরেজিতে হইত out-broadening); ইত্যাদি।

কতকগুলি ভারতীয় শব্দ বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানীর মারফৎ (এবং ক্বচিৎ তামিল ও অন্য ভাষা হইতে) ইংরেজি ভাষায় পঁহুছিয়াছে; যথা—bungalow, pundit, loot, jungle, pucca, toddy, raja, ranee, avatar, gooroo বা gurn, dacoit; khaki, lascar, sepoy, curry, cheroot ইত্যাদি, এবং হালের blighty, cushy প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ। ভারতীয় বিদ্যা ও চিন্তার সহিত পরিচয়ের ফলে, guna, vriddhi, sandhi, ahimsa, dharma, karma, yoga, yogi প্রভৃতি শব্দও ইংরেজিতে স্থান পাইয়াছে।

ইংরেজিতে সমাস হয়—যেমন, watch-man, house-wife, book-keeper, book-shop, red-breast, head-strong, blue-beard, long-shanks ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণতঃ আজকাল শব্দগুলিকে বাঙ্গালার মতো পৃথক্ করিয়াই রাখা হয়; যথা—All India Railway Workers' Conference; Smoke Nuisance Committee; State Transport Corporation; ইত্যাদি।

ইংরেজি ও বাঙ্গালা, এই দুই ভাষা পরস্পরের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি—উভয়ের মূল পূর্ব্বপুরুষ হইতেছে আদি-আর্য্য ভাষা। আধুনিক বাঙ্গালা ও ইংরেজির মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা গেলেও, ইহাদের প্রাচীন রূপে (যথাক্রমে সংস্কৃত ও প্রাচীন-ইংরেজির মধ্যে) ইহাদের উভয়ের নানা লক্ষণীয় সাদৃশ্য বিদ্যমান। ধাতু- ও শব্দ-বিষয়ে সাম্য তো আছেই; অধিকন্তু দুইটি ভাষার ব্যাকরণের রীতিতে এবং প্রত্যয়-বিভক্তিতেও যথেষ্ট মিল আছে। সংস্কৃত ও ইংরেজির শব্দ- ও ধাতু-গত সাম্য: যথা—*ভ্রূ—brow; দন্ত, দাঁত—tooth (প্রাচীনতম ইংরেজি রূপ ছিল *tanth); নাসা—nose; নখ—nail (প্রাচীন রূপ—næg-el); পদ, পা— foot; উদর—udder; অদ্—eat; গম্—come; ভিদ্—bite; স্মি—smi-le; ভৃ, ভর্—bear; পৃ, পার্—fare; ধৃষ্—durs-t; তৃষ্—thirs-t; পূ—fou-l; পিতর্, পিতা—father; মাতর্, মাতা, মা—mother; ভ্রাতর্, ভ্রাতা, ভাই—brother; স্বসর্, স্বসা—

sister; দুহিতর্, দুহিতা—daughter; সূনু—son; বিধবা—widow; শিলা—hill; স্রু—stream; উক্ষ=উক্ষ—ox (=oks); গো—cow; অবি—ewe; মূষ, মূষিক—mouse; উদ্র>উদ (উদ্‌বিড়াল)—otter; ইত্যাদি বহু বহু শব্দ, সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে, আদি-আর্য্যভাষা হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ।

ব্যাকরণের রীতি- ও প্রত্যয়-বিভক্তি-ঘটিত সাম্য; যথা—

১। সংস্কৃতে বিশেষ্যের বহুবচন—"-অস্" বিভক্তির দ্বারা: "মানব+-অস্=মানবাস্=মানবাঃ"; ইংরেজিতে -s, -es প্রত্যয়ের দ্বারা: friend—friends.

২। সংস্কৃতে "-স্য" বা "-অস্" দ্বারা ষষ্ঠী: "মানবস্য; মনসস্=মনসঃ; মতেস্=মতেঃ"; ইংরেজিতে -'s, -s' (মূল রূপ -es) দ্বারা ষষ্ঠী হয়, যথা—man's, boys', mind's

৩। সংস্কৃতে "-ঈয়স্, -ইষ্ঠ" প্রত্যয়দ্বয়ের যোগে তারতম্য, ইংরেজিতে -er, -est: "স্বাদু—স্বাদীয়স্—স্বাদিষ্ঠ"=sweet—sweeter—sweetest; তুলনীয়—সংস্কৃত "নি-তর"—ইংরেজি nether; "প্র-তর"—farther.

৪। ক্রিয়াতে—সংস্কৃত "লুভ্-য-তি=লুভ্যতি"; প্রাচীন ইংরেজি luf-ie-th, luvieth, মধ্য-যুগের ইংরেজি loveth, আধুনিক ইংরেজি loves; "অস্মি"—am; "অস্তি"—is (জর্মান ist); "সন্তি"—প্রাচীন ইংরেজি sint.

৫। সংস্কৃতে শতৃ-প্রত্যয় "-অন্ত্"; প্রাচীন ইংরেজিতে -end, আধুনিক ইংরেজিতে -ing: "ভর্+-অন্ত্=ভরন্ত্"=ber-end—bearing; প্রী+-অন্ত্=fri-end, friend.

৬। সংস্কৃতে নিষ্ঠা "-ত, -ইত" বা "-ন" প্রত্যয় এবং ইংরেজির Past Participle-এ -ed, -en প্রত্যয় মূলে এক: "ভিদ্-ন>ভিন্ন"=bitt-en; "অ-দম্-ইত, *ন-দাম্-ত=অদান্ত"=un-tam-ed, untamed.

সংস্কৃত ও ইংরেজির মধ্যে স্বর-ধ্বনি ও ব্যঞ্জন-ধ্বনির যে-সমস্ত পার্থক্য দেখা যায়, সেই সব পার্থক্যের মধ্যেও একটি নিয়ম আছে; যেমন—যেখানে শব্দের আদিতে সংস্কৃতে "প", সেখানে ইংরেজিতে f; সংস্কৃতে "শ, ক"—ইংরেজিতে h; সংস্কৃতে "ত"—ইংরেজিতে th; সংস্কৃতে "ভ"—ইংরেজিতে b; ইত্যাদি। সংস্কৃতে নঞর্থক উপসর্গ "অ-, অন্" ইংরেজিতে un-; ইত্যাদি। তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে এই-সব বিষয় বিশেষ খুঁটিনাটির

ফার্সী (ঈরানী) ভাষার ব্যঞ্জন-ধ্বনি

	কণ্ঠনালীয় শ্বাসনালীয়	কণ্ঠ্য	তালব্য	* দন্ত্য ও দন্তমূলীয়	দন্তোষ্ঠ্য	ওষ্ঠ্য
স্পৃষ্ট		k, ক (ک) g, গ (گ)		* t, ত (ت, ط) * d, দ (د)		p, প (پ) b, ব (ب)
ঘৃষ্ট			č, চ (چ) j, জ (ج)			
নাসিক্য		ŋ, ঙ (ক, গ-এর পূর্বে ن)		n, ন (ن)		m ম (م, ن)
কম্পন-জাত				r, র (ر)		
পার্শ্বিক				l, ল (ل)		
উষ্ম	h, হ (ه, ح)	kh, খ. (خ) g^h, ঘ. (غ, ق)	š, শ (ش) ž, ঝ. (ژ)	s, স (ص, ث, س) z, জ. (ز, ذ, ض, ظ)	f, ফ. (ف) v, ভ., ব (و)	

সহিত আলোচিত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা এই দুইটি আর্য্য-ভাষার মৌলিক সাদৃশ্য ও সংযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ফার্সী ও বাঙ্গালা

ফার্সী ভাষা বাঙ্গালার মতো আর্য্য-গোষ্ঠীর ভাষা—আধুনিক ফার্সীর মূল-স্বরূপ প্রাচীন-পারসীক ও অন্য প্রাচীন ঈরানীয় ভাষা, এবং বাঙ্গালার মূল বৈদিক সংস্কৃত ভাষা, এই দুইটি এত কাছাকাছি যে, ইহাদিগকে এক-ই ভাষার দুইটি উপভাষা বলা চলে। ফার্সী ও বাঙ্গালা এই দুই ভাষার মধ্যে যে মৌলিক সাদৃশ্য আছে, এই দুই ভাষার বর্ণমালার পার্থক্য এবং শব্দ-সমষ্টির অনৈক্য সত্ত্বেও তাহা অনেক সময়েই সহজেই ধরা যায়।

আরবী বর্ণমালাতে কতকগুলি নূতন বর্ণ যোগ করিয়া ফার্সী বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে। সাধু বা সাহিত্যের ফার্সীর ধ্বনিগুলি খুব জটিল নহে। ইহাতে মাত্র বাইশটি (অথবা "ক" ও "গ"-এর দুইটি আধুনিক বিকৃত বা তালব্যীকৃত উচ্চারণ ধরিয়া চব্বিশটি) ব্যঞ্জন-ধ্বনি আছে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় ফার্সীর ব্যঞ্জন-ধ্বনি প্রদর্শিত হইল।

আরবী ভাষার কতকগুলি ধ্বনি ফার্সীতে অজ্ঞাত, যদিও ঐ-সব ধ্বনির জন্য আরবীর বর্ণগুলি ফার্সী বর্ণমালায় আছে; যেমন— ح (ফার্সীতে ইহা ه হইতে অভিন্ন); ذ ض ظ (এই তিনটির উচ্চারণ আরবীতে পৃথক্ পৃথক, কিন্তু ফার্সীতে এগুলি ز=জ় বা z-এর সমান); ث ও ص (আরবীতে এই দুইটি পৃথক, ফার্সীতে কিন্তু س বা দন্ত্য স বা s-এর সঙ্গে এই দুইটি অভিন্ন); ط (ফার্সীতে ت-র সঙ্গে অভিন্ন); ق (ফার্সীতে غ=ঘ়-এর মতো); ع এবং ء (همزه)—ফার্সী উচ্চারণে এই ধ্বনি দুইটি এক প্রকার পরিত্যক্ত হয়।

ফার্সীর ব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলির মধ্যে উষ্ম-ধ্বনির বাহুল্য লক্ষণীয়।

স্বর-ধ্বনি— ـَ ـِ ـُ =হ্রস্ব অ (বিবৃত—কতকটা অ্যা-কারের মতো), হ্রস্ব এ, হ্রস্ব ও (অথবা হ্রস্ব ই, হ্রস্ব উ)। ফার্সীর ا অর্থাৎ দীর্ঘ "আ"-এর উচ্চারণ এখন বাঙ্গালা "অ" বা 'অও"-এর মতো হইয়া গিয়াছে (تمام 'তমাম' শব্দ এখন ঈরান-দেশের উচ্চারণে দাঁড়াইয়াছে 'থ্যামওম্'); দীর্ঘ "ঈ" এবং দীর্ঘ "ঊ" আছে; এবং দুইটি সন্ধি-স্বর আছে—ei "এই" এবং ou "ওউ"। পুরাতন ফার্সীতে দীর্ঘ "এ" এবং দীর্ঘ "ও" ছিল—আজকাল এই ধ্বনিগুলি যথাক্রমে

দীর্ঘ "ঈ" তথা দীর্ঘ "ঊ" হইয়া গিয়াছে। 'বাঘ' বা 'সিংহ' অর্থে شیر শব্দ প্রাচীন উচ্চারণে ছিল šēr "শের্", এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে "শীর্" šīr ('দুগ্ধ' অর্থে شیر 'শীর্' হইতে অভিন্ন); 'দিন' অর্থে, روز শব্দের আগেকার উচ্চারণ ছিল rōz "রোজ্." এখন হইয়া গিয়াছে rūz "রূজ্."।

ফার্সীর হ্রস্ব ধ্বনিগুলি বিশেষ হ্রস্ব, দীর্ঘ ধ্বনি সচরাচর বিশেষ দীর্ঘ থাকে; বাঙ্গালার মতো সমস্ত শব্দ বা বাক্যাংশের উপরে অক্ষরের হ্রস্বত্ব বা দীর্ঘত্ব নির্ভর করে না। ফার্সীর শ্বাসাঘাত সাধারণতঃ শব্দের অন্ত্য অক্ষরের উপরে পড়ে। বাঙ্গালায় ঠিক উহার উল্‌টা—বাঙ্গালায় শ্বাসাঘাত শব্দের আদ্য অক্ষরে পড়ে।

আধুনিক ফার্সীর "p=প, k=ক, t=ত" ধ্বনিগুলি মহাপ্রাণ "kh=খ, ph=ফ, th=থ" রূপে উচ্চারিত হয়।

ফার্সীতেও সন্ধি আছে—অনেক সময়ে তাহা লিখিয়া দেখানো হয় না, বিশেষতঃ ব্যঞ্জন-সন্ধি হইলে; যথা—بدتر "বদ্‌তর্"—উচ্চারণে "বৎতর্"; گنبد ,گنبذ "গুন্‌বহ্, গুন্‌বজ্."—উচ্চারণে "গুম্বহ্, গুম্বজ্."; ناخدا "নাও-খু.দা"—ناخدا "নাখু.দা"।

শব্দরূপ

ফার্সীতে শব্দের লিঙ্গ-নির্ণয়-ব্যাপারে, বাঙ্গালা বা ইংরেজিরই মতো কোনও ঝঞ্ঝাট নাই—অর্থ-অনুসারে শব্দের লিঙ্গ স্থিরীকৃত হয়। উভয়-লিঙ্গ শব্দের পূর্ব্বে نر "নর্"='পুরুষ' এবং ماده "মাদহ্"='স্ত্রী', এই দুই শব্দ বসাইয়া, পুরুষ বা স্ত্রীর বিশেষ দ্যোতনা হয়। ফার্সীতে স্ত্রীলিঙ্গের জন্য বিশেষ প্রত্যয় নাই—তবে আরবী শব্দে স্ত্রী-প্রত্যয় পাওয়া যায়; যথা—ملک "মলিক"='রাজা'—ملکه "মলিকহ্, মলিকা"='রানী'; اسود "অস্‌বাদ্" ='কালো'—سوده "সব্‌দহ্, সোদা"='কৃষ্ণবর্ণা'; ইত্যাদি।

প্রাচীন-পারসীক শব্দ-রূপ সংস্কৃতের মতোই ছিল। আজকালকার ফার্সীতে প্রাচীন সুবন্ত রূপগুলির প্রায় সমস্তই লোপ পাইয়াছে, সুতরাং ফার্সীর শব্দ-রূপ অতি সরল হইয়া গিয়াছে। বহুবচনের চিহ্ন প্রাণি-বাচক শব্দে ان "-আন্" ও অপ্রাণি-বাচক শব্দে ها "-হা"—এই দুইটি ছাড়া আর কোনও প্রত্যয় নাই; আধুনিক ফার্সীতে আবার ان "-আন্"-এর ব্যবহারও নাই—সর্ব্বত্রই বহুবচনে ها "-হা" প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। Preposition বা উপসর্গ ও Post-position বা অনুসর্গের দ্বারা বিভিন্ন কারক

দ্যোতিত হয় ; যথা—از خانه "অজ্.-খ.নহ্" 'ঘর হইতে'; با مرد "বা-মর্‌দ্" 'মানুষের প্রতি' ; مرد را "মর্‌দ্-রা" 'মানুষকে'; دست مرد "দস্.ৎ-ই-মর্‌দ্" 'মানুষের হাত' (*dast-i-mard* – 'hand-of-man'); ইত্যাদি। এই-সব Preposition-এর ব্যবহারে, ফার্সী ও ইংরেজির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। সম্বন্ধ-পদে অধিকারী ও অধিকৃতের নামের মধ্যে "-ই-" (বা "-এ-") প্রত্যয় (ফার্সীতে যাহাকে اضافت বলে) ফার্সীর এক বৈশিষ্ট্য : دختر پادشاه "দুখ্.তর্-ই-পাদিশাহ্" 'রাজার কন্যা'।

ফার্সীর Indefinite Article বা অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের অবধারণ (یای وحدت, یای تنکیر) বাঙ্গালায় অজ্ঞাত ; যেমন—مرد "মর্‌দ্" 'মানুষ', مردے, مردی "মর্‌দে, মর্‌দী" 'কোনও একজন মানুষ'। বৃহত্ত্ব, পরিপূর্তি অথবা সম্মান জানাইবার জন্য যে ی "-এ, -ঈ" অক্ষর বিশেষ্যের সঙ্গে প্রত্যয়বৎ যুক্ত হয় (یای تاکید), তাহার মতো প্রত্যয়ও বাঙ্গালায় নাই ; যথা—خلق "খ.ল্‌ক্" 'জাতি', خلقی "খ.ল্‌কী" ' সমগ্র জাতি'।

বিশেষ্যকে অনুসরণ করিয়া বিশেষণের কোনও পরিবর্তন হয় না ; বাঙ্গালার সহিত ফার্সীর এ বিষয়ে মিল আছে। ফার্সীতে বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্বে বসে ; যথা— نیک مردمان "নীক্ মর্‌দুমান্" 'ভালো মানুষ'; هشیار وزیر "হুশ্.য়ার্ বজ.ীর" 'বিচক্ষণ মন্ত্রী', ইত্যাদি ; আবার বহু স্থলে বিশেষ্যের পরেই বসে, এবং উভয়ের মধ্যে ی "-ই, -এ" প্রত্যয় (اضافت توصیفی) আসে ; যথা— بازوی سخت "বাজ্.-এ-সখ্.ৎ" 'কঠিন বাহু'; بندهٔ وفادار "বন্দহ্-ই-বফ.াদার" 'বিশ্বাসী ভৃত্য'। বাঙ্গালায় এইরূপ রীতি অজ্ঞাত।

তারতম্য

সংস্কৃত ও ইংরেজির অনুরূপ, تر "-তর্" ও ترین "-তরীন্" প্রত্যয়ের-যোগে নিষ্পন্ন হয় : به "বিহ্" 'ভালো', به تر "বিহ্-তর্" 'অপেক্ষাকৃত ভালো', به ترین "বিহ্-তরীন্" 'সর্বাপেক্ষা ভালো'। সাধারণতঃ পঞ্চমী ও ষষ্ঠী ("-তর্" প্রত্যয়ে পঞ্চমী বা অপাদান, "-তরীন্" অর্থাৎ '-তম' প্রত্যয়ে ষষ্ঠী বা সম্বন্ধ) বিভক্তির সহযোগে তারতম্য প্রদর্শিত হয়।

সর্বনাম

সর্বনাম-বিষয়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সহিত ফার্সীর অনেক মিল আছে।

ফার্সীর 'পদাশ্রিত সর্বনাম' একটি বিশেষ বস্তু, বাঙ্গালায় তাহা নাই।

সর্বনামের কতকগুলি বিশেষ রূপ আছে—ষষ্ঠী বিভক্তিতে এই বিশেষ রূপগুলি বিশেষ্য-পদের সহিত সংযুক্ত হয়; যথা—'আমার পিতা' অর্থে, پدر من "পিদর্ ই-মন্" অথবা پدرم "পিদর্-অম্, পিদরম্" (তুলনীয়, সংস্কৃত "মম পিতা—পিতা-মে"); 'তোর পিতা'— پدر تو "পিদর্-ই-তু" অথবা پدرت "পিদর্-অৎ, পিদরৎ"; 'তাহার বই'— کتاب او "কিতাব-ই-উ," অথবা کتابش "কিতাব্-অশ্, কিতাবশ্"; ইত্যাদি। ক্রিয়ার কর্ম হইলেও, এই-রূপ সংক্ষিপ্ত সর্বনাম ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়; যথা—دیدم "দীদম্" 'আমি-দেখিলাম'; دیدمش "দীদম্-অশ্=দীদমশ্" 'আমি-তাহাকে-দেখিলাম'; زدند "জ.দন্দ্"='তাহারা মারিল', কিন্তু 'তাহারা আমাকে মারিল'= مرا زدند "ম-রা জ.দন্দ্" অথবা زدندم "জ.দন্দ্-অম্, জ.দন্দম্।"

ক্রিয়াপদ সাধন

প্রাচীন-পারসীকের ক্রিয়ার রূপ প্রায় পুরাপূরি সংস্কৃতের-ই মতো ছিল। প্রাচীন-পারসীকের ক্রিয়ার অনেক প্রত্যয় ও বিভক্তি, আধুনিক ফার্সীতেও বাঁচিয়া আছে; অধিকন্তু, কতকগুলি বিশ্লেষমূলক প্রকার (বা ভাব) ও কাল-রূপ, আধুনিক ফার্সীতে সৃষ্ট হইয়াছে। Preposition বা অব্যয়-রূপী উপসর্গ-দ্বারা কতকগুলি ক্রিয়ার কাল-রূপ এবং প্রকার (বা ভাব) দ্যোতিত হয়।

বাঙ্গালা ও ইংরেজির মতো আধুনিক-ফার্সীতে মূল ক্রিয়ার শতৃ - ও নিষ্ঠা-যুক্ত রূপের সহিত অস্তি-বাচক ও ইচ্ছা-বাচক সহায়ক-ক্রিয়ার যোগে কতকগুলি যৌগিক কাল-রূপ হইয়াছে। মোটের উপর, ক্রিয়ার রূপে সব ক্ষেত্রে পূরা মিল না থাকিলেও, বাঙ্গালা ও ইংরেজির সঙ্গে বেশ একটা সামঞ্জস্য ফার্সীতে দেখা যায়।

একবচনে ও বহুবচনে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য ফার্সীতে প্রদর্শিত হয়—বাঙ্গালার সঙ্গে এখানে অমিল।

ফার্সী ক্রিয়ার রূপ—

১। پرس "পুর্স্" ধাতু='পুছ্, জিজ্ঞাসা কর্' (সংস্কৃত 'প্রচ্ছ্'='পৃষ্' ধাতু)

২। پرسد "পুর্সদ্" 'সে পুছে' (পৃচ্ছতি) [নিত্য বর্তমান]

৩। پرسید "পুর্সীদ্"='সে পুছিল' [সাধারণ অতীত]

৪। پرساد "পুর্সাদ" 'যেন সে পুছে' [ইচ্ছাদ্যোতক ভাব]

৫। بپرس "বি-পুর্স্" 'তুই পুছ্' [অনুজ্ঞা]

৬। بپرسد "বি-পুর্সদ্" 'সে পুছিতে পারে' [সম্ভাব্য, বর্তমান]

৭। می پرسد, همی پرسد "মী-পুর্সদ্, হমী-পুর্সদ্" 'সে পুছিতেছে' [ঘটমান বর্তমান]

৮। می پرسید - همی پرسید "মী-পুর্সীদ্, হমী-পুর্সীদ্" 'সে পুছিতেছিল, সে পুছিত, সে পুছিতে থাকিত' [ঘটমান অতীত]

৯। پرسیده است "পুর্সীদহ্-অস্ত্" বা پرسیدست "পুর্সীদস্ত্" 'সে পুছিয়াছে' [পুরাঘটিত বর্তমান]

১০। پرسیده بود "পুর্সীদহ্-বদ্" সে পুছিয়াছিল' [পুরাঘটিত অতীত]

১১। خواهد پرسید "খ্বাহদ্-পুর্সীদ্" 'সে পুছিবে' [যৌগিক ভবিষ্যৎ]

১২। پرسیده باشد "পুর্সীদহ্-বাশদ্" 'সে পুছিয়া থাকিতে পারে, সে পুছিয়া থাকিবে' [ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য]

এতদ্ভিন্ন আরও দুই-তিনটি যৌগিক কাল হয়।

অসমাপিকা, শতৃ-ইত্যাদি অন্ত রূপ—پرسا "পুর্সা"='পুছিয়া'; پرسان 'পুর্সান্' 'পুছিতে-পুছিতে"; پرسنده "পুর্সন্দহ্"='পুছন্ত'; پرسیده "পুর্সীদহ্"='পুছিলে পরে'; پرسیدن "পুর্সীদন্"='পুছিতে'; پرسیدنی "পুর্সীদনী"='পুছিবার যোগ্য, জিজ্ঞাস্য'; ইত্যাদি।

বাঙ্গালার মতো ফার্সীতে কতকগুলি অসম্পূর্ণ ক্রিয়া আছে।

নিষ্ঠা-প্রত্যয়-যুক্ত রূপের সহিত অস্তি-বাচক ধাতু মিলাইয়া, কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়—বাঙ্গালার মতো।

ফার্সীতে বিশেষ্যের সহিত "কর্" বা 'দা" ধাতুর যোগে, বহু যৌগিক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় বটে (যথা—رحم کردن "রহ্‌ম্ কর্দন্"='দয়া করা'; بیدار کردن "বীদার কর্দন্"='জাগরিত করা'; تیار کردن "তৈয়ার কর্দন্"='তৈয়ার

করা', ইত্যাদি); কিন্তু বাঙ্গালার মতো দুইটি বিভিন্ন ধাতুতে মিলিয়া গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব ফার্সীতে নাই।

বাক্য-রীতি

বাক্য-রীতিতে ফার্সীর সহিত বাঙ্গালার বহু বিষয়ে ঐক্য আছে।

১। ফার্সীতে (বাঙ্গালার মতো) কর্তা + সম্প্রদান + কর্ম + ক্রিয়া ; ক্রিয়া শেষে বসে : پادشاه با وزیر فرمان داد "বাদ্‌শাহ্‌ বা-ৱজ়ীর ফ.র্মান্‌ দাদ্‌" = 'রাজা মন্ত্রীকে অনুমতি-পত্র (প্রমাণ) দিলেন'।

২। ক্রিয়ার বিশেষণ বাঙ্গালার মতো পূর্বে বসে।

৩। কর্তার বচন অনুসারে ক্রিয়ার একবচন বা বহুবচনের রূপ হয় : مادر گفت "মাদর্‌ গুফ্‌.ৎ" = 'মা বলিলেন'; مادران گفتند "মাদরান্‌ গুফ্‌.তন্দ্‌" = 'মায়েরা (বা মাতা-পিতা) বলিলেন'। বাঙ্গালাতে কিন্তু বচন অনুসারে ক্রিয়া-পদের রূপের ভেদ নাই।

৪। গৌরবে একবচনের কর্তার ক্রিয়া বহুবচনের হয় ; যথা—خدا تعالی او را دشمن دارند "খু.দা-ত'আলা ও-রা দুশ্‌মন্‌ দারন্দ্‌" 'পরমেশ্বর উহাকে শত্রু ধরেন (= ভাবেন)'।

৫। পরোক্ষ উক্তি প্রায়ই হয় না—বাঙ্গালার মতো।

৬। ইংরেজির অনুরূপ Sequence of Tense নাই।

৭। সংযোজক-রূপে ব্যবহৃত অস্তিত্ব-বাচক ক্রিয়া বাঙ্গালার মতো উহ্য থাকে না, ব্যক্ত থাকে, যথা—বাঙ্গালা, 'সে আমার ভাই' = او برادر من است "উ বিরাদর্‌-ই-মন্‌ অস্ত্‌"।

শব্দাবলী

ফার্সীর নিজস্ব আর্য্য-ভাষার শব্দাবলীর সহিত সংস্কৃতের বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান : روز "রোজ়্‌." 'দিন' (= সংস্কৃত "রোচঃ" 'আলোক') ; شب "শব্‌" 'রাত্রি' (= ক্ষপা, কৃষপা) ; شیر "শীর্‌" 'দুধ' (= ক্ষীর, কৃষীর); اسپ "অস্‌প্‌" (= অশ্ব) ; گاو "গাব্‌" (= গৌ) ; خر "খ.র" 'গাধা' (= খর); شتر "শুতুর্‌, শুতর্‌" (প্রাচীন-পারসীক উশ্‌.ত্র = উষ্ট্র) ; پدر "পিদর্‌", مادر "মাদর্‌", برادر "বিরাদর্‌." خواهر "খ্‌.াহ্‌.র্‌," دختر "দুখ্‌.তর্‌" (= পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ, স্বসৃ, দুহিতৃ); داماد "দামাদ্‌." (= জামাতা); دادار "দাদার্‌." (= ধাতৃ); خدا "খু.দা" = 'ঈশ্বর' (= স্ব-ধা – 'যিনি নিজে কাজ করেন'); ایزد "ঈজ়্‌.দ্‌" = 'পূজ্য, ঈশ্বর' (= যজত) ; نماز "নমাজ়্‌." (= নমঃ, নমস্‌);

دو - سه - چهار - پنج - شش - هفت - هشت - نه - ده - بیست - سد (صد)-هزار
- یک "য়ক্ (=এক), দো, সি (=ত্রি), চহার্, পন্‌জ্, শশ্ হফ্.ৎ (=সপ্ত), হশ্‌ৎ (=অষ্ট), নৌ, দহ্ (=দশ), বীস্‌ৎ (=বিংশতি), সদ্ (=শত), হজ়ার্ (অবেস্তার ভাষায় হজ়.ঙ্‌র=সহস্র)"; باد "বাদ" (=বাত); مهر "মিহ্‌র্" (=মিত্র); پاک "পাক্" 'পবিত্র' (=পাবক, 'পাকিস্তান'='পাবকস্তান, পবিত্র দেশ'); سر "সর্" (=শিরঃ); دست "দস্ত্" (=হস্ত); پا পা (=পাদ, পদ); خود 'খ়ুদ্' (=স্বতঃ); کر "কর্" ধাতু (= √কৃ, কর্); خواب "খ্‌বাব্" 'নিদ্রা' (=স্বাপ); خواں "খ্‌বান্" 'পাঠ করা' (= √স্বন্); بر , بر "বুর্, বর্" (= √ভৃ, ভর্); بو "বূ" (= √ভূ); دا "দা" (= √দা); استا "ইস্তা" (= √স্থা : فرستا "ফিরিস্‌তা" 'প্রেরিত পুরুষ, দেবদূত'=প্র- √স্থা); خری খ়্‌রী" (= √ক্রী); سفی "শনা" (= √শ্রু—শৃণোতি); ام "অম্" (অস্মি); است "অস্ত্" (=অস্তি); نرم "নর্ম্" (=নম্র); شرم "শর্ম্" (=শর্ম); گرم "গর্ম্" (=ঘর্ম); چرخ "চর্‌খ়্" (=চক্র); سرخ "সুর্‌খ়্" 'লাল' (=শুক্র)"; ইত্যাদি।

কতকগুলি ফার্সী নাম—

আধুনিক ফার্সী	প্রাচীন পারসীক	সংস্কৃত
ঈরান<এরান্	ঐর্‌য়ানাম্, অরিয়ানাম্	আর্য্যানাম্
বহ্‌মন্	ব্‌হুমনো	বসুমনাঃ
খ়ুস্‌রৌ, খ়ু-স্‌রব্	হুস্রবও	স্বশ্রবাঃ
রুস্তম্	রউদস্তম	রোধস্তম
সুহ্‌রাব্	সুখ্‌রাস্প	শুক্রাশ্ব
জ়র্‌দুস্ত্	জ়রথুশ্‌ত্র	জরদুষ্ট্র
দারা<দারাব্	দারয়বহুষ্	ধারয়দ্বসুঃ, ধারয়দ্‌বসুঃ
অর্দ্‌শীর্	অর্তখ়্‌শথ্র	ঋতক্ষত্র

ফার্সীর নিজস্ব ধাতু ও প্রত্যয়ের যোগে, বহু শব্দ ফার্সীতে সৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, আরবী ভাষা হইতে ফার্সী বহু সহস্র শব্দ গ্রহণ করিয়াছে—উচ্চ-ভাব-দ্যোতক শব্দ ফার্সী ভাষায় প্রচুর থাকিলেও, আধুনিক ফার্সী এইরূপ অনেক শব্দ আরবী হইতে ধার করিয়াছে। বর্তমানে ফার্সী অভিধানের ৬০টির উপর শব্দ আরবী হইতে গৃহীত। কিছু গ্রীক, সিরীয়, ভারতীয় ও তুর্কী শব্দও ফার্সীতে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। আজকাল ইউরোপের সভ্যতার সহিত

ঘনিষ্ঠ যোগের ফলে, ফ্রেঞ্চ্ বা ফরাসি ভাষা হইতেও অনেক শব্দ ফার্সীতে গৃহীত হইতেছে। অধুনা কতকগুলি ফার্সী লেখক, ভাষায় আগত আরবী শব্দাবলীকে বর্জন করিয়া, সেগুলির স্থানে প্রাচীন বা খাঁটি ফার্সী শব্দকে পুনঃ-প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন, এবং কেহ কেহ আবার প্রচুর পরিমাণে ফরাসি ও অন্য ইউরোপীয় শব্দ আমদানি করিতে চাহিতেছেন।

ফার্সীর সমাস, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের ন্যায় ; যথা— شاه نامه "শাহ্-নামহ্" ='রাজগ্রন্থ'; تخت نشین "তখ্ৎ-নশীন্" = 'সিংহাসনারূঢ়'; شاه زاده "শাহ্-জ়াদহ্" = 'রাজ-জাত, রাজপুত্র'; شیر مرد "শের্-মর্দ্" = 'নৃসিংহ'; خوش بو ="খ্.শ্-বো" = 'সু-গন্ধ '; نیک نام "নেক্-নাম" = 'সু-নাম'; دراز دست "দরাজ্.-দস্ত্" = 'দীর্ঘ-বাহু, দীর্ঘ-হস্ত' ; شش پا 'শশ্-পা" = 'ষট্-পদ' ; ইত্যাদি।

হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উর্দু) ও বাঙ্গালা

হিন্দুস্থানী ভাষার দুইটি সাহিত্যিক রূপ—হিন্দী, উর্দু। ইহাদের ধ্বনি ও ব্যাকরণ এক—প্রভেদ শুধু বর্ণমালা ও উচ্চ-ভাবের শব্দাবলী লইয়া। ফার্সী হরফে লেখা এবং প্রচুর-ফার্সী-আরবী-শব্দ যুক্ত হিন্দুস্থানী ভাষার নাম "উর্দু" এবং নাগরী অক্ষরে লেখা ও প্রচুর সংস্কৃত শব্দে ভরা হিন্দুস্থানী ভাষার নাম "হিন্দী" ; উর্দুকে "মুসলমানী হিন্দী" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপে এক-ই দেশের মানুষ এক-ই ভাষাকে, ধর্ম-অনুসারে বিভিন্ন বর্ণমালায় লিখিয়া এবং অন্য ভাষা হইতে উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতির শব্দ গ্রহণ করিয়া দুইটি পৃথক সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করিয়াছে। সাহিত্যের ভাষা রূপে ব্যবহৃত হিন্দী ও উর্দু ব্যতীত, সাধারণ লোকে যে হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করে, তাহার আবার সমস্তভারতব্যাপী প্রচলিত সরল একটি রূপ আছে ; তাহাকে "বাজারী হিন্দুস্থানী" বা "চল্‌তী হিন্দুস্থানী" বলা চলে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ কার্য্যকর হইলেও, ব্যাকরণানুসারী নহে বলিয়া, এই "চল্‌তী হিন্দুস্থানী"-তে কেহ সাহিত্য রচনা করে নাই, এবং ইহার দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।

ধ্বনি

সংস্কৃতের বর্ণগুলির দ্বারা নির্দিষ্ট ধ্বনিগুলি মোটামুটি ভাবে হিন্দুস্থানীতে পাওয়া যায়। "ঋ, ষ্ণ, ৯" হিন্দীতে ব্যবহৃত নাগরী বর্ণমালায় আছে,

কিন্তু প্রাচীন উচ্চারণ নাই। "ঐ, ঔ"-এর উচ্চারণ বদলাইয়া গিয়াছে। "ঞ"-র উচ্চারণও নাই। "ণ"-এর উচ্চারণও লোপ পাইয়াছে—এই ধ্বনি উর্দূতে স্বীকৃত হয় নাই; হিন্দীতে "ণ" কেবল সংস্কৃত শব্দে মিলে, এবং এই ণ-এর উচ্চারণ করা হয় "ড়ঁ"। হিন্দীতে পূর্বে তালব্য শ-এর উচ্চারণ ছিল দন্ত্য স-কারের মতো, এবং মূর্ধন্য ষ-কারের উচ্চারণ ছিল "খ"; এখন "শ" ও "ষ" এই দুইটি বর্ণ ইংরেজির *sh*-রূপে উচ্চারিত হয়। ফার্সীর কতকগুলি ধ্বনি হিন্দুস্থানীতে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে—বিশেষতঃ উর্দূতে; যে-সব আরবী-ফার্সী শব্দ উর্দূতে ঢুকিয়াছে, সেগুলিকে আশ্রয় করিয়া এই-সব বিদেশী ধ্বনি ভারতে আসিয়াছে। এই ধ্বনিগুলি হইতেছে ফ় = f = ف, খ় = *kh* = خ; ঘ় = *gh* = غ এবং জ় = *z* = ز (এবং ذ ض ظ)। এগুলির জন্য বিন্দু-যুক্ত নাগরী অক্ষর হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়—ফ়, জ়, গ়, জ়, কিন্তু সাধারণ "ফ, জ, গ জ-ও চলে। ق-এর ধ্বনি (ক়, ক়) শিক্ষিত উর্দূওয়ালার মুখে শুনা যায়—এই আরবী ধ্বনিটি নাগরীতে ক় রূপে লিখিত হয়। আরবী ع "'অয়্‌ন্‌' অক্ষর উর্দূ লিপিতে আছে, এবং উর্দূতে আগত আরবী শব্দে পাওয়া যায়, কিন্তু মুসলমান মৌলবী ও আরবী-জানা লোকেদের মুখে ছাড়া হিন্দুস্থানীতে এই ধ্বনি শুনা যায় না, সেইজন্য ইহাকে বর্জন করা হয়; নাগরী অক্ষরে স্বরবর্ণের তলায় ফুট্‌কি দিয়া কখনও কখনও ইহাকে জানাইবার চেষ্টা করা হয়; যথা—علی = অ়লী = আলী; علم = ইল্‌ম = (চল্‌তি বাঙ্গালায়) এলেম; عثمان = উ়সমান = ওসমান।

মহাপ্রাণধ্বনি "ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ" শুদ্ধ বা পূর্ণ রূপে হিন্দীতে উচ্চারিত হয়। সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিও হিন্দীতে বেশ স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালার তুলনায় হিন্দুস্থানীর এটি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। হিন্দীতে "জ্ঞ" -এর উচ্চারণ "গ্‌য্‌" এবং 'ক্ষ" সাধারণতঃ "ক্‌ষ" -রূপে, কচিৎ "ছ্‌" -রূপে উচ্চারিত হয়। ফ = ফ = ph, এবং ফ় = ফ় = f—এই দুইটির পার্থক্য হিন্দুস্থানীতে রক্ষিত হয়। হিন্দীতে ব = "ব" (অন্তঃস্থ ব) সর্বত্র ব = "ব' (প-বর্গীয় ব) হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা হয়।

স্বরধ্বনিগুলির হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ-বিষয়ে হিন্দুস্থানী ভাষা বেশ নিয়মানুসারী—বাঙ্গালার মতো হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ, শব্দের দৈর্ঘ্যের বা বাক্যে ইহার অবস্থানের বশবর্তী নহে। হ্রস্ব "অ"-এর উচ্চারণ বাঙ্গালা অপেক্ষা

বিবৃত—ইংরেজির *hut*-এর *u*-এর মতো। "ঐ, ঔ"-এর উচ্চারণ "অ্যায়্, অও"-এর মতো। অনুস্বার হিন্দীতে আছে—উচ্চারণ "ন্"—বাঙ্গালার মতো "ঙ্" নহে; "হংস,বংশ" [=হন্স্, বন্স্]।

উর্দুতে আরবী অক্ষরগুলির উচ্চারণ-বিষয়ে ফার্সীরই অনুসরণ করা হয়। ط , ظ , ض , ص , ذ , ح , ث —এই অক্ষরগুলির শুদ্ধ আরবী ধ্বনি উর্দুতে অজ্ঞাত; ع , ق—কচিৎ এই দুই অক্ষর উচ্চারণের চেষ্টা করা হয় মাত্র।

হিন্দুস্থানীর শ্বাসাঘাত বাঙ্গালার মতো আদ্য অক্ষরে নহে—শব্দের শেষের দিকে যে দীর্ঘ স্বর থাকে, তাহার উপরেই সাধারণতঃ স্বরাঘাত পড়ে। হিন্দুস্থানীতেও সন্ধি আছে, তবে তাহা মৌখিক, লেখায় প্রকাশ করা হয় না।

শব্দ-রূপ

হিন্দুস্থানীতে মাত্র পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ আছে, ক্লীবলিঙ্গ নাই। অর্থ ধরিয়া এবং প্রত্যয় ধরিয়া হিন্দুস্থানী শব্দের লিঙ্গ নির্ণিত হয়—এবং অনেক সময়ে হিন্দুস্থানীর একটি শব্দ কেন পুংলিঙ্গ না হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইল তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; যেমন—"ভাত, হাথ, চনা (=ছোলা), কাগ.জ." হইল পুংলিঙ্গ, কিন্তু "দাল,নাক, রোটী (=রুটি), কেতাব" হইল স্ত্রীলিঙ্গ।

বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গের হইলে, তাহার বিশেষণ স্ত্রীবাচক "-ঈ" প্রত্যয় গ্রহণ করে; সম্বন্ধ-পদের সহিত যে পদের সম্বন্ধ তাহা স্ত্রীলিঙ্গের হইলে, সম্বন্ধের বিভক্তি "-কা"-স্থানে "-কী" হয়; যথা—"অচ্ছা কাগ.জ., অচ্ছী কিতাব; ঘর-কা বেটা, ঘর-কী বহু; ছোটা কাম, বড়ী বাত"।

বহুবচন (১) বিশেষ বিভক্তির দ্বারা, (২) সমষ্টি-বাচক শব্দের যোগে, ও (৩) কেবল একবচনের রূপের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়; যথা "(১) ঘোড়া—ঘোড়ে; বাত—বাতেঁ; লাঠী—লাঠিয়াঁ; (২) রাজা—রাজা-লোগ; বন্দর—বন্দর-লোগ (প্রাণি-বাচক শব্দে); (৩) হাথ—হাথ; কাম—কাম"। প্রথম রীতি—অর্থাৎ, বিভক্তি-যোগে বহুবচন—বাঙ্গালায় বিরল।

হিন্দুস্থানীতে বিশেষ্যের তির্য্যক্ রূপ বা প্রাতিপাদিক রূপ আছে, ইহা এখন বাঙ্গালায় অপ্রচলিত। কর্তৃ-কারক ভিন্ন অন্য কারকে যে-সকল বিভক্তি বা অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হিন্দুস্থানীতে অবিকৃত বিশেষ্য-শব্দের পরে বসে না, সেগুলি বিশেষ্যের একটি পরিবর্তিত রূপের পরে বসে—তাহার নাম Oblique Form অর্থাৎ 'তির্য্যক্ রূপ'; যথা—"ঘোড়া—ঘোড়ে-কা, ঘোড়ে-সে; ঘোড়ে-পর; বহুবচনে—"ঘোড়েঁ—ঘোড়োঁ-কা, ঘোড়োঁ-সে, ঘোড়ো-

(তির্য্যক-রূপ—এক-বচনে "ঘোড়ে", বহুবচনে "ঘোড়োঁ")। বাঙ্গালায় এখন কেবল সর্বনামে এই প্রকারের তির্য্যক্ রূপ আছে।

হিন্দীতে একটি Agentive Case—কর্তৃকারক-স্থানীয় করণ-কারক আছে, সকর্মক ধাতুর অতীত কালের ক্রিয়ার কর্তা রূপে "-নে" বিভক্তি-সহ তাহা ব্যবহৃত হয়; যথা—"রাম-নে শ্যাম-কো দেখা; লড়কে-নে দূধ পিয়া; মৈঁ-নে ভাত খায়া; উস্-নে রোটী খাঈ"। বাঙ্গালায় এই কারকের প্রচলন নাই।

সম্বন্ধ-পদ যে বিশেষ্যর সহিত অন্বিত, সেই বিশেষ্য পুংলিঙ্গে কর্তৃ-কারকে একবচনের হইলে, সম্বন্ধের প্রত্যয় বা বিভক্তি হয় "-কা"; কর্তৃ-কারক ভিন্ন অন্য কারকে একবচনের হইলে, এই "-কা" বিভক্তিটি হইয়া যায় "-কে", এবং বহুবচনে সর্বত্র হয় "-কে"; যথা—"সিপাহী-কা ঘোড়া খড়া হৈ, সিপাহী-কে ঘোড়ে-পর জীন লগাও; সেঠজী-কে তীন ঘোড়ে হৈঁ, সেঠজী-কে তীন ঘোড়োঁ-মেঁ এক ভী অচ্ছা নহী"; ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্তন বাঙ্গালার সম্বন্ধ-পদের বিভক্তি "-র,-এর"-তে নাই।

স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষ্যের সহিত অন্বিত হইলে, সম্ভব হইলে, বিশেষণে স্ত্রী-বাচক "-ঈ"-প্রত্যয় যুক্ত হয়: "কালা ঘোড়া, কালী ঘোড়ী; সুন্দর বালক, সুন্দরী বালিকা; গোরা লড়কা, গোরী লড়কী"; কিন্তু "খূব-সুরৎ লড়কা, খূব-সুরৎ-লড়কী"।

তারতম্য বাঙ্গালার মতো।

সংখ্যাবাচক শব্দ—বাঙ্গালার মতো ১ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক সংখ্যার শব্দ পৃথক্ পৃথক্ প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, ইংরেজির মতো নূতন করিয়া গঠিত নহে; যথা—"পচাস, একাবন, বাবন, তিরপন্, চৌপন্, পচ্পন", ইত্যাদি;—ইংরেজির ধরনে "পচাস, পচাস-এক, পচাস-দো, পচাস-তীন", ইত্যাদি নহে। ক্রম-বাচক প্রত্যয় হিন্দীতে জীবিত, বাঙ্গালার মতো মৃত নহে; "১=পহিলা, ২=দূসরা, ৩=তীসরা, ৪=চৌথা, ৫=পাচবাঁ, ৬=ছঠা, ৭=সাতবাঁ, ৮=আঠবাঁ, ৯=নববাঁ"—সমস্ত উর্ধ্ব সংখ্যাতে এই "বাঁ" প্রত্যয় যুক্ত হয়, ইংরেজির th-এর মতো: 88th="অঠাসীবাঁ"=বাঙ্গালায় "আটাশীর, অষ্টাশীতিতম"।

তাবৎ সর্বনামের তির্য্যক্ রূপ লক্ষণীয়। "মৈঁ—মুঝ; হম—হম; তূ—তুঝ; তুম—তম; বহ-উস্; বে—উন্; যহ—ইস্; য়ে—ইন্; কৌন্—কিস্, বহুবচনে কিন্; জো—জিস্, জিন"; ইত্যাদি।

ক্রিয়া-পদ

ক্রিয়া-পদের বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক কাল-রূপের গঠন-বিষয়ে বাঙ্গালা ও হিন্দীর সাদৃশ্য থাকিলেও, এই দুই ভাষার ক্রিয়া-পদে নানা লক্ষণীয় পার্থক্য আছে।

বর্তমান ও ভবিষ্যতে ক্রিয়ার বচন-ভেদ কর্তার বচন-অনুসারে হয় : "মৈঁ জাউঙ্গা—হম জায়েঙ্গে ; মৈঁ জাউঁ=হম জাএঁ ; মৈঁ জাতা হুঁ—হম্ জাতে হৈঁ"।

সকর্মক ক্রিয়ার অতীতে, কর্মের সহিত ক্রিয়া অন্বিত হয়—ক্রিয়া যেন কর্মের বিশেষণ ; অকর্মক ক্রিয়ার অতীতে, কর্তার বিশেষণের মতো কর্তার সহিতই ক্রিয়া অন্বিত হয় , যথা—অকর্মক, "মৈঁ চলা—হম চলে ; তু চলা—তুম চলে ; বহ্ চলা—বে চলে" ; সকর্মক—"মৈঁ-নে এক লড়কা দেখা—হম-নে এক লড়কা দেখা ; মৈঁ-নে চার লড়কে দেখে—হম-নে চার লড়কে দেখে"। বাঙ্গালায় এই রীতি এখন অজ্ঞাত।

বাঙ্গালার তুলনায়, হিন্দুস্থানীর অতীত কালের ক্রিয়ার তিন প্রকার "প্রয়োগ" একটি লক্ষণীয় পার্থক্য—(১) কর্তরি-প্রয়োগ, (২) কর্মণি-প্রয়োগ, (৩) ভাবে-প্রযোগ। অ-কর্মক ক্রিয়ায়, অতীতে কর্তরি-প্রয়োগ হয়—ক্রিয়া তখন যেন কর্তার বিশেষণ; স-কর্মক ক্রিয়ায়, অতীতে কর্মণি-প্রয়োগ হয়, ক্রিয়া কার্যতঃ কর্মের বিশেষণ (উদাহরণ উপরের অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। ভাবে-প্রয়োগে, স-কর্মক ক্রিয়ার কর্মকে "-কো"-বিভক্তি-যুক্ত করিয়া, পৃথক্ ভাবে রাখা হয়, ইহাতে ক্রিয়া-পদের পরিবর্তন হয় না ; যেমন—"মৈঁ-নে এক লড়কে-কো দেখা, মৈঁ-নে চার লড়কোঁ-কো দেখা ; শঙ্কর-নে দৌড়তে-হুএ পাঁচ ছঃ লড়কোঁ-কো দেখা" (ক্রিয়াপদ "দেখা" অপরিবর্তিত) ; ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এখন কেবল কর্তার-প্রয়োগ বিদ্যমান।

ভবিষ্যৎ কালে, হিন্দুস্থানীর ক্রিয়া, কর্তার বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হয়।

বাঙ্গালার ক্রিয়া-পদ, পূর্ণ-ভাবে ক্রিয়ার রূপেই বিদ্যমান ; ইহাতে বিশেষণের গুণ আর নাই—পুরাতন বাঙ্গালায় তাহা ছিল—প্রয়োগ-বিষয়ে হিন্দুস্থানীর সহিত পুরাতন বাঙ্গালার মিল ছিল।

হিন্দীতে পরিচালিত বা আরোপিত ণিজন্ত ক্রিয়া আছে—বাঙ্গালায় নাই।

হিন্দীতে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রীতি বাঙ্গালার মতো।

যৌগিক-ক্রিয়া হিন্দীতে বাঙ্গালার মতো প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

বাক্য-রীতি

মোটের উপর বাঙ্গালার সঙ্গে খুবই মিল আছে।

১। কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া: "উস্-নে খানা খায়া"।

২। সংযোজক অস্ত্যর্থক ক্রিয়া স্পষ্ট থাকে: "য়হ মেরা ভাঈ হৈ"।

৩। নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে: "মৈঁ নহীঁ দূঁগা"।

৪। প্রত্যক্ষ উক্তির সমধিক ব্যবহার।

৫। কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দুস্থানীতে বেশি ব্যবহৃত হয়।

শব্দাবলী

বাঙ্গালার মতো হিন্দুস্থানীতেও, ভাষার শব্দগুলি প্রাকৃত-জ ও দেশী, তৎসম, অর্ধ-তৎসম এবং বিদেশী প্রভৃতি শ্রেণীতে পড়ে। তবে উর্দুতে সংস্কৃত শব্দ অত্যন্ত কম, ফার্সী ও আরবী শব্দের অনুপাত খুবই বেশি, শতকরা ৫০ কি তাহার অধিক হইবে; আবশ্যক হউক বা অনাবশ্যক হউক, উর্দু-লেখক-গণ অবাধে আরবী ও ফার্সী অভিধান হইতে শব্দ আনিয়া ব্যবহার করেন,—সংস্কৃতের কথা স্বপ্নেও মনে আনেন না। হিন্দীর জন্য সংস্কৃতের ভাণ্ডার খোলা, কিন্তু উর্দুর মারফৎ এবং চলতি হিন্দুস্থানীর মারফৎ বহু আরবী-ফার্সী শব্দ হিন্দীতেও আসিয়া গিয়াছে। চলতি হিন্দুস্থানীতে এই দুইয়ের সামঞ্জস্য দেখা যায়—তবে চলতি হিন্দুস্থানীতে উচ্চ-ভাবের বিষয়ের আলোচনা নাই; আজকাল ইংরেজি শব্দও অনেক পরিমাণে হিন্দুস্থানীতে স্থান লাভ করিতেছে—এই সব ইংরেজি শব্দ, উত্তর-ভারতের উচ্চারণ-রীতি ধরিয়া পরিবর্তিত হয়, বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট ইংরেজি শব্দের মতো এগুলির রূপ হয় না (যেমন "কালিজ, কমেটী, য়ুনিবর্সিটী, রেলবে, শার্ট্‌হৈণ্ড, আনররী-মৈজিস্‌ট্রেট", ইত্যাদি)। দুই-পাঁচটা বাঙ্গালা শব্দও হিন্দুস্থানীতে স্থান লাভ করিয়াছে (যেমন "গম্‌ছা, রস্‌গুল্লা, কবিরাজী, জোগাড়, তাড়াতাড়ি, কালী")। আবার বহু হিন্দুস্থানী শব্দও বাঙ্গালায় আসিয়া গিয়াছে।

আরবী ও বাঙ্গালা

বাঙ্গালা ও আরবী উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্যই অধিক, কারণ এই দুই ভাষা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন দুইটি ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী, ফার্সী ও ইংরেজি প্রভৃতি আর্য্য-গোষ্ঠীর ভাষার গঠন-প্রণালী, এবং শেমীয়-গোষ্ঠীর ভাষা আরবীর গঠন-প্রণালী, নানা দিক্ দিয়া

পরস্পর হইতে খুবই পৃথক্। আর্য্য-ভাষার শব্দ-সৃষ্টি এইরূপে হয় : প্রথমে আসে ধাতু (সরল রূপে, অথবা গুণ ও বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ দ্বারা, কিংবা ধাতুর অভ্যন্তরে "ন"-যুক্ত অক্ষর বা "ন"-ধ্বনির আগম করিয়া, পরিবর্তিত রূপে); তৎপরে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় জুড়িয়া দেওয়া হয়। কচিৎ বা উপসর্গ আসিয়া ধাতুর পূর্বে বসে। আর্য্য-ভাষার ধাতু সাধারণতঃ monosyllabic বা একাক্ষর—এবং এই একাক্ষর ধাতুর পরিবর্ধিত রূপ হিসাবে, দ্ব্যক্ষর বা ত্র্যক্ষর ধাতুও আদি আর্য্য-ভাষায় পাওয়া যাইত; কিন্তু আধার ছিল—একাক্ষর ধাতু। কুত্রাপি ধাতুর অভ্যাস বা দ্বিত্ব-ভাব ঘটে; যথা—"(সংস্কৃত) √চল্—চল্-অ-তি, চাল্-অয়্-অ-তি, প্র-চল্-ইত, চ-চাল্-অ; √ ভূ—ভব্-অ-তি, ব-ভূব্-অ, ভবি তুম্; √লুপ্—লু-ম্-প-অ-তি, √রুধ্—রু-ণ-ধ্-তি = রুণদ্ধি"; "(বাঙ্গালা) √কর্—কর্-ইল্-আম"; "(ইংরেজি) sleep—slep-t, sleep-er, sleep-ing, sleep-ing-ly"; ইত্যাদি।

আরবীর ধাতুগুলি সাধারণতঃ triliteral বা ত্রি-ব্যঞ্জনময়; ধাতুর এই তিনটি ব্যঞ্জন-ধ্বনির পূর্বে ও পরে প্রত্যয় বসিতে পারে: কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের স্বর-ধ্বনির, এবং কতকগুলি বিশেষ ব্যঞ্জন-ধ্বনির আগম-দ্বারা, এই ত্রি-ব্যঞ্জনময় ধাতুর অভ্যন্তরে যে প্রকারের পরিবর্তন ঘটে, তাহাই আরবী হিব্রু প্রভৃতি শেমীয় শ্রেণীর ভাষার বৈশিষ্ট্য; যথা—ك , ت , ب বা كتب k-t-b "ক্-ত-ব্" এই তিনটি ধ্বনি মিলিয়া একটি ধাতু, অর্থ—"লিখ্" বা "লেখা"; ইহা হইতে আভ্যন্তর স্বর-পরিবর্তনে, এবং আদিতে, মধ্যে, ও অন্তে নানা ব্যঞ্জন-যোগে ও স্বর-যোগে শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে—كَتَبَ *kataba* "কাতাবা" (হ্রস্ব-আ) = 'সে লিখিল, লিখিয়াছে, লিখিয়াছিল'; كُتِبَ *kutiba* "কুতিবা" = 'ইহা লিখিত হইয়াছে'; يَكْتُبُ *ya-ktuba* "য়াক্তুবু" = 'সে লেখে, লিখিবে'; كَتَبْتُ *katab-tu* "কাতাব্-তু" = 'আমি লিখিয়াছি'; كَتَّبَ *kattaba* "কাত্তাবা" = 'সে পুনঃপুনঃ লিখিল'; كَاتِبٌ *kātibun* "কাতিবুন্" = 'যে লেখে, লেখক'; كِتَابٌ *kitābun* "কিতাবুন্" = 'বই, কেতাব'; كُتُبٌ *kutubun* "কুতুবুন্ = বইগুলি'; مَكْتُوبٌ maktūbun "মাক্তুবুন্" = 'লিখিত'; مَكْتَبٌ *maktabun* "মাক্তাবুন্" = 'লিখন-স্থান, বিদ্যালয়, মক্তব'; ইত্যাদি।

তদ্রূপ ن, ظ, ر = نظر বা n-ðw-r বা n-ẓ-r "ন্-ধ্ব্-র্, বা "ন্-জ.-র্"—এই ত্র্যক্ষর ধাতুর অর্থ 'দেখা'; نظر naẓara "নাজ.ারা" = 'সে দেখিল'; ناظر nāẓirun "নাজি.রুন্" = 'যে দেখে, পরিদর্শক, নাজির'; نظر naẓrun "নাজ্.রুন্" = 'দেখন, দর্শন, দৃষ্টি, নজর'; منظور manẓūrun "মান্‌জ্.রুন্" = 'দেখা, দৃষ্ট, দৃষ্ট ও অনুমোদিত, মঞ্জুর'; ইত্যাদি। আরবী ভাষায় সমস্ত ধাতুতেই এক-ই প্রকারের স্বর-ধ্বনির আগমনে ও এক-ই প্রকারের উপসর্গ- রূপী প্রত্যয় এবং অন্য প্রত্যয়ের যোগে, ধাতুর রূপের পরিবর্তন ঘটে, ও সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হয়। একটি স্থির-নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতি অথবা আদর্শ অনুসারে এই পরিবর্তন সব ধাতুতেই হয়; 'আরবী কায়দা হেলে না'—সেই আদর্শকে আরবী ব্যাকরণে وزن wazn "বজ্.ন্" অর্থাৎ 'তৌল' বা 'মান' বলে। 'কর্' বা 'করণ' অর্থে فعل f'l (ف, ع, ل—এই তিন ব্যঞ্জন ধ্বনির সমাবেশে জাত) "ফ.'ল" ধাতু হইতে গঠিত বিভিন্ন রূপকে, আর সমস্ত ধাতু-সম্পর্কে ওজন বা মান বলিয়া ধরা হয়; যেমন, "কিতাবু" = 'কেতাব' শব্দকে বলা হয়, ইহা "কাতাবা"-র "ফি.'াল" ওজনে গঠিত; "নাজি.রু" 'নাজির' ও "মান্‌জ্.রু" 'মঞ্জুর' শব্দদ্বয়কে তেমনি বলা হইবে, এই দুইটি যথাক্রমে "ফ.া'ইলু" ও "মাফ.'উলু" ওজনে "নাজ.ারা" হইতে গঠিত।

অল্প কতকগুলি আরবী ধাতু চারি ব্যঞ্জনে, ও কতকগুলি ধাতু দুই ব্যঞ্জনে গঠিত হয়।

ব্যাকরণ-ঘটিত এই-সব পার্থক্য ছাড়া-ও, আর্য্য ও শেমীয় ভাষায় ধাতু ও শব্দের আকার অর্থাৎ ধ্বনিতে খুবই বেশি পার্থক্য আছে—এই দুই শ্রেণীর ভাষার ধ্বনি মোটেই মিলে না। আরবীর ও অন্য শেমীয় ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট ধ্বনি আছে, সেগুলি আর্য্য-ভাষায় অজ্ঞাত।

আরবী ধ্বনি

সাধু অর্থাৎ প্রাচীন-সাহিত্যের আরবীতে, আমাদের ভারতীয় ভাষার "শ" ভিন্ন তালব্য বর্গের, এবং মূর্ধন্য বর্গের ধ্বনিগুলি নাই; মহাপ্রাণ বর্ণ-গুলি—যথা, "খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ"—নাই; "ড়, ঢ়" নাই; কণ্ঠ্যবর্ণের মধ্যে "গ" ও ওষ্ঠ্য বর্ণের মধ্যে "প" নাই। আরবী ج অক্ষরের প্রাচীনতম উচ্চারণ ছিল "গ" বা "গ্য", এখন বিভিন্ন আরব দেশে ইহার নানা উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে; যথা—"j = জ" (আরব-উপদ্বীপে ও ইরাকে), "zh = ঝ়" (শাম বা সিরিয়াতে); কেবল মিসরে পুরাতন "গ" উচ্চারণ বহাল আছে।

আরবী ث হইতেছে উষ্ম "থ.", অর্থাৎ ইংরেজি think, three প্রভৃতি শব্দের th; আরবী ذ = উষ্ম "ধ.", ইংরেজি this, that শব্দের th (বা dh); خ غ হইতেছে উষ্ম "খ." ও উষ্ম "ঘ."—পূর্ব-বাঙ্গালার স্থানীয় লোক-ভাষায় মিলে, সাধু ও চলিত বাঙ্গালায় অজ্ঞাত (ফার্সীতেও এই দুইটি ধ্বনি আছে); ح ع = ḥ এবং '—আলজীভের নীচে Pharynx বা গলবিলের মধ্যে উচ্চারিত অঘোষ ও ঘোষবদ্ উষ্ম দুই ধ্বনি—এই দুইটি বিশেষ-ভাবে শেমীয় ধ্বনি—আর্য্য-ভাষায় এই দুইটি অজ্ঞাত; ق = q—আলজীভের কাছাকাছি উচ্চারিত "ক্ক" বা "ক.", ভারতের ভাষায় নাই; এবং ص ض ط ظ—যথাক্রমে ঈষৎ-উ-কার বা অন্তঃস্থ-ব-কার-সম্পৃক্ত দন্ত্য বা দন্তমূলীয় "স, দ, ত" এবং উষ্ম "ধ."-এর ধ্বনি (ص = স্ব্, ض = দ্ব্, ط = ত্ব্, ظ = ধ্ব্)—এগুলিও ভারতের পক্ষে নিতান্ত বিদেশী ধ্বনি; এই কয়টি বর্ণের উচ্চারণের সময়ে, জীভের সামনের দিক্, দাঁত অথবা দন্তমূলের দিকে আসে বা সেখানটা স্পর্শ করে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে জীভের পিছন দিক্-ও কোমল-তালুকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় উত্তোলিত হয়—তাহাতেই উ-কার বা ব-কারের আমেজ আসে; এই গুণকে আরবী-ব্যাকরণকারগণ اطبق "ইৎবক্" বলেন। আরবীর ء (همزة hamza) হইতেছে, পূর্ব-বঙ্গের হ-কার। আরবী ভাষায় এই ২৭টি ব্যঞ্জন-ধ্বনি আছে—ء, ب, ت, ث, ج, ح, خ, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ: ع, غ, ف, ق, ك, ل, م, ن, و, ه, ي; এগুলির মধ্যে ১৪টি সাধু বাঙ্গালায় ও চলিত-বাঙ্গালায় অজ্ঞাত। কতকগুলি ধ্বনি বিশেষ-ভাবে শিক্ষা না করিলে, বাঙ্গালীর জীভে উচ্চারণ করাও কঠিন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় আরবীর ব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলি উচ্চারণ-স্থান-অনুসারে সাজাইয়া দেখানো হইয়াছে।

অপর পক্ষে, আরবীর স্বর-ধ্বনিগুলি খুব-ই সরল—হ্রস্ব "অ, ই, উ", দীর্ঘ "আ, ঈ, ঊ", সংযুক্ত স্বর "আয়্, আব্"; আরবীর "অ, আ", উভয়-ই উচ্চারণে কতকটা বাঙ্গালার বাঁকা এ-কারের মতো, অর্থাৎ অ্যা-কার-ঘেঁষা।

সন্ধি

আরবীতে সন্ধি আছে, কিন্তু তাহা লেখায় প্রকাশিত হয় না; যেমন—আরবীর Definite Article বা নির্দেশক উপসর্গ ال 'al- "'আল্"-এর "ল্", কতকগুলি অক্ষরের পূর্বে আসিলে, সেই অক্ষরগুলিকে দ্বিত্ব করিয়া

আরবী ভাষার ব্যঞ্জন-ধ্বনি

	কণ্ঠনালী শ্বাসনালীয় বা কাকল-জাত)	গলবিল Pharynx	অলি-জিহ্বা	কোমল তালু	কঠিন তালু	দন্তমূল	দন্ত	ওষ্ঠ
স্পৃষ্ট	ʼ = ء (hamza)		q ক (ق)	k ক (ك)	g′ = j জ (ج)		t ত (ت), d দ (د)	b ব (ب)
উ-মিশ্র (কণ্ঠ্যীকৃত) স্পৃষ্ট (muṭbaq, velarised)						dwদ্ব(ص)	tw ত্ব (ط)	
নাসিক্য				ŋ = ঙ (ن) (ك এর পূর্বে)	ñ = ঞ (ن) (ج এর পূবে)		n ন (ن)	m ম (م, ن)
কম্পন-জাত						r র (ر)		
পার্শ্বিক						l ল (ل)		
উষ্ম	h হ (ه)	ḥ হ্’ (ح) ‘ (ع)		kh খ (خ) g^h (غ)	š শ (ش)	s স (س) z জ. (ز)	δ ধ. (ذ) θ থ. (ث)	f ফ. (ف)
উ-মিশ্র (কণ্ঠ্যীকৃত) উষ্ম (muṭbaq, velarised)						swস্ব (ض)	δwধ্ব(ظ)	
অর্ধস্বর					y য় (ي)			w ব (و)

সংখ্যা গঠিত হয়; যথা— ثلاثة "থ.লাাথ.াতুন্" = 'তিন' (পুং), ثلاث বা ثلث "থ.লাাথু.ন্" = 'তিন' (স্ত্রী),—ক্রম-বাচক ثالث "থ.াালিথু.ন্" = 'তৃতীয়' (পুং—ইহার অর্থ দাঁড়ায় 'তৃতীয় ব্যক্তি'—তাহা হইতে বাঙ্গালা 'সালিস'= 'নিরপেক্ষ ব্যক্তি'); ثالثة 'থ.াালিথ.াতুন্' = 'তৃতীয়া' (স্ত্রী); এবং ভগ্নাংশ-বাচক ثلث "থু.ল্থু.ন্" = 'এক-তৃতীয়াংশ'।

ক্রিয়া-পদ

আরবী ক্রিয়া-পদ-গঠনের রীতিও সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব—বাঙ্গালা প্রভৃতির সঙ্গে কোনও মিল নাই। আরবীতে দুইটি মাত্র মৌলিক কাল-রূপ আছে—একটি সাধারণ অতীত, অন্যটি Aorist বা অনির্দিষ্ট-কাল-বাচক (ভবিষ্যৎ ও বর্তমান)। ত্রি-ব্যঞ্জনময় ধাতুগুলিকে পনেরো রকমের শ্রেণীতে ফেলা যায়—অবশ্য প্রত্যেক ধাতুকে সমস্ত শ্রেণীতে পাওয়া যায় না, কোনও একটি ধাতু আটটি বা দশটি মাত্র শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে। এই পনেরোটি শ্রেণীতে অতীত ও অনির্দিষ্ট দুই রকম-ই কাল-রূপ আছে। এই-সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কাল-রূপ এবং কতকগুলি Auxiliary Verb বা সহায়ক-ক্রিয়ার সাহায্যে, আরবীতে ক্রিয়ার অন্য নানা কাল-রূপ ও প্রকার (বা ভাব) প্রদর্শিত হয়। অস্তিবাচক ধাতু كان "কানা" -র সাহায্যে, কতকগুলি যৌগিক কাল-রূপ গঠিত হয়।

ধাতু বা ক্রিয়ার বিভিন্ন শ্রেণী, যথা—(১) كتب "কাতাবা" (নির্দেশক), (২) كتّب "কাত্তাবা" (পৌনঃপুনিক), (৩) كاتب "কাতাবা" (পারস্পরিক বা ব্যতীহারিক), (৪) اكتب "আক্তাবা" (প্রযোজক), (৫) تكتّب "তাকাত্তাবা" (দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মনিষ্ঠ ভাব), ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ক্রিয়ার কাল-রূপে, মধ্যম- ও প্রথম-পুরুষে তিন বচন ও দুই লিঙ্গ হয়,—কেবল উত্তম-পুরুষে লিঙ্গ-ভেদ ও দ্বিবচন নাই, ও মধ্যম-পুরুষে দ্বি-বচনে লিঙ্গ-ভেদ নাই। ক্রিয়ার দুই বাচ্য আছে—কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য; বিভিন্ন 'ওজন'-দ্বারা বাচ্য নির্দিষ্ট হয়।

বাক্য-রীতি

আরবীর বাক্য-রীতি সরল ও যৌগিক—মিশ্র বাক্য-রীতি প্রচলিত নাই। বিভক্তি-বহুল ভাষা বলিয়া, প্রাচীন আরবীতে বাক্যে শব্দের ক্রম বা ধরা-বাঁধা-

নিয়ম পালন না করিলেও চলে। আরবীতে সমাস হয় না—সম্বন্ধ-পদ পরে বসে; যেমন—বাঙ্গালায় "ঈশ্বর-দাস" (=ঈশ্বরের দাস), আরবীতে عَبْدُ اللّٰهِ "'আব্‌দু 'আল্‌লাহি (=আব্‌দুল্লাহ্)" (=দাস ঈশ্বরের)। অত্যর্থক ধাতু প্রায়ই উহ্য থাকে। ক্রিয়াকে প্রথমে বসাইয়া বাক্য আরম্ভ করা হয়: قَالَ اللّٰهُ "কালা-ল্লাহু" অর্থাৎ 'বলিলেন ঈশ্বর'='ঈশ্বর বলিলেন'। ইংরেজির মতো Sequence of Tenses-এর বিধি নাই। আরবী বাক্য-রীতি বহু বিষয়ে অত্যন্ত সরল, প্রত্যক্ষ, এবং আদিম-প্রকৃতিক—চিন্তায় জটিলতা-বর্জিত। বাঙ্গালা হইতে এ বিষয়েও অতি লক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান।

শব্দাবলী

আরবী খুব-ই 'স্বদেশী' ভাষা—নিজ ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগে আবশ্যক শব্দ খুব সুন্দর-ভাবে গঠন করিতে পারে। এ বিষয়ে আরবীকে পৃথিবীর অন্যতম মৌলিক ভাষা বলা যায়—সংস্কৃত গ্রীক, লাতীন ও চীনার মতো। কিন্তু তাহা হইলেও, আরবীতে গৃহীত বাহিরের বিদেশী শব্দ, সংখ্যায় কম নহে। সিরীয় হিব্রু, গ্রীক, ঈরানী প্রভৃতি ভাষা হইতে আরবী শব্দ গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইয়াছে—এমন কি দুই-চারিটি ভারতীয় (সংস্কৃত ও অন্য) শব্দ-ও আরবীতে স্থান লাভ করিয়াছে (যথা—"নার্‌জীল <নারগীল"='নারিকেল'; "সুক্কর"='শর্করা')।।

●

বাঙ্গলা ভাষার রূপ-বিবর্তন

বাঙ্গলা ভাষার বংশপীঠিকা এইরূপ:— বৈদিক কথিত ভাষার রূপ-ভেদ > প্রাচ্য অঞ্চলের কথিত ভাষা > কথিত মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ > প্রাচীন বাঙ্গলা > মধ্যযুগের বাঙ্গলা > আধুনিক বাঙ্গলা। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা দেখাইবার জন্য, নীচে আধুনিক বাঙ্গলার নিদর্শন হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা হইতে দুইটি ছত্র উদ্ধার করিয়া, বাঙ্গলা ভাষার পূর্ব-পূর্ব যুগে এই দুই ছত্রের প্রতিরূপ কী রকম থাকা সম্ভব ছিল, তাহা প্রদর্শিত হইল। আলোচনার সুবিধার জন্য তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ 'তরী'-কে বাদ দিয়া তাহার জায়গায় নৌকা-বাচক তদ্ভব শব্দ 'না' ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং প্রাচীন রূপ 'উহারে'-কে বর্জন করিয়া আধুনিক 'ওরে'-কে গ্রহণ করা হইয়াছে।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে—
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।

'সোনার তরী', ফাল্গুন ১২৯৮

আধুনিক বাঙ্গলা

গান গেয়ে না বেয়ে কে আসে (=আশে) পারে—
দেখে যেন (=জ্যানো) মনে হয়, চিনি ওকে (=ওরে) ॥

মধ্যযুগের বাঙ্গলা (আনুমানিক ১৫০০খ্রীঃ অঃ)

গান গায়্যা (গাইয়্যা) নাও বায়্যা (বাইয়্যা) কে আশ্যে (আইশে) পারে—
দেখ্যা দেইখ্যা) জেন্অ (জেন্হ, জেহেন) মনে হোএ, চিনী
(চিন্হীয়ে) ওআরে (ওহারে, ওহাকে) ॥

প্রাচীন বাঙ্গলা (অনুমানিক ১১০০ খ্রীঃ অঃ)

গাণ গাহিআ নাব বাহিআ কে আইশই (আরিশই) পারহি (পালহি)—
দেখিআ জৈহণ মণে (মণহি) হোই, চিন্হিঅই ওহারহি (ওহাকহি) ॥

মাগধী অপভ্রংশ (আনুমানিক ৭০০খ্রীঃ অঃ)

গাণঁ গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ কই (কি) আরিশই পারহি (পালহি)—
দেক্খিঅ জইহণ (জইশণঁ) মণহি হোই, চিণ্হিঅই ওহঅলহি
(ওহঅন্নহি ; ওহকহি) ॥

মাগধী প্রাকৃত (অনুমানিক ২০০ খ্রীঃ অঃ)

গাণং গাধিআ (গাধিত্তা) নাবং বাহিঅ (বাধিত্তা) কগে (কএ, কে)
আরিশদি পারধি (পালধি)—
দেক্খিঅ (দেকখিত্তা) যাদিশণ মণধি ভোদি (হোদি), চিণ্হিঅদি
অমুশ্শকলধি (অমুশ্শকদে) ॥

প্রাচ্য প্রাকৃত (আনুমানিক ৫০০খ্রীঃ পূঃ)

গানং গাথেত্বা নাবং বাহেত্বা ককে (কে) আরিশতি পালধি (পালে)—
দেক্খিত্বা যাদিশনং (যাদিশং) মনধি (মনশি) হোতি (ভোতি), চিন্হিয়তি
অমুশ্শ কলাধি (কলে কতে) ॥

কথিত বৈদিকের রূপ-ভেদ (আনুমানিক ১০০০খ্রীঃ পূঃ)

গানং গাথয়িত্ব ন বং বাহয়িত্ব ককঃ (=কঃ) আরিশতি পারধি (পারে)—
দৃক্ষিত্বা (=দৃষ্ট্বা) যাদৃশং মনোধি (মনসি) ভবতি, চিহ্ন্যতে অমুষ্য (+করধি,
করে, কৃতে) ॥